আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত

রচনাবলী

স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনাবলী

সম্পাদনা

শ্রীমতী বাণী রায়

রামায়ণী প্রকাশ ভবন

১০৬/১, রাজা রামমোহন সরণী

কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা—শ্রীমনোজ বিশ্বাস

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—আঞ্চলিক ভাষা উন্নয়ন প্রকল্প—
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তায় সুলভ মূল্যে প্রকাশিত।

মূল্য—আঠারো টাকা মাত্র

রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১০৬।১, রাজা রামমোহন সরণী, কলিকাতা-৯ হইতে
শ্রীশান্তি সান্যাল কর্তৃক প্রকাশিত ও সত্যনারায়ণ প্রেস, ১, রমাপ্রসাদ
রায় লেন, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীহরিপদ পাত্র কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে

বিশ্বনারীদের উদ্দেশে—

প্রকাশনা উপসমিতি

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ রাজ্যস্তর সমিতির

প্রকাশনা উপসমিতি

কমলা দাশগুপ্ত

অশোকা গুপ্ত

কল্যাণী প্রামাণিক

মঞ্জুশ্রী সিংহ

বাণী রায় (আহ্বায়িকা)

পৃষ্ঠাঙ্ক

জীবনী ও সাহিত্যকৃতি

স্বর্ণকুমারী দেবী সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে লিখিত ভাবে যা বলেছি, সভাস্থলে যা বলেছি, আজ স্পষ্ট ভাষায় সেই কথাটিই আবার বলতে চাই, স্বর্ণকুমারী দেবীর চরম দুর্ভাগ্য, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজা রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

আমার এম্ববিধ উক্তি আমাকে বাতুল অথবা নির্বোধ অথবা উদ্ধতভাষী প্রতিপন্ন করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত কথা আমি বলতে চাই যে, আসমুদ্রহিমাচল ব্যাপ্ত, সারাপৃথিবীস্পর্শী প্রতিভাধর অনুজ রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির অন্তরালে এই অসাধারণ লেখিকা অদ্যাপি সম্পূর্ণ আবৃত হয়ে আছেন। তাঁর যা প্রাপ্য তিনি তা পাননি। কেন অদ্যাপি আমার কা-ছ কারণ অজ্ঞাত।

স্বর্ণকুমারী দেবী ওই অসামান্য ঠাকুরপরিবারে জন্ম গ্রহণের ফলে সে যুগের স্ত্রীজাতির পক্ষে দুর্লভ শিক্ষা ও সাহিত্যের আবহাওয়া পেয়েছিলেন অবশ্য।

আনুমানিক ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দশম সন্তান ও চতুর্থী কন্যা স্বর্ণকুমারী জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন প্রথানুযায়ী ও ঠাকুরবাড়ীর বিশিষ্ট ধারানুযায়ী তিনি স্কুলকলেজের মুখ দর্শন করেন নি। অন্তঃপুরে অবশ্য স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত ছিল বহুল পরিমাণে ও বিভিন্ন শাখায়। মহর্ষি নিজে ও তাঁর পুত্রগণ এ বিষয়ে অতিশয় উৎসাহী ছিলেন। সুতরাং শিক্ষাসংস্কৃতি ললিতকলা সাধনায় ঠাকুরপরিবারের বধূ ও কন্যাবৃন্দ সে সময়ে অগ্রণী ছিলেন। তাঁদের নিজস্বধারায় শিক্ষা-সাহিত্য-সঙ্গীত, বেশবিন্যাস, রূপচর্চা, গৃহসজ্জা, বৃক্ষপালন, আহার্যনির্মাণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁরা এক এক ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। 'ঠাকুরবাড়ীর ষ্টাইল' নামক কথাটির তাই উৎপত্তি হয়েছিল।

সাধারণতঃ রূপসী এই রমণীকুল ওই বাড়ীর পুরুষপ্রতিভার অনুসারী ছিলেন।

কখন কোন সময়ে কার ক্ষেত্রে এই অনুসরণ দিকপ্রদর্শনে পরিণতি লাভ করত, কয়জন সেটি স্মৃতিগ্রথিত রেখেছে ?

স্বকীয় প্রতিভায় উজ্জ্বল—ভাস্বর একটি নাম, সেই প্রাসাদোপম গৃহ, সেই যুগকে অতিক্রম করে সাহিত্যজগতে আপন মহিমায় স্বাধীন পদক্ষেপে প্রতিষ্ঠিত—তিনি স্বর্ণকুমারী।

এ কথা সত্য স্বর্ণকুমারী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইত্যাদির সহোদরারূপে জোড়াসাঁকোর বিশিষ্ট ধনী ও গুণীজনগৃহে জন্মমাত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। স্মরণীয়দের স্মরণসূত্রে তাঁরও নাম সর্বদা উচ্চারিত হত। তজ্জন্য তাঁকে আয়াস স্বীকার করতে হত না। ওখানে আবির্ভাবের ফলে যে শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন, জীবনের নানাক্ষেত্রে যতদূর সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলেন, সে-সব তিনি অন্যত্র পেতেন কিনা সন্দেহ।

তবু আমার এ আক্ষেপ কেন ?

কারণ তাঁর পটভূমিকা, সহোদরমহিমা, বংশগরিমা প্রভৃতি থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্নতায় পর্যালোচনা করে দেখেছি সাহিত্যসৃষ্টির উৎকর্ষে শুধু নয় সাহিত্যসৃষ্টির বৈচিত্র্যে তিনি অদ্যাপি অতুলনীয়া।

তবে কলেজস্ট্রীটের ফুটপাথের দোকানে দিনের পর দিন সন্ধান করে করে আমাকে তাঁর গ্রন্থাবলী উদ্ধার করতে হল কেন ?

স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর চতুষ্পার্শ্বের সাহিত্যিকদের উপর থিসীস্ লিখে কোন পণ্ডিত ডক্টর উপাধি অর্জন করলেও স্বর্ণকুমারীর একখানি গ্রন্থও বাজারে পেলাম না কেন ?

'বিশ্বভারতী'র মহৎ ও বৃহৎ প্রকাশনাপ্রয়াসে স্থান পেয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর নেহাৎ মামুলী 'টাকডুমাডুম' ও 'সাত ভাই চম্পা'। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর অজস্র রচনাসম্ভাবের মধ্যে একখানিও সেখানে নেই কেন ?

যে-কোন সাহিত্যপাঠকের কাছে এ প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। আইনগত বাধা, ইচ্ছাগত অনীহা অথবা সম্পর্কগত তিক্ততা কিম্বা অনধাবনগত অবহেলা, কোন্‌টা এক্ষেত্রে প্রয়োজ্য ?

আমি রবীন্দ্রজীবনীকার নই, শান্তিনিকেতন ও জোড়াসাঁকোর সঙ্গে আমার ব্যবধান পর্বতপ্রমাণ, অতএব আমি কিছু জানি না।

জানি শুধু এই লেখিকার প্রতি সুবিচার হয়নি। তিনি রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা

আনুমানিক ছয় বৎসরের বড়। শৈশব থেকে তাঁরা সাহিত্যজীবন আরম্ভ করেছিলেন। পর পর ভ্রাতা ও ভগিনীর পুস্তক প্রকাশিত হত প্রতি বৎসরে। স্বর্ণকুমারীর তের বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। তিনি তখনই লেখিকা।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় স্বর্ণকুমারীর অবদান অপরিসীম। উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক, গীতিনাট্য, গান, হাস্যকৌতুক, প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ভ্রমণ, গাথা, প্রহসন, কাব্যনাটক, শিক্ষাপুস্তক প্রভৃতি অসংখ্য রচনা তাঁর। পত্রসাহিত্যও দেখি। ইংরেজি ভাষায় যথেষ্ট অধিকার তাঁর দেখা যায়। 'The Unfinished Song' অর্থাৎ 'কাহাকে'র অনুবাদ ও মূরের অনুবাদ। নিজের গানের অধিকাংশ সুর স্বর্ণকুমারী স্বয়ং সংযোজন করেন।

এছাড়া স্বর্ণকুমারী কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। সুদীর্ঘকাল 'ভারতী' পত্রিকার তিনি সম্পাদন করে মহিলাজগতে সাংবাদিকতায় পথিকৃৎ হন।

স্বর্ণকুমারীর স্বদেশসেবা, সমাজসেবা নিয়ে যথেষ্ট প্রশংসা করা যায়। তাঁর পরিণয় হয় একজন অতি যোগ্য ও উচ্চশিক্ষিত আধুনিক যুবক কৃষ্ণনগরের জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর রবিবারে। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে প্রথমা কন্যা হিরণ্ময়ীর জন্মের পরে জানকীনাথ স্বর্ণকুমারীকে বোম্বাই শহরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে পাঠান ইংরেজী শিক্ষাহেতু। স্বামীর কাছ থেকে সর্ববিধ সাহায্য ও উৎসাহ পাওয়ার ফলে এবং কংগ্রেস নেতা, উচ্চপদারূঢ়, অতি আধুনিক স্বামীর ও পিতৃকুলের বিশিষ্ট সামাজিক পরিমণ্ডলে বিচরণের ফলে স্বর্ণকুমারী যা অভিজ্ঞতা ও বহির্জগতের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন বর্তমানের লেখিকারাও সে অভিজ্ঞতার স্বাদবর্জিত। পাশ্চাত্য ভাষা ও পুস্তকের সঙ্গে বহুল পরিচয়, তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দের সাহচর্যে সাহিত্যিক আবহাওয়ায় নিয়ত উপস্থিতি স্বর্ণকুমারীর রচনায় যে বিশিষ্টতার ছাপ ও বিভিন্ন আঙ্গিক মাধ্যমে যে নিপুণতা দেখি তাতে আমরা বিস্ময়বোধ করি।

অসাধারণ সক্ষমা এই লেখিকার সম্পর্কে আমাদের প্রধান চিন্তা কি? ইনি প্রকৃতপক্ষে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিকা 'দীপনির্বাণ' উপন্যাসের রচয়িত্রী হিসাবে, এই নাকি? ইনি নারীরচনায় পথিকৃৎ হিসাবে সযত্নে প্রাতঃস্মরণীয়া, এই নাকি? নারী নয়, নর নয় স্বর্ণকুমারী একজন অসামান্য লেখক ছিলেন, এই তাঁর একমাত্র সংজ্ঞা।

আজ অতি বেদনায় গলাবাজী করে আমাকে নারীবর্ষের দোহাই পেড়ে যৎকিঞ্চিৎ সরকারী অনুদান সংগ্রহ করতে হচ্ছে এই সমস্ত বিস্মৃতপ্রায় লেখিকার রচনার পুনরুদ্ধারের জন্য। সত্য কথা, স্বর্ণকুমারী নামে বেঁচে আছেন, কিন্তু কয়জন তাঁর একটিও লেখা পড়েছেন? অমানুষিক পরিশ্রম করে আমি 'লেখিকামন' নামক একটি গল্পসংকলন করেছিলাম স্বর্ণকুমারী ও অন্যান্য বিস্মৃত লেখিকা থেকে বর্তমান পর্যন্ত। স্থিতিশীল প্রকাশক পাইনি, অধুনা বইখানির অবিক্রিত খণ্ডগুলি উদ্ধার করতে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানের সাধ্য আমার নেই।

আজকাল অনেক লেখিকা বলে থাকেন: নারী রচনাকারের সঙ্গে গ্রথিত হতে চাই না আমি, একজন লেখক এই আমার একমাত্র পরিচয় থাক।

একথা আমিও বলেছি—পঁচিশ বৎসর পূর্বে বলেছি। লিখিত ভাবে বলেছি: আচার জ্যামজেলির মত বোতলের লেবেল এঁটে নারীসাহিত্যকে পৃথকীকরণের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হয়তো এখনও নেই। কিন্তু নারীলেখকের লেখা সংরক্ষিত হচ্ছে না কেন? তাহলে আমাদের দাবী তুলতেই হয়—অনুদানের আনুকূল্যে এ যাবৎ বহু প্রকাশিত রচনাবলী ও পুস্তকের তালিকায় একজনও লেখিকার নাম নেই কেন? স্বর্ণকুমারী থেকে অনুরূপা, নিরুপমা, গিরীন্দ্রমোহিনী, মানকুমারী, কামিনী, প্রিয়ম্বদা, শৈলবালা ঘোষজায়া, সীতাদেবী ও অনেক—এঁদের কারুর লেখা কি সংরক্ষণযোগ্য নয়? কেবলমাত্র লেখকেরাই সংরক্ষণ-যোগ্য লেখা লিখেছেন? অগত্যা গলা তুলে আমাকে অগ্রণী হতে হয় নিশ্চিত লুপ্তির হাতে কতকগুলি নামের ধ্বংস বাঁচাতে। সভাস্থলে আবার আমারি অতীত উক্তি আত্মসাৎ করে যখন বয়োকনিষ্ঠা আমাকে খণ্ডন করতে প্রয়াস দেখান তখন নিরুত্তর হাস্য ভিন্ন এবং "অমৃতং বালভাষিতং" বয়ান আওড়ানো ভিন্ন আমার করবার কিছু থাকে না।

আমি প্রশ্ন তুলব: লেখিকাদের রচনা বাঁচাবার উপায় কি? সাহিত্য জগতের নেতা বহুদিন থেকেই পুরুষ। যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় লেখিকা প্রাধান্য পেয়েছেন তাঁরা স্বীয় কৃতিত্বে তৃপ্ত। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে যে অমরত্ব তাঁরা অর্জন করবেন, একত্রে বিধৃত হলে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে তাঁদের যে স্বতন্ত্র মূল্যায়ন হবে, সে বিষয়ে তাঁরা অবহিত নন। ঐক্যে যে উৎকর্ষ, সে কথা তাঁরা ভেবে দেখেন না। বিদেশী সাহিত্যের সাহিত্যতত্ত্বের ইতিহাসে Women Writersদের নাম পৃথক অনুচ্ছেদে লিখিত হয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বলিখিত 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে অনুরূপ প্রণালী অনুসরণ করেছেন।

এত কথা বলার অভিপ্রায় এই যে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের দোহাই পেড়ে আমি যে পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছি সেই পরিকল্পনার প্রভূত প্রয়োজন আছে। স্বর্ণকুমারী থেকে আরম্ভ করে কয়েকটি বিশিষ্ট লেখিকার রচনাবলী বিস্মৃতি-গহ্বর থেকে উদ্ধার করে আমরা সাহিত্যের দরবারে পুনরায় উপস্থাপিত করব।

পূর্বে বহু উজ্জ্বল লেখিকানামের তালিকা থাকলেও আমরা প্রচলিত অগ্রণী নাম স্বর্ণকুমারী দেবীকেই পেলাম। ১৮৫৫ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত দীর্ঘজীবন তাঁর কখনই নিষ্ফলা ছিল না। স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি আমরা সমর্থন করি :—

—"বাংলাদেশের কোনও নারীর সাহিত্যকীর্তি এত বিরাট নয়, তিনি শুধু অগ্রণী নন, শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সাহিত্য পঠিত ও আলোচিত হইলে এই সত্য দিনে দিনেই স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।" (স্বর্ণকুমারী দেবী—'সাহিত্য সাধক চরিতমালা')

স্বর্ণকুমারীর ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার অতিপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। তীক্ষ্ণধী সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, এক্ষেত্রে ('বিদ্রোহ' উপন্যাসে) তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা রমেশচন্দ্রের দ্বারা অধিক অনুপ্রাণিত হয়েছেন। শ্রীকুমারের মতে—"সত্যনিষ্ঠা ও তথ্যানুবর্তনে তিনি রমেশচন্দ্রের সহিতই অধিক তুলনীয়। তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট উপন্যাসে ভাষা, মন্তব্যের সারবত্তা ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের দিক দিয়া বরং সময় সময় রমেশচন্দ্র অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়।" ("বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা")

রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারীর শিক্ষা, সাহিত্যপ্রয়াস একই পরিবেশে, একই আবহাওয়ায়। তাঁদের সম্মুখে পূর্বসূরী হিসাবে কবি বিহারীলাল, মধুসূদন, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি লেখক উপস্থিত। বাড়ীর সীমানায় দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতিভার মধ্য গগনে। সকলের রচনার ধারা মিলে মিশে কখনও একরকম, কখনও বা পরস্পরের প্রভাবযুক্ত মনে হয়। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর লিখনভঙ্গির অতি প্রকট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত। আঙ্গিক, ভাষাভঙ্গি, এমন কি নামকরণেও সাদৃশ্য দেখি আমরা।

রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, আবার স্বর্ণকুমারীর রচনা থেকেও তিনি উদ্বুদ্ধ হন। স্বর্ণকুমারী বিহারীলালের কাব্যের প্রভাবযুক্তা, কখনও রবীন্দ্রনাথ কোনও ক্ষেত্রে অগ্রণী।

একই সময়ে পরস্পরের নিকটস্থ ভ্রাতা-ভগিনীর রচনার যে নিবিড় সাদৃশ্য পাই, কে আগে কে পরে উক্তভাষা বন্ধ অথবা ভাববিন্যাসের রচয়িতা এটি অনুসন্ধানের

বস্তু।* গবেষণায় ভ্রমের অবকাশ প্রচুর। কখনও পুস্তকেধৃত কবিতা বা গাথা বহু পূর্বে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত। সুতরাং সময় নির্ণয় নির্ভুল হয় কি?

বিহারীলাল 'প্রভাতসঙ্গীত' লেখেন, 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' লেখেন ভারতী পত্রিকায় ১২৮৯ সালে। রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাতসঙ্গীত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ১২৯০ সালে আর 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ১২৮৮তে। বিহারীলাল 'মধ্যাহ্নসঙ্গীতও লেখেন (১২৮৯) 'নিশীথসঙ্গীত' প্রবাসীতে প্রকাশিত (১৮৯৯)।

স্বর্ণকুমারীর কবিতাসঙ্কলন 'কবিতা ও গান'এ (১৮৯৫) অনুরূপ 'প্রভাত-সঙ্গীত', 'মধ্যাহ্নসঙ্গীত', 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'নিশীথসঙ্গীত' ইত্যাদি নামে খণ্ড কবিতা-গুচ্ছ দেখা যায়। পূর্বে এগুলি কোথায় প্রকাশিত অথবা এদের প্রথম প্রকাশকাল জানা নেই। তখন হয়তো এইভাবে দিবসের বিভিন্ন যামের নামে কবিতাগুচ্ছ প্রচলিত ছিল। স্বর্ণকুমারীর 'সঙ্গীতশতকের' নামও পূর্বসূরী বিহারীলালের পুস্তকের। বিহারীলালের প্রকট প্রভাব স্বর্ণকুমারীর কোন কোন কবিতা ও সঙ্গীতে পাওয়া যায়।

বিহারীলালের—

> "নাহি চন্দ্র সূর্য্য তারা
> অনল-হিল্লোল-ধারা"·········ইত্যাদি।

স্বর্ণকুমারীর—

> "চন্দ্রশূন্য তারা শূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে
> দুরভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় রয়েছে ছেয়ে"—ইত্যাদি
>
> ('বসন্তউৎসব')

এমনি মধ্যে মধ্যে এক সুরের ধ্বনি শোনা যায়। বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়।

'সারদামঙ্গল' কিনা সরস্বতীমঙ্গল বিহারীলালের শ্রেষ্ঠকাব্য। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্যে—'যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়' পংক্তিটি সোজাসুজি বিহারীলালের।

এইভাবে কোথায় রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারীর কাব্য-সংযোগ বলা শক্ত। অন্য একটি বৃহৎ প্রবন্ধের তথ্য হিসাবে সেই উপাদান ব্যবহার করা যায়।

এখানে আমরা যৎসামান্য কয়েকটি উদাহরণ মনে করি। নানা সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারীর যৌথ রচনা নাটক ইত্যাদি অনেক পাওয়া যায়। সেখানে উভয়ের লেখা গানগুলি এত এক রকম যে সময়ে তাদের বেছে পৃথক করা কঠিন হয়।

বিশেষতঃ কিশোর কবির সৃষ্টির ঢং তখনও পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক ত্যাগ করেনি।

স্বর্ণকুমারীর 'দেবকৌতুক' কাব্যনাটকের রতির আক্ষেপ—"ধরণী কি চলিতেছে ধনধান্যে শুধু। প্রেম কি কিছুই নহে?"—পড়ে মনে আসে রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' কাব্যনাটকে প্রত্যাখাতা দেবযানীর ভাষা:—"বিদ্যাই দুর্লভ শুধু, প্রেম কি হেথায় এতই সুলভ?"—

'দেবকৌতুকে' উর্বশীর রূপজালে পুরুষ হৃদয় জয় করার চেষ্টা, পরে রূপকে ধিক্কার দেওয়া রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদাকে' স্মরণ করায়।

স্বর্ণকুমারী নানা কাব্যনাটকের ও প্রহসনের চরিত্র, পরিস্থিতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রহসনের ও কাব্যনাটকের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

স্বর্ণকুমারীর 'সাজাব তোমারে আসি মোরা যতনে' ('রাজকন্যা' নাটক) পরবর্তী রবীন্দ্রসঙ্গীত "তোমারে সাজাব যতনে কুসুমে রতনে" গানকে প্রভাবিত করেছে। ('শাপমোচন')

ব্রজবুলিতে রচিত স্বর্ণকুমারীর গানগুলি রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী'র পূর্বে লেখা হয়েছিল।

স্বর্ণকুমারীর 'যুগান্ত' কাব্যনাটকটির (১৯১৮) সমাপ্তিসঙ্গীত

"হের, ঐ নবযুগ উদীয়মান।
প্রীতিদীপ্তিময় দিব্য আলোকে ঈর্ষ্যা-তিমির অবসান।
সুর নর গাহে জয়গান।"

এই গানটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের—"ঐ মহামানব আসে—
—সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—" গানটি তুলনীয়।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে স্বর্ণকুমারী গাথাধরণের কবিতা লিখেছেন ও বিশেষ অর্থে গাথা-কবিতার তিনি প্রথম রচয়িতা। 'গাথা' নামক কাব্যখানি স্বর্ণকুমারী উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথকে—

"ছোট ভাইটি আমার,
যতনের গাথা হার, কাহারে পরাব আর?
স্নেহের রবিটি, তোরে আয় রে পরাই,
যেনরে খেলার ভুলে, ছিঁড়িয়ে ফেল না খুলে,
দুরন্ত ভাইটি তুই—তাইতে ডরাই।" (১৮৮০)

কবিতাটির মধ্যে ঈষৎ অভিমানমিশ্রিত মৃদু শ্লেষ লক্ষ্যণীয়। দিদি উদীয়মান

কবি ছোট ভাইয়ের প্রতি স্নেহশীলা ছিলেন, নিজের নাটক ইত্যাদির অনুষ্ঠানে কবির রচিত গান গাওয়াতেন। রচনার মধ্যে মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ কখনও বা কৌতুকবহ। 'কান্তিবাবুর খোসনান' গল্পটিতে লেখিকার বিদ্রূপভাজন কবি কান্তির কথায় আমরা পাই :—"রবীবাবুর কাব্যগ্রন্থে তাহার সেল্‌ফ আলমারী ভরিয়া গেল, সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা হইল—"এই উক্তি দ্বারা লেখিকা ছোট ভাইদের প্রভাবান্বিত একটি তরুণ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন এবং কান্তির কবিতায় স্থানে স্থানে প্রকট রবীন্দ্রগীতির সবিদ্রূপ অনুরণন আছে, যথা :—

"মরি আজ দখিনা হাওয়ায়
কোন কাননের বিদেশিনী কোন সুরে গান গায় ?
কম্পিত থর-থর—পল্লব মর-মর
হৃদয় হাহুতাশে করে হায় হায়। * *
—কলি ফুটুক মুঞ্জরিয়া—
অলি উঠুক গুঞ্জরিয়া
নদী ছুটুক কল্লোলিয়া-" ইত্যাদি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, কান্তি-সহোদরা বিবাহিতা শান্তির স্বামীর বিদেশগমনহেতু শান্তি পিত্রালয়ে সাহিত্য রচনারতা। সে সহোদর অপেক্ষা বহু শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে। অবশেষে কান্তির সহোদরার গল্পগুলি আত্মসাৎ। রবীন্দ্রনাথের ক্রমবর্ধমান মহিমা এখানে স্বীকৃত, তবু গল্পটি আমাকে চিন্তান্বিত করে তোলে।

এইরূপ 'স্নেহলতা' উপন্যাসে রবীন্দ্রানুসারীদের প্রতি স্পষ্ট কটাক্ষ চোখে পড়ে।

কবি তাঁর অজস্র রচনাবলী উৎসর্গ করেছেন নানা জনকে। কিন্তু একখানিও লেখিকা অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীকে করেননি, যদিও অগ্রজা দীর্ঘজীবন লাভ করে একই নগরে বাস করেছেন। স্বর্ণকুমারীর পুত্রকন্যা অথবা স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে কোনও পত্রালাপও পাওয়া যায় কি ? 'ভারতী' সম্পাদনায় এবং স্বাদেশিক কর্মকাণ্ডে ভ্রাতাভগিনীর নানা অবদান একত্রে দেখা যায়। সরলা দেবী তো স্বদেশীযুগে বীরাঙ্গনাখ্যাতি লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটির পূর্বে (১৯০১) কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষ্যে সরলা দেবীর গান —'অতীত গৌরবাহিনী মম বাণী, গাহ আজি হিন্দুস্থান—**

হিন্দু-পার্শি জৈন ঈশাহি শিখ মুসলমান
গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে নমো হিন্দুস্থান।

হরহরহর জয় হিন্দুস্থান
শাশি আকালা হিন্দুস্থান
আল্লাহো আকবর হিন্দুস্থান,
নমো হিন্দুস্থান।'

কিন্তু কয়জন গানটিকে মর্যাদা দিয়েছেন? আজ এই গানটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত। একতারে বাঁধা হৃদয় যাঁদের, রচনার নৈকট্যে প্রমাণিত হয়, তাঁদের হৃদয়ের নৈকট্য কতটা ছিল জানি না।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে স্বর্ণকুমারী শোকগাথায় মেঘকে স্মরণ করলেন :—

"গুরু গুরু গর্জনে বারিধারা বহে,
কি জানি প্রমত্ত ভাষে কি কথা সে কহে।
এমন বর্ষণ-ক্ষণে বিরহী যক্ষের মনে
যে ছন্দ উঠিল জাগি তাহা এ নহে--

কবিতাটি 'কবিতা পারিজাত-হার' নামে গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ('বসুমতী-সাহিত্য মন্দির')

রবীন্দ্রনাথের সত্যেন্দ্র দত্তের বিয়োগে কবিতাও মেঘস্মরণে—

"বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে—ইত্যাদি। ছোটখাটো অসংখ্য মিল ও সাদৃশ্যে প্রথমযুগের রবীন্দ্রকাব্য অগ্রজার সঙ্গে কখনও বা এক তারে গাঁথা। স্বর্ণকুমারীর কবিত্ব ও গীতিধর্মী কবিতার মাধুর্য অপরিসীম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে ভাবলোকের যে সুউচ্চ শীর্ষে উপনীত সেখানে অগ্রজা স্থান অর্জন করতে পারেন নি।

স্বর্ণকুমারীর রচনা আমাদের আপাতদৃষ্টিতে সেকালীন বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু রচয়িতাকে সর্বদাই তাঁর কালের পটভূমিকায় রেখে বিচার করা সমীচীন। সেই বিচারে স্বর্ণকুমারীর বৈদগ্ধ্য, বৈচিত্র্য ও শক্তি বিস্ময়-জনক।

স্বর্ণকুমারী কিন্তু অনুজের মত নিজের কালকে অতিক্রম করতে পারেন নি দীর্ঘজীবন সত্ত্বেও। রবীন্দ্রনাথের মত নিজেকে নবরূপে বিভিন্ন কালে বিভিন্নভাবে তিনি সৃজন করেন নি। কোন একটি পথের শেষেই তাঁর যাত্রা শেষ হয়েছে। অন্য পথে নিজেকে বিস্তারের প্রয়াস নেই। শেষদিকের রচনায়ও নয়।

বরঞ্চ স্বর্ণকুমারীর রচনার শেষ ভাগে লেখা ট্রিলজির তিনখণ্ড 'মিলনপূর্ণিমা', 'বিচিত্রা', 'স্বপ্নবাণী' উপন্যাসত্রয় আলোচনা করা হলে দেখা যায় অতি নাটকীয়তা

•ও ভাবালুতায় আচ্ছন্ন। রাজকুমারীর সখি হাসির রাজকুমারীর বিপত্নীক পিতা অতুলেশ্বরের সঙ্গে প্রণয়দৃশ্য বেখাপ্পা। অবশ্য প্রথম দিকে সখার কন্যার প্রতি প্রেমও 'বিদ্রোহ' উপন্যাসে দেখা যায়। ভীলবন্ধু জুমিয়ার সুন্দরী কন্যা সুহারের প্রতি রাজার অনুরাগ ও বালিকার প্রতিদানও উভয়ের বয়সের খানিকটা পার্থক্য ও প্রেমিক পিতার বন্ধু হিসাবে অনুরূপ বেখাপ্পা। এই উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী ভীলদের মৌখিক ভাষা হিসাবে একটি ডায়ালেকটের স্বচ্ছন্দ ও সুনিপুণ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রকথাসাহিত্যের মাত্রাজ্ঞান লাভ করেছেন কি? তাঁর গতি অত ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু গানে ভ্রাতা ও ভগ্নীর অচ্ছেদ্য মিলন, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগে।

স্বর্ণকুমারীর—"সখিলো, রিমঝিম ঘন বরিষে"র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "রিমঝিমরে ঘন ঘন বরিষে" তুলনীয়।

স্বর্ণকুমারীর—"—ও যে শুধু ঝরা দল,
কেন আর সমীরণ উহারে ছুঁইবি বল ? "('মরণ সোহাগ'—সন্ধ্যাসঙ্গীত)
এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "আর কেন, আর কেন
দলিত কুসুমে বহে বসন্ত সমীরণ—" তুলনীয়।

মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের ন্যায় স্বর্ণকুমারী 'অর্জুনের প্রতি জলকুমারী উলুপী,' 'গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমর,' 'কচের প্রতি দেবযানী' ইত্যাদি প্রেম-পত্রিকা রচনা করেছিলেন ('মধ্যাহ্নসঙ্গীত')। স্বর্ণকুমারীর 'বর্ষায়' ('নিশীথসঙ্গীত') কবিতাটির অনুরণন রবীন্দ্রকাব্যে একাধিকবার দেখা যায়। স্বর্ণকুমারী, পূর্বেই বলেছি, ব্রজবুলির ঢং গানে প্রবর্তিত করেছিলেন। একটি গান দেখা যাক—

"সজনি, নেহারো বসন্ত সাজে
ক্যায়সে মাতল হরষে দিক।
কাননে কাননে ফুলকুল জাগল,
কুঞ্জে কুঞ্জে কুহরল পিক।**
আওলো সজনী, এ সুখ রজনী
নিকুঞ্জে আজু পোহায়ব দোঁহে"— ('সঙ্গীতশতক')

স্বর্ণকুমারীর এই ধরণের সুললিত গানগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলীর' তুলনামূলক চমৎকার আলোচনা চলে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য তা নয়। শুধু তুলনামূলক বিচারের দ্বারা উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দিলাম। আমরা স্বর্ণকুমারীর অনবদ্য 'সঙ্গীতশতক'-ও কবিতাসমূহ

পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করছি তাঁদের নিজস্ব বিচার তাঁরা করবেন।

ফুল ভালবাসেন স্বর্ণকুমারী, 'নলিনী' তাঁর প্রিয় নায়িকার নাম :—

"জলেতে রাখিয়া রাঙা পা দু'খানি
নলিনী, নলিনী মেয়ে,
ঢল ঢল ঢল দুলিছে কমল,
দেখিছে তাহাই চেয়ে"— ('সাশ্রু সম্প্রদান')

রবীন্দ্রনাথেরও প্রিয় নাম 'নলিনী'। একাধিক কবিতার ধ্বনি অনুরূপ।

প্রকৃতপক্ষে কখনও বা দুইজনের গান ঠাকুরবাড়ীতে নানা উৎসবে অভিনীত নাটকের মধ্যে এমনভাবে মিশে যেত যে, পরবর্তী যুগে সেগুলির পার্থক্য নির্ণয় গবেষণাসাপেক্ষ ছিল। রবীন্দ্রনাথ দিদির গান গাইতেন সানন্দে। একটি কাহিনী আমাদের যুগে চলে এসেছে।

বিবাহের পরে রবীন্দ্রনাথ নিজের বিবাহবাসরে দিদি স্বর্ণকুমারীর গান

"আমরি লাবণ্যময়ী কে ও স্থির সৌদামিনী,
পূর্ণিমা জোছনা দিয়ে মার্জিত বদনখানি"

সহাস্য কৌতুকে নবোঢ়াকে উদ্দেশ করে গেয়েছিলেন। বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'মৃণালিনী দেবী' নামক সংকলনগ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথের বিবাহবাসর' প্রবন্ধে হেমলতা ঠাকুর তথ্যটি পরিবেশন করেছেন।

বিবাহের কিছুদিন পরে জানকীনাথ ঘোষাল বিদেশ যাত্রা করেন আইন অধ্যয়নে। তখন স্বর্ণকুমারী কন্যা হিরণ্ময়ী ও সরলা, পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ও আর একটি ছোট কন্যাসহ পিতৃগৃহে বাস করেন। তখন জ্যোতিরিন্দ্রের স্বর্ণযুগ, উদীয়মান রবীন্দ্রনাথ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য মহান উপস্থিতিতে জোড়াসাঁকোর বাড়ী ভরপুর। বাইরের বিভিন্ন সাহিত্যসঙ্গীরও যথেষ্ট আনাগোনা। সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, মজলিশে দিনগুলো পরিপূর্ণ। ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ তখন দিদির ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে রচনাকার্যে লিপ্ত ছিলেন। অতএব স্বাভাবিক ভাবেই রচনায় সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়।

স্বর্ণকুমারীর সাহিত্য কেবল নিজের মহিমায় নয়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্রহেতুও স্মরণীয়। পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছে তিনি যে শিক্ষা পান, তের বৎসর বয়সে বিবাহ, চোদ্দ বৎসরে জননীত্ব সে শিক্ষাকে ব্যাহত করতে পারেনি। উত্তরোত্তর তিনি উৎকর্ষ লাভ করেন। কেবলমাত্র গৃহস্থালীকর্মে নিজেকে তিনি ব্যাপৃত রাখেন নি, অনলস অধ্যয়নে বিদেশী ভাষার পুস্তক আয়ত্তে

এনেছিলেন, বিস্তৃত রচনার মধ্যে তাঁর অধ্যয়নের ছাপ আছে। সঙ্গীতশিক্ষা, সেতার বাজানো, সঙ্গীতের সুর ও স্বরলিপি তৈরী এ সমস্ত তাঁর প্রতিদিনের জীবন। উচ্চপদস্থ স্বামীর পত্নী হয়ে বিলাস ও আয়াসের ক্রোড়ে তিনি আত্ম-নিমজ্জন করেন নি।

স্বর্ণকুমারীর সমগ্র রচনা আমি দেখার সৌভাগ্য পাইনি, কোন মরদেহীর আর সে সৌভাগ্য হয় কিনা সন্দেহ। তবু তাঁর রচনার পরিধি ও বৈচিত্র্য দেখে মুগ্ধ হই।

সাহিত্যের যতগুলি শাখা সম্ভব সেই যুগে স্বর্ণকুমারী অনুধাবন করেছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ বলা চলে। এছাড়া সুদীর্ঘকাল তিনি খ্যাতির সঙ্গে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। কিয়ৎকাল 'বালক' সম্পাদনাও করেছেন। দু' একজন বঙ্গ মহিলার নাম পত্র-পত্রিকা সম্পাদিকা হিসাবে ঘোষিত থাকুক না কেন স্বর্ণকুমারীকে মহিলা সাংবাদিক হিসাবে অগ্রণী বলা চলে। ১২৯১, বৈশাখে তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে 'ভারতী' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। ১২৯১—১৩০১ তিনি সফল সম্পাদনা অন্তে কন্যাদ্বয় সরলা দেবী ও হিরণ্ময়ী দেবীর উপর সম্পাদনার ভার দিলেন। কারণ অসুস্থতা। ১৩১৫—১৩২১ সাল পর্যন্ত তিনি আবার 'ভারতী' সম্পাদনা করেছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে স্বামীর মৃত্যুর পরে ভগ্নহৃদয়া সম্পাদিকা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্পাদনার ভার দিয়ে বিদায় নেন। সুতরাং তিনি পূর্ণ আঠারো বছর 'ভারতী' সম্পাদনা করেন। এই সময়ে 'ভারতী'র স্বর্ণযুগ হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য সমস্ত সাহিত্যিকের রচনায় 'ভারতী' প্রতি মাসে সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হত।

প্রবল সাহিত্যানুশীলনের পাশাপাশি স্বর্ণকুমারী দেবীকে নানাবিধ সমাজসেবা এবং দেশাত্মবোধক কার্যকলাপে অহরহ লিপ্ত থাকতে দেখা যায়।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়। জানকীনাথ ঘোষাল আজীবন কংগ্রেসে যুক্ত ছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই অধিবেশনে সর্বপ্রথম মহিলাবৃন্দ যোগ দেন। বাংলা থেকে সেখানে স্বর্ণকুমারী দেবী যোগদান করেন। ১৮৯০-এ কলিকাতায় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে মহিলা মধ্যে একমাত্র স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন।

স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপ্তা স্বর্ণকুমারীর রচনায় অতি প্রকট স্বদেশপ্রেম। স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জন ও দেশপ্রেমী নায়ক স্বর্ণকুমারী ঐতিহাসিক উপন্যাসে বিন্যস্ত করেছেন। মনে হয় অন্তর্নিহিত স্বদেশপ্রেমই তাঁকে 'দীপনির্ব্বাণ' উপন্যাসের

বিষয়বস্তু নির্বাচন করায় (১৮৭৬)। পৃথ্বীরাজের পরাজয়, মহম্মদ ঘোরীর বিজয়, হিন্দুরাজ্যের পতন চিত্রিত করে লেখিকা 'উপহার' পত্রে আক্ষেপ করেছেন—

"কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়েছে চলি,
ঢেকেছে ভারতভানু যেন মেঘজাল—"

তাঁর 'মিবাররাজ', 'বিদ্রোহ' উপন্যাসদ্বয়ে রাজপুত ও ভীলদের মধ্যে সংঘর্ষ বর্ণিত ; মূল কারণ জন্মভূমির উপর আধিপত্য।

স্বদেশপ্রেম স্বর্ণকুমারীর বহু রচনার উৎস। শেষ জীবনের তিনটি উপন্যাস 'মিলনরাত্রি', 'বিচিত্রা' ও 'স্বপ্নবাণী'র মধ্যে সামাজিক ক্ষেত্রে তৎকালীন জাতীয়তা-আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদ, দেশপ্রেমে ব্রতীর প্রাণবিসর্জন ইত্যাদি, বিবৃত হয়েছে। 'দীপনির্ব্বাণ' অপরিণত রচনা। এই তিনখানিও অতি নাটকীয় ও ভাবপ্রবণ পূর্বে বলা হয়েছে।

'গাথার' 'খড়্গ' 'পরিণয়' নামক গাথাটিতে মিবাররাজ ও বুন্দিরাজ উভয়ের অসিযুদ্ধের বীরপণা প্রেমলালিত্যকে অতিক্রম করে লেখিকার মনোভাব অনুযায়ী। কাবতাগুচ্ছের, কাব্যনাটকের মধ্যে মধ্যে কবির দেশপ্রেম ও তেজস্বিতার পরিচয় আছে। 'সাহিত্যে দেশবন্ধু' ও ইংরেজের সহিত সুরেন্দ্রপ্রসঙ্গ প্রবন্ধ দুইটির একাগ্র শ্রদ্ধা তাঁর কংগ্রেসপ্রীতি ও স্বাদেশিকতার চিহ্ন। 'গান্ধীপত্নীর সম্বর্দ্ধনা' ও 'বেঙ্গলী' নিবন্ধও উল্লেখ্য। গল্পের মধ্যে 'নব ডাকাতের ডাইরি' ইত্যাদি কয়েকটি গল্পের মধ্যে লেখিকার স্বদেশপ্রীতি দেদীপ্যমান।

নারীকল্যাণের কাজে স্বর্ণকুমারীর অবদান সুপ্রচুর। স্বাদেশিকতার সঙ্গে আত্মনির্ভরতা তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি ১২৯৩ সালে 'সখি সমিতি' স্থাপন করেছিলেন নিজে সম্পাদিকা রূপে। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য "অসহায় বঙ্গবিধবা ও অনাথা বঙ্গকন্যাগণকে সাহায্য করা"।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য উক্ত নারীগণকে সুশিক্ষিত করে "তাহাদিগের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করা"।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চাঁদা সংগৃহীত হত। কিন্তু তদ্দারা ব্যয় নির্বাহ করা যেত না বলে স্বর্ণকুমারী "মহিলা শিল্পমেলা" নামক একটি চমৎকার বাৎসরিক মেলার আয়োজন করেন। এই সুসজ্জিত তিনদিন ব্যাপি মেলার ক্ষেত্রে ক্রেতা, বিক্রেতা সকলেই মহিলা।

মহিলাদের নানাবিধ ও বিচিত্র শিল্পসম্ভার মহিলাদের ক্রয়োপযুক্ত অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে এখানে কেনাবেচা হত। শিল্পমেলায় শিল্পোন্নতি ও মহিলাদের

পরস্পর সম্মিলন, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই যুগে সে ব্যবস্থা অভিনব। শেষদিনে একখানি নাটকও মহিলা ও বালিকারা অভিনয় করতেন। প্রথম মেলায় রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য অভিনীত হয়েছিল।

দেশহিতকর কার্যের এই সকল প্রচেষ্টায় সেকালের যাবতীয় বিশিষ্ট মহিলাবৃন্দ যুক্ত ছিলেন।

ইতিপূর্বে স্বর্ণকুমারী মহিলা-থিয়সফিক্যাল সভা নিজের বাড়ীতে প্রবর্তন করেছিলেন। ১৮৮২—৮৬ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবী 'লেডিস্ থিয়সফিক্যাল সোসাইটির' সভানেত্রী ছিলেন।

স্বর্ণকুমারীর যাবতীয় নারীকল্যাণ কাজে সহায়তা করতেন জ্যেষ্ঠা কন্যা—হিরণ্ময়ী দেবী!

'সখি সমিতির' আয়ু প্রায় শেষ হওয়ায় হিরণ্ময়ী দেবী মাতার প্রতিষ্ঠানটি নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই 'বিধবা শিল্পাশ্রমে' (১৯০৬) রূপান্তরিত করেছিলেন। পরিচালনা সমিতির সভানেত্রী ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী।

এইটি 'হিরণ্ময়া বিধবা শিল্পাশ্রম'। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে হিরণ্ময়ীর মৃত্যু হয়। সাতাত্তর বৎসর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্বর্ণকুমারী উক্ত প্রতিষ্ঠানটির সভানেত্রী ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন 'সখিশিল্পসমিতি'। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণকুমারী তাঁর যাবতীয় পুস্তকের স্বত্ব এই প্রতিষ্ঠানে দান করেছিলেন। স্বর্ণকুমারীর মৃত্যু হয় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুলাই (১৯শে আষাঢ়, ১৩৩৯)।

বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের ১৩৩৬ সালের কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ১৯শ সম্মেলনে স্বর্ণকুমারী সাহিত্যশাখার সভানেত্রী নির্বাচিত হন। কিন্তু মূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেননি এজন্য স্বর্ণকুমারী সভানেত্রীত্ব করেছিলেন। মহিলাদের মধ্যে এটা প্রথম।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণকুমারীকে শ্রেষ্ঠ লেখিকারূপে 'জগত্তারিণী স্বুবর্ণপদক' দেন। প্রথম লেখিকা স্বর্ণকুমারী এই সম্মান পান।

সেই যুগে যখন স্ত্রী-শিক্ষা অপ্রসারিত, অবরোধ ও নানা সংস্কারে নারীজীবন, ধিক্কারিত তখন স্বর্ণকুমারী নবজাগরণের প্রতীক হিসাবে আমাদের চির স্মরণীয়া।

ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সমন্বয়ে বাংলায় যে নূতন ভাবধারার বিকাশ হয়, যাকে রেনেসাঁস বলা হয়, সেই ভাবধারার সার্থক বাহক স্বর্ণকুমারী দেবী। নারী-

জগতে তিনি এই ভাবধারার প্রথম প্রবর্তক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই যুগের রীতিনীতিকে অতিক্রম করে কন্যার জন্য বিশেষরূপ শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন।

স্বর্ণকুমারীর পারিবারিক জীবন সুখময় ছিল। মহর্ষির তিনি আদরিণী কন্যা ছিলেন। প্রত্যহ পিতার জন্য পুষ্প আহরণ করতেন তিনি, মাতাকেও দিতেন। বিবাহের পর সুযোগ্য স্বামীর অপরিসীম সহায়তা ও যত্নে তাঁর লেখিকাজীবন ও সামাজিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়।

সরলাদেবী ঈষৎ অভিমানে মাতাকে কিঞ্চিৎ উদাসীন আখ্যা দিলেও তিন পুত্র কন্যার প্রতি মাতার অনাদর কখনও দৃশ্যমান নয়। গৃহস্থালীর মধ্যে সাহিত্য-সাম্রাজ্ঞী নিজেকে নিয়োজিত রেখে সেই গণ্ডির মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। বন্ধুবান্ধব, পরিজন, সকলের কাছেই তিনি ভদ্রতা ও স্নেহে উৎসারিত। ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ মধুর, সত্যেন্দ্রনাথের কাছে তিনি শিক্ষার জন্য যান, জ্যোতিরিন্দ্রের গানের সুরে কথা যোগান, রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয় করান। ভ্রাতৃবধূদের সঙ্গেও নিয়ত সাহচর্যে সৌহার্দ্যের অভাব নেই।

আমার সর্বাপেক্ষা ভাল লাগে সমকালীন প্রসিদ্ধ নারীলেখিকাদের সঙ্গে তাঁর সুমধুর সম্বন্ধ গিরীন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে তাঁর 'মিলন' পাতানো। তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতাটি স্মরণ করি :—

> "অধরে মোহন হাসি নয়নে অমৃত ভাসে,
> বিরহে জাগাতে শুধু মিলন পরাণে আসে।" (বিরহ—'সন্ধ্যাসঙ্গীত')

লেখিকা শরৎকুমারী চৌধুরাণীর সঙ্গে তাঁর 'বিহঙ্গিনী' পাতানো ছিল। 'বসন্তউৎসব' গীতিনাট্যের উপহারে লেখা :—

> "ভাই বিহঙ্গিনী,
> সখি লো জনম ধোরে
> ভাল যে বেসেছি তোরে,
> নে, লো, তার নিদর্শন—এই উপহার
> হৃদয়ের-আদরিণী-বিহগি আমার।"

এই রকম অন্যান্য সখিদের, স্বজনদের তিনি নানা আদরের ভাষায় উপহার লিখে বই উৎসর্গ করেন।

অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের তিনি যথেষ্ট সমাদর করে 'ভারতী'তে প্রকাশিত করেন।

বিভিন্ন মহিলার সঙ্গে অতিশয় সখ্য না থাকলে তিনি নারী কল্যাণমূলক এত কাজ করতে পারতেন না।

এছাড়া সমসাময়িক ও অনুজ সাহিত্যিকদের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা প্রীতি প্রচুর ছিল।

এই যে সর্বদিকে সফল ও অনন্যসাধারণ লেখিকার অজস্র ও বিচিত্রধারার রচনার মধ্যে স্বল্প পরিসরে কোন-কোনটি রাখব চিন্তায় বিচলিত হতে হচ্ছে। অত্যন্ত শক্তিশালী কতকগুলি রচনায় চোখ পড়ে লোভ হয়, বাদ দিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু যেটুকু সম্ভব মাত্র সেটুকুই দিতে পারলাম। সব রকমই কিছু দেবার চেষ্টা হয়েছে।

'হুগলীর ইমামবাড়ী' উপন্যাস (১৮৮৮) ওই নামের অট্টালিকার জন্যই হোক কি বিরাটত্বের জন্যই হোক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। উপন্যাসখানির কথা আমরা শৈশব থেকে শুনেছিলাম। এখন পড়ার পরে নিরুৎসাহ হলাম। মহম্মদ মহসীনের মহত্ব, তাঁর ভগ্নী মুন্নার বঞ্চিত জীবন, উভয়ের স্নেহবর্ণনা উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। নানা নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে একটি নিপুণ প্লট বিন্যাসের প্রয়াস পাওয়া যায়। ইতিহাস বর্ণিত পটভূমিকায় এই সামাজিক উপন্যাসটির দীর্ঘ ধর্মতত্ত্ব বাখ্যা, ঘোর-আদর্শবাদ, অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব সমস্ত কিছু বর্তমানের পাঠকের মনকে বিমুখী করে। সেকালের বৃহৎ অনুরূপ নীরস উপন্যাসগুলির কথা স্মরণ হয়। মহম্মদ মহসীনের দানে প্রতিষ্ঠিত হুগলীর ইমামবাড়ী অনিবার্যরূপে স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসটিকে স্মরণ করায়, কিন্তু পাঠককে আকৃষ্ট করে না।

দুই খণ্ডে লিখিত 'স্নেহলতা' উপন্যাসখানি সেকালের সমাজচিত্র হিসাবে আদরণীয় (১৮৯০ ও ১৮৯৩)। 'ফুলের মালা' উপন্যাসটি (১৮৯৫) ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছিল (The Fatal Garland) এবং আখ্যানের বিষয়বস্তু নিয়ে চিত্রও অঙ্কিত হয়। সুতরাং উপন্যাসটি অতি জনপ্রিয়। কিন্তু স্বর্ণকুমারীর স্বভাবতঃ উপন্যাস নাটকীয় উচ্ছ্বাসে ভারাক্রান্ত। শক্তির শুষ্ক ফুলের মালার রক্ষণ রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবী কঙ্কন' উপন্যাসের শুষ্ক মাধবীকঙ্কন মনে পড়ায়।

সুশৃঙ্খলিত গঠনশৈলে স্বর্ণকুমারী দেবী কথাসাহিত্যের দৃঢ় রূপ মহিলারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। উপন্যাসেই তাঁর অধিক মনোযোগ হেতু ছোটগল্প দৃঢ় গঠনভঙ্গি

সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ দুর্বল, বিশেষতঃ সে যুগের অন্যান্য লেখিকা অনুরূপা দেবীর যুগের লেখিকার বিশেষত্ব আদর্শবাদে কখনও নাটকীয় ও অস্বাভাবিক।

১৩৩৪এ প্রকাশিত 'বার্ষিক বসুমতী'র 'তিনটি দৃশ্য' গল্পটি আমি 'লেখিকামনে' সংন্যস্ত করেছি। গল্পটি প্রধানতঃ চমৎকার, সেকালীন কর্ণবেধ চিত্রের উজ্জ্বল বর্ণনা সহ সূচিত। নায়িকা ধনিষ্ঠার মধ্যে যে দেবীভাবের সঞ্চার প্রথম থেকে লেখিকা দেখিয়েছেন, তারই পূর্ণ পরিণতি 'তিনটি দৃশ্যে'র শেষ দৃশ্যে।

অন্য গল্পগুলির মধ্যে 'পেনে প্রীতি' কিন্তু রসোত্তীর্ণ, যদিও শেষে মহারাষ্ট্রীয় বালিকার নিত্য পুষ্প প্রদান ভগ্নিপতির উদ্দেশে ও চিরদিন একটি পরিহাসবাণীর উপর নির্ভর করে যৌবন অতিবাহিত করা একটু বেশী রোমান্টিক যেন। কিন্তু অ্যাসিষ্ট্যান্ট কালেক্টর বা লৌকিক ভাষায় 'প্রান্ত-সাহেবদের'র ক্যাম্পের জীবন ও বোম্বাই প্রদেশের নানা বর্ণনায় লেখিকার গল্পের মধ্যে সোজাসুজি নিজেকে প্রকাশ উপভোগ্য। 'টার্গলিসম্যান' গল্পে ভারতপল্টনের যুদ্ধে যোগদান ও বিদেশী ভূভাগে আত্ম-বিসর্জন লেখিকা দেখিয়েছেন। 'পূজার তত্ত্বে' লেখিকা বধূর গরীবঘরে জন্ম হেতু তত্ত্ব মনোমত না হওয়ার লাঞ্ছনা এঁকেছেন। 'অমরগুচ্ছ' গল্প 'কাহাকে উপন্যাসের কলমে লেখা, কবিত্ব ও নিষ্কাম প্রেমের চিত্র। 'মালতী' গল্পের মামুলী দাম্পত্য ঈর্ষার চিত্র মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট। 'জীবন অভিনয়' গল্পে আধুনিকীর নির্দয়তা দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গল্পের মধ্যে 'বিজয়ার আশীর্বাদ' ও 'স্বপ্ন না কি' লেখিকার নাট্যপ্রীতির চিহ্ন।

লেখিকার হাত ছোটগল্পের অপেক্ষা গান-কবিতা-নাটিকা এবং উপন্যাসে বেশী নৈপুণ্য দেখিয়েছে। তাঁর কিছু কিছু গল্প আমরা পড়েছি, সম্যক আলোচনায় কালক্ষেপ করে লাভ নেই। তাই সামান্য দু-চারটির উল্লেখমাত্র করলাম।

সেই যুগে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রকে আদর্শপ্রায় করে ঐতিহাসিক উপন্যাসে হাতেখড়ির ফলে তাঁর গল্প উপন্যাস প্রায়শঃ আদর্শবাদের চৌকাঠে হোচট খায় ও আত্মসমর্পণ করে থাকে। তাঁর নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রকট পরিচয় উপন্যাস সমূহ বহন করছে। নাটকীয় বিন্যাসের অতি প্রবণতার জন্য স্বর্ণকুমারীর রচনাবিন্যাস আধুনিক সমালোচকের কাছে মাঝে মাঝে হাস্যকর লাগে। হিন্দী সিনেমার মত মধ্যে মধ্যে গ্রথিত সঙ্গীত-পরিস্থিতিকে দু'হাতে তুলে ধরে। স্বর্ণকুমারী দেবী অলৌকিকতায় বিশ্বাসী। অলৌকিকের যখন-তখন উপস্থিতি ও কার্যকলাপে

বৈজ্ঞানিক যুক্তি অদৃশ্য। কিন্তু পূর্বেই বলেছি লেখিকাকে তো তাঁর যুগে স্থাপনান্তে বিচার করতে হ'বে।

স্বর্ণকুমারী দেবী নিবিষ্ট চিত্তে শেক্সপীয়রের নাটক পড়তেন। তাই তাঁর কয়েকটি নাটকে উক্ত প্রভাব দেখা যায়। 'দেবকৌতুক' 'বসন্তউৎসব' গীতিনাট্য ও 'রাজকন্যা' নাটকে কখনও সেই ছায়াপাত দেখি। 'রাজকন্যা' মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'র মত আত্মবিসর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' বইটির ঢং মনে করায়। নাটকের গান,

'যাও ভুলে—চাও মুখ তুলে।
ওগো গরবিণী ধনী রাধা।'

গানটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষের' "শ্রীমুখপঙ্কজ দেখব বলে হে—"গানখানি মনে করায়।

মধুসূদনের মত স্বর্ণকুমারী নাটকের মধ্যে মধ্যে চলতি-কথার চমৎকার ব্যবহার করেছেন। শেক্সপীয়রে ও সংস্কৃত নাটকে উক্ত প্রকার ব্যবহার দেখি, যথা: "মাগীর যেন বাপকেলে ধন—রাজকন্যার মা বড়রাণীর খেয়ে পরে মানুষ, আর তিনি মরতে না মরতে তাঁর সতীনের ঘরে ঢুকলো" ইত্যাদি। বিদূষকও স্বর্ণকুমারীর নাটকে সরস মূর্তিতে দৃশ্যমান—"এস এস প্রেয়সি—আমার প্রাণসমুদ্রে বাণ—আমার জীবন মাঠে ধান" ইত্যাদি।

'দেবকৌতুক' গীতিনাট্যে 'ত্রিদিবের মোরা ললনা' গান রবীন্দ্রনাথের মায়াকুমারীদের গান মনে করায়।

'দেবকৌতুক' ও 'বসন্তউৎসব' গীতিনাট্যে অলৌকিকের ব্যবহার শেক্সপীয়রীয়। সেনেকা শেক্সপীয়রের উপর প্রভাব রেখেছিলেন। মঞ্চ অভিনয়কালে হত্যা, আত্মহত্যা, স্বেচ্ছামৃত্যু দ্বারা রক্তাক্ত হয়ে যেত—স্বর্ণকুমারীর নাটকে এ দৃশ্য অগণিত। উপন্যাসেও মৃত্যুর হানা যখন তখন।

স্বর্ণকুমারীর অসাধারণ কতকগুলি গদ্যরচনা কিন্তু কালজয়ী। এখনও এগুলি সেই যুগের চিত্র হিসাবে আমাদের অত্যন্ত ভাল লাগে। ঝরঝরে জোরালো গদ্যভাষা, জীবন্ত বর্ণনা, অতি সততায় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরিবেশরচনা তৎসঙ্গে হাস্যরস এই রচনাগুলিকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। এই পর্যায়ের গদ্যনিবন্ধ গুলির নাম:—'দার্জিলিং', 'মিউটিনি', 'সমুদ্রে', 'সেকেলে কথা'।

'পত্রাবলী'র মধ্যে সোলাপুর থেকে লেখা চিঠিখানি ও পূর্বোক্ত 'দার্জিলিং'এর

চিঠিখানি পরম উপভোগ্য।

এবার আমরা যে সকল গ্রন্থ পাঠকদের উপহার দিতে পারলাম, তাদের বিষয়ে সংক্ষেপ আলোচনা করা যাক্।

'কাহাকে' (১৮৯৮) স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বীয় জগতের ছায়াঘেরা উপন্যাস। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে স্বর্ণকুমারী নারীমনের অন্তর্লীন ভাবসত্তার অতি অনায়াসে উন্মোচন করেছেন। সুমধুর বৈধ রোমান্স এই বইটি ইঙ্গবঙ্গ সমাজের আচার-আচরণ ও পূর্বরাগের চিত্র। ঐতিহাসিক উপন্যাসে হাতেখড়ি স্বর্ণকুমারীর, সামাজিক উপন্যাসেও সেই ভারাক্রান্ত ভঙ্গি দেখা যায়। কিন্তু 'কাহাকে' এইরূপ দোষমুক্ত। নারীমনের অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ যেখানে সেখানেও তত্ত্বালোচনা বা উপদেশের গাম্ভীর্য নেই, বরঞ্চ সম্পূর্ণ নারীদৃষ্টিভঙ্গির আয়ত্ত একটি নারীর নিজস্ব জগতের নিপুণ চিত্র প্রকাশিত। লেখিকার বিস্তৃত পড়াশোনা ও ইংরেজী ভাষায় অধিকার এই উপন্যাসে বোঝা সহজ। 'কমেডি অফ্ এর্‌রস্'এর কৌতুকাবহ পরিবেশ উপন্যাসটির মধ্যে পাঠকচিত্তে আনন্দ আনে। নায়িকা বাল্যকালে পিতাকে ভালবেসে ফুল দিত। এটি লেখিকার স্বজীবন চিত্র। অতঃপর পাঠশালার সর্দার পোড়ো ছোটুকে সে সেই ফুল দিত। তারপর স্বাভাবিক ভাবে ছোটুর সঙ্গে বিচ্ছেদ।

কিন্তু নায়িকা একটি গান, একটি সুর খুঁজে বেড়াত :—

"হায়! মিলন হোলো,
যখন নিভিল চাঁদ, বসন্ত গেলো!
হাতে পরে মালাগাছি, সারাবেলা বসে আছি
কখন ফুটিবে ফুল, আকাশে আলো—"

এ গানখানি সে বাল্যবন্ধু ছোটুর মুখে অসমাপ্ত রূপে শুনেছে। পরে এই গান বিবাহিতা দিদির বাড়িতে ভগ্নিপতির বন্ধু রমানাথের মুখে শুনে সে অভিভূত হয়ে পড়ে। স্বপ্নে সে এই গান শোনে, জাগরণে রমানাথের মুখে গান শোনার প্রতীক্ষায় থাকে। অবশেষে রমানাথের সঙ্গে বাগ্‌দান। তখনই রঙ্গমঞ্চে ডাক্তার বিনয়কুমারের আবির্ভাব।

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে রমানাথের সঙ্গে নায়িকার বিবাহ ভেঙে গেল। সে তখন ডাক্তারের প্রেমে আত্মহারা। অথচ পিতার নির্বাচিত পাত্রে বিবাহ করতে হবে তাকে। পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের পরে সে পিয়ানোয় নিজের মনে গান গায়—"হায়, মিলন হোল—"

তখনি পেছন থেকে অন্য একটি কণ্ঠ গানকে সম্পূর্ণ করে। নায়িকা তখন চিনতে পারল ডাক্তার বিনয়কুমারই তার বাল্যপ্রেম ছোটু এবং পিতার নির্বাচিত পাত্র। সমস্ত বইখানির মধ্যে নারীমনের উথাল-পাথাল প্রশ্ন সে 'কাহাকে' ভালবাসে। সম্মোহনশক্তির মত সর্বত্র শৈশবশ্রুত প্রেম-সঙ্গীতটির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

স্বর্ণকুমারীর গীতিকাব্যে যে অপরিসীম মাধুর্য সেই মাধুর্য এই গ্রন্থের পশরা। চিরদিন বিশ্বের যত রোমান্স, যত ভালবাসা আমাদের বিমুগ্ধ করেছে এখানে তারই বাণী বিধৃত।

'কাহাকে' পড়তে আমাদের এ-যুগেও ভাল লাগে। যখনি লেখিকা তাঁর অসংখ্য রচনার কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের দেখা ও চারপাশের জগতের উপাদান আরোপ করেছেন, তখনি তাঁর রচনা তৎকালীন সমাজদলিল রূপে স্বীকৃত হয়েছে। এই বইখানির মধ্যে তরুণপ্রেমের সৌন্দর্যে মন আপ্লুত হয়ে যায়।

'বিদ্রোহ' স্বর্ণকুমারী দেবীর সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। লেখিকার ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মিবাররাজ' এই গ্রন্থখানির পূর্বসূরী। সেই সময়ে টডের 'রাজস্থান' থেকে লেখকেরা সাগ্রহে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মালমশলা আহরণ করতেন। স্বর্ণকুমারীও অনুরূপ ভাবে ঐতিহাসিক উপাদান গ্রহণের পরে প্রবাদ ও লোকশ্রুতি অনুসারে এবং নিজের বুদ্ধি ও সুবিধা অনুসারে সে উপাদান ব্যবহার করতেন।

রাজপুত-ইতিহাস 'মিবাররাজ' ও 'বিদ্রোহের' উপজীব্য। ভীল ও রাজপুতের সম্বন্ধ, তাদের সংঘর্ষ পুস্তকদ্বয়ে আলোচিত। 'গুহাকে' লেখিকা আদি মিবাররাজ করেছেন। যবনহস্তে নিহত শিলাদিত্যের পুত্র গুহ ভীলরাজ মন্দালিকের আনুকূল্যে ইদররাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। 'মিবাররাজের' পরিশিষ্টে লেখিকা বিশেষ পাণ্ডিত্যে টডের রাজস্থান ও অন্যান্য পুস্তক থেকে ইদররাজগুহা ও পরবর্তীকালে চিতোররাজ বাপ্পার ইতিবৃত্ত বিচার করেছেন।

'বিদ্রোহ', 'মিবাররাজের' দুইশত বৎসরের পরের ঘটনা। ভীলদিগের রাজপুতরাজত্বের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ, ভীল বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র, সংঘর্ষ ইত্যাদি 'বিদ্রোহের' উপজীব্য। ভীলদের অসন্তোষ সত্ত্বেও রাজপুতের প্রতি ন্ধ ব আনুগত্য, বিশেষতঃ রাজার ভীলপুত্র জু[illegible] মহৎ-সরল বিশ্বস্ততা [illegible]কে

আকর্ষণ করে।

পিতা জম্বুর রাজা নাগাদিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উস্কানি জুমিয়াকে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত করাতে পারেনি। মিবারের আদি রাজা গুহার নাম ছিল গ্রহাদিত্য। বর্তমান রাজা নাগাদিত্যের অশুভগ্রহ খণ্ডনার্থে তাঁরও এই নাম রাখা হয়। তিনি চঞ্চলমতি, জেদী কিন্তু রাজোচিত গুণসম্পন্ন। তিনি আবার বন্ধু জুমিয়ার পালিতা কন্যা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সুহারের প্রতি অনুরক্ত। ফলে সুহারের পাণিপ্রার্থী ভীল যুবক ক্ষেতিয়া রাজার শত্রু ও বিদ্রোহের একজন প্রধান হোতা। পরাধীন ভীলদের পূর্বপুরুষ একদা রাজপুতকে কথার মর্যাদা রাখবার জন্য রাজা করে রাজত্ব দিয়েছিলেন। নিজেদের চাষবাস, পশুপালন, শিকার ইত্যাদি কর্মে আবদ্ধ, নিজস্ব কুসংস্কারাচ্ছন্ন জগতের সীমায় আত্মপ্রীত-ভীলদের মানসে মাঝে মাঝে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগে। তখনই বিদ্রোহের অনল প্রজ্জ্বলিত হয়।

শেষপর্যন্ত রাজা নাগাদিত্য বা গ্রহাদিত্যের সুহারকে বিবাহের সভায় এই আগুন জ্বলে ওঠে। সুহার ক্ষত্রিয়া কন্যা, জুমিয়া দ্বারা পালিতা এই বোধে ক্ষত্রিয়রাজার সঙ্গে তার বিবাহ। কিন্তু সেই সভায় প্রমাণিত সুহার প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণকন্যা। মূর্খ-সরল ভীল জুমিয়া রাজপুরোহিত হরিতাচার্যের কথায় ঘোষিত এই অশাস্ত্রীয় বিবাহরোধে ক্ষণিকের ক্রোধে রাজাকে বর্শাবিদ্ধ করে। তখন ভীলেরা রাজপুরী আক্রমণ ও রাজসৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। "—বিদ্রোহ আরম্ভ হইল।"

জুমিয়া রাজবাড়ী ও ক্ষত্রিয়দের রক্ষায় প্রাণ দিল। নাগাদিত্যের শিশুপুত্র বাপ্পারাও-কে হরিতাচার্য ও সুহার রক্ষা করলেন।

রমেশচন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ স্বর্ণকুমারীকে উদ্দীপনা দিয়েছিল। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির অনুরণন অতি প্রকট। জ্যোতিষশাস্ত্রের অব্যর্থ গণনা, গ্রহাচার্য, কুলপুরোহিত নানাবিধ উপাদান লেখিকা বহুল ব্যবহার করেছেন। পূর্বেই বলেছি ভীলদের সংস্কার, জীবনযাত্রা, ভাষা ও নানা আনুষঙ্গিকের তিনি বিস্ময়জনক অভিজ্ঞতা দেখিয়েছেন।

জুমিয়া চরিত্রের সহজ নীতিবোধ, সারল্য, বিশ্বস্ততা এক অপূর্ব মানবিক বিকাশ। বন্ধুর প্রতি ভালবাসা ও পিতার আদেশ। এই দোটানার মধ্যেও জুমিয়া চরিত্র মহত্ব হারায় নি। কিশোর তেজস্বী রাজাও কোথাও খর্ব নন।

রাণী সেমন্তির সঙ্গে রাজার ভুলবোঝা ও মান-অভিমান নিপুণ দক্ষতায় বিচিত্রিত। রাজসভা, অন্তঃপুর, উদ্যান, সর্বত্রই লেখিকার বর্ণনাশক্তি প্রকাশিত। অরণ্যের বর্ণনা, ভীলদের বর্ণনায় লেখিকার কল্পনা ও পর্যবেক্ষণের মিলনের ফলে সম্ভবপর হয়েছে।

হৃতগৌরব জলুর অরণ্যদেবতার কাছে কাতর ক্রন্দন মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে :—"পাখিরা অন্ধকারেই গান গাহিয়া উঠিয়াছে, বনফুলের সুগন্ধ অন্ধকারের মধ্যেই চারিদিকে খেলিয়া বেড়াইতেছে। একাকী জলু এই সময়ে অরণ্যতলে একটি শালবৃক্ষকে প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন,—"দেবতা, এখনও তুইডার এমনি কারখানা,—মুইদের ছাড়িয়া তুইডা তানাদের হইলি, তানাদের বড় করিলি ? মুইদের ধন তানাদের দিলি ?—তুইকে সোনায় মড়াইবু, তুইডার তলায় হাজার ছাগ বলি দিবু, মুদের পানে ফিরে চাহ—মুদের দুখ তাড়াউ দেবতা!" ('বিদ্রোহ'-একাদশ পরিচ্ছেদ)

অসহায় সরল ভীলের প্রাণের প্রার্থনা কোনও এক প্রকারে অবশেষে সফল হয়েছিল।

কল্পনাসমৃদ্ধ ও কবিত্বময় 'বিদ্রোহ' স্বর্ণকুমারীর অপার লিখনশক্তির সাক্ষ্য। ওই প্রকার রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু আমরা বর্তমানে চাইনা সত্য ; তবুও কথাশিল্পীর ক্ষমতাকে স্বীকার করি। স্বর্ণকুমারী নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য প্রভৃতি রচনায় মনোযোগী ছিলেন। তাঁর কালে নানা উপলক্ষ্যে নাটক, প্রহসন ইত্যাদির বহু প্রচলন ছিল। ঠাকুরবাড়ীর প্রায় প্রতিটি বিবাহ অন্তে একদিন নাটক, প্রহসন বা গীতিনাট্য অভিনয়ের রেওয়াজ ছিল। স্বর্ণকুমারী, রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পরিবারের মধ্যেই অভিনয় করাতেন সযত্নে সেগুলি লেখার পরে। এইভাবে স্বর্ণকুমারীর 'পাকচক্র', 'বসন্ত-উৎসব' প্রভৃতি রচিত হয়।

মহিলা-করাঙ্গুলি প্রায়শঃ হাস্যরস উৎপাদনে সীমিতশক্তি। স্বর্ণকুমারীর কিন্তু হাস্যরসের অভাব ছিল না। 'পাকচক্র' একখানি প্রহসন (১৯১১) অবশ্য স্থানে স্থানে আমাদের কাছে রস একটু আতিশয্যে দুষ্ট মনে হয়। হয়তো এই আতিশয্যকে লেখিকা কার্টুনছবির আর্টের টেক্‌নিকে লিখেছেন। সেই সময়েও বিবাহের পণপ্রথা নিয়ে বিদ্রূপের গানটি ঘটকীর মুখে উপভোগ্য :

—"লাগবে না টাকাকড়ি সোনা ভরি ওজন করা।

শুধু উনিশ কি বিশ, যৌতুকটি দিস

কাগজ ভরা, ওগো কাগজ ভরা,
অমনি পরবে টোপর, আপনি সে বর দেবে ধরা।"

এই সঙ্গীতটি স্বর্ণকুমারীর অন্য প্রহসন 'কনে বদলে' ও (১৯০৬) এক ঘটকীর মুখে গীত। কনেবদলের সঙ্গীতপরায়ণ ভোলানাথ, রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভার' রসিক ও অমৃতলাল, বসুর 'ব্যাপিকা বিদায়ের' চৌধুরী মহাশয়ের পূর্বসূরী। 'কনেবদল' পুস্তাকারে প্রকাশিত ১৯৬-এ, 'প্রজাপতির নিবন্ধ'* উপন্যাস ১৯০৭-৮ এ, তার নাট্যরূপ চিরকুমার সভা ১৯২৫-২৬ এ।

'পাকচক্রে' পাকাদেখার জলখাবার বাঁচাবার জন্য কৃপণ গিন্নীর প্রয়াস অনাবিল হাস্যরস উদ্রেক করে। কিন্তু বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ কর্তার শেষ দৃশ্যে পুলিশের ভয়ে গিন্নীর আঁচল ধরার ব্যাকুলতা ভাঁড়ামী বলে মনে হয়। তবে আমরা কল্পনা করতে পারি সেকালে দর্শকপূর্ণ প্রাঙ্গণ করতালির শব্দে মুখর হয়ে উঠত।

স্বর্ণকুমারীর 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্য (১৮৭৯) আমাদের কাছে কৌতূহলপ্রদ নানা কারণে। 'গাথা'র কবিতার মত এখানে স্বাচ্ছন্দ্য কম, 'দেবকৌতুকের' কাব্যনাটক অধিক মার্জিত। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রের অধ্যক্ষতায় এই গীতিনাট্য মঞ্চস্থ হয়, স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রজায়া কাদম্বরী দেবী লীলার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অগ্রজার রচনার নিবিড় সাদৃশ্য পর্যবেক্ষণের পক্ষেও গীতিনাট্যটি অনুধাবনযোগ্য।

উদাসিনীর আবির্ভাব স্বর্ণকুমারীর দৈবশক্তির ও অলৌকিকের প্রতি পক্ষপাতের চিহ্ন। Dieus et machina-এর প্রথায় সঙ্কটমুহূর্তে দৈবী সহায়তা প্রাপ্তি।

উদাসিনীর প্রেমসঞ্চারের ঔষধপ্রয়োগ শেক্সপীয়রের 'মিড্ সামার নাইটস্ ড্রীমের' কথা মনে পড়ায়।

বসন্তকালে শোভা ও কুমারের বিবাহ, তৎসহ সখী লীলার প্রেমে প্রতিদান না পাওয়ার জ্বালা, উদাসিনীর সাহায্য, গোলযোগ, অবশেষে মধুর মিলন।

কতকগুলি সুন্দর গান এই গীতিনাট্যটিতে গ্রথিত।

উষা ও ইন্দুর গান:

"আজু কোয়েল কুহু বোলে,
আয় তবে সহচরী রুনুঝুনু রুনুঝুনু
বসন্তে জয়ধ্বজা তুলে।"

অথবা

শোভার গান : "একি সুখের তরঙ্গ বহিছে"

অথবা

লীলার গান : …"বিমল এ জোছনায়, সুমন্দ এ মৃদু বায়
দলিত কুসুমকলি আর কি উঠিতে পারে"

উদাসিনীর গান : "পোহাইল বিভাবরী উদিল নব তপন—"

অথবা

'কুমার ও শোভার গান : "প্রিয়ে, হৃদয়ের ধন, রাখো চরণে তোমারি।"

গানগুলি রক্ষণযোগ্য। এই গানগুলির সঙ্গে অনুরূপ রবীন্দ্রসঙ্গীতের তুলনা সাহিত্যছাত্রের পক্ষে আনন্দজনক।

স্বর্ণকুমারীর গদ্যরচনার তীক্ষ্ণতা ও সাবলীলভঙ্গি তাঁর ছোট-ছোট গদ্য রচনায় আরও উজ্জ্বল।

লেখিকার 'কৌতুকনাট্য ও বিবিধ কথা' ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের—'হাস্যকৌতুক' ১৯০৭-৮এ। এখানে 'কৌতুকনাট্য' আমরা তখনকার সমাজ-চিত্র হিসাবে আবার পড়ছি।

'লজ্জাশীলা', 'লোহার সিন্দুক' খণ্ডনাট্যে স্ত্রীজগৎ চিত্রিত। পরিহাস ও শ্লেষ মিশ্রিত এই ছোট ছোট নাটকগুলি রবীন্দ্রনাথকে এরকম রচনায় অনুপ্রেরণা দিয়েছিল অনুমান হয়।

'বৈজ্ঞানিক বর', 'সূক্ষ্ম ডাক্তারী'-র মধ্যে অধীত বিদ্যার ফলাফল নিয়ে আস্ফালনকে শ্লেষ করেছেন লেখিকা। 'গানের সভায়'—

"ছক্রগাড়ী চক্রনাড়ী বক্রপাড়ি মানছে!
বক্ককাহু ফুংকি বেণু যন্ত্রতন্ত্র সারছে—"

পশ্চাৎসূরী সুকুমার রায়ের রচনাকে মনে করায়।

এখানে আতিশয্য থাকলেও বৈদগ্ধ্য, হাস্যরস মিলেমিশে এমন একটি স্তর সৃষ্টি করেছে যেখানে লেখিকার লেখনী সম্পূর্ণ মেয়েলীভাব বর্জিত। এগুলির প্রত্যেকটি জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাবহ। 'বিবিধ কথা' গদ্য লেখিকার বিভিন্ন দিকে মনোভাব ও মতামতের প্রতিফলন।

'সঙ্গীত শতক' স্বর্ণকুমারীর অতি বিশিষ্ট সঙ্গীতের সঞ্চয়ন।

'এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী,
সে শুধু গো যদি আসিত।

পরাণে এমন আকুল পিয়াসা,
যদি সে শুধু গো ভালবাসিত।”

—গানটি অদ্যাপি শোনা যায়। তেমনি “ওগো পরাণ প্রিয়,” “এমনি করে তারো কি কাঁদে প্রাণ আমারো তরে”, “সেই তো কুসুম ফোটে”, “সুখের স্বপনে ছিনু কে ভাঙালে ঘুমঘোর”, “এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন”, “এমন মধুর মধু, এমন বারি ঝরে”, “সখি নব শ্রাবণ মাস”, ইত্যাদি গানগুলি উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণকুমারীর প্রবল কবিত্বশক্তি, শব্দচয়নের বৈশিষ্ট্য, ছন্দে পরম কুশলতা এই গানগুলির মধ্যে প্রকট ভাবে দৃশ্যমান। সেকালে সঙ্গীতগুলির জনপ্রিয়তা বিস্ময়কর ছিল। লেখিকা এই সকল গান নিজের নানা নাটকের মধ্যে ব্যবহার করেছেন। পথেঘাটে, গ্রামোফোনে, সভাসমিতিতে, সঙ্গীতশিক্ষার্থীর কণ্ঠে বহু প্রচলনে গানগুলি জীবন্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথের বহু গানের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ‘হায়রে হোলনা মালা গাঁথা গানটিতে আত্মবিস্মৃতার মালা গাঁথার চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের “ওই জানালার কোলে বসে আছে সে—” গানটির সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানটি রসলোকের যে স্তরে উন্নীত, স্বর্ণকুমারীর গান সেখানে প্রবেশ করেনি। এইভাবে পাশাপাশি রেখে দুই কবির কাব্য ও সঙ্গীত পাঠ করার আনন্দ পাঠকদের উপরেই ছেড়ে দিলাম। স্বর্ণকুমারীর ব্রজবুলিসমন্বিত গানসমূহ, ‘ভানুসিংহের পদাবলী’র পূর্বে লেখা, আগেই বলেছি। সেগুলি ‘ভানুসিংহের পদাবলী’ অপেক্ষা ন্যূন নয়।

স্বর্ণকুমারী যেরকম প্রহসন রচনা করতেন, হাস্যরসের অনুশীলন করতেন, তেমনি তাঁর গানের মধ্যেও সেই হাস্যরসের অনুধাবন করা সমীচীন। “ছি ছি কেমন জামাই”, “সইলো মোর গঙ্গাজল” ও উত্তরে “ও প্রাণ আমার গঙ্গাজল” ‘সঙ্গীতশতকে’ সন্নিবিষ্ট। ‘পাকচক্র’ ‘কনে বদল’ ইত্যাদি প্রহসনের মধ্যে মধ্যে স্বর্ণকুমারীর হাস্য ও শ্লেষাত্মক বহু গানের সন্ধান মেলে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘প্রভাত সঙ্গীতে’, ‘খুকুরাণী’, ‘আশীর্বাদ’, ‘ভাইবোন’, ‘আশা’, ‘নিশীথসঙ্গীত’ প্রভৃতি কবিতা বাৎসল্য রসের। রবীন্দ্রনাথের শিশুদের আশীর্বাদ পর্যায়ের কবিতার কথা মনে পড়ে। প্রভাতের বর্ণনা দিয়ে ‘প্রভাতসঙ্গীত’ আরম্ভ।

কবি অবশ্য প্রেমসঙ্গীত ও প্রেমের কবিতায় অধিক মনোযোগী। নানা রূপ প্রেমকে তাঁর কাব্যের বিভিন্ন প্রহরে দেখি আমরা। তেরটি কবিতায় সংকলন

''প্রভাত সঙ্গীতে' কবি পূর্ণ প্রাণে গাইছেন: "আমি কি চাহি?/সে আমার, আমি তার, আমার কি নাহি!" ('আমি কি চাহি') 'সৌন্দর্যের পূর্ণ মহিমা' দেখছেন একখানি মুখে (কোথায় কোথায়?), 'দেহের সীমানায় অনন্তের বাসা'কে ভালবাসা বলে চিনেছেন ('জানিনাত')। সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কবিতা—'বিরহ কারে কয়?'

"বিরহ কারে কয়?
আমি ত দিবানিশি তোমাতে আছি মিশি,
জগৎ সদা হেরি তুমিময়
বিরহ কারে কয়?"

'মধ্যাহ্ন সঙ্গীত' নামক অংশটি মধ্যাহ্নের বর্ণনা সহ আরম্ভ। চিত্রাঙ্কনের মত নিপুণ বর্ণনা সখী গিরীন্দ্রমোহিনীর লেখনীচিত্রগুলি মনে করায়। সতেরোটি কবিতার মধ্যে "বঙ্গের বিধবা" কবিতাটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তিনখানি প্রেমপত্রিকাও এই পুস্তিকায়। তরুলতার কথোপকথন মধুসূদনের মত। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কবি কয়েকটি গান রচনা করে গেছেন এখানে 'বলি শোন খুলে' 'প্রভাতসঙ্গীতে', 'কলিকালে কালোরূপ ও 'শিশু হরি' গান উদাহরণ দেওয়া যায়।

'কেউ চাহেনা আপন পানে' কবিতার লঘুসুরে নীতি বাক্য উপভোগ্য।

'সন্ধ্যাসঙ্গীতের' আরম্ভ সন্ধ্যার বর্ণনায়। প্রাকৃতিক বর্ণনায় চারটি কাব্যাংশের আরম্ভ। 'নিশীথসঙ্গীতে' 'জীবন-অভিনয়' কবিতা প্রকৃতপক্ষে রাত্রির বর্ণনা, কিন্তু নিছক প্রকৃতির বর্ণনায় শেষ নয়—এক বৃহত্তর জীবন-দর্শনে পরিব্যাপ্ত। 'সন্ধ্যা' কবিতার মধ্যে কবির উদাসী মনের ছায়া কবিতাকে মর্মস্পর্শী করছে। সেই উদাসী বৈরাগ্য পরবর্তী অংশে রূপ নিয়েছে আরও স্পষ্ট 'জীবন-অভিনয়ে'।

'নিশীথসঙ্গীত' স্বভাবতঃ রাত্রির গান। তাই বোধহয় জ্যোৎস্নার প্রকারভেদ এখানে, যথা 'শারদ জ্যোৎস্নায়', 'বসন্ত জ্যোৎস্নায়', 'জ্যোৎস্নায় নদীকূলে' নামক কবিতার প্রাদুর্ভাব এবং নিশীথ ও জ্যোস্নার বিবরণ।

'জীবন-অভিনয়ের' দার্শনিক তত্ত্ব লেখিকাকে অবশ্য জীবনের নানা বিভিন্ন স্বাদ গ্রহণে বীতরাগ করেনি। কবির একটি শ্রেষ্ঠ প্রেমকবিতা নিশীথের সঙ্গীতে উপস্থিত, এই জীবন স্বাদ।

—"তুলিয়া কুসুমহার
সঁপিলাম করে তার,
অনন্ত খুলিল আঁখি পরে,
মুহূর্তে বন্ধন চূর্ণ,
অপূর্ণ হইল পূর্ণ
স্পর্শ হোল অধরে অধরে।" ('অধরে অধরে')

'নিশীথসঙ্গীতের' অধিকাংশ কবিতা ব্যথাতুর। কবি মনের সকরুণ বেদনাবোধ। কবির চিত্ত কোমল ও প্রেমেপূর্ণ। 'বাল্যসখী' কবিতায় নারীর প্রতি যে প্রেম সে ও উত্তাল। গান ও কবিতার মধ্য দিয়ে নানা জনকে কেন্দ্র করে সে প্রেম উচ্ছ্বসিত। দয়িতের মিলনে ও বিরহে এই প্রেমের বিচিত্ররূপ। 'কাহাকে' উপন্যাসের রহস্যময় উৎসর্গপত্রটি 'নহে অবিশ্বাস' প্রভৃতি কবিতার সঙ্গে একাত্মভূত। কোন এক বিশেষ সত্তাকে বিচিত্রিত করে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর সমস্ত রচনার মধ্যেই প্রেমের একটা বিশেষ স্থান আছে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর যুগ স্বর্ণযুগ। যে গৃহে তিনি বিরাজ করতেন সেখানে শিক্ষাসাহিত্যসংস্কৃতির পরিমণ্ডল রচিত ছিল। পূর্বপুরুষ ছিলেন সর্বজ্ঞানের অধিকারী। সহোদরেরা ছিলেন অগ্রগণ্য সাহিত্যিক। স্বামী শিক্ষানুরাগী, উৎসাহদাতা। চতুষ্পার্শ্বে যে পরিমণ্ডল সেখানে নক্ষত্রের দীপ্তিতে সেই যুগের বিশিষ্ট লেখক, লেখিকা ও চিন্তাবিদ। সখীরাও লেখিকা ও রসিকা, কন্যাদ্বয় সমান উৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগিণী। একখানি মালার মত স্বর্ণকুমারীর চারপাশে একমনে, এক আদর্শে সকলে শোভিত। যদি সেই কালের 'ভারতীর' কোন খণ্ড আমরা দেখি, দেখা যাবে স্বনামধন্য, স্বনামধন্যাব উপস্থিতির দ্বারা 'ভারতী' ধন্য। শুধু সাহিত্য নয়, বিভিন্ন রেখাচিত্র, বর্ণাঢ্য চিত্র, নানা বিষয়ে রচনা, অনুবাদ, দেশবিদেশের কথায় সমৃদ্ধ ভারতীর জোড়া ছিল না। আমার মনে আছে মাতা শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীর সংগ্রহাগার থেকে প্রাচীন 'ভারতী'র পাতায় রাজা সলেমনের 'সঙ্ অফ সঙস্' পাঠে মোহিত হয়েছিলাম। অনুবাদ স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

স্বর্ণকুমারীর এই নিজস্ব জগতে প্রচুর অর্থ, অনন্ত অবসর, অসামান্য প্রেম সমস্ত ছিল। গোলাপবেলচামেলিসুরভিত দিনগুলির ময়ূরকণ্ঠী রংএ ভেসে যেত কবিতা,—

গান, নাটক, কথাশিল্প। তাদের রং এ বর্তমানের রং মিলবে না। তাই হয়তো শক্তিশালিনী সাহিত্যসাম্রাজ্ঞী কোনও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রেখে যেতে পারেননি। সমাজের এক স্তরের নিপীড়িত মানুষের কথা তাঁর কলমে ফুটে ওঠেনি। দূর থেকে দেখা দিয়েছেন যাঁরা এই পরিশীলিত ও মার্জিত সাহিত্যে তাঁরা নিজের রং পাননি। যদিও বর্তমানের তুলনায় বহু পৃথক তবু সমসাময়িক কালকে ধরে রাখার দলিল এগুলি। লেখিকা ঐতিহাসিক উপন্যাসে বহু সময় ব্যয় করলেও তাঁর 'স্নেহলতা', 'কাহাকে' ও গল্পগুলি মাত্র তৎকালীন সমাজ-আলেখ্য।

আমরা বহু চেষ্টার পরে স্বর্ণকুমারী দেবীর কিছু রচনা বর্তমানের পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি। সংক্ষিপ্ত আলোচনা লেখিকার প্রতিভার সম্যক মূল্যায়নে ব্যাপিত নয়। কিন্তু তাঁর অসাধারণ ও অপরিসীম সাহিত্যসৃজন আমাদের প্রতি মুহূর্তে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

স্বর্ণকুমারী দেবী নমস্যা।

শ্রীমতী বাণী রায়

উপন্যাস

বিদ্রোহ

১

পার্ব্বত্য প্রদেশে ঝড় উঠিয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যার অন্ধকারে মগ্ন। সজোর বাতাসে ঘনীভূত মেঘরাশি পাহাড়ে পাহাড়ে ক্ষত-বিক্ষত খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ছুটিতেছে; দিগবিদিগ্ ব্যাপী বৃষ্টিধারা শত শত ক্ষুদ্র শীকরকণায় কীর্ণ-বিকীর্ণ হইয়া উড়িতেছে, পাহাড়ের গাত্রে তরুরাজি সজোরে হেলিয়া দুলিয়া, ছিন্নভিন্ন-পত্রশাখ হইয়া নুইয়া নুইয়া পড়িতেছে, মনে হইতেছে, শৈলমালা দুর্দান্ত ঝড়-দেবতার চরণে সভয়ে যেন প্রণিপাত করিতেছে। সেই বৃক্ষপল্লব-তরঙ্গায়িত পাহাড়ের আঁধার শৃঙ্গে বিদ্যুৎ চমকিয়া যাইতেছে, মেঘ প্রতিধ্বনিত হইয়া ঘন ঘন গর্জ্জন করিতেছে।

নদীতে ভীম তুফান; স্রোতের বেগ দুর্দ্দম্য; নৌকা যায় যায়, আর থাকে না। নৌকার মধ্যে যাত্রী চারিজন;—একটি শিশু, দুইজন স্ত্রীলোক, পুরুষ একজন। শিশু কাঁদিয়া কাঁদিয়া কিছু পূর্ব্বেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, আর সকলে বিবর্ণমুখে ভয়াকুল দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া সমস্ত হৃদয়ের সহিত ভগবানের নাম জপিতেছিল।

ঝড় বাড়িতে লাগিল। মাঝিদের কোলাহল নিশ্চিত-মৃত্যুর মত সকলের কর্ণে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ঘুমন্ত শিশুকে এক রমণী অন্যের ক্রোড় হইতে সহসা তুলিয়া লইয়া আপনার বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল, এ-বুক হইতে যেন আর মৃত্যু তাহাকে কাড়িতে পারিবে না! অন্যের মুখে তাহাতে চকিতের মত ঈষৎ বিরক্তির ভাব প্রকাশিত হইল, কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে এ-বিরক্তি আবার পূর্ব্বের ঘন ঘোর আকুলতায় বিলীন হইয়া গেল। রমণী কাতরদৃষ্টিতে শিশুর মুখ হইতে

পুরুষের মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া দুই হাতে তাঁহার বক্ষ বেষ্টন করিয়া ধরিল। তিনজনের অস্ফুট আকুলকণ্ঠের প্রার্থনা একসঙ্গে সহসা ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

পুরুষটি রমণীর হস্তবন্ধন ছাড়াইয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিলেন, না পারিয়া সেইখান হইতে মাঝিদের অনুজ্ঞা দিতে লাগিলেন। সহসা ঝটিকার প্রাণ ভেদ করিয়া হৃদয়বিদারক রব উঠিল—"গেল গেল!" মাঝিরা চিৎকার করিয়া উঠিল, "গেল গেল",—মেঘ-বৃষ্টি-বজ্র-বিদ্যুতে রাষ্ট্র হইল—"গেল গেল!" দিগ্-বিদিক্ হইতে প্রতিধ্বনি উঠিল—"গেল গেল!" পুরুষটি বলে রমণীর হাত ছাড়াইয়া বাহিরে আসিলেন, রমণী অচেতন হইয়া পড়িল, অন্যজন শিশুবক্ষে অর্ধঅচেতনভাবে উঠিয়া পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে চারিদিকে অন্ধকার, আশে-পাশে পাহাড়ের অন্ধকার। বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, তুফানের খেলা; তাহা হইতে আরো ভয়ানক, এই অন্ধকারে অন্ধকারের খেলা,—একটা উচ্চ অন্ধকার উন্মত্ত মহিষের মত শৃঙ্গ তুলিয়া এই অন্ধকারের মধ্য দিয়া হন্ হন্ করিয়া নৌকার কাছে সরিয়া আসিতেছিল। এ অন্ধকার আর কিছু নহে, একটা পাহাড়শৃঙ্গ। তাই মাঝিরা সভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, "গেল গেল!" স্রোতের টানে নৌকা তাহার উপর গিয়া পড়িতেছিল—এই পড়ে পড়ে—এই পড়িল, মাঝি দুই একজন প্রাণভয়ে লাফাইয়া পড়িল, 'জোরে বাহ', 'জোরে বাহ' বলিয়া পুরুষটি উন্মত্তভাবে নিজে একটি দাঁড় ধরিলেন—কিন্তু সে কতক্ষণ? দেখিতে দেখিতে পাহাড় ঢুঁ মারিল। নৌকা সবলে পাহাড়ের উপর পড়িয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

* * * *

বিকালবেলা, এখনও অল্প অল্প মেঘ করিয়া আছে, কিন্তু ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ আর নাই। নদীবক্ষ প্রশান্ত, আর্দ্র তরুলতা নিস্তব্ধ। শুষ্ক তরুশিখরে বসিয়া কাকের দল আর্দ্র পাখনা ঝাড়া দিয়া কা কা করিতেছে। গাছের ভিতরে এক একটা হনুমান লম্বা লম্বা লেজ ঝুলাইয়া গম্ভীরভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে; প্রকৃতির এই পরিবর্তন-রহস্য-ধ্যানেই যেন তাহারা মহামগ্ন; কিন্তু অবশেষে নিতান্তই যখন ইহা ভেদ করিতে অক্ষম হইতেছে, তখন অগত্যা উত্তর-বংশের উপর ইহার আয়ত্তভার রাখিয়া দিয়া আকাশকে আপন আপন দন্তচ্ছটা দেখাইয়া বৃক্ষান্তরে লম্ফ দিয়া বসিতেছে।

এইসময় একজন পথিক নদীতীর দিয়া গমন করিতেছিলেন, সহসা নিকটে

শৈলতলে আহত, নির্জীব রমণীকে শিশু বক্ষে করিয়া পতিত দেখিয়া থামিয়া দাঁড়াইলেন। নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া রমণীকে এখনও জীবিত বলিয়া মনে হইল। নদী হইতে জল তুলিয়া পথিক রমণীর আহত রক্তাক্ত মস্তকে, মুখে, চক্ষে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। রমণী নড়িয়া উঠিল। পথিক তখন আশা-পূর্ণ-চিত্তে রমণীর হাতের বন্ধন হইতে আস্তে আস্তে শিশুকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলেন, শিশু জীবিত কি না, এইবার দেখিবেন। রমণী সহসা আরও বলপূর্ব্বক শিশুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু মেলিল, তাহার বিহ্বল বিবর্ণ দৃষ্টি পথিকের নয়নের উপর পতিত হইল, পথিক সচকিতে শিশুকে ছাড়িয়া দিলেন। রমণী তখন অস্ফুট স্বরে বলিল, "দেব, ক্ষত্রিয়াণীর শিশু ক্ষত্রিয়াণী ফিরাইয়া আনিয়াছে. এই লও, এখন তোমার ধন তুমি লও।"

বলিয়া দুই হাতে বক্ষ হইতে শিশুকে উঠাইয়া ধরিল। পথিক নির্জীব শিশুকে হাত পাতিয়া ধরিলেন। রমণী প্রাণত্যাগ করিল।

২

বন্ধুতা

গুহা ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যসময়ে ইদরে যে ক্ষুদ্র রাজত্ব স্থাপন করিয়া যান, এখন অষ্টম শতাব্দীর মধ্যসময়ে তাহা মিবারের অন্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; শতাব্দীকাল হইল, গুহার প্রপৌত্র আশাদিত্য আহর পর্য্যন্ত স্বাধিকারভুক্ত করিয়া এইখানে আশাপুর নামে রাজধানী স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আহরের নাম হইতে গুহার বংশধরগণ এখন আহরীয় নামে খ্যাত। আশাপুরই এতদিন গুহলুট আহরীয়দিগের প্রধান বাসস্থান ছিল; মৃগয়া উপলক্ষ্যে কখন কখন তাঁহারা ইদরে আসিয়া বাস করিতেন মাত্র। কিন্তু আশাদিত্যের পৌত্র নাগাদিত্য রাজা হইয়া অবধি ইদর আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। ইদরই এখন রাজনিবাস। কিন্তু 'মিবাররাজ্যে' আমরা যে ইদর দেখিয়া আসিয়াছি—এখনকার ইদর আর সে ইদর নহে। ইদরের মন্দিরপুর-গ্রাম এখন আর গ্রাম নাই, এখন তাহা রাজপুরী। গুহা এই পার্ব্বত্য-প্রদেশে রাজা হইয়া মন্দিরপুরের চারিদিক লইয়া রাজধানীতে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। দুর্গ, প্রাসাদ, মন্দিরাদিতে ইহার এখন স্বতন্ত্র শ্রী। একলিঙ্গদেবের সেই পুরাতন কুটীর, যাহা হইতে মন্দিরপুর নামের সৃষ্টি, তাহা

এখন উচ্চস্বর্ণচূড়া-যুক্ত নূতন বেশে রাজ-প্রাসাদের উদ্যানমধ্যে বিরাজিত।• মন্দিরপুরের সুহারমতী নদী—যাহার তীরে দণ্ডায়মানা বালিকা সত্যবতীর ভয়চকিত দৃষ্টির সম্মুখে দুরন্ত দরিদ্র বালক গুহা ও তাহার সহচরগণের প্রচণ্ড সন্তরণে প্রতিদিন মথিত আলোড়িত হইয়া, মন্দির-নিম্নের তরুলতা-তৃণ-শষ্পময় আঁকাবাঁকা পাষাণ-ভূমির মধ্য দিয়া বহিয়া যাইত,* তাহা এখন মন্দির-সংলগ্ন সুরম্য পাষাণ-সোপানাবলীনির্ম্মিত ঘাটে সুসজ্জিত হইয়া রাজপুরুষদিগের স্নানের জন্য নিয়োজিত।

আজ মাঘের ভানু-সপ্তমী; উষাকালেই মহারাজ নাগাদিত্য সহচরবর্গের সহিত এই ঘাটে সূর্য্য-পূজা করিতে আসিয়াছেন। নাগাদিত্যের আর এক নাম গ্রহাদিত্য। কুগ্রহের দৃষ্টিতে নাগাদিত্যের জন্ম, জন্মের অল্পদিন পরেই নাগাদিত্য পিতৃমাতৃহীন, (মাতা-পিতার সহিত সহমরণ গমন করেন)—তাই নাগাদিত্যের কনিষ্ঠতাত বুধাদিত্য ইঁহার আর একটি নাম রাখিয়া ছিলেন—গ্রহাদিত্য।

যেখানে যে বিষয়ের অভাব অনুভব করা যায়, সেইখানে তাহার ভানেতেও একটি পরিতৃপ্তি। যে ধনী, তাহাকে ধনী বল, তাহার তাহাতে আনন্দ নাই। কিন্তু যিনি ধনী নহেন, ধনী নামে তাঁহার বিশেষ আনন্দ।

নাগাদিত্যের উক্ত নামে গ্রহগণ কতদূর ভীত হইয়াছিল, জানি না, তবে এই নাম রাখিয়া অবধি বুধাদিত্য অনেকটা মনের সন্তোষে ছিলেন। বিশেষ মিবারের আদি-রাজ গুহার গ্রহাদিত্য নাম ছিল, তিনি বাল্যকালে কত বিপদে পড়িয়াও পরে রাজ্যেশ্বর হইয়া দীর্ঘ-জীবন লাভ করেন। সেই নাম ধারণ করিলে, নাগাদিত্যও যে তাঁহার ভাগ্য লাভ করিবেন, বুধাদিত্য এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। ইচ্ছা হইতেই কি না সাধারণতঃ আশা জন্ম লাভ করে।

কেবল নামে নহে, আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যেও নাগাদিত্য গ্রহাদিত্যের অনুরূপ, ইহা সাধারণের বিশ্বাস।

ষোড়শবর্ষীয় যুবক নাগাদিত্য উজ্জ্বল-গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ, সুকুমার দেহ, উন্নত নাসিকা, আয়ত লোচন, দৃঢ়তাপ্রকটিত-সুশ্রীমুখ।

গুহার সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই বোধে নাগাদিত্যও গর্ব্ব অনুভব করেন, সর্ব্বতোভাবে দ্বিতীয় গ্রহাদিত্য হওয়া নাগাদিত্যের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। নৃত্যগীত প্রভৃতি লইয়া তিনি অধিক সময় থাকেন ' অট্টালিকা-উপবন-শোভিত.

---

* মিবাররাজ উপন্যাস দেখ।

ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ-ভূষিত, আশা-পুর উপত্যকা-সহর অপেক্ষা অরণ্যপর্ব্বতশোভিত ইদরের ভীলভূমিই তাঁহার অধিক ভাল লাগে।

এখন বেলা প্রায় এক প্রহর। সূর্য্য-পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, বন্দনাগান নীরব হইয়া পড়িয়াছে, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢাক, ঢোল থামিয়া গিয়াছে। মন্দিরের রসানচৌকির ললিত রাগিণীতান এখনও কেবল মৃদুমধুর সৌরভের মত অলক্ষ্যভাবে চারিদিক্ পরিপূর্ণ করিতেছে। স্নান-পূজা শেষ করিয়া মহারাজ সসভাসদ্ ঘাটের উপরে বিচিত্র কারুকার্য্য-ভূষিত মন্দিরদালানে বহুমূল্য গালিচার উপরে আসিয়া বসিয়াছেন; অনুচর সৈন্যসামন্ত উদ্যানে, ঘাটে, সোপানে, যেখানে সেখানে সারিবন্দী দণ্ডায়মান। পরশু বসন্ত-পঞ্চমী গিয়াছে, রাজা হইতে সামান্য সৈনিকটির পর্য্যন্ত পরিধানে আগাগোড়া বসন্ত রং, বাতাসে শত শত দণ্ডায়মান সৈনিকের বসন্ত পাগড়ীর আঁচল দুলিয়া দুলিয়া প্রভাত-সূর্যকিরণে বসন্তের তরঙ্গ তুলিয়াছে। চারিদিকের এই নবীন বসন্ত-দৃশ্যের মধ্যে, বাগানের গাছে গাছে, রাজবাটী ও মন্দিরের স্তম্ভে, প্রাচীরের—পরশুকার বসন্ত-উৎসবের শুষ্ক ফুলের মালা। স্মৃতির পুরাতন ভগ্ন প্রেমের মাঝখানে নূতন প্রেমের মত চারিদিকের নবীনত্ব ইহাতে ঈষৎ ম্লানভাব হইয়াও সতেজ রহিয়াছে।

রাজার পশ্চাতে সুসজ্জ প্রহরিগণ মুক্ত তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান, আশেপাশে সভাসদগণ এবং সম্মুখে কুশাসনোপরি আচার্য্য পাঁজি-হস্তে উপবিষ্ট। ফাল্গুন মাস আগতপ্রায়, ফাল্গুনের প্রথমেই আহরীয়-উৎসব (শীকার-উৎসব), আচার্য্য এই দিনের শীকারের একটি শুভ সময় নির্ণয় করিয়া দিবেন, সেই মুহূর্ত্তে শীকার সিদ্ধ হইলে সংবৎসর শুভ কাটিবে, সকলে উৎসুকনেত্রে আচার্য্যের মুখাপেক্ষা করিয়া আছেন। আচার্য্য পুঁথি হইতে মুখ উঠাইতে না উঠাইতে রাজা আগ্রহে জিজ্ঞাস করিলেন,—"ঠাকুর—কি দেখিলেন?"

গণপতি ঠাকুর আপাততঃ এই মন্দিরের পুরোহিত। প্রধান পুরোহিত কয়েক বৎসর তীর্থ করিতে গিয়াছেন, এখনও ফেরেন নাই। ইহার বয়স অল্প—বিংশ বৎসরের অধিক হইবে না, পুরোহিতের গাম্ভীর্য্য দৃঢ়তা ইহাতে কিছুই নাই। মাথার জটাবদ্ধ কেশ, শরীরের বিভূতি, গলার পদ্মবীজমালা এই তরলমতি বালকে অশোভন হইয়াছে। পৌরোহিত্যের, এই মুখোসের মধ্য হইতে গণপতির মুখে চোখে হাবভাবে একটা ক্ষুদ্র মোসাহিবী ধরণ উঁকি মারিতেছে, সভাসদগণও পুরোহিত অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অনেকটা বিদূষকের মতই ব্যবহার করেন, ঠাকুরকে লইয়া অহরহঃ তাঁহাদের ঠাট্টা-তামাসা চলে, ঠাকুরও সন্তুষ্ট ছাড়া অসন্তুষ্ট

নহেন, তিনিও সুযোগ পাইলে তাঁহাদের তামাসা তাঁহাদেরই ফিরাইয়া দিয়া থাকেন।

রাজার জিজ্ঞাসায় হাসিবার যে বড় কিছু ছিল, তাহা নহে—তবু ঠাকুর হাসিলেন ;—বলিলেন, "বেলা দ্বিতীয় প্রহর, দুই যাম, তিন দণ্ড, চারি পল শুভ লগ্ন, শুভ মুহূর্ত্ত, শুভ-সিদ্ধি, ইহার কোন মার নাই, মুনির বচন।"

নাগাদিত্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "সে প্রায় তৃতীয় প্রহর ! ভোর হইতে অতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে ? সে ত বিষম ব্যাপার। ইহার আগে একটা মুহূর্ত্ত নাই ?"

ঠাকুর বলিলেন,—"থাকিবে না কেন ? প্রাতঃকাল এক প্রহর, অর্দ্ধ যাম, তিন দণ্ড, এক পল—ছাই ধরিলে স্বর্ণমূর্ত্তি হইবার সময়।"

সেনাপতি গজপতি সিংহ কহিলেন,—"তবে আগেই এ মুহূর্ত্তের কথা বলিলেন না কেন ?"

মন্ত্রী বলিলেন,—"গৃহিণীও ত ঘরে নাই যে, এতটা বেঠিক !"

বিদূষক বলিল,—"হাঃ হাঃ গৃহিণী থাকিলে বড় বেঠিক হইত না, ঠাকুর বিলক্ষণ ঠিক হইয়া যাইতেন।"

রাজা কি ভাবিতেছিলেন, সহসা কহিলেন,— "বিদূষক, একটু থাম হে। ঠাকুর, তবে সকালবেলাই লগ্ন স্থির রহিল ?"

বিদূষকের মুখের কথাটা মুখেই থাকিয়া গেল—ঠাকুরও একটা চোখা উত্তরের চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা হইতে রেহাই পাইয়া একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে রহিল বই কি ?"

মন্ত্রী স্বভাবতঃ কিছু মুখফোঁড়, তিনি বলিলেন,—"কিন্তু দ্বিতীয় প্রহরের মুহূর্ত্তটাই অধিক শুভ, তাহার কথাই ঠাকুর আগেই বলিয়াছেন।"

নাগাদিত্যের বীর-শ্রীযুক্ত বালক-মুখে বিরক্তি প্রকাশিত হইল—দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—"না, প্রথম প্রহরই শীকারের সময়।"

কেহ আর কথা কহিল না। বৎসরখানেকমাত্র বুধাদিত্যের মৃত্যু হইয়াছে, নাগাদিত্য স্বহস্তে রাজ্যভার পাইয়াছেন। ক্ষুব্ধ সিংহের ন্যায় তিনি এতদিন অধীনতা সহ্য করিয়া আসিয়াছেন। এখন সে খুল্লতাত নাই, সে বৃদ্ধ মন্ত্রীও নাই, (বুধাদিত্যের আগেই তাঁহার মৃত্যু হয়)—এমন কি, এই মন্দিরের পুরোহিত—যিনি থাকিলে সম্ভবতঃ যাঁহার রাশ এখনো তাঁহাকে কতকটা মানিয়া চলিতে হইত, তিনিও নাই, নাগাদিত্য এখন নিতান্ত বন্ধনমুক্ত। তিনি যে

আর অধীন বালক নহেন—সভাসদ্‌গণ প্রতিপদে তাহা এখন বুঝিতে পারেন।

প্রাতঃকালেই শীকারের সময় স্থির রহিল, সে সম্বন্ধে আর কেহ কোন কথা কহিল না, অন্য বিষয়ের প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। গজপতি সিংহ কহিলেন,—"ঠাকুর, দেখুন একবার, শীকার কিরূপ মিলিবে? পুথিতে কি বলে?"

আচার্য্য গণনা না করিয়াই বলিলেন,—"শুভ মুহূর্ত্তে শীকার শুভই মেলে, একটুক বুদ্ধি হইল না বাবা।"

বিদূষক বলিলেন,—"বুদ্ধি ওর যত, তা নামেই প্রকাশ পাইতেছে—বুদ্ধিতে উনি চার পা।"

রাজার মুখ হইতে নল পড়িয়া গেল, তিনি হাসিয়া উঠিলেন, সকলেই হাসিয়া অস্থির হইল। গজপতি মনে মনে একটু ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু সামলাইয়া বলিলেন, —"ঠাকুর, আপনি শুভ কাহাকে বলেন, জানি না, আরবারেও শুভ বলিয়াছিলেন—তবে কি না আরবারে একটিও বরাহ মিলে নাই।"

রাজা বলিলেন,—"সত্য কথা। এবার কিন্তু বড় বরাহ চাই।"

ঠাকুর বলিলেন,—"যে আজ্ঞে, তাহাই হইবে। আপনি যখন বড় চাহেন, তখন আর কি কথা।"

গজপতি বলিলেন,—"তা যদি সত্য হয় ত সে আপনার কথায় নহে, আরবারে আপনি কি বলিয়াছিলেন, মনে আছে ত?"

বিদূষক বলিলেন,—"ঠাকুরের সব কথাই অমনি। কি গো ঠাকুর, বলেন কি? গৃহিণী ত দিন দিন গোকুলেই বাড়িতেছেন, আপনার ভরসায় আর ক'দিন থাকি?"

কথাটায় আর কেহ হাসিল না, বিদূষক নিজেই হাসিতে আরম্ভ করিলেন। সংসারে এ একরকম সম্ভাদরের রহস্য সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।

সভাসদ্‌ শ্রীমন্ত সিংহ কহিলেন,—"ঠাট্টা নয়, ঠাকুরের গণনার গতিকই ঐ। ঠাকুর বলিলেন, আমার ছেলে হইবে—হইল মেয়ে!"

ঠাকুর সহজে দমিবার পাত্র নহেন, বলিলেন, "আরে বাবা, মেয়ে কি আর ছেলে নয়? মেয়ে-ছেলে ত বটে! অশুভ খবরটা কি হঠাৎ দেওয়া যায়? বুদ্ধিমান্‌ হইলে আপনিই বুঝিয়া লয়। আর অমন যে একটু তরতফাৎ, সে গণনার দোষ নয়, কালের দোষ। গণনার নিয়ম সব কালেই এক, তবে কি না, ত্রেতা যুগের আজানুলম্বিত বলিলে বুঝিতে হয় রামচন্দ্র,আর কলিযুগের আজানুলম্বিত"—বলিয়া ঠাকুর বিদূষকের দিকে চাহিলেন—হাসিলেন। রাজা হাসিয়া

তাঁহার কথাটা শেষ করিলেন, বলিলেন,—"আমাদের হনূমান্।" হাসিটা বেশ ভাল করিয়া জমিল, কেবল বিদূষক একটু থমকিয়া গেলেন, তাঁহার নাম হনুমান প্রসাদ। কি উত্তর দিবেন, হঠাৎ যোগাইল না, তিনি নামের উপযুক্ত একটু মুখভঙ্গী করিলেন। যখন কথাটা যোগায় না, তখন মুখভঙ্গীই তাঁহার অস্ত্র। এই সময় মন্ত্রী বিদূষকের মুখ রাখিলেন, আচার্য্যকে বলিলেন,—"ঠাকুর তবে এখন হইতে আপনি তালগাছ বলিলে আমরা আখের গাছ বুঝিব?"

পুরোহিত বলিলেন,—"আমি তা বলিতেছি না—তবে কি—গতিক তাই বটে,—চাহিয়া দেখ।"

একজন সৈনিক সোপানের উপর দাঁড়াইয়া পাশের একটি গাছড়া বামহাতে টানিয়া তুলিতেছিল, দুইবার টানিয়া তাহা আমূল উঠিল না, ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া আসিল, এই সময় কতকগুলো চোখ তাহার উপর পড়িল—সে শশব্যস্ত হইয়া দুই হাতে তাড়াতাড়ি গাছটা টানিয়া তুলিল।

পুরোহিত বলিলেন,—"শুনিয়াছি, রাজা গ্রহাদিত্যের সৈনিকেরা এক একটা গাছ উপাড়িয়া তুলিতে পারিত, আর ঐ দেখ, একটা তৃণ তুলিতে উহার কত কষ্ট!"

সেনাপতি গজপতি সিংহ বলিলেন,—"আপনি যখন গাছ বলিতেছেন, তখন অবশ্য তাহা তৃণ হইবে।"

ঠাকুর বলিলেন,—"আজ্ঞে না। এ বাড়ান কথা নহে। গ্রহাদিত্যের সৈনিকেরা যে গাছ টানিয়া তুলিত, ইহা প্রসিদ্ধ কথা।"

কথাটা রাজার ভাল লাগিল না, গ্রহাদিত্যের সৈন্যেরা যাহা পারিত, তাঁহার সৈন্যেরা তাহা পারে না, ইহা তাঁহার পক্ষে মানের কথা নহে। গজপতি সিংহ তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন, বলিলেন,—"ঠাকুর ম'শায়, তৃণ না হইয়া যদি সে গাছ হয় ত বুঝি এরূপ গাছ হইবে?" তিনি নদী-তীরের একটি গাছ অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন, জলের তোড়ে তোড়ে সে গাছটা এমন শিথিল-শিকড় হইয়া পড়িয়াছে যে, দেখিলে মনে হয়, একবার টানিতে না টানিতে উঠিয়া পড়ে। কিন্তু পুরোহিত জানিতেন, দেখিতে উহ. যতই শিথিলমূল হউক—উহাকে উঠান বড় সহজ হইবে না। ঠাকুর বলিলেন,—"আপনার সৈনিকদের ইহাই উঠাইতে আজ্ঞা হউক।"

রাজার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সেনাপতি কোন কথা কহিবার অগ্রে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে বলিলেন,—"যে তোমাদের মধ্যে ঐ গাছটা

একটানে উঠাইতে পারিবে, সে পুরস্কৃত হইবে।"

অবাক্ সৈনিকবৃন্দ রাজার দিকে উন্মুখ হইয়া চাহিল, রাজা আবার আজ্ঞা করিলেন, সহসা একটা কোলাহল উত্থিত হইল, গাছের চারিধারে লোক জমিয়া গেল—সহস্র দৃষ্টি সেই গাছটার প্রতি নিবদ্ধ হইল, অথচ কেহ সাহস করিয়া তাহার অঙ্গে হস্ত নিক্ষেপ করিল না, প্রত্যেকেই প্রত্যেককে আগে চেষ্টা করিতে অনুনয় করিতে লাগিল। সেনাপতি কম্পিতকণ্ঠে আবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন, রাজা তীব্র-স্বরে বলিলেন,—"আমার এমন সৈনিক কেহ নাই যে, ঐ গাছটা তুলিতে সাহস করে!"—একজন অগ্রসর হইল, গাছ ধরিয়া টানিল, নিষ্ফল হইয়া লজ্জায় সরিয়া দাঁড়াইল, সেনাপতি লজ্জায় লাল হইলেন, রাজার হৃৎকম্প হইল,—আবার একজন গাছ ধরিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিল, সে-ও নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। আরও দুই একজন গেল, ঐরূপ নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। আর কেহ যাইতে সাহস করে না। রাজা সেনাপতির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সত্যই আমার রাজ্যে এমন সৈনিক নাই, যে ঐ গাছ উঠাইতে পারে?"

সেনাপতি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজা মাটিতে পদাঘাত করিয়া বলিলেন,—"আমি যাইব।" দালান হইতে তিনি লাফাইয়া নামিলেন। এমন সময় একজন ভীল গাছটার কাছে আসিয়া বলিল,—"ইহা উপড়াইতে হইবে? বলিতে বলিতে সহস্রমুখী শিকড়শুদ্ধ গাছটা উপড়াইয়া ফেলিল, অন্য সৈনিকেরা এতক্ষণ নিজের পরিশ্রমে তাহারই যেন যশোদ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিতেছিল—তাহাদের হাতের টানে টানে ঐ শিথিলমূল বৃক্ষ আরও শিথিলমূল হইয়া ভীলের হস্তে উঠিবার জন্যই যেন অপেক্ষা করিতেছিল।

সংসারে অনবরত এইরূপই হইতেছে। শত ক্ষুদ্রের প্রাণপণ পরিশ্রম কাহারও চক্ষে পড়ে না; তাহার স্থলে একজন ভাগ্যবানকেই সকলে দেখিতে পায়। অদৃষ্ট শতজনের ধন দিয়া আপনার এক প্রিয় ব্যক্তিকে পোষণ করে। সকলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, কিন্তু কাহারও মুখে একবার জয়ধ্বনি উঠিল না। রাজা দ্রুতপদে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সে তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছে। কে বলিতে পারে রাজাও তাঁহার সৈনিকদিগের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া ফিরিতেন না?

৩

একে আর

এখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই, কিন্তু দীপালোকে দুর্গপ্রাঙ্গণ দিনের ন্যায় আলোকিত। ফুল-চন্দন ধূপ-ধূনার গন্ধ-পূর্ণ, আলোকিত প্রাঙ্গণ শঙ্খধ্বনিতে মাঝে মাঝে শিহরিত হইয়া উঠিতেছে। বাদকগণ ঢাকঢোল স্কন্ধে শানাই-বাঁশী হস্তে; সৈন্যসামন্তগণ অশ্বের লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সকলেই ফুল-চন্দনে ও শ্যামবস্ত্রে সজ্জিত। আহরীয় শীকার-উৎসব উপলক্ষ্যে রাজা স্বহস্তে এই শ্যামবস্ত্র সকলকে উপহার দিয়াছেন। রাজা আসিলে বাদকেরা বাজনা বাজাইয়া উঠিবে, সৈনিক ও সভাসদেরা অশ্বারূঢ় হইবেন। এই সময় প্রান্তরের এক নির্জ্জনপ্রান্তে কয়েকজন সভাসদ চক্র করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কি যেন একটা কানাকানি চলিতেছিল। জুমিয়া ভীল মহাপ্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়া অবধি দুই চারজন সভাসদ্ একত্র মিলিলেই এইরূপ হইয়া থাকে।

জুমিয়া বন্য-পশুর সহিত দ্বন্দযুদ্ধ করিয়া আশ্চর্য্যরূপে জয় লাভ করে, জুমিয়া একজন সুনিপুণ তীরন্দাজ, কুস্তিতে রাজসভায় জুমিয়াকে কেহ পারিয়া উঠে না, অল্পদিনের মধ্যেই জুমিয়ার এইরূপ নানাগুণ রাজা আবিষ্কার করিয়া লইয়াছেন। সভাসদ্‌গণ ইহাতে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এতদিন যে একটা রেষারেষি ছিল, সে সকল ভুলিয়া পাঁচজন একত্র হইলেই তাহারা আজকাল এক-প্রাণ হইয়া পড়ে, মুখে আর কোন কথা থাকে না, রাজার কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য অরাজকীয় ব্যবহারের উপর অবিশ্রাম হাস্য চলে, ভাষ্য চলে, কিন্তু যেহেতু তাহাদের পক্ষে ইহা বড় একটা হাসির কথা নহে—তাই অবশেষে সে সমস্ত হাসি-কানাকানি ক্রুদ্ধ তর্জ্জন-গর্জ্জনে পরিণত হয়।

উহাদের মধ্যে দুই একজন বিজ্ঞ যাঁহারা, তাঁহারা কেবল বড় একটা কথা কন না, আর সকলের তর্জ্জন-গর্জ্জনের মধ্যে গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িতে থাকেন, আর সেই ঘাড় নাড়ার মাঝে মাঝে ধীর-শান্তভাবে—বেশী নয়—কিন্তু এমন দু' একটি বুলী ঝাড়েন যে, অন্যের সহস্র কথার অপেক্ষা তাহার অর্থ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে এবং উত্তেজিত সভাসদ্‌গণ সহস্রগুণ অধিক উত্তেজিত হইয়া রাজা ও জুমিয়ার বিরুদ্ধে খড়্গ-হস্ত হইতে কৃতসঙ্কল্প হয় ও এই সঙ্কল্প অসঙ্কোচে রাজার নিকট তখনি গিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। অথচ অল্পক্ষণের মধ্যেই এই আস্ফালন আপনা হইতেই তাঁহাদের সেই ক্ষুদ্র-সীমাতেই বিলীন

হইয়া পড়ে। রাজার কাছ পর্য্যন্ত তাহার একটি অণু এ পর্য্যন্তও পৌঁছায় নাই। কেননা, সেনাপতি একদিন রাজার কাছে জুমিয়ার বিরুদ্ধে কি একটা কথা বলিতে গিয়া রাজার চোখে আগুন দেখিয়াছিলেন।

জুমিয়া আজ এখনও এখানে আসে নাই, তাই বিদূষক গাহিতেছিলেন—

কোথায় গেলে কালরূপ
কেঁদে সারা নন্দ ভূপ,
যশোদার কোল অন্ধকার—
দাঁড়ায়ে যমুনা-জলে
গোপিনী ভাসিছে জলে—
বাজে না যে কদম-মূলে
রাধা রাধা বাঁশরীটি আর।

জুমিয়ার প্রতি সেনাপতি সকলের অপেক্ষা বেশী চটা, জুমিয়া তাঁহারই অধিক ক্ষতি করিয়াছে। তিনি চারিদিক্ চাহিয়া "তাই ত" বলিয়া গোঁফ জোড়ায় ভালরূপে 'তা' দিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন,—"আজ যদি সে আমাদের সঙ্গে শীকারে যায়, তা হ'লে কিন্তু আমি আজ আর ধনুক ধর্‌ছিনে। সেদিন যে তীরটা হরিণ স্পর্শ করিল না, রাজা বুঝিলেন না ব্যাপারটা কি? একজন ভীলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা— এ অপমানে একজন ভদ্রলোকের হাত ঠিক থাকে?"

শ্রীমন্ত বলিলেন,—"রাম রাম! তোমার আমার যাতে অপমান মনে হয়— রাজা স্বচ্ছন্দে তাই কর্‌ছেন।"

বিদূষক গান বন্ধ করিয়া নীরবে ভ্রূভঙ্গী করিলেন।

মন্ত্রী বলিলেন,—"রাজা কি আর রাজা—রাজা ত বালক।"

শ্রীমন্ত বলিলেন,—"দেশটা অরাজক হোল।"

মন্ত্রী গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িলেন।

সেনাপতি বলিলেন,—"বেশী দিন আর টিক্‌ছে না, এই আমি ব'লে দিলেম। ভীলদের অত প্রশ্রয় দেওয়া!"

মন্ত্রী বলিলেন,—"মহারাজ আশাদিত্যকে একজন ভীল ত মার্‌তে যায়!"

সেনাপতি। সেই পর্য্যন্তই ত ভীলদের সঙ্গে রাজাদের মেশামেশি ছিল না।

শ্রীমন্ত বলিলেন,—"আবার যে এই আরম্ভ হোল, দেখা যাক, গড়ায় কোথায়?"

মন্ত্রী বলিলেন,—"আর এরা যে সেই নির্ব্বাসিত ভীলের বংশ নয়, তাই বা কে বল্‌তে পারে? সম্প্রতি না এসেছে?"

মুরলীধরের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল—বলিলেন,—"তবে রাজার জীবনের উপর যে জুমিয়ার লক্ষ্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কই?"

কলের পুতুলের মত চারিদিকে একটা নীরব ঘাড়-নাড়ানাড়ি পড়িয়া গেল, রাজার জীবনের জন্য সকলে মহাব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই সময় পুরোহিত এখানে আসিলেন। বিদূষক বলিল,—"ঠাকুর ম'শায়, তোমারই এই কীর্ত্তি।"

ঠাকুর জড়সড় হইয়া বলিলেন, —"কেন, কি, করিয়াছি কি?"

সেনাপতি বলিলেন,—"হুঁঃ, করিয়াছেন কি? জুমিয়া ভীল যে রাজার এমন প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তার মূলটা কে?"

পুরোহিত নিজের জটার মধ্যে পাঁচটা আঙ্গুল চালাইয়া দিয়া বলিলেন,— "তাতে ত আর ক্ষতি কিছু হয় নাই।"

শ্রীমন্ত বলিলেন,—"আপনার ক্ষতি নাই হোক—রাজ্যের ক্ষতি!"

মন্ত্রী বলিলেন,—"আপনার ক্ষতিই বা নয় কেন? আগে আপনাকে মহারাজ যত ভালবাস্‌তেন, জুমিয়া এসে পর্য্যন্ত তা কি বাসেন?"

পুরোহিত বলিলেন,—"কি, করিতে হইবে কি?"

সেনাপতি বলিলেন,—"যা করিতে হইবে, আপনি বুঝুন। আমাদের আর মান না খোয়াইতে হইলেই হইল।"

শ্রীমন্ত বলিলেন,—"আপনার জন্যই এরূপ হয়েছে, আপনিই এখন বুঝিয়ে তাঁর চোখটা খুলে দিন।"

পুরোহিত কহিলেন,—"রাজা কোথায়?"

শুনিলেন শিশামহলে। পুরোহিত শিশামহলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিশামহল—আয়নামহল—অর্থাৎ সজ্জাগৃহ। রাজা এই গৃহে শীকার-সজ্জা করিতেছিলেন। সাজ একরূপ শেষ হইয়া গিয়াছে; বর্ম্মাবৃত দেহে অস্ত্র-শস্ত্র শোভা পাইতেছে, লম্বিত কেশজাল সীঁতিতে বিভক্ত হইয়া পৃষ্ঠদেশে পড়িয়াছে। ভৃত্য মুকুট-হস্তে দণ্ডায়মান, মুকুট মাথায় পরিলেই সজ্জা শেষ হয়; কিন্তু রাজা তাঁহার ক্ষুদ্র স্বল্পকেশ গোঁপ লইয়া মহাব্যস্ত, তাহার আগাটায় অবিশ্রাম চাড়া দিয়া কোনমতে তাহা পাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন—আর মাঝে মাঝে দেয়ালের একখানি আকর্ণ বিস্তৃত বৃহৎ গুম্ফের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। ছবিখানি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ গুহার। এমন সময় পুরোহিত

মন্ত্রী বলিলেন,—"আর এরা যে সেই নির্ব্বাসিত ভীলের বংশ নয়, তাই বা কে বল্‌তে পারে? সম্প্রতি না এসেছে?"

মুরলীধরের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল—বলিলেন,—"তবে রাজার জীবনের উপর যে জুমিয়ার লক্ষ্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কই?"

কলের পুতুলের মত চারিদিকে একটা নীরব ঘাড়-নাড়ানাড়ি পড়িয়া গেল, রাজার জীবনের জন্য সকলে মহাব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই সময় পুরোহিত এখানে আসিলেন। বিদূষক বলিল,—"ঠাকুর ম'শায়, তোমারই এই কীর্ত্তি।"

ঠাকুর জড়সড় হইয়া বলিলেন, –"কেন, কি, করিয়াছি কি?"

সেনাপতি বলিলেন,—"হুঁঃ, করিয়াছেন কি? জুমিয়া ভীল যে রাজার এমন প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তার মূলটা কে?"

পুরোহিত নিজের জটার মধ্যে পাঁচটা আঙ্গুল চালাইয়া দিয়া বলিলেন,— "তাতে ত আর ক্ষতি কিছু হয় নাই।"

শ্রীমন্ত বলিলেন,—"আপনার ক্ষতি নাই হোক—রাজ্যের ক্ষতি!"

মন্ত্রী বলিলেন,—"আপনার ক্ষতিই বা নয় কেন? আগে আপনাকে মহারাজ যত ভালবাস্‌তেন, জুমিয়া এসে পর্য্যন্ত তা কি বাসেন?"

পুরোহিত বলিলেন,—"কি, করিতে হইবে কি?"

সেনাপতি বলিলেন,—"যা করিতে হইবে, আপনি বুঝুন। আমাদের আর মান না খোয়াইতে হইলেই হইল।"

শ্রীমন্ত বলিলেন,—"আপনার জন্যই এরূপ হয়েছে, আপনিই এখন বুঝিয়ে তাঁর চোখটা খুলে দিন।"

পুরোহিত কহিলেন,—"রাজা কোথায়?"

শুনিলেন শিশামহলে। পুরোহিত শিশামহলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিশামহল—আয়নামহল—অর্থাৎ সজ্জাগৃহ। রাজা এই গৃহে শীকার-সজ্জা করিতেছিলেন। সাজ একরূপ শেষ হইয়া গিয়াছে; বর্ম্মাবৃত দেহে অস্ত্র-শস্ত্র শোভা পাইতেছে, লম্বিত কেশজাল সীঁতিতে বিভক্ত হইয়া পৃষ্ঠদেশে পড়িয়াছে। ভৃত্য মুকুট-হস্তে দণ্ডায়মান, মুকুট মাথায় পরিলেই সজ্জা শেষ হয়; কিন্তু রাজা তাঁহার ক্ষুদ্র স্বল্পকেশ গোঁপ লইয়া মহাব্যস্ত, তাহার আগাটায় অবিশ্রাম চাড়া দিয়া কোনমতে তাহা পাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন—আর মাঝে মাঝে দেয়ালের একখানি আকর্ণ বিস্তৃত বৃহৎ গুম্ফের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। ছবিখানি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ গুহার। এমন সময় পুরোহিত

আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রাজা গোঁফ হইতে হাত উঠাইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"কি প্রয়োজনে ?"

ঠাকুর আশিস করিয়া বলিলেন,—"আর কিছু নহে, মহারাজের বিলম্ব দেখিয়া আগেই আশিস করিতে আসিলাম।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন,—"আশীর্ব্বাদ করুন, যেন বড় বরাহ পাই।"

পুরোহিত বলিলেন,—"তাহাই হউক। যাইবার বিলম্ব কি ?"

রাজা বলিলেন,—"বিলম্ব কিছুই নাই, এখনি যাইতেছি।"

রাজা মুকুট পরিয়া অগ্রসর হইলেন, সহসা পুরোহিত গলার পদ্মবীজ-মালার বীজগুলি সরাইতে সরাইতে বলিলেন,—"মহারাজ, জুমিয়া এখনো আসে নাই।"

রাজা বিস্ফারিত নয়নে চাহিলেন, পুরোহিত নিতান্তই সহসা ও কথা বলিয়াছিলেন, তাহার পর বলিলেন, "হ্যাঁ, জুমিয়া আসিবার কথা ছিল বটে।"

পুরোহিত বলিলেন,—"কিন্তু আসে নাই—তা না আসিলেই কি ভাল হয় না ?"

নাগাদিত্যের আবার গোঁপে হাত পড়িল বলিলেন,—"ভাল হয় ! কেন ?"

পুরোহিত একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"সে ভীল, আপনি রাজা—সবাই বলে—"

নাগাদিত্যের বড় বড় কাল পাতার মধ্যে কাল কাল চোখের তারাগুলা পর্য্যন্ত যেন জ্বলিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন,—"মহারাজ গ্রহাদিত্য যে ভীলের সহিত মিশিতেন, সবাই কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছে ? তিনি যাহা যাহা পারিতেন, তাঁহার বংশধরের তাহাতে অপমান নাই। সবাই যাহা বলে বলুক—আপনিও কি তাই বলেন না কি ?"

পুরোহিত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন,—পদ্মবীজগুলি ঘন ঘন ঘুরপাক খাইতে লাগিল—তিনি বলিলেন—"না, তাহা বলি না,—দোষটাই বা তাতে কি,—তবে—"

রাজা বলিলেন,—"তবে থাক্। আপনার আজ্ঞাই আমি পালন করিব—সবাই যাহা বলে, বলিতে দিন।"

রাজা দুর্গপ্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ভাট স্তুতি-গীত গাহিল, জয়ধ্বনি বাদ্যনাদ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল, রাজা অশ্বারোহণ করিলেন, সৈনিক সভাসদেরা অশ্বারোহণ করিল। আবার কোলাহল থামিয়া গেল, সকলে রাজার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। রাজা একবার সভাসদ্‌দিগের প্রতি ক্রুদ্ধ

কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"জুমিয়া ভীলের বাড়ীর দিকে চল।"

যদি পুরোহিত রাজার চোখ ফুটাইতে না যাইতেন ত এত দূর হইত না। সভাসদ্‌গণ অবনতমস্তকে অনুবর্ত্তী হইলেন।

৪

বালিকা

মন্দিরপুরের নিকটে—রাজধানীর সীমানার অব্যবহিত পারে জুমিয়ার পর্ণকুটীর। অল্পক্ষণের মধ্যেই অসংখ্য অশ্বারোহী পুরুষ জুমিয়ার কুটীর-নিকটের বিজন প্রান্তর পূর্ণ করিয়া দাঁড়াইল।

সূর্য্য উঠিয়াছে—তাহার তরুণ শুভ্র কিরণ সহস্র সৈনিকের শ্যাম উষ্ণীষে, শ্যাম পরিচ্ছদে শত সহস্র উন্মুক্ত বর্শা-ফলকে, সহস্র অশ্বের ঝলসিত সাজসজ্জার উপর বিভাসিত হইয়াছে। প্রান্তরের দিগ্‌দিগন্তে স্তব্ধ তরুরাজি, সূর্য্য-কিরণদীপ্ত শুভ্র ধূম্রকান্তি শৈল-শৃঙ্গরাজি, সূর্য্যের অগ্নিময় মূর্ত্তির দিকে স্তব্ধ-নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে, আর তাহাদেরই মত স্তব্ধনেত্রে কয়েকজন রাখাল-বালক গাভী-গাত্রে হস্ত রাখিয়া অশ্বারোহীদিগকে উন্মুখ হইয়া দেখিতেছে। প্রান্তরে দাঁড়াইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"জুমিয়ার বাড়ী কোন্‌টি?" একজন সৈনিক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল—"হুকুম হইলে খবর দিয়া আসি।"

রাজা বলিলেন,—"না, আমি যাইতেছি।"

রাজার ইচ্ছা, হঠাৎ জুমিয়াকে বিস্মিত করিবেন এবং এইরূপে সভাসদ্‌দিগকেও ক্ষুণ্ণ করিবেন। রাজা অশ্ব হইতে নামিলেন। সভাসদ্‌গণ সকলেই রাজার সহিত যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল, রাজা বলিলেন,—"আবশ্যক নাই।"

নাগাদিত্য ভীলের গৃহের কাছাকাছি আসিয়া দেখিলেন, কুটীর-সম্মুখে বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া একটি বালিকা অশ্বারোহীদিগকে দেখিতেছে। রাজাকে দেখিয়া সে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইল—রাজাও সহসা সেইখানে দাঁড়াইলেন। সে বড় বড় চোখে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল—"তুমি কে?"

রাজা কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না—বলিলেন—"আমি—"

মেয়েটি বলিল—"তুমি রাজা?"

রাজা বলিলেন,—"হাঁ।"

বালিকা এক রাজা ও তাহার মৃগয়ার গল্প জানিত। তাহার সেই গল্পের

রাজা মৃগয়া করিতে গিয়া পথ হারাইয়া এক কুটীরে আসিয়াছিলেন, কুটীরে এক কন্যা ছিল, তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যান। তাহার মনে হইল—এ বুঝি সেই রাজা। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি রাজা?" রাজা যখন বলিলেন, 'হাঁ', তাহার কচিমুখখানিতে হাসি ধরিল না। সে তখন আর একটু কাছে আসিয়া বলিল, "তুমি বর?" রাজা হাসিলেন, সে ছুটিয়া কুটীরধারের এক তরুময় ক্ষুদ্র কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেইখান হইতে দুই একটি নাগকেশর ফুল কুড়াইয়া আনিয়া রাজার হাতে দিয়া বলিল—"বর—তুমি ফুল নেবে?" রাজা ফুল হাতে লইলেন, বালিকার মুখটি শুভ্র আনন্দের হাসিতে প্রফুল্ল হইল, রাজা পলকহীন-নেত্রে তাহার সেই হাসি-ভরা কচি মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন,—উষার শুভ্রসৌন্দর্য্য সে মুখে তিনি বিভাসিত দেখিলেন। এলোকেশের মধ্যে শুভ্র ক্ষুদ্র মুখখানি—সেই মুখে ক্ষুদ্র ভ্রূ-রেখার উপরে স্বচ্ছ ললাট, নীচে চঞ্চল কৃষ্ণতারা চক্ষু, সুন্দর নাসিকা, গোলাপবর্ণ ওষ্ঠাধর—ক্ষুদ্র সুঠাম চিবুক, রঙ্গিন কাপড়পরা ক্ষুদ্র দেহ, সে মূর্ত্তিতে রাজা অপার্থিব সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলেন—নির্ম্মল উষাকালে উষাদেবী শরীরী হইয়া জগতে কল্যাণ বিতরণ করিতে আসিয়াছেন মনে হইল। রাজা কি জন্য আসিয়াছেন, ভুলিয়া গেলেন—বালিকা যাইতে উদ্যত হইল, রাজা তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"তোমার বাবা কে?"

বালিকা বলিল, "আমার বাবা কে? আমার বাবা।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন,—"তাহার নাম কি?"

"জুমিয়া ভীল।"

রাজা অবাক্ হইলেন, বলিলেন,—"তাকে বল রাজা আসিয়াছে।"

বালিকা দৌড়িয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা ফিরিয়া আসিয়া অশ্বারূঢ় হইলেন।

৫

পুনর্ম্মিলন

প্রায় এক বেলার পথ হাঁটিয়া একজন পথিক মন্দিরপুর হইতে শিখরপাড়-গ্রামের নিকট আসিয়া পৌঁছিল।

এখন বেলা প্রায় আড়াই প্রহর,—পরিষ্কার দিন, দূরে পাহাড়-স্তরের উপর শুভ্র শ্বেত মেঘগুলি রৌদ্রদীপ্ত হইয়া ঘুমাইয়া আছে; নিকটে পথিকের বামদিকে পশ্চিমের একটি পাহাড়-শিখরের উপর শুভ্র উজ্জ্বল আকাশ সুবিস্তৃত। তাহার

একদিকে স্বর্ণমেঘ একখানি স্নিগ্ধ বিদ্যুতের মত পাশের ঘন ঘোর নীলাকাশের উপর জ্বলজ্বল করিতেছে, আর একদিকে সূর্য্যের প্রখর জ্যোতিষ্মান্ গোলাকার অনলমূর্ত্তি শত সহস্র অনল-কিরণ তীর নিক্ষেপ করিয়া চারিদিক্ সুদৃশ্য, উজ্জ্বল, স্বর্ণাক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

চির-নবীন তৃণগুল্মময়, শৈবাল-জড়িত তরু-লতাময় পাহাড়ের হরিদ্বর্ণ ঢালু গাত্র দিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে, সে পথে খানিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতে পশ্চাতে অতিক্রান্ত নিম্ন-পথগুলি দুই ধারের জঙ্গলের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া পড়ে—আর তাহার চিহ্নও থাকে না। পথের আশেপাশে বড বড গাছের মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে প্রশস্ত তৃণ-ক্ষেত্র, সেখানে গরু চরিতেছে, ঘোড়া চরিতেছে, ভীল রাখাল-বালকেরা নিকটে বড় বড় লাল ফুলে ফুলে ভরা এক একটি ঝাঁকড়া পারিজাত-মন্দারের তলে কেহ শুইয়া আছে, কেহ বসিয়া গান করিতেছে। চারিদিকের জঙ্গল হইতে অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ আসিতেছে—তাহাদের মাথার উপর মন্দার গাছে ঘুঘু ডাকিতেছে—দোয়েল ডাকিতেছে—মাঝে মাঝে কোথা হইতে এক একবার পাপিয়া গাহিয়া গাহিয়া উঠিতেছে। শীতের শেষে হঠাৎ বসন্তের বাতাস বহিয়াছে, তাই পাখীগুলি গীতক্লান্ত। সহসা তাহাদের সঙ্গীতের মাঝখানে কাক দু একটা বিকৃতকণ্ঠে কা কা করিয়া উড়িতেছে।—তাহারা গাহিতে পারে না—তাই তাহাদের কর্কশ সমালোচনায় সুকণ্ঠদিগকে থামাইতে চাহে। পাহাড়ের উপরে গ্রাম, গ্রামের নীচেই সুবিস্তৃত ঢালু শস্য-ক্ষেত্র, ভীল কৃষকেরা কাজ করিতেছে, কতক শস্য পাকিয়াছে, সেই পরিপক শস্য বড় বড় কাস্তে-হাতে স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া কাটিতে কাটিতে হাসি-গল্প কলহ-গণ্ডগোল একসঙ্গে বাধাইতেছে। অনেকক্ষণ হইতে ভীল-বালিকাগণ শালপাতে মোড়া এক একখানি রুটী ও দু এক টুক্‌রা শুষ্ক মাংস হাতে করিয়া শিশুক্রোড়ে দাঁড়াইয়া আছে—কাহারও পিতা-মাতা কাস্তেখানি কোমরে গুঁজিয়া কন্যার হাত হইতে শালপাতাখানি হাতে লইতেছে, কাহারও সে অবকাশটুকুও নাই, মেয়েটি লক্ষ্মণের ফল হাতে করিয়া নীরব-নেত্রে তাহাদের হস্তচালিত কাস্তের দিকে চাহিয়া আছে। ক্ষেত্রের একদিকে নবকর্ষিত মৃত্তিকায় নূতন শস্যের অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে, নিকটের একটি হ্রদের তীরে দুই চারিজন ভীলনী—তাহাদের কোমর হইতে হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত মোটা কাপড়ের ঘাগরা,—গায়ে আঙ্গিয়া কোর্ত্তা—গলায় একরাশ পুঁতির মালা,—তাহারা উঁচু খোঁপায় পালক গুঁজিয়া, পায়ে কাঁসার বাঁকি, নাকে কানে মোটা মোটা কাঁসা-পিত্তলের চাক্‌তি পরিয়া ডোঙ্গাকলে জল তুলিয়া মাঠে

ফেলিতেছে। সে জল আ'ল বহিয়া সমস্ত অঙ্কুর সিক্ত করিতেছে।

হ্রদে কতকগুলি ভীল বালক সাঁতার দিতেছে, পাশের ডোবায় কতকজনে পোলো করিয়া মাছ ধরিতেছে, মাছ যত না ধরুক, চীৎকার কোলাহল করিয়া তাহাদের ততোধিক আনন্দ হইতেছে। ক্ষেত্রের একপ্রান্তে নিবিড় অরণ্য, অরণ্য হইতে স্ত্রীলোকেরা ভার-পৃষ্ঠে, পুরুষেরা বা বালকেরা ধনুর্ব্বাণ স্কন্ধে, শীকারপৃষ্ঠে ঈষৎ অবনত হইয়া চলিয়াছে। তাহাদের নিকট দিয়া হঠাৎ এক একটা নীলগাই চকিত-দৃষ্টিতে চাহিয়া ছুটিয়া পালাইতেছে। ক্ষেত্রের অপর প্রান্তে পাহাড়ের খদ, খদের ধারে পোষা বরাহের দল বন্য ছাগলের সহিত একসঙ্গে চরিতেছে। একজন বালকের একটি গরু হারাইয়াছে, সে খদের ধারে গরু খুঁজিতে আসিয়া অপর পারের পাহাড়-স্তরের দিকে চাহিয়া বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। পাহাড়ের অঙ্গ হইতে নির্ঝর ছুটিতেছে, তুষার শ্বেতধারায় নীচে পড়িয়া সফেন রজত-কণায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার দিকে চাহিয়া বুঝি সে আর সব ভুলিয়া গেছে, বুঝি একটা অজানা আনন্দে তাহার হৃদয় উদাস হইয়া পড়িয়াছে, তাই কটি হইতে বাঁশের বাঁশীটি খুলিয়া সে বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঠের পশ্চাতে গ্রামের একখানি কুটীর হইতে এতক্ষণ যাঁতা ঘুরাইবার শব্দ উঠিতেছিল, বাঁশী বাজিতে বাজিতে তাহা বন্ধ হইয়া গেল, কুটীর-দ্বার হইতে কতকগুলি স্ত্রীলোকের সতৃষ্ণ-নয়ন রাখাল-বালকের দিকে পড়িল। সহসা বাঁশী বন্ধ হইয়া গেল, কোমরে বাঁশী গুঁজিয়া রাখাল-বালক সহসা ক্ষেত্রাভিমুখে ছুটিল—স্ত্রীলোকেরা গৃহের নিকট আসিয়া উন্মুখ হইয়া সেই দিকে চাহিল, কাঠুরিয়া স্ত্রীলোকেরা, শীকারপৃষ্ঠে পুরুষেরা চলিতে চলিতে বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইল; কৃষকেরা কাস্তে হাতে, গম্ভীর মুখে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল, সহসা চারিদিকে একটা গোল পড়িয়া গেল, আর কিছুই নহে, একজন অপরিচিত পথিককে দেখিয়া তাহারা সকলে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। চারিদিক হইতে জিজ্ঞাসা পড়িল—"তুই কোন্‌ডা রে? কেউ আউছু রে? রাজাডা আসিছে না কি রে?" ইত্যাদি—আসল কথা, এখানে কদাচিৎ নূতন লোক আসে। রাজা কিম্বা তাঁহার সভাসদগণ কালে-ভদ্রে দলবল সঙ্গে এখানে মৃগয়া করিতে আসেন। একদিনে গ্রামবাসীদের বহু পরিশ্রমের শস্যক্ষেত্র দলিত করিয়া, তাহাদের বহু দিনের আহার্য্য নষ্ট করিয়া চলিয়া যান। তাঁহাদের এইরূপ শুভাগমনের পূর্ব্বেই এই বিজন গ্রামে অপরিচিত লোকের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রভুদিগের পূর্ব্বে ভীল বা রাজপুত সৈনিক ভৃত্যেরা এইখানে শিবিরাদি স্থাপন করিতে আসে, সুতরাং নূতন লোক দেখিলেই গ্রামবাসীদের আতঙ্ক

উপস্থিত হয়।

গ্রামবাসীদের প্রশ্নে ভীল পথিক উত্তর করিল—"রাজাডার মুই ধার ধারিনে, মুই আউছি কুল্লু ভীলের কাছে, মুইডা তার কুটুম্ব।"

এই কথায় গ্রামবাসিগণ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, একজন সরু গলায় কুল্লু কুল্লু করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। পৃষ্ঠভারে অবনত একজন শীকারী কু করিয়া সাড়া দিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—পথিক কথা কহিবার আগেই অনেকে এক সঙ্গে বলিল, "আরে তোর কুটুম্ব আসিছে, মুরা ভাবিনু রাজার লোকডা,—ভয়ে সারা হউছিনু।"

কুল্লু কুটুম্বের প্রতি বিস্ময়-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, পথিক তাহার হাত ধরিল, বলিল,—"তুইডা কুল্লু?" কুল্লু ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"তুইডা কোন্ রে?" পথিক বলিল, "মুইডা তোর কুটুম—চল রে তোর ঘরকে চল।"

বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া একটা আনন্দের ঝাঁকানি দিয়া জনতার মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল, কুল্লু কথা কহিবার অবসর পাইয়া বিস্মিত চিত্তে তাহার সহিত গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল, লোকেরা তখন নিশ্চিন্তচিত্তে যে যাহার স্থানে গমন করিল। পথিক কুল্লুর কুটুম্ব, সুতরাং তাহাদের আর কৌতূহল বা ভয়ের কোন কারণ নাই। কিন্তু কুল্লুর কৌতূহল যেমন, তেমনি রহিয়া গেল, কিছুদুর আসিয়া যখন প্রথম বিস্ময়ভার লাঘব হইল, তখন বলিল—"মুইডা ত কুল্লু—তুইডারে ত চিনিতে নারিল?"

পথিক বলিল—"আরে সেই দশ বরিষের বুড্ড বুড্ডা, মুইডাই চিনিতে নারিল, তুইডা কি চিনিবি? মুইডা জঙ্গু যে!"

"তুইডা জঙ্গু। আরে বার বরিষের তোর চেহারাটা মনে পড়িছে মোর! বুড্ডারে মুই চিনবু কেমনে রে।"

দুই বুড্ডায় তখন আহ্লাদে গদগদ-কণ্ঠে আলিঙ্গন করিল।

৬

পরামর্শ

কুল্লুর কুটীরের দ্বারদেশে তিনটি ছেলে-মেয়ে খেলিয়া বেড়াইতেছিল, দূর হইতে কুল্লুকে আসিতে দেখিয়া তাহারা হাততালি দিয়া 'দাদু দাদু' করিয়া সেই দিকে ছুটিল, কিন্তু কাছাকাছি আসিয়া তাহার সঙ্গে আর একজন অপরিচিতকে

দেখিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। কুল্লু বলিল, "আরে ভাইয়া সবরে, আয় রে আয় রে—আর একটা দাদু দেখিবি আয়,—এই তোদের জঙ্গু দাদা।"

জঙ্গু দাদার গল্প তাহারা অনেকে শুনিয়াছিল ; এত শুনিয়াছিল যে, না দেখিয়াও জঙ্গু দাদার সহিত তাহাদের বিশেষরূপ আলাপ-পরিচয় চেনা-শুনা হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যাহার চ'খের সম্মুখে জঙ্গু দাদার একটি জীবন্ত ছবি অঙ্কিত হইয়া যায় নাই, এবং সে ছবির প্রতি একটা আন্তরিক ভালবাসা জন্মায় নাই! এমন কি, তাহাদের মনের এই ছবি তাহাদের নিকট এতদূর আসল হইয়া পড়িয়াছিল যে, আর কেহ আসিয়া কখনও যে ইহাকে নকল করিয়া দিতে পারে, এমন সম্ভাবনা পর্য্যন্ত কখনও তাহাদের মনের ত্রিসীমায় আসে নাই। সুতরাং জঙ্গু দাদার নাম শুনিয়া তাহাদের মুখগুলি সহসা দীপ্ত হইয়া উঠিল, অত্যন্ত অবাক হইয়া তাহারা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিস্ময়ের প্রভাবে ছয় বৎসরের ছোট মেয়েটির ডান হাতের সমস্ত আঙ্গুলগুলি সমূল মুখের মধ্যে উঠিয়া গাল দুটাকে নৌকার পালের মত ফুলাইয়া তুলিল। এমন আশ্চর্য্য যেন তাহার জীবনে হয় নাই। তাহাদের জঙ্গুদাদা— সে ত বীরমূর্ত্তি যুবাপুরুষ, উগ্রভাবে ধনুর্ব্বাণ তুলিয়া রাজাকে বধ করিতে উদ্যত,— এই প্রশান্ত হাস্যময় বৃদ্ধ কি করিয়া সে জঙ্গু-দাদা হইবে? তাহাদের অবাক্ দীপ্ত-মুখে নৈরাশ্যের ছায়া পড়িল। বালিকা আস্তে আস্তে কুল্লুদাদার পায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া দুই হাতে তাহার একটা পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদকাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিল—"না জঙ্গুদাদা না।"

কুল্লু বলিলেন—"হাঁরে বুড়িড, এইডা জঙ্গুদাদা।"

সে কাঁদিয়া ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করিল, ইহার উপর জঙ্গুদাদার অস্তিত্ব রহিবার আর যেন কোন সম্ভাবনাই রহিল না। এত সহজে অস্তিত্বহীন হইয়া জঙ্গুদাদা হাসিয়া উঠিলেন, হাসিয়া বুড়িড বুড়িড করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া যখন বাম হাতের উপর বসাইলেন এবং আর একহাতে দুই বালকের এক এক খানি হাত ধরিয়া আপনার চারিদিকে ঘানির বলদের মত ঘুরপাক দিতে লাগিলেন, তখন সহসা সেই বুড্ডা জঙ্গুদাদার সহিত, যুবা জঙ্গুদাদার মতই তাহাদের ভাব হইয়া গেল, বালিকা তাহার গলা জড়াইয়া বলিল—"তুইডা জঙ্গুদাদা?" বালকেরা ঘুরপাক খাইতে খাইতে জঙ্গুদাদা জঙ্গুদাদা করিয়া মহা আমোদে চীৎকার করিতে লাগিল, অবশেষে ঘুরপাক শেষ হইলে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে মহা কলরবে তাঁহাকে কুটীরে আনিয়া উপস্থিত করিল।

তাঁহারা 'দাওয়ায়' আসিয়া বসিলেন—বয়োজ্যেষ্ঠ দ্বাদশবর্ষীয় বালক ক্ষেতিয়া তামাকের নল আনিতে ছুটিল, তাহার কনিষ্ঠ বুড্ডা দাদার ধনুর্ব্বাণ খুলিয়া ঘরের কোণে রাখিতে গেল, কিন্তু উঠানে নামিয়া হঠাৎ মতলবটা বদলিয়া ফেলিয়া ঘরের কোণের পরিবর্ত্তে নিজের স্কন্ধে দ্বিগুণ দীর্ঘ ধনুকের ভার চাপাইয়া গম্ভীর মেজাজে—মস্ত লোকের চালে পা ফেলিয়া কোন রকমে ধনুকটাকে টানিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মাঝে মাঝে বক্র নয়নে কুল্লুদাদা ও জঙ্গুদাদার দিকে দৃষ্টি দিতে লাগিলেন। অর্থখানা—তাঁহারা তাহার কারখানাটা দেখিতেছেন ত?

দাদার এ আস্ফালন বোনটির বড়ই অসহ্য হইল—তিনি বুড্ডাদাদার কোলে বসিয়া তাহাকে ক্রমাগত শাসাইতে লাগিলেন, ধনুক খুলিয়া না রাখিলে এখনি জঙ্গুদাদাকে এ কথা বলিয়া দিয়া তাহাকে জব্দ করিয়া দিবেন—এ কথা পর্য্যন্ত বলিলেন, আর সত্য সত্য কথাটা কার্য্যেও পরিণত করিলেন। কিন্তু তাহাতেও যখন কোন ফল হইল না, জঙ্গুদাদা যখন তাহাতে একটি কথাও কহিলেন না,—তখন অগত্যা ভর্ৎসনাটা বন্ধ করিয়া জঙ্গুদাদার ঝুঁটির উপর আক্রমণ করিলেন। ইত্যবসরে বড় ভাই তামাকু আনিয়া উপস্থিত করিল—তখন তিনি ঝুঁটি খোলা রাখিয়া বলিলেন—"আমি খাবার আনিব"—বলিয়া তিনি মায়ের কাছে রান্নাঘরে ছুটিলেন। বড় ভাই বলিল—"আমিও যাইব", মেজোও তাড়াতাড়ি ধনুকটা খুলিয়া তাহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন।

তাহারা তিনজনে চলিয়া গেল, দুই বন্ধুতে মিলিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর পরে এই তাঁহাদের দেখা, তখন দু'জনে ছেলেমানুষ ছিলেন, এখন প্রায় বৃদ্ধ, জঙ্গুর বয়স এখন ৫৪, কুল্লুর ৫২। এতদিন পরে আবার সেই বাল্যবন্ধু জঙ্গুর সহিত যে দেখা হইবে—কুল্লুর এরূপ আশা ছিল না, জঙ্গু যে কোথায়, বাঁচিয়া কি মরিয়া, তাহা পর্য্যন্ত কুল্লু জানিতেন না।

আজিকার এই আশাতীত আনন্দে পুরাতন বিষাদকাহিনী, পুরাতন বিদায় তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। যা ছিল, তা আর নাই, যারা ছিল, তারা এখন কোথায়? জঙ্গু আসিয়াছে, কিন্তু জঙ্গুর মাতা—কুল্লুর ভগিনী সে কোথায়? তাহাকে জঙ্গু নির্ব্বাসিত স্থানে চিতায় শুইয়া রাখিয়া আসিয়াছে। বিদায়ের দিনের চারিদিকে সেই ক্রন্দন-কোলাহল তাহার মনে পড়িতে লাগিল, যাহারা সেদিন একসঙ্গে কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল, তাহারা আজ কেহই প্রায় নাই। পুরাতন স্মৃতির ভারে দু'জনে বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে কুল্লু বলিল—"আজ কত্তদিনভার পর দেখা—আরে তানারা কুথা সব!" দুজনের দীর্ঘনিশ্বাস

পড়িল।

জঙ্গু বলিল, "যানারা গেল, তানারা যাক। তানারা ত দেব হইলু, তানারা ত ভালয় আছে, তানাদের লাগি দুখ নাই। বুক ফাটিলু তুইডাদের দেখি, দেশডা দেখি। যোন দিক্‌টায় চাহুছি—আঁখিয়া ঝুরিছে, পরাণ বাহুরিছে। সে দেশডা নাই, সে গ্রামডা নাই—সে মনিষ্যিডা নাই। যানারা আছে, তানারা কি মনিষ্যি, তানারা যেন মড়াডা। যোন পা তানাদের থেঁতো করুছে, সোনডা তানারা পূজিছে। পরাণ ফাটে রে ফাটে!"

কুল্লু নীরব হইয়া রহিল, জঙ্গুর অধর-প্রান্তে ঘৃণার ভ্রূকুটি প্রকটিত হইল, জঙ্গু আর অনেকক্ষণ কিছু বলিল না। কিছু পরে সহসা জিজ্ঞাসা করিল—"তুইরা ভীলগাঁ হইতে উঠ্‌লি কেন রে?"

কুল্লু বলিল, "তুরা চলু গেলি—রাজপুতরা বড় বাড়ন বাড়ুল, মুরা বড় নাকাল হইনু। রাজাডার দলে যত ভীল লায়েক (সেনানায়ক) অছিল, তানাদের সব তাড়াউল, গাঁয়ে গাঁয়ে রাজপুত কর্ত্তা জুটুল, মুদের তানারা কেবলি খুৎ ধরুল, তানাদের হাতে মুইদের খাজনা, তানাদের হাতে মুইদের মরণ-বাঁচন। রাজাডা মোদের কথা শোনে না,—তুইডা তানারে মারুতে গেলি—মুরা সবাইরে রাজা নারাজ হউল—গ্রামকে কি আর টেকুতে পারু?"

জঙ্গু নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, কিছু পরে বলিল—"এখানে ভালয় আছু রে?"

কুল্লু। এখন ত ভালয় আছু। মহারাজডা যত্ত দিন শীকারে না আউসে। জানুস্ রে ভাইডা, রাজাডা শীকারে আউলে মুদের আর পরাণ বাঁচে না। সব দল বলরে তুষ্টু করুতে মুদের গম চাল কুছু থাকে না।

জঙ্গু। হ্যাঃ হ্যাঃ, তা জানু রে, জানি—উপায় কি করিছু এর?

কুল্লু। মরিবার লাগিন ঠিক হউছি।

জঙ্গু। তুইডা মুইডা যেন মরিল, মুরা বুড্ডা, মুদের ছাবালরা—তুইডার ঐ ছাবালরা উনারা অমনি থেতোল খাইবে—পিষণ সহিবে চিরকালডা রে চিরকালডা?"

কুল্লু। কি করিবু ভাইয়া?

ইহাদের সম্পর্কে যাহাই হউক, ইহারা বয়স্য বলিয়া বাল্যকাল হইতে ইহাদের মধ্যে এইরূপ প্রিয় সম্বোধন।

জঙ্গু। তুইডা এ কথা বলুস? মোর ভাই হইল তুই, তুইডা এ কথা বলুস?

কুল্লু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"মুই একাডা কি করিবু?"

জঙ্গু। একাডা হইতেই দোকাডা মেলে—দোকাডা হইতে হাজারডা মেলে। কাজে লাগু রে—কাজে লাগু। (ভাবটা চেষ্টার অসাধ্য কি?)

কুল্লু। তুইডা ত কাজে লাগুলি, হইলু কি? হউল তুইডার দেশছাড়ান (নির্ব্বাসন) মুইলোকদের কসা হাতকড়ি।

জঙ্গু। আরে—কুলুয়া—মুইডা সে কালিন কি মনিষ্যি—একটা ছাবাল, ১২ বরিষের একডা শুধু ছাবাল।

এ কথার অর্থ, দ্বাদশবর্ষীয় বালকের চেষ্টা একজন অদূরদর্শীর উদ্যম মাত্র। সে উদ্যম অকৃতকার্য্য হইয়াছে বলিয়া চিরকাল কি তাহারা চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবে?

কুল্লু বলিল—"কোনডা তুইরে মানা করুছে? এত্ত দিন চুপ করি আছুস কেন রে?"

জঙ্গু। চপ ছিনু কেন, তুইডা কি জানুস নে তা? মুইডার হাত-পা বাঁধা, মুইডারে চিরণকালের লাগিন এমনি বাঁধি বাবাডা মুইডার পরাণ ভিক্ষা মাগিল! মুইডা যে এর চেয়ে হাজার বার মরুতে পারুত! মোর পরাণ থাকুল, হিচ্ছা থাকুল মুইডা শুধু সে হতনভাগাদের বাণ মারুতে নারিবু—এমনি কিরেডা! কি করুলি বাবাডা!

তীব্র কষ্টে জঙ্গুর হৃদয়-বন্ধন যেন শিথিল হইয়া আসিল।

কুল্লু বলিল—"তুইডা বাণ ধরুতে নারুবি ত কাজে লাগুবে কোন্‌ডা?"

জঙ্গু। মুইডা বাণ নাই ধরিলু, তবু কাজে লাগিবু। মুই বাণ না ধরি—মুইডার ছাবালরা ধরুবে—তুইরা ধরুবি—ইদরের সব ভীলডা ধরুবে। এই মন্তর জুমিয়ার কানে চিরণকালডা ভজুছি—এই দিনডার লাগি এত দিন মুই চোক চাহু আছি। বাবাডা যত দিন ছিল, মুই সেথা আসুতে নারিলু, এখন বাবাডা মরুল, জুমিয়া জোয়ান হউছে, এই ত সময়ডা, এখন তুইরা উঠ্ দাঁড়া সব।

কুল্লু দেখিল—জঙ্গু কৃতসঙ্কল্প, সে আবার বিদ্রোহী হইবেই হইবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে না বিদ্রোহী হইলেও যেন আর উপায় নাই।

সহস্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৃণ ঝড়ের মুখে না উড়িয়া থাকিতে পারে না, সবল-হৃদয়, প্রখর-বুদ্ধি, দৃঢ়-সঙ্কল্প, গুরু-মতের নিকট দুর্ব্বল, অল্পবুদ্ধিগণ মাথা তুলিয়া স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়াইতে পারে না—সহস্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের ক্ষুদ্র

স্বতন্ত্রকণা তাহার প্রখর তেজোরাশিতে মিলাইয়া পড়ে।

সংসার ইহা বুঝে না, সংসার অপরাধী দুর্ব্বলকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। সংসার বলে, এখানে কে সবল কে দুর্ব্বল, তাহা জানি না—এখানে কে কেমন কাজ করিতেছে, তাহাই জানি। যে সবল, সে-ও নিজের ইচ্ছায় কাজ করে—যে দুর্ব্বল, সে-ও নিজের ইচ্ছায় কাজ করে—ইচ্ছা না থাকিলে কেহ কাজ করাইতে পারে না। সুতরাং নিজে যে যাহা করিয়াছে, সে তাহার ফলভোগ করুক। দুর্ব্বল বলিয়া আমি তাহাকে মমতা করিব কেন?

সংসার, তুই ভ্রান্ত! ইচ্ছা না করিয়াও অনেকে কাজ করে—ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেকে কাজ করিতে বাধ্য হয়। তুই হৃদয়হীন কঠোর সংসার, তোর কাছে দুর্ব্বলতার ক্ষমা নাই, তুই আবার স্বর্গের নিকট ক্ষমা প্রত্যাশা করিস্!

কুল্লু বলিল—"এখন কি করিবু মুই?"

জঙ্গু। এখন ভীলগ্রামকে চলু, কাচ্ছাকাচ্ছি থাকু। যতডা পারুস বসতি সেইখানকে লউ চলু।

এই সময় কুল্লুর বিধবা পুত্রবধূ ছেলেদের গোলমালের মধ্যে একখানা কাঁসার থালায় বাজরির মোটা মোটা রুটী, আর বড় বড় আস্ত লঙ্কা-ফেলা লোনা শূকর-মাংসের ব্যঞ্জন আনিয়া উপস্থিত করিল।

৭

গণনা

শিখরপাড় গ্রামের অনতিদূরে পাহাড়ের একটি নির্জ্জন স্থানে ঝন্নু গণৎকারের বসতি। ঝন্নুকে ভীলগণ দেবপ্রসাদিত জ্ঞান করে। সুতরাং ঝন্নুর বাক্য দেববাক্যের ন্যায় তাহাদের শিরোধার্য্য। ঝন্নুর মুখ হইতে একবার যাহা উচ্চারিত হয়, তাহা নিতান্ত অসম্ভব হইলেও তাহারা অসম্ভব মনে করে না। এমন কি, ঝন্নু যদি বলে, এই মুহূর্ত্তে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহারা তাহার জন্য তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়। আকাশের চন্দ্র ভূতলে পড়িতে পারে—কিন্তু ঝন্নুর কথা ব্যর্থ হইবার নহে। ঝন্নু কোন্ অসম্ভব সম্ভব না করিয়াছেন?

একবার একজন গরু হারাইয়া ঝন্নুর কাছে গণনার জন্য গিয়াছিল—ঝন্নু

পতনোন্মুখ প্রস্তরমধ্যস্থিত বৃক্ষ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—"ঐ যে পাথরের উপর গাছ দেখিতেছ, যদি পাথর খসিয়া যায় ত কি হইবে? গাছটিও পড়িয়া যাইবে। গরু হারাইয়াছে—বনের মধ্যে—বন খুঁজিলে গরুও পাইবে।"

আশ্চর্য্য এই, চিরকাল তাহারা সেই পাথরখণ্ড দেখিয়া আসিতেছে—ঝন্নুর মুখ হইতে যেমন ঐ কথা বাহির হইল, তেমনি দেখিতে দেখিতে মাস কতকের মধ্যে সম্মুখের বর্ষায় সেই পাথরখণ্ড অকস্মাৎ খসিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে গাছটা শুদ্ধ পড়িয়া গেল। গরুটা যদিও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু সে খুঁজিবার কোনো দোষে। গণকের বাক্য ব্যর্থ হইবার অনেক দিন পরে সেই বনের মধ্যে একটা কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল।

আর একবার একজন ভীল-বালিকার বিবাহাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঝন্নুর কাছে আসিয়াছিল। সে দিন প্রভাতটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল—ঝন্নু বলিল—"এই মেঘ ছাড়িয়া যাইবে—আর সূর্য্য উঠিবে—তোমার অদৃষ্ট-মেঘ কাটিয়া যাইবে আর তোমার ঐ বালিকার সহিত বিবাহ হইবে।" সত্যই কি—সেই দিন দুই প্রহরে যেমন মেঘ কাটিয়া গেল—অমনি সূর্য্য প্রকাশ হইল। কেবল তাহাই নহে, পরে বালিকার সহিত তাহার বিবাহও হইয়াছিল। ইহা হইতে আশ্চর্য্য আর কি আছে?

এইরূপে ঝন্নু যাহা বলিত, কোন না কোন প্রকারে তাহা সফল হইয়া যাইত, ভীলগণের আর আশ্চর্য্যের সীমা থাকিত না!

আজ প্রাতঃকালে দুইজন ভীল তাহার নিকট গণাইতে আসিয়াছে। ঝন্নু তাহাদের লইয়া তাহার কুটীর-সম্মুখে বৃক্ষতলে বসিয়া আছে। তাহার মাথায় লতাপাতা জড়ান, তাহার গাত্রের মলিন অঙ্গাবরণের উপরে এক রাশ পুঁতির ও ফুলের মালা ঝুলিতেছে, সে হাতে এক মন্ত্রযষ্টি লইয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে তদ্দ্বারা মাঝে মাঝে ভূমিতে আঘাত করিতেছে। সাত বার এইরূপ আঘাতের পর ঝন্নু বলিল—"জিনিসডা—জিনিসডা—কোন্ জিনিসডা? ঘটী, বাটি, কাস্তে, উহুঁ—হাত দে—"

তাহারা দুইজন যষ্টি স্পর্শ করিল, তখন ঝন্নু আবার মাটীতে যষ্টি আঘাত করিয়া নানা জিনিসের নাম করিতে লাগিল—কিন্তু ইহার মধ্যে বরাবর তাহাদের প্রতি তীক্ষ্ন-দৃষ্টি রাখিতে সে ভুলিল না। ক্রমে জিনিসের নাম ফুরাইলে পশুর নাম আরম্ভ করিল, বলিল—"গরুডা? ঘোড়াডা? ছাগলডা? মহিষডা? ভেড়াডা? শূকরডা? গাধাডা? উহুঁ মানুষডা—"

ভীলদিগের মুখ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঝন্নু বলিল—“মানুষ, কোন্ মানুষ? ছেলেমানুষ—না, মেয়েমানুষ—না যুবা মানুষ? হ্যাঁ, সে কোন্‌ডা? সে কোন্‌ডা? চোরডা?”

জঙ্গু আর থাকিতে পারিল না—বলিয়া উঠিল,—“চোর? না চোর না, ডাকাত না ডাকাতের বাড়াডা—”

কুল্লু বলিল—“চুপ্ কর, শুণিতে দিউ রে।”

ঝন্নু বলিল—“চোর না। ডাকাত? না শক্রু,—শক্রু—”

জঙ্গু বলিল —“ঠিক বল্লুরে—শক্রু।”

গণক। শক্রু, শক্রু। তানাডার মন্দের লাগিল আসুছিস।

জঙ্গু বলিল—“তানারে মারিবার লাগিন আসুছি—মরুবে কি?”

গণক গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—“হুঁ, মারিবার লাগিন আসিছ, মরুবে কি? দেবকে তুষ্ট কর, উত্তর মিলিবে!”

জঙ্গু বলিল—একডা ছাগ দিবু, দুইডা শূকর দিবু।”

ঝন্নু বলিল—“মুই তবে সুধই আসি।”

প্রবাদ এই—শালগাছ ঝন্নুর পিতৃপুরুষের আত্মাদিগের প্রিয় অধিষ্ঠানস্থান, সুতরাং ঝন্নুর কুটীরের পশ্চাতে পাহাড়ের কিছু নিম্নাংশে এক বাঁধান পুরাতন শালগাছের নিকট গিয়া ঝন্নু চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—“এক ছাগল, দুই শূকর—এক ছাগল দুই, শূকর।” বার কতক এইরূপে চীৎকার করিয়া পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিল, শালদেবের উত্তর শুনিবার জন্য ভীলগণ উৎসুক হইয়াছিল, ঝন্নু বলিল,—“উঁহু, তাহাতে হইবে না, আর একটা গরু চাই”

জঙ্গু বলিল—“তাই দিবু। আর সিদ্ধ হউলে সোনায় গাছ মড়াইবু।”

ইহা শুনিয়া ঝন্নু আবার বৃক্ষের নিকটে গিয়া তাহাকে সেই কথা নিবেদন করিল। বলা হইলে মাটী হইতে একগাছি কুটা লইয়া বৃক্ষের গাত্র লক্ষ্য করিয়া তাহাতে ফুঁ দিল, কিন্তু তাহার ফুঁয়ে কুটাগাছাটি শালবৃক্ষের গাত্র পর্য্যন্ত না আসিয়া নীচে মাটীতে পড়িল, ঝন্নু কুটা উঠাইয়া আবার তাহাতে ফুঁ দিলে দ্বিতীয়বারে তাহা তাহার গাত্রে আসিয়া পড়িল। ঝন্নু মনে মনে বলিল—“প্রথমে ভুমে পড়িল, তাহার অর্থ—সিদ্ধ হইবে না, দ্বিতীয় অর্থ, সিদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার কোন্‌টি ঠিক?” আর একবার সে কুটাতে ফুঁ দিল, কুটাগাছের কাছাকাছি আসিয়া নীচে পড়িল—কিন্তু একেবারে গাছ স্পর্শ করিল না। ঝন্নুর একটু গোল বাধিল। কিন্তু তিনবারের পর আর এরূপ করিতে নাই—সে ফিরিয়া

আসিয়া বলিল—"চেষ্টা কর, সিদ্ধ হইবে—সিদ্ধ না হইলে হতাশ হইও না।"

জম্বু বুঝিল, শালদেব প্রসন্ন, তাহার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তাহারা দুই বন্ধুতে মিলিয়া ঝম্নুকে প্রণাম করিল, তাহার পর শালবৃক্ষকে প্রণাম করিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইল, শাল প্রণাম করিতে করিতে জম্বু মনে মনে বলিল— "দেবতারা তুষ্ট হও, তুইদের ছাবালের তুইদের কাজেই হাত দিউছে, কাজ হউলেই তুইকেই আগে সোনাই মড়াইবে।"

৮

পূর্ব্ব-ঘটনা

লোকে অনেক সময় নিতান্ত কেবল একটা গায়ের জ্বালায় একজনের সম্বন্ধে এমনতর সব বাজে কথা বলিয়া বসে, যাহার মূল কেবল বক্তার মনের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও খুঁজিয়া মেলে না। বক্তার ইচ্ছা—'এরূপ হউক'—এই ইচ্ছা হইতে আগাগোড়া কথাগুলার সৃষ্টি হইয়া থাকে। এমন কি, স্রষ্টা যিনি, তিনি যদিও কথাগুলা বলিবার সময় খাঁটি সত্যের মত করিয়াই বলেন, কিন্তু তিনিও ঠিক তাহা সত্য হইবার সম্ভাবনা মনে করিয়া বলেন না। তথাপি পরে কখনও কখনও তাহাও সত্য হইয়া দাঁড়ায়। তখন আর কি—বক্তার ভবিষ্যদ্দৃষ্টির ক্ষমতার প্রতি তাহার বন্ধু-বান্ধব পারিষদদিগের ভক্তির সীমা থাকে না—আর সর্ব্বাপেক্ষা বক্তাই নিজে নিজের এই দূরদর্শিতায় অবাক্ হইয়া যান। এই একটি ঘটনা হইতে নিজের অদ্বিতীয় অনুমানশক্তির উপর তাঁহার নিজের কতদূর অকাট্য বিশ্বাস জন্মে যে, ভবিষ্যতে আর দশসহস্র অনুমান মিথ্যা হইলেও সে বিশ্বাস তাঁহার টলে না। টলিবে কি, তখন বক্তার মুখনিঃসৃত বাক্য আর ত অনুমান নহে, তাহা এক একটি সিদ্ধান্ত সত্য।

সভাসদ্‌গণ যদি জানিতেন, কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া জুমিয়া সম্বন্ধে যেদিন তাঁহারা যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য সত্যই সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহারা প্রত্যেকেই আপনাকে উত্তমরূপে ভবিষ্যদ্‌বক্তার পদে যে অধিষ্ঠিত করিয়া ফেলিতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, সভাসদ্‌গণ এখনও তাহা জানিতে পারেন নাই। জুমিয়া যে সত্যই নির্ব্বাসিত রাজদ্রোহী জম্বুর আত্মীয় ব্যক্তি, যেমন তেমন আত্মীয় নহে, তাহার আপনার পুত্র, আর জম্বুর এখানে আগমনের অভিপ্রায়ও যে রাজার পক্ষে কিরূপ হানিজনক, তাহা

পাঠক জানিয়াছেন—কিন্তু সভাসদ্‌গণ তাহা না জানায় তাঁহারা একটি বিশেষ আনন্দ, বিশেষ সুবিধা হারাইয়াছেন।

এইখানে আমরা জম্বুর আর একটু পরিচয় দিয়া লই।

জম্বু ভীলরাজ মন্দালিকের বংশ। জম্বুর পিতামহ চিন্তন মন্দালিকের প্রপৌত্র। গুহার বংশের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল। তাহাদের ন্যায্য সিংহাসন হইতে যে গুহা তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন, ইহা তিনি কোনমতেই ভুলিতে পারেন নাই।

জম্বুর পিতা, চিন্তনের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত। পুত্র জন্মিবার অল্পদিন পরেই এই স্ত্রীর মৃত্যু হয়, চিন্তন আবার বিবাহ করেন এবং পুত্র মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হয়। জম্বুর পিতামহীর পিত্রালয় ভীলগ্রাম হইতে একে অনেক দূরে, তাহার পর চিন্তন দ্বিতীয় পক্ষ লইয়া ব্যস্ত থাকায় জম্বুর পিতার খোঁজখবর লওয়া তাঁহার ঘটিয়া উঠিত না। পুত্রের বয়স যখন পঞ্চদশ, তখন হঠাৎ একদিন তিনি শুনিলেন, সে আশাদিত্যের একজন সেনা হইয়াছে। অপমানে কষ্টে তিনি জ্বলিয়া উঠিয়া আশাপুর গমন করিয়া পুত্রকে ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দেখিলেন, পুত্রের মনের এতদিনের সঞ্চিত দৃঢ়বদ্ধ রাজানুরাগ উৎপাটন করা তাঁহার সাধ্যাতীত। গুহার কৃতঘ্নতা কহিয়া পুত্রের মনের প্রতিশোধ-স্পৃহা প্রজ্বালিত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পুত্র বলিল—"রাজা আমাকে পুত্রের মত ভালবাসেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বাসঘাতক হইয়া তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইতে পারি না।"

পুত্রের কথায়, তাহার রাজানুরাগে পিতার ক্রোধ সহস্রগুণে বাড়িল। শৈশবাবধি পুত্রকে দূরে রাখিয়াছেন বলিয়া তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন আর উপায় কি? তাহার পুত্রাদি যাহাতে পিতার ভাব না পায়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভীলগ্রাম হইতে নিজে মনের মত একটি কন্যা বাছিয়া পুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন এবং জম্বু পাঁচ বৎসরের হইতে না হইতে পুত্রবধূকে ও তাহাকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়া সেই বয়স হইতে তাহাকে রাজবিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। গুহার কৃতঘ্নতা, মন্দালিকের রক্তাক্তদেহ প্রতিদিন সে সম্মুখে দেখিতে লাগিল। এই অবস্থায় জম্বুর দ্বাদশ বৎসর বয়সে মহারাজ আশাদিত্য সসৈন্যে ইদর আক্রমণ করিলেন, পুত্রকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া জম্বুর পিতা তাহাকে রাজসেনানী করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পিতার এই প্রস্তাবে জম্বু রাজার প্রতি মনে

মনে ক্রুদ্ধ হইল। তাহার পিতাকে ভৃত্য করিয়া ক্ষান্ত নহেন, আবার তাহাঁকে পর্য্যন্ত ভৃত্য করিতে চাহেন! এই সময় আবার একটি ঘটনা হইল, জঙ্গুর এক আত্মীয়কন্যা এক জন ক্ষত্রিয়সেনার গৃহে চলিয়া গেল। তাহাদের মনে ছিল—ক্ষত্রিয়সেনা তাহাকে বিবাহ করিবে, কিন্তু সে বিবাহ করিল না। তাহার গৃহে সে দাসীরূপে রহিল। জঙ্গুর ক্রোধের সীমা রহিল না মৃগয়াক্ষেত্রে স্বয়ং মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া সে ইহার বিচার প্রার্থনা করিল। মহারাজ বলিলেন—"ইহা বিচারের স্থল নহে, বিচারালয়ে বাদী অভিযোগ উপস্থিত করিলে তিনি বিচার করিবেন।" জঙ্গুর উত্তপ্ত কৈশোর রক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, অদূরদর্শী বালক হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্য হইয়া সেইখানে তাঁহার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিল; কিন্তু দৈবক্রমে রাজা বাঁচিয়া গেলেন—জঙ্গুর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল।

জঙ্গুর পিতা আশাদিত্যের একজন প্রিয় সেনা ছিলেন। তিনি কাতর-চিত্তে পুত্রের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন; শপথ করিয়া বলিলেন,—"একবার মার্জ্জনা পাইলে সে আর কখনও রাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবে না।" পিতার কাতর-প্রার্থনায় মহারাজ পুত্রকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিয়া নির্ব্বাসনদণ্ড দিলেন। জঙ্গুর পিতা পিতামহ সকলেই তাহার অনুগমন করিলেন।

৪০ বৎসর পরে পিতার মৃত্যুর পর জঙ্গু আবার দেশে ফিরিয়াছেন, পিতা বাঁচিয়া থাকিতে তিনি পিতার জন্য বিদ্রোহী হইতে পারেন নাই, এই ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যে আগুন হৃদয়ে জ্বালিয়াছিল, এখনও তাহা নিভে নাই, যে ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, এখনও তাহা ছাড়েন নাই, সেই আগুনে আহুতি দিতে, সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতেই এত দিন পরে আবার তাঁহার দেশে প্রত্যাগমন। চিরদিনের সেই আশা এখন তাঁহার পূরিবে কি?

এই কথা ভাবিতে ভাবিতে জঙ্গু শিখরপাড় হইতে মন্দির-পুর অভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন। প্রাতঃকাল; শ্যাম-সৌন্দর্য্যময় শস্য-ক্ষেত্রে, বসন্ত-পক্ষীয় স্বরলহরী-তরঙ্গীত নব-পল্লবিত বনানী-শিখরে, নীলাভ পাহাড়-স্তর-আলিঙ্গিত সুন্দর সুনীল মেঘে, চৌদিকের দূর-দুরান্তব্যাপী অনন্ত দৃশ্যে সূর্য্যের প্রাতঃকিরণ-বিভাসিত মধুর আনন্দ বিরাজমান। সেই জ্যোতির্ম্ময় আনন্দময় জগতের দিকে চাহিয়া—জঙ্গু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পীড়িতহৃদয়ে কেবলই ঐ কথা ভাবিতে লাগিলেন—কেবলই মনে হইতে লাগিল, 'এই শোভা-সৌন্দর্য্য-বিকসিত বনপ্রদেশ এক দিন তাঁহাদের ছিল—আবার কি তাঁহাদের

হইবে না? এই প্রভাত সূর্য্য—এই মধুর বসন্ত এক দিন তাঁহাদের আনন্দ দিবার জন্যই বিকসিত হইত, এই অধীন জাতির সুখের জন্য এখন আর তাহারা উদয় হয় না, কিন্তু কখনও কি আর দিন ফিরিবে না? হায় হায়! তাঁহাদের সব ছিল রে সব ছিল, সে দিনও সব ছিল। সে দিন মাত্র—সে দিনও, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মন্দালিক এই পশুপক্ষি-বনঅরণ্যশালী শৈলপ্রদেশের রাজা ছিলেন, কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক গুহাকে ভালবাসিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইলেন।' পিতামহের প্রতি কথা, প্রতি উত্তেজনা জঙ্গুর যতই মনে পড়িতে লাগিল, সমস্ত ব্যাপার ততই সে দিনের বলিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল। মন্দালিকের মৃতদেহ পর্য্যন্ত যেন জঙ্গু চোখের উপর দেখিতে লাগিলেন।*

ভাবিতে ভাবিতে তিনি দ্রুত-চরণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আসিবার সময় যে পথে আসিয়াছিলেন, অন্যমনে সে পথ ছাড়িয়া যে ভিন্ন পথ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জানিতেও পারিলেন না। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রাজ-পুত গ্রামের মাঠে আসিয়া তাঁহার যেন সব নূতন মনে হইতে লাগিল। এ গ্রাম, এ মাঠ যেন তিনি পূর্ব্বে দেখেন নাই। একটু ভাবিয়া মনে পড়িল, এ সমস্তই আগে বন ছিল। মাঠে ভীলেরা চাষ করিতেছে। সাধারণ ভীল হইতে তাহাদের স্বতন্ত্র বেশ। তাহাদের অঙ্গে ধনুর্ব্বাণ কিংবা কটিদেশে কোন প্রকার খড়্গ আবদ্ধ নাই। কর্ণে রৌপ্যবলয়, পরিধেয়ে অবিকল ক্ষত্রিয়-পরিচ্ছদ, মাথায় ক্ষাত্র উষ্ণীষ, দেহ অপেক্ষাকৃত সুকুমার। জঙ্গু তাহাদের পরিধান-পরিচ্ছদ, চেহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। জঙ্গুর সময়ে ক্ষত্রিয়-সংসর্গে ভীলদের যে কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই—এমন নহে। দেড় শত বৎসরেরও অধিক হইল —ক্ষত্রিয়গণ ইদর অধিকার করিয়াছেন—জঙ্গু নির্ব্বাসিত হইয়াছেন ৪০ বৎসর মাত্র। অর্দ্ধ-শতাব্দীরও পূর্ব্ব হইতে ভীলদিগের—বিশেষতঃ রাজভৃত্য ভীলদিগের —নিতান্ত সামান্য কৌপীন পরিধান এবং শীতকালে একমাত্র পশুচর্ম্ম ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে, শীকার মাংসই তাহাদিগের একমাত্র খাদ্য না হইয়া চাষ-বাস কতক কতক আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু একেবারে এতটা পরিবর্ত্তন জঙ্গু দেখিয়া যান নাই, তাঁহার চক্ষে ইহা আজ নিতান্তই নূতন—নিতান্তই বিস্ময়জনক। তিনি নিকটে আসিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হেথাকার বন কি হইলু রে?"

---

* মিবার উপন্যাস দেখ

একজন ক্ষেতি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বলিল,—"অরে তুইডা কোন্ জঙ্গল থেকে আওলু রে ?"

আর একজন বলিল, "সে রাজাডা কাটি লইছে।"

জঙ্গু। কত্ত দিন্‌ডা ?

উত্তর। বছর ৩০ হইলু।

জঙ্গু। ক্ষেতডায় কত্ত শস্ত হউছে ?

উত্তর। তা ঢের।

জঙ্গু। তুইদের কয়জনডার ক্ষেত ?

উত্তর। জনডার না।

জঙ্গু বিস্মিত হইলেন—বলিলেন,—"জনডার না—তবে কোন্‌ডার ?"

উত্তর। জায়গীরদারের।

জঙ্গু। তুইরা কে তানাডার ?

উত্তর। মুরা শুধ্ দাস।

ভীলেরা দাস! এই কয়েক বৎসরে এতদূর হইয়াছে! জঙ্গু হৃদয়ে বিষম আঘাত অনুভব করিলেন, বলিলেন,—"দাস কোন্‌ডা করিল ?"

উত্তর। দশ বরিষের কথাডা। উপরি উপরি দুই বছর আকাল পড়িল, মুরা না খাইয়া মরিবার নাকাল হইনু, জায়গীরদার বলিল, 'তুইরা দাসখৎ লিখি দে. তুইদের খাওয়াইমু।' মুইরা তাই করিল।

ঘৃণায়, ক্রোধে জঙ্গুর ওষ্ঠাধর ভ্রূকুটি-বদ্ধ হইল—তিনি বলিলেন,—"ধিক্ তুইদের পেট্‌কে! ইদরের জঙ্গলডা থাক্‌তে খাইবার লাগিন দাস হইলু তুইরা! জানোয়ারে তুইদের পেট ভরিলু না ?"

উত্তর। আরে ভাই, মুইরা কি ধনুক ধরিতে জানু ? ৪০ বরিষ আগে মুদের বাবারা—রাজাডার সেনা ছিল—কইবু কি—চাঁদিলা বলি একটা জন রাজাডারে মারুতে গেইল, রাজা রাগ করি বাবাদের বাণ কাড়ি বলুল—'যা তুইরা চাষ করি খা।' মুদের বাবারা চাঁদিলার কুটম হউত—তাই রাজাডা রাগ করুল। তাই মোরা ২০ ঘর ধনুক ধরিতে জানু না। নইলে মুইদের এই দশা! সর্ব্বনেশে চাঁদিলা!

জঙ্গুর আসল নাম চাঁদিলা। জঙ্গু উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ সুগঠন সুশ্রী ছিলেন, তাই পিতামহ তাঁহার নাম চাঁদিলা রাখিয়াছিলেন। অসভ্য আদিম জাতি বলিয়া পাঠক যেন ভীল জাতিকে কাফ্রির দলে না ফেলেন। ভীলেরা দেখিতে সাধারণতঃ

শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ, সুশ্রী মুখ। সাধারণ বাঙ্গালীর সহিত সাঁওতাল-দিগের চেহারার যেমন সাদৃশ্য,—সাধারণ হিন্দুস্থানীর সহিত ভীলদিগের চেহারারও সেইরূপ সাদৃশ্য !

চাঁদিলা নামেই জঙ্গুকে বাহিরের সকলেই জানিত। কিন্তু ঘরের লোকে কেহ কেহ তাহাকে আদর করিয়া জঙ্গু জঙ্গু করিতেন,—এই জন্য কুল্লুও তাহাকে জঙ্গু বলিয়া ডাকিত।

জঙ্গুর ঘৃণা মমতায় পরিণত হইল। একটি হৃদয়ভেদী কষ্টে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। তাহার পূর্ব্বপুরুষ মন্দালিক ক্ষত্রিয়কে রাজ্য দিয়া দেশের সুখশান্তি যে জলাঞ্জলি দিয়া গিয়াছেন, এই অপরাধের বোঝা মাথায় লইয়া তিনিই এখনও দণ্ডায়মান ! দেশের এই অধীনতা, এই হীনতার তিনিই যেন এখনও মূর্ত্তিমান্ কারণ ! প্রতিশোধের স্পৃহা তাঁহার দ্বিগুণ হইয়া উঠিল,—সেই সঙ্গে প্রকৃত স্বাধীনতার মহান্ ভাবে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল।

এক এক এমন মুহূর্ত্ত আছে, যে মুহূর্ত্ত অচেতনকে চেতনা দেয়—অন্ধকারকে আলোক প্রদান করে, পাপকে পুণ্যে পরিণত করে। এই মুহূর্ত্তে জঙ্গুর হৃদয়ের প্রতিশোধস্পৃহা অজ্ঞাতভাবে স্বজাতির অনুরাগে এক হইয়া পড়িল।

এই সময় একজন ভীলগ্রামবাসী পরিচিত ভীল এইখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হউছে রে ?" সে কথা জঙ্গু শুনিলেন না, জঙ্গু উত্তেজিত-কণ্ঠে বলিলেন—"ভীল এখন ক্ষত্রিয়ের দাস !" আগন্তুক তাঁহার রাগ দেখিয়া হাসিল, বলিল—"তুইডার তাতে কি ? জুমিয়াকে যে রাজা বড় ভালবাসুল।" জঙ্গু বিস্ফারিত নয়নে চাহিলেন। সে তখন জঙ্গুর এ কয়দিনকার অনুপস্থিতিকালে জুমিয়া রাজার কিরূপ প্রসাদ লাভ করিয়াছে, তাহা গল্প করিল। জঙ্গু আর দাঁড়াইলেন না, বিদ্যুৎবেগে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

৯

জঙ্গু যখন বাড়ী পৌঁছিলেন—তখন সন্ধ্যা হয় নাই। তিনি গৃহে পা দিতে না দিতে আবার সেই কথা ! বধূরা তাঁহাকে দাঁড়াইবার সময় পর্য্যন্ত না দিয়া মহা আহ্লাদে মুখ-ভরা হাসি হাসিয়া আগে-ভাগে রাজার সেই অনুগ্রহের কথাই পাড়িল। কিন্তু বেশী কথা তাহাদের বলিতে হইল না, মুহূর্ত্তের মধ্যে মুখের কথা

মুখে, ঠোঁটের হাসি ঠোঁটেই তাহাদের মিলাইয়া গেল। শ্বশুরের ভ্রূকুটি-অঙ্কিত অন্ধকার মুখ দেখিয়া তাহারা সহসা নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল,—জঙ্গু তখন গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"জুমিয়া কুথা ?"

জুমিয়ার স্ত্রী বলিল—"নিমতায় (নিমন্ত্রণে) গেলু।"

"কখন আসুবে ?"

"রাত কাটুবে।"

জঙ্গু আর কথাটি না কহিয়া গম্ভীরভাবে উঠান হইতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্বশুরের ভাব দেখিয়া বধূরা বিস্মিত, ঈষৎ ভীত হইল।

সে রাত্র জঙ্গু শয্যায় শয়ন করিলেন না, গৃহদ্বারের পার্শ্বে রোয়াকে শয়ন করিয়া রহিলেন—অভিপ্রায় এই, জুমিয়া গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি দেখিতে পাইবেন। প্রভাতের কিছু পূর্ব্বে জুমিয়া কুটীরে প্রবেশ করিয়া, দ্রুত-পদবিক্ষেপে অতি ব্যস্তভাবে তাঁহার সম্মুখের উঠান দিয়া একটি গৃহমধ্যে ঢুকিল, জঙ্গুও উঠিয়া কিছু পরে সেই গৃহে গমন করিলেন—দ্বারস্থ হইয়া দেখিলেন, জুমিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া আবার গৃহের বাহিরে আসিতেছে। পিতাকে দেখিয়া জুমিয়া দাঁড়াইল। জঙ্গু বলিলেন—"কুথার যাউবি ?"

তাঁহার স্বরে কি অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ! জুমিয়া চমকিয়া গেল, বলিল,—"শীকারে যাউছিনু।" জঙ্গু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"টুকুন সবুর করিয়ে যা, কথাটা আছে।"

বলিয়া বজ্রমুষ্টিতে পুত্রের হাত ধরিয়া গৃহের মধ্যস্থলে আনিয়া তাহাকে বসাইলেন ! জুমিয়ার কথা ফুটিল না, একটা অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় কেমন যেন ভীত হইয়া পড়িল। জঙ্গু আবার বলিলেন—"বাছাডা মনে রাখুছু কত্ত দিন বলুনু 'অগুণ' মুইদের ঘর না।"

জুমিয়া ঔৎসুক্য-পূর্ণনেত্রে নীরবে মাথা নাড়িল। জঙ্গু বলিলেন—"কত্তদিন বলুনু মনে রাখুছু—তুইডার বংশডা থাট না, রাজবংশে তুইডার জনম।"

জুমিয়ার মুখ জ্বলিয়া উঠিল, অধীর-স্বরে বলিল—"মনে আছু বাবাডা মনে আছু। কত্ত দিন—"

জঙ্গু তাহাকে কথা কহিতে না দিয়া বলিলেন—"আর সেইডা মনে আছুত কেমনে বিশ্‌; (বিশ্বাস) ভাঙ্গি, কেমন পীড়ন করি মুইদের ধন, মুইদের রাজত্বি চুরি করুল ! মুইদের তাড়াউল ?"

জুমিয়া আর থাকিতে পারিল না, দীপ্ত-স্বরে বলিল—কিন্তু কোন্‌ডা সে

চোর? কত্ত দিন এই কথা শুধাউছি বলুবি কবে? শোধ নিবু কবে? শোধ নিবু কোন্‌ডার উপর? কুথায় মুদের সেই ঘর? কুথায় সেই দেশ? মুইদের রাজত্বি মুইদের করুব কথন্‌? এখনো কি সেডা বলুবার কাল আউল না?"

জুমিয়ার সেই আগ্রহভাবে জঙ্গুর হৃদয় আশ্বস্ত হইল। বলিলেন,—"কাল আসুছে। এই ইদরডাই তুইডার দেশ, নাগাদিত্য রাজাডাই সেই চোরডার বংশধর, ইনাডারি—পূবজন (পূর্ব্বপুরুষ) মুইদের দেশ, ধন, পরাণ সবিডা চুরি করুল, ইনারি দাদাডা মুদের তাড়াউল।"

জুমিয়ার হৃদয় সহসা কাঁপিয়া উঠিল—মুখ সহসা বিবর্ণ পাংশু হইয়া গেল—মহারাজ নাগাদিত্য যিনি জুমিয়াকে এত ভালবাসেন,—যাঁহাকে বন্ধু বলিয়া জুমিয়া আলিঙ্গন করিয়াছে—তিনিই তাহার প্রতিশোধের পাত্র। খানিকক্ষণ জুমিয়ার কথা বাহির হইল না, পরে বলিল—"এত দিন মুইরে এ কথা বলুলি না বাবাডা?"

জঙ্গু এত দিন বলেন নাই, তাহার কারণ ছিল, এত দিন তাঁহার পিতা বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি থাকিতে এ কার্য্যে হাত দিলে সফলতা লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই কার্য্যের জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুত হইবার অগ্রে জুমিয়াকে এ সকল কথা বলিবেন না স্থির করিয়াছিলেন। অনুপযুক্ত সময়ে হঠাৎ উৎসাহে নীত হইয়া একটা কাজ করিয়া বসিলে তাহা কিরূপ বিফল হইবার সম্ভাবনা, তাহা আপনার শৈশব-কার্য্য হইতে তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর আগে—ইদরে আসিবার জঙ্গুর উপায় ছিল না। কিন্তু তিনি জানিতেন—জুমিয়ার নিকট ঐ কথা বলিলে সে তৎক্ষণাৎ ইদরে আসিয়া একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে। অথচ সে ছেলেমানুষ, শুধু উৎসাহেই কাজ হয় না, তাহাকে চালাইবার জন্য জঙ্গুর সঙ্গে থাকা চাই, নহিলে সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

তাহার পর ইদরে আসিয়াই বা এ কথা এত দিন জুমিয়াকে বলেন নাই কেন? ইদরে আসিয়াই জঙ্গু গ্রামে গ্রামে বেড়াইয়া চারিদিক্‌ এই কার্য্যের উপযোগী করিতে গিয়াছিলেন। গৃহে আসিয়া একেবারে জুমিয়াকে সমস্ত বলিবেন, সমস্ত বলিয়া তাহাকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন, এই তাঁহার সঙ্কল্প। সেই সঙ্কল্প-সিদ্ধির যখন সময় আসিয়াছে, তখন হঠাৎ পুত্রের মুখে এই কথা? জঙ্গু জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন—"কেন এই দুদিনডায় কাল ফুরই গেলু কি? রাজাডার দয়া না কি এ!"

দয়া! এ তীব্র উপহাস জুমিয়ার হৃদয় বিঁধিল, জুমিয়া বলিল—"দয়া! না,

দয়া না, বিশ্ (বিশ্বাস) বাবাডা বিশ্। যে মুইরে ভাই এর মত বিশ্ করুল —মাতার মত ভালবাস্নুল, তানারে কি করি মুইডা মারুব ? বাবাডা, মুই পারুব না, রাজ্য অনেক দিন গেলু, যাউতে দে, শোধ লউবার কাল অনেক দিন চলু গেলু, যাউতে দে, এখন তানাডার দোষ নাই—”

জঙ্গু তীব্রস্বরে বলিলেন —“বিশ্ ! গুহা কেমনি বিশ্ রাখুল ? তানাডার যে মন্দালিক পরাণ চেয়ে ভালবাস্নুল, সে ভালবাসার সে কেমনি শোধ দিল ? কাপুরুষ ! আজ রাজ্যডার একডা মিঠে কথায় পূর্বজনদের অপমান তুই ভুলুলি ?”

জুমিয়া বলিল—“না বাবাডা, ভুলুনি, কিন্তু যে অপমান করুল, সে কুথায় আজ ? তানাডার দোষে আব জনাডারে মারুলে শোধ কুথা ?”

ভালবাসার মত শিক্ষক কেহ নাই, অসভ্য ভীলের নিকট আজ খাঁটি যুক্তিদ্বার খুলিয়া গেল। জঙ্গু আরও জ্বলিয়া উঠিলেন, এতদিন ধরিয়া যে অনবরত জুমিয়াকে উত্তেজিত করিয়া আসিতেছেন, সেই উত্তেজনার আজ এই ফল ! বলিলেন—“তানাডার দোষ নাই ! মুইদের সর্ব্বনাশে যানার রাজত্বি, তানাডার দোষ নাই ! মুইদের আপুনার ধন, পরাণ, দেশ যে চোরডার হাতে, তানাডার দোষ নাই ? সে চোরডার দু একডা মিঠে কথায় তুইডা সব ভুলুলি ?”

জঙ্গুর দুই নেত্র হইতে ঝর-ঝর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল, জঙ্গুর উত্তপ্ত ক্রোধ তীব্র নিরাশার অশ্রুতে পরিণত হইল। জুমিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, সে অশ্রুবারিতে তাহার হৃদয় দ্রব হইতে লাগিল, জুমিয়া বলিয়া উঠিল—“বাবাডা, কি করুব বল ?”

জঙ্গু বজ্র-গম্ভীরস্বরে দেয়ালের একটি তীর দেখাইয়া বলিলেন—“ঐ তীরডায় গুহা মুইদের বাবা মন্দালিককে মারুল, ঐ তীর তুলি নে, ঐ তীরডায় রাজাডাকে বিঁধি শোধ নে, রাজত্বি রাখ।” তাঁহার শেষ কথা শেষ না হইতে হইতে হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল, বালিকা হর্ষের আতিশয্যে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—“বাবাডা আয় আয়, বর এসেছে।”

তাহার সেই হাসিতে সেই মৃত্যু-গম্ভীর রুদ্ধ গৃহও যেন হাসিয়া উঠিল, নির্জীব স্তম্ভিত জুমিয়ার প্রাণে যেন সহসা প্রাণের আবির্ভাব হইল। বালিকা আবার ‘আয় আয়’ করিয়া বিষাদ-স্তব্ধ গম্ভীর পিতার হাত ধরিয়া টানিল। জুমিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিলেন। তাঁহার চোখে দুই ফোঁটা জল দেখা দিল। জঙ্গু বলিলেন—“মা টুকুন, বাইরে যা, তোর বাবা এখনি যাউছে।”

বালিকা তাহা শুনিবার পাত্র নহে, কোল হইতে উঠিয়া বাবার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আবার বলিল—"না, আয়, বর এসেছে।"—জুমিয়া তাহার হাত ধরিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"বর কে ?"

সে বলিল—"রাজা। আয় বাবা।"—জুমিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হইল। জঙ্গু বিস্মিত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

১০

শীকার

জুমিয়া আসিয়া মহারাজকে অভিবাদন করিয়া যখন গম্ভীর-নতমুখে দাঁড়াইল, তখন তাহার সেই অবনত মুখের অন্ধকার দেখিয়া মহারাজ বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—'-কি হইয়াছে জুমিয়া ? আজ যে এত দেরী হইল ?"

জুমিয়া মুহূর্ত্তকাল তেমনি অবনত-দৃষ্টিতে থাকিয়া পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মৃত্তিকা-খননে প্রবৃত্ত হইল, তাহার পর হঠাৎ পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া বলিল—"তাই ত, সূর্য্যিটা উঠি গেলু ?"

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন—"তাই ত। সে খবরটা এতক্ষণ পাও নাই ?"

সভাসদ্‌গণ হাসিল, জুমিয়াও হাসিতে চেষ্টা করিয়া আবার মুখ নত করিল। মহারাজ বলিলেন—"আর বিলম্ব কেন ? অশ্বে চড়িয়া লও।"

জুমিয়ার একটি সজ্জিত অশ্ব লইয়া একজন অশ্বপাল দাঁড়াইয়া ছিল, জুমিয়া সেই অশ্বে উঠিলে মহারাজ তাঁহার অশ্ব চালনা করিয়া দিলেন, নিমিষে শত শত অশ্ব-পদ গ্রামপ্রান্তর কাঁপাইয়া তাঁহার অনুগমন করিল, জুমিয়াও একটি কলের সিপাহীর ন্যায় তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইল।

বন বেশী দূর নহে, বৃহৎ অরণ্য বড় বড় গাছে পূর্ণ। বনে শাল আছে, শেগুন আছে, দেবদারু আছে, ঝাউ আছে, মন্দার আছে, ইহা ছাড়া অপরিচিত বন্য গাছ কত রকমের আছে, তাহার সীমা নাই। বহু শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট ঝাকড়া ঝাকড়া, আগাগোড়া পাতায় ঢাকা সরল—সুদীর্ঘ স্বল্প-পত্র স্বল্প-শাখা প্রকাণ্ড গুঁড়ি—এরূপ নানা-জাতীয় বন্য-বৃক্ষে বন ঢাকিয়া আছে। গাছে গাছে শৈবাল ঝুলিতেছে, কোন কোন গাছ ফুটন্ত পরগাছায় আগাগোড়া ঢাকা, কোথায় একটি হলদে ফুলের লতা দুই তিনটি গাছকে একত্র বাঁধিয়া ফেলিয়া তাহাদের গায়ে ফুলের তারকা ফুটাইয়াছে। ফুলে ফুলে মক্ষিকা গুন্ গুন্ করিয়া

বেড়াইয়াছে। দুই গাছের মাঝে মাঝে প্রায়ই বড় বড় এক একটি গোলাকার ঢালের মত মাকড়শার জাল—তাহা শিশির বিন্দুতে পূর্ণ। গাছের ফাঁক দিয়া তাহাতে রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে, প্রভাতপবনে ঈষৎ কাঁপিতে কাঁপিতে রৌদ্র-কিরণে তাহা ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। কোন কোন ঝাঁকড়া গাছ সাদা মুকুলে ভরা,—কোন কোন গাছ ঘন ঘোর লাল পাতার মুকুট পরিয়াছে—দূর হইতে তাহা ফুল বলিয়া মনে হয়; কিন্তু কাছে আসিলে সে ভ্রম দূর হয়। আকাশে মেঘের বৈচিত্র্যের ন্যায় ফুল-পত্রের এই বর্ণবৈচিত্র্যে শ্যাম অরণ্যে অপরূপ শোভা বিকসিত হইয়াছে; আর এই নানা শোভার, নানা রকমের, নানা আকৃতির গাছে গাছে মিলিয়া মিশিয়া আকাশ যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই একচ্ছত্র একাকার অসংখ্য বৃক্ষের মাঝে মাঝে পত্রহীন—নিতান্ত অদ্ভুত আকৃতির গাছ আগাগোড়া শৈবালাবৃত হইয়া গুঁড়ির মত দুই চারিটি-মাত্র মোটা মোটা শাখা বাহির করিয়া—উচ্চ অরণ্যের মাথার উপর আরও দুই চারি হাত উচ্চ হইয়া স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়াইয়াছে। অসংখ্য বৃক্ষের মধ্যে দূর হইতে তাহার দিকেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই শৈবালাবৃত শুষ্ক প্রায় প্রকাণ্ড দৈত্যতরু দেখিলে মনে হয়, সে যেন তাহার শৈবাল-লোমশালী শাখাহস্ত বাড়াইয়া অরণ্যের প্রহরিতায় নিযুক্ত।

অরণ্যের বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়—যেন এই ঘনবদ্ধ বৃক্ষাবলীর মধ্যে মক্ষিকা প্রবেশ করিতে পারে না—কিন্তু যতই নিকটবর্ত্তী হও, ততই নিবিড়তা যেন দুই পার্শ্বে সরিয়া গিয়া পথিককে পথ দেখাইতে থাকে, অরণ্যে প্রবেশ করিলে গাছের ফাঁকে ফাঁকে কেমন প্রশস্ত স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, এক এক স্থান এত প্রশস্ত যে, আট দশ জন অশ্বারোহী নির্ব্বিঘ্নে অশ্বচালনা করিয়া তাহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে। অরণ্য ও জঙ্গলের মধ্যে এই একটি বিশেষ প্রভেদ—জঙ্গলে পথ মেলে না, অরণ্যের ভিতর প্রশস্ত স্থান। এইরূপ প্রশস্ত স্থানে তৃণক্ষেত্র; তৃণক্ষেত্রের মাঝে মাঝে শ্বেত পীত নীল কত রকম সুগন্ধ তৃণ-ফুল, কত রকম সুগন্ধ গাছড়া। বন্যছাগলেরা তৃণ খাইতে খাইতে কত ফুল, কত গুল্ম দলিত করিয়া রাখিতেছে। এক একটি বৃক্ষতল ফলে ফলে বিছান, খরগোসেরা এক একটা ফল সম্মুখের দুই পায়ে ধরিয়া টুক টুক করিয়া খাইতে বসিয়াছে, মাঝে মাঝে কাল কাল এক একটি কাঠবিড়ালী আসিয়া এক একটা ফল মুখে লইয়া তাড়াতাড়ি গাছের উপর উঠিতেছে। পাহাড়ের গাত্রে কোন কোন স্থানে গাছপালার মাঝে মাঝে এক একটি

সঙ্কীর্ণ প্রণালী। একটা প্রণালী দিয়া নীচে জল পড়িতে পড়িতে পাহাড়-প্রাচীরের নীচে একটা গুহার মত হইয়াছে। একটা হরিণ সেইখানে শান্তিতে জল পান করিতেছে; গাছের মধ্যে পাখীরা বসিয়া গান করিতেছে। ঝিঁঝিঁ পোকা অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ করিতেছে, স্তব্ধ গম্ভীর অরণ্যের শিরায় শিরায় যেন তাহার প্রশান্ত প্রাণ সঞ্চালিত হইতেছে, সেই প্রাণের মধ্যে নির্ভয়ে শত সহস্র জীব আশ্রয় লইয়াছে।

সহসা এই প্রশান্ত গম্ভীর অরণ্যভূমির অটল সিংহাসন টলিয়া উঠিল, শীকারী-দের পদদাপে অরণ্য কাঁপিয়া উঠিল। জীব-জন্তু কে কোথায় পালাইবে ঠিক নাই, পাখীরা কোলাহল করিয়া বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিতেছে; ছাগগণ লাফে লাফে ছুটিয়া অরণ্য ছাড়াইয়া পাহাড়ের উঁচু উঁচু ধারে আসিয়া উঠিতেছে, ক্ষুদ্র খরগোসেরা রাঙ্গা চক্ষু বাহির করিয়া কম্পিত কলেবরে গর্ত্তে ঢুকিয়া পড়িতেছে, মহিষ এক একটা পথ হারাইয়া বনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল—তাহারা প্রকাণ্ড গর্জ্জন করিয়া শিং বাঁকাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিয়াছে। ঐ হরিণ সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, ঐ একটা নেকড়ে বাঘ পার্শ্বের বনমধ্যে লুকাইয়া পড়িল। কিন্তু এ সকল জীবের প্রতি আজ শীকারীদের বড় দৃষ্টি নাই, ইহাদের মধ্যে সহসা কোন একটি মাত্র কোন শীকারীর অযত্ন-নিক্ষিপ্ত বাণে আহত হইয়া ভূমিশায়িত হইতেছে, আর সকলে পলায়নের অবসর পাইয়া বাঁচিয়া যাইতেছে। বরাহই আজিকার প্রধান শীকার—এক একটি বরাহের পশ্চাতে শীকারীগণ চৌদিক্ হইতে ছুটিতেছে; ছুটিতে ছুটিতে বৃক্ষগাত্রে কাহারো অশ্বের গাত্র ঘর্ষিত হইয়া যাইতেছে, শাখায় বাধিয়া কাহারো উষ্ণীষ ঝুলিয়া পড়িতেছে। একজনের অশ্ব গাছে ঠোক্কর খাইয়া আরোহীকে ফেলিয়া দিল—সেই ভূপতিত শীকারীর চোখের উপর দিয়া অন্য আরোহিগণ বিস্তৃত একটা গহ্বর-প্রণালী উল্লম্ফনে পার হইয়া গেল।

একজন শীকারী বর্শাঘাতে একটি বরাহশিশু বিদ্ধ করিয়া বর্শা তুলিতেছিল, হঠাৎ আর একজনের বর্শা তাহার বাহুর মাংস বিদ্ধ করিয়া আবার সেই বরাহের গাত্র বিদ্ধ করিল। এই সময় আর একটা বরাহ পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যায়, শীকারী বাহুর শোণিত প্রবাহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি ধাবিত হইল। মহারাজ সর্ব্বাগ্রেই একটা বরাহের প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন।

এই শান্তিহীন উৎসাহ-কোলাহলের একপ্রান্তে জুমিয়া একাকী কেবল তাহার নিরুৎসাহ বিষাদ-ভার লইয়া একটা পাষাণ দর্শকের ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠে স্তব্ধ বসিয়া-ছিল। তাহার চারদিকে উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি, উন্মত্ততা, শীকারের ছুটোছুটি, শীকারীর

চীৎকার অনুসরণ। এই উন্মত্তকারী শীকার-দৃশ্য অধীর স্বরে ক্রমাগত তাহাকে নিজের দিকে ডাকিতেছে। অশ্ব অধীর হইয়া হ্রেষারব করিয়া উঠিতেছে, অশ্বারোহী তাহাকে টানিয়া ধরিয়া মনে মনে বলিতেছে—"আর না, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন আর তোমরা কেহ জুমিয়াকে আমাদের জন্য ডাকিও না, তোমরা এখন তোমাদের অন্ধকার ভ্রূকুটি দেখাও, সে যে ভয়ানক ব্রতে ব্রতী হইয়াছে, তাহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হউক।"

নিকট দিয়া একটা হরিণ চলিয়া গেল। হঠাৎ জুমিয়ার হাতের রাশ শিথিল হইয়া পড়িল, অশ্ব চারি পা তুলিয়া ছুটিবার উদ্যোগ করিল; আবার তৎক্ষণাৎ সংযত হইয়া দাঁড়াইল। এই সময় মহারাজ ছুটিয়া একবার জুমিয়ার কাছ দিয়া চলিয়া গেলেন। হঠাৎ যেন মহারাজের কণ্ঠ-নিঃসৃত, 'জুমিয়া জুমিয়া' আহ্বানে বনতল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার কঠিন প্রাণও যেন বিগলিত হইয়া উঠিল, দুদিন আগের মত মহারাজকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা হইল—কিন্তু দুদিন কি আর এখন আছে? সে ত বহুকাল চলিয়া গিয়াছে। এখন ত আর নাগাদিত্য বন্ধু নহেন, পিতা কহিয়াছেন—এখন নাগাদিত্য তাহার শত্রু, সে যে আজ তাঁহাকে মারিতে আসিয়াছে। সে ডাকে আর আজ পা সরিল না—কে যেন তাহাকে ধরিয়া পাষাণের মত সেইখানে অচল করিয়া রাখিল, মহারাজ চলিয়া গেলেন, সে কেবল সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

মহারাজ বরাহ বিদ্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন—চারদিকে একটা আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইয়াছে—মহারাজ জুমিয়ার নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"জুমিয়া, তুমি আজ এত শ্রান্ত! কত শীকার করিলে?"

জুমিয়ার দৃষ্টি আবার নত হইয়া পড়িল, তাঁহার দিকে চাহিতে আর যেন তাহার সাহস নাই, সে বলিল,—"শীকার কই আজ হউল, পারুল না আজ?"

জুমিয়া আজ শীকার করে নাই! মহারাজ বিস্মিত নিরানন্দ দৃষ্টিতে চাহিলেন। সভাসদেরা যে আজ জুমিয়ার সম্বন্ধে যাহার যাহা ইচ্ছা বলিয়া লইবে, তাহা মহারাজের অসহ্য। এই সময় একটা হরিণকে নিকট দিয়া ছুটিতে দেখা গেল—রাজা বলিলেন,—"জুমিয়া, হরিণ, হরিণ, মার, মার, ছুট, ছুট।"

জুমিয়া অস্বাভাবিকস্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—"হ্যাঁ, মারুব, মারুব।"

কিন্তু অশ্ব ছুটাইল না, কেবল হাতের ধনুক তুলিয়া হঠাৎ উঁচু করিয়া ধরিল। ধনুক মহারাজের প্রতিই যেন লক্ষ্য নিবদ্ধ হইল—কিন্তু রাজা নির্ভয়ে হাসিয়া

বলিলেন,—"জুমিয়া, বান কই? শীঘ্র শীঘ্র!" ইতিমধ্যে আর একজন হরিণকে বাণাহত করিল, রাজার মুখ মলিন হইয়া গেল, চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিয়া থামিয়া গেল—রাজা অধীর হইয়া বলিলেন—"জুমিয়া ইচ্ছা করিয়া মারিল না—জুমিয়ার আজ কি হইয়াছে!"

জুমিয়া যে রাজাকে মারিতে যাইতেছিল—এখনো তাঁহার এই ভালবাসা! এই বিশ্বাস! জুমিয়া আর পারিল না, তাহার অশ্রু উথলিয়া উঠিল, সে ধনুক আবার স্কন্ধে ফেলিয়া বলিল,—"সত্যি মুই নারিনু, মহারাজ, আজ্ঞা দে, চলু যাই!"

মহারাজ তাহার অশ্রুজলে, তাহার সেই বিষাদের স্বরে আরও ব্যথিত হইলেন, বুঝিলেন, আজ শীকারে অকৃতকার্য্য হইয়া জুমিয়া বড় কষ্ট পাইয়াছে। পাইবারই ত কথা। মহারাজ বলিলেন,—"জুমিয়া, আজ তোমার কি হইয়াছে?"

জুমিয়া বলিল,—"মহারাজ, মুইডার অসুখ হউছে, মুই আর দাঁড়াইতে নারুছি।"

জুমিয়া অশ্ব ছুটাইয়া চলিয়া গেল। মহারাজের সেদিন শীকারের অর্দ্ধেক আমোদ নষ্ট হইল। সভাসদ্‌দিগের আর সেদিন আহ্লাদ ধরিল না।

১১

নৈরাশ্য

সুদুর্গম বনমধ্যে সুপ্রশস্ত মুক্তভূমি। এই মুক্ত ভূমির একদিকে নিবিড় অরণ্য পথ, অন্য তিন দিকে পাহাড়ের সোজা সোজা পাষাণ-প্রাচীর। প্রাচীরের বাহির-পৃষ্ঠ বৃক্ষপূর্ণ; কিন্তু ভিতরপিঠ এমন উলঙ্গ তৃণপত্রহীন যে, দেখিলে মনে হয়, কে যেন করাত দিয়া পাহাড়-গাত্রকে এখনি এমন মসৃণ করিয়া কাটিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এই উলঙ্গ সোজা সোজা পাহাড়ের গায়ে গায়ে মৌমাছির বড় বড় লাল চাক, তাহার কাছে কাছে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর। গহ্বর নিশাচর পক্ষীতে পূর্ণ।

একটি পাহাড়-গাত্র হইতে একটি জল-প্রপাত-পড়িতেছে—পড়িয়া নীচে একটি জলাশয় হইয়াছে, জলাশয় হইতে একটি সঙ্কীর্ণ জলধারা আঁকিয়া বাঁকিয়া বড় বড় প্রস্তরখণ্ডের মধ্য দিয়া অদূর অরণ্যের পাদমূল ধৌত করিয়া কে জানে কোথায় বিলীন হইয়া পড়িতেছে।

আজ অন্ধকার রজনীতে এই নিস্তব্ধ নির্জ্জন সুদুর্গম জলাশয়তটে ধূধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, আগুনের চারিপাশে বিদ্রোহী ভীলেরা বসিয়া ধীরে ধীরে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। তাহাদের বহুজনের সেই গুন্ গুন্ শব্দে অরণ্য যেন চমকিয়া উঠিতেছে, নির্ঝর-প্রপাত আর শুনা যাইতেছে না—এই বিজন প্রদেশের নিস্তব্ধতা যেন সহসা কুম্ভকর্ণ-নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া রাঙ্গা চক্ষু মেলিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তাহাদের চুপি চুপি কথা আর রহে না—বিলম্ব যেন আর সহে না। কি জন্য তাহারা অপেক্ষা করিতেছিল—আর যেন সে অপেক্ষায় থাকিতে পারে না। তাহাদের অধীর উৎসাহ সেই অন্ধকার নিশীথের আগুনে তাহাদের মুখে, চোখে, সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশিত হইতেছে—তাহারা আর পারে না—সে উৎসাহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। রাজা দূরে, বিপদ দূরে—নিকট কেবল তাহারা আপনারা একসংকল্পী বদ্ধপরিকর সশস্ত্র দল, আর তাহাদের আপনাদের উৎসাহ ও অভীষ্ট জয়। এ অবস্থায় তাহাদের চুপি চুপি কথা আর কতক্ষণ চুপি থাকে? তাহাদের অধীরতা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল, তাহাদের মৃদুস্বর ক্রমশই স্ফীত হইয়া বন্যার মত অল্পে অল্পে বন-প্রদেশ ছাইয়া ফেলিতে লাগিল, দলপতি ব্যস্ত হইয়া বারংবার 'শান্ত হও, শান্ত হও,' করিয়া তাহাদিগকে থামাইতে লাগিলেন এবং সতৃষ্ণ উৎসুক নেত্রে অরণ্য-পথের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

সহসা অরণ্যের এই অস্পষ্ট কোলাহল স্তম্ভিত করিয়া দিয়া অদূর অরণ্য হইতে একবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে 'কু'ধ্বনি উত্থিত হইল—মুহূর্ত্তে বিদ্রোহিগণ থামিয়া পড়িল—এই 'কু'ধ্বনি বনপ্রান্তে মিলাইয়া পড়িতে না পড়িতে চারিদিক সুগভীর নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল,—রুদ্ধশ্বাস নির্ঝর কেবল এই স্তব্ধ প্রাণ পাইয়া সজোরে নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে আবার জলপ্রপাতের গভীর শব্দ স্তব্ধ অরণ্যের প্রাণে তান তুলিল। দলপতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একজন যুবক বাম-হস্তে মশাল—দক্ষিণ-হস্তে যষ্টি লইয়া অরণ্য-পথে জলাশয়ের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল—তাহাকে একাকী দেখিয়া বিদ্রোহীদিগের উৎসাহভাব সহসা তাহাদের প্রক্ষিপ্ত ছায়ার মত মলিন হইয়া গেল। দলপতি গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"জুমিয়াডা কই?" উত্তর হইল—"তানারে খুঁজি মিলুলু না।" জজুর হৃৎকম্পন-শব্দ সেই বিজনতার মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। বলিলেন,—"খুঁজি মিলুলু না? গেলু কুথা?"

"কোনডা বলতে নারুল।"

"বহুডা ?"

"বহুডা নাই, মেয়েডা নাই। তানাদের বুঝি লউ।"

শুষ্ক পত্রের আগুন ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছে, কিন্তু একটা বাতাস উঠিলেই সহসা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যেমন নিভিয়া যায়, তেমনি উক্ত সংবাদে ভীলদিগের প্রদীপ্ত-মুখ সহসা অন্ধকার হইয়া গেল। কিন্তু যে বাতাসে শুষ্কপত্র অগ্নিহীন হয়, সেই বাতাসে কাঠের আগুন আরও জ্বলে বই নেভে না, লঘু দ্রব্য যেমন সহজেই ধরে, তেমনি সহজেই নিভে—ভারী জিনিসে একবার আগুন ধরিলে আর রক্ষা নাই। জঙ্গু যখন শুনিলেন, জুমিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই জুমিয়া—যাহার উপর তিনি সমস্ত আশা-ভরসা স্থাপন করিয়াছেন, যাহাকে হৃদয়ের শোণিত দিয়া এতদিন পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, সেই জুমিয়া আজ তাঁহার সমস্ত আশা ভাঙিয়া, সুখ-স্বস্তি হরণ করিয়া কৃতঘ্ন পাষণ্ডের ন্যায় চলিয়া গিয়াছে—তখন মুহূর্ত্তকাল তিনি বজ্রাহতের ন্যায় নিস্তব্ধ জ্ঞান-হীন হইয়া পড়িলেন,—কিন্তু মুহূর্ত্তে তাঁহার সে ভাব চলিয়া গেল, তাঁহার সে নিস্তেজতা মুহূর্ত্তে জ্বলন্ত উত্তেজনায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সত্য বটে, তিনি জুমিয়াকে ভালবাসেন,—কিন্তু তাঁহার ব্রতকে তিনি তাহা অপেক্ষাও অধিক ভালবাসেন। এই ব্রত তাঁহার জীবন, জুমিয়া এই জীবনের সুখ মাত্র। ইহা তাঁহার প্রেম, জুমিয়া এই প্রেমের আধার মাত্র। ইহা তাঁহার আশা, জুমিয়া এই আশার ভরসা মাত্র। ইহা তাঁহার তৃষ্ণা—জুমিয়া এই তৃষ্ণার জল মাত্র। সুতরাং সুখশান্তি পানীয় হারাইয়া মুহূর্ত্তকাল জঙ্গু অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, কিন্তু যন্ত্রণা-কাতর পিপাসিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার উত্তেজনা আরও বাড়িয়া উঠিল। সেই যন্ত্রণা, সেই পিপাসা অন্য উপায়ে নিবৃত্তি করিবার স্পৃহা আরও বাড়িয়া উঠিল। বাধা পাইলে দুর্ব্বল যে,—সে নুইয়া পড়ে—কিন্তু সবল আরও ভীষণ হইয়া উঠে। জঙ্গু অসভ্য—কিন্তু সবল-হৃদয়, দৃঢ় উদ্দেশ্যধারী।

জঙ্গু উত্তেজিত অথচ সুস্পষ্ট গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "জুমিয়া ভীরু। জুমিয়া অমনিষ্যি! (কাপুরুষ!) সেডা গেলু যাক্, তানাডারে মুইরা চাহু না, এখন কোনডা রাজা হুঁউবি বল ?"

নিস্তব্ধতার মধ্যে তাঁহার কথা ধ্বনিত হইয়া নিস্তব্ধতায় মিশাইয়া গেল, বিদ্রোহীরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু কেহ একটি কথা কহিল না, কেহ একপদ অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল না। জঙ্গু আবার বলিলেন

—"ভীরু উহার মুখ চাহু কি তুইরা এ কাজে লাগুতে আউলি? তাহাঁরে না পাই সব হাল ছাড়ুবি?"

কুল্লু বলিল—"মুরা রাজা চাই, কানার সাথে মুরা কাজে লাগুবু?"

চারিদিকে অমনি একটা অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল—"মুরা রাজা চাই —মুরা রাজা চাই।"

জঙ্গু বলিলেন,—"কানডা তুইদের মাঝে রাজা হউবি আয়, এঁই বাণ লউ কিরে কর—"

জঙ্গুর কথা শেষ না হইতে আর একবার কোলাহল উঠিল—"মুরা রাজা চাই—রাজা চাই"; কিন্তু কেহ রাজা হইতে অগ্রসর হইল না। জঙ্গু তখন পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"যেডা গেল সেডা মুইডার ছাবাল না আয় বেটা, তুইডা বাজা হউবি।"

চারিদিক্ নিস্তব্ধ হইয়া গেল, জঙ্গু কটি হইতে একটি বাণ খুলিয়া হাতে ধরিয়া সেই গম্ভীর নিশীথের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "এই বাণে মন্দালিককে গুহাডা মারুল, এই বাণ হাতে লউ কিরে কর, গুহাডার বংশ ওজড় করি দেশ বাঁচাউবি—"

পিতার প্রতিধ্বনির মত কম্পিত-কণ্ঠে পুত্র ধীরে ধীরে সেই শপথ আওড়াইয়া গেল। আর কেহ একটি কথা কহিল না—একবার জয়ধ্বনি উঠিল না, চারিদিকে নিরুৎসাহের মধ্যে পুত্রের শপথ-বাণী ধ্বনিত হইয়া আস্তে আস্তে মিলাইয়া পড়িল। নিভ নিভ আগুনের আলোকে পাষাণ-প্রাচীরের দীর্ঘ ছায়া জলাশয়ে ফুটিয়াছিল, স্তব্ধ বিদ্রোহীদের চোখের উপর কেবল তাহা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগল, আর তাহাদের মাথার উপর এক একটা চামচিকা ঘুরিয়া উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

* * * *

সকলে চলিয়া গেছে, ভোর হয় হয়—কিন্তু এখনও অরণ্য অন্ধকার, জটিল বৃক্ষ ভেদ করিয়া এখানে এখনো উষায় আলো প্রবেশ করিতে পারে নাই, পাখীরা অন্ধকারেই গান গাহিয়া উঠিয়াছে, বনফুলের সুগন্ধ অন্ধকারের মধ্যেই চারিদিকে খেলিয়া বেড়াইতেছে। একাকী জঙ্গু এই সময় অরণ্যতলে একটি শালবৃক্ষকে প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন—"দেবতা, এখনও তুইডার এমনি কারখানা। মুইদের কি ঘুম দিউবিনে, মুইদের ছাড়ি তুইডা তানাদের হইলি, তানাদের বড় করিলি? মুইদের ধন তানাদের দিলি? তুদের ছাবাল কাঁদি মরুছে, তুইডা

তানাদের পানে চোখ চাহিলি নে? এখনো চাহুবি নে? তুইকে সোনায় মড়াইবু, তুইভার তলায় হাজার ছাগ বলি দিবু, মুদের পানে ফিরু চাহ—মুদের দুখ তাড়াউ দেবতা! মুদের তুই ঘুম দে—মোরা তুইভারই ছাবাল!"

১২

তণ্ডুল

পৃথিবীর যখন যে দেশে কোন মহৎ কার্য-সিদ্ধি হয়, প্রায় একজনের দ্বারাই হইয়া থাকে, দেশের অন্তর্নিহিত সমগ্র রুদ্ধ শক্তি দিয়া সময় যে ক্ষুদ্র একজনকে গঠিত করিয়া তোলে, তাহার শক্তি তরঙ্গিত হইয়া দেশের শত সহস্রকে সঞ্চালিত অনুপ্রাণিত করে।

ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই সপরিবারে যে রাষ্ট্র-বিপ্লবে প্রাণ হারাইলেন, নেপোলিয়নের কটাক্ষপাতে সেই বিপ্লব স্তম্ভিত হইয়া গেল।

এই শক্তি হৃদয়ে ধরিয়াই ম্যাটসিনি সমগ্র ইটালি উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন, ওয়ালেস স্কটলণ্ডকে স্বদেশানুরাগে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন। প্রতাপসিংহ ভারতেশ্বর আকবরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। আর ইহার অভাবেই, সিরাজউদ্দৌলার সহস্র সৈন্য, বাঙ্গালার কোটী কোটী লোক বিনাযুদ্ধে ক্লাইবের নিকট নতশির হইয়াছিল। তাই বলিতেছি, বিদ্রোহী ভীলেরা যে "রাজা চাই" বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অকারণে নহে। জংলা তাহাদের রাজা হইল বটে, কিন্তু রাজার গুণ তাহাতে কিছুই ছিল না—যে দীপ্ত উৎসাহ দেখিয়া তাহারা উৎসাহ পাইবে। এমন উৎসাহ তাহার কই? যে দৃঢ়সংকল্প যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকালেও সৈনিকদিগকে অটল রাখিতে পারে—এমন সংকল্প তাহার কই? যে বীরত্ব, সাহস দেখিয়া সৈনিকেরা জীবন-মরণে তাহার ভক্ত হইয়া দাঁড়াইবে—এমন সাহস তাহার কই? জুমিয়া তাহাদের মনের মত অধিনায়ক ছিল, জুমিয়ার কটাক্ষ-চালনে তাহারা উত্তেজিত হইতে পারিত, তাহার অটল সাহস দেখিয়া নির্ভয়ে তাহারা মৃত্যুর অনুসরণ করিতে পারিত, সে অধিনায়ক নাই, সে জুমিয়া নাই, বিদ্রোহীদিগের উৎসাহ কে ধরিয়া রাখে? জন্মুর উৎসাহবাক্যে, তাহার দেশানুরাগ-বাক্যে মুহূর্তের জন্য তাহারা একবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠে—তিনি এক পা সরিয়া গেলে আবার নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। তাহারা কেবল কথা চায় না, তাহারা একজন সঙ্গের

সঙ্গী, কর্ম্মের কর্ম্মী অধিনায়ক চায়, জঙ্গু তাহা পারেন না, শপথে তাঁহার হাত-পা বদ্ধ।

দিন যাইতেছে, মাস যাইতেছে, জঙ্গু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না; কত পরামর্শ হইতেছে, কত সংকল্প-হইতেছে, কিন্তু কাজের সময় সকলই ভণ্ডুল হইয়া পড়িতেছে। পরামর্শের সময় যাহারা অধিক আস্ফালন করে, মুহুর্মুহুঃ নাগাদিত্যের মস্তক চিবাইতে থাকে, উৎসাহের উন্মত্ততায় সম্মুখের গমনশীল নিরীহ শৃগাল-কুকুরকে বাণাহত না করিয়া ছাড়ে না, কার্য্যক্ষেত্রে তাহারাই সর্ব্বাগ্রে সরিয়া পড়ে। সেই সময় তাহাদের আত্মাভিমান মত্ত হইয়া উঠে, জঙ্গু কোনদিন নাংলুর সহিত আগে কথা না কহিয়া কাংলুর সহিত কহিয়াছেন, ভদিয়ার মত যোগ্য লোক থাকিতে খুদিয়াকে হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়াছেন, এই রকম শত সহস্র কথা তাহাদের মনে পড়িয়া যায়। জঙ্গু যে নিতান্ত মতলব করিয়া যোগ্যদিগকে ছাঁটিয়া অযোগ্যদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন, সে বিষয়ে তাহাদের আর সন্দেহ থাকে না, একটা রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষির বিপ্লবের মধ্যে সমস্ত একতা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়, কাজের সময় সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া পড়ে।

একদিন সব স্থির, দোলোৎসব-নিশিতে উৎসবোন্মত্ত সৈনিকেরা সিদ্ধিপানে বিহ্বল হইয়া থাকিবে, ভীলেরা ধীরে ধীরে দুর্গে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ অস্ত্রাগার আক্রমণ করিবে। সন্ধ্যার সময় শালবৃক্ষতলে সকলে একত্র হইয়া সেখান হইতে সকলে শুভযাত্রা করিবে।

জঙ্গু, তাহার পুত্র ও কতিপয় বন্ধুর সহিত সন্ধ্যা হইতে অন্য সকলের অপেক্ষায় শালবৃক্ষতলে আসিয়া বসিয়াছেন। রাত্রি হইল, তবু কাহারও দেখা নাই। জঙ্গু বুঝিলেন, একটা কি গোল হইয়াছে। নিরাশ-হৃদয়ে তাহাদের অনুসন্ধানে গমন করিলেন। পূর্ণিমারাত্রি, জ্যোৎস্নায় দূর-দূরান্তর একখানি স্বপ্ন-দৃশ্যের মত নেত্রপথে পড়িতেছে, দূরের অস্পষ্ট উৎসবকোলাহল জঙ্গুর নিরানন্দ হৃদয়ে একটা ভীতি জাগরিত করিতেছে, তিনি দ্রুতগতিতে চলিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, হঠাৎ যেন নিকটের কোথা হইতে পরিচিত কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি একটু দাঁড়াইয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলেন, কিছু দূর গিয়াই অদূরের একটি বৃক্ষতলে জনতা দেখিতে পাইলেন, সেইখানে দাঁড়াইলেন, তাহারা যেমন কথা কহিতেছিল, কহিতে লাগিল, দুই তিন জন তাহার মধ্যে প্রধান বক্তা, আর সকলেই শ্রোতা। একজন কহিল—"তুইরা যাউতে চাস ত যা, মুই ত না।"

দ্বিতীয় জন কহিল,—"মরুবার সময় মরিবু মোরা, আর রাজা হইবার বেলায়

তানার ছেলেডা !”

ক্রুদ্ধ শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন কহিল—“মুরিবুই বা কেন মোরা ? এ রাজার রাজ্যে মুইদের কষ্ট কি ?”

আর একজন বলিল—“তার তরে মরিবু কেন মুরা ? কানাডার লাগিন মরিবু, জুমিয়া থাকিত ত সে জুদ কথা—”

প্রথম বক্তা বলিল—“কিন্তু জংলা রাজা হউল কোন্ গুণডায় ? মোরা কি সেইডার চেয়ে কিছু কম ?”

দ্বিতীয় বক্তা বলিল,—“মুইরা এতটাই কি ফেলা ছ্যাড়া। সেদিন কাল্লু মোদের দিকে পিছন করি বসিল কেন তানাটা কি কথা কইতে নারিল ?”

সকলে গস্ গস্ করিয়া উঠিল—বলিল,—“মুরা কেউ যাউব না।”

এই সময় জঙ্গু তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সকলে বলিল—“জঙ্গুডা, মরিবু মুইরা,—রাজা হউবে তোর ছেলেডা ! তোরা রাজা হইবার লাগিন মোদের মরুতে লউ চলুছিস !”

জঙ্গু দৃঢ়-স্বরে বলিলেন, “ছাবালরা শোন, তুইদের পরাণ বাঁচাউতেই তুইদের মরুতে ডাকুছি ! পরাণ যদি না দিবু, তবে পরাণ রাখিবু কেমন ? চোরের হাত হউতে ঘর বাঁচাউতে—ছাবাল বাঁচাউতে তোরা পরাণ দিউবি—মুইডার লাগিন না।”

দশকণ্ঠ একস্বরে বলিয়া উঠিল—“তবে তুইডার ছাবাল কেন রাজা হউল ? নাংলু তানার চেয়ে কর্ম কি ?”

সেদিন তাহারা নিজেই যে কেহ রাজা হইতে অগ্রসর হয় নাই, সে কথা তাহারা ভুলিল। জঙ্গু বলিলেন—“মুইরা চিরদিনকার রাজা—তাই তুইরাই সেদিন মুইদের রাজা করুলি। মুইরা তুইদের বাঁচাউতেই সামনে রহুব, বিপদ আসুলে মুইদের উপরেই পড়ুব। আচ্ছা নাংলুই রাজা হউল, মুইরা তানাডার আজ্ঞাকারী।”

সকলের মুখ যেন মেঘমুক্ত হইল, সকলের আহ্লাদের মধ্যে নাংলুই নেতা হইল কিন্তু ইহাতেও কাজ বড় একটা অগ্রসর হইল না। দুর্গ আক্রমণের সঙ্কল্প সঙ্কল্প-অবস্থাতেই ক্রমে মরিয়া গেল। সকলের মতে বিশেষতঃ নাংলুর মতে তাহা বড়ই কঠিন ব্যাপার, কাজেই তাহারা এ সঙ্কল্প ছাড়িয়া অন্য নানারূপ সহজ উপায় স্থির করিতে লাগিল। একদিন স্থির হইল, রাজা যখন স্নানে আগমন করিবেন, তখন বিদ্রোহীরা তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। পরামর্শের সময় নাংলু মহা উৎসাহ

প্রকাশ করিল, কিন্তু আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় একেবারে বাঁকিয়ে বসিল। বলিল —সে নেতা হইয়াছে বলিয়া সকালবেলা সূর্য্যের আলোকে রাজাকে বধ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইতে আসে নাই। এ সমস্তই জঙ্গুর শঠতা, তাহাকে রাজা করিয়া জব্দ করিবার জন্য জঙ্গু এরূপ ফন্দী করিতেছে। সমস্তই ভাঙ্গিয়া গেল, প্রভাতে রাজা স্নান করিয়া গৃহে গেলেন, জনপ্রাণী তাঁহার পথে উঁকি মারিল না।

এইরূপে ক্রমাগত উপায়ের উপর উপায় স্থির হইতে লাগিল, পরামর্শের উপর পরামর্শ চলিতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বৎসরের পর বৎসরও কাটিতে লাগিল কাজে কিছুই হইয়া উঠিল না। জঙ্গু দিন দিন হতাশ অবসন্ন হইতে লাগিলেন, জংলার অক্ষমতা প্রতিপদে বুঝিতে লাগিলেন, দেখিলেন, লোকের মত লোক নাই। বিপদের মুখোমুখী হইতে পারে, এমন এক জন নাই, এমন কেহ নাই যে, সূর্য্যের মত আপনার তেজে সকলকে তেজস্বী করিতে পারে! অধীনতায় সকলে অবসন্ন নিস্তেজ, কার্য্যক্ষেত্রে আগুয়ান হইতে তাহারা অপারগ, কেবল অপারগ নহে, অধিক ভাগ অপদার্থ, তাহারা ভাল করিতে পারে না, মন্দ করে, কিন্তু এখন তাহাদের দল হইতে তাড়াইলেও মঙ্গল নাই, তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে যদি বিদ্রোহ প্রকাশ করিয়া দেয় ত অঙ্কুরেই সমস্ত নির্ব্বাপিত হইবে। প্রতিদিন হতাশ হইয়া জঙ্গু জুমিয়ার অভাব প্রাণপণে অনুভব করিতে লাগিলেন।

তবুও জঙ্গু আশা ত্যাগ করিলেন না, প্রতিপদে ব্যর্থ হইয়া, প্রতি তরঙ্গে আহত হইয়া তবু হাল ধরিয়া রহিলেন। একে একে বিদ্রোহীগণ সরিয়া পড়িতে লাগিলেন, দল ভাঙ্গিয়া গেল, পরামর্শের জন্যও আর কেহ আসে না, নিমন্ত্রণ করিলেও জঙ্গুর গৃহ কেহ মাড়ায় না, তথনও জঙ্গু নিরাশয় আশা ধরিয়া উত্তেজিত হৃদয়ে সবলে হাল্ ধরিয়া রহিলেন।

১৩

বাণাঘাত

জঙ্গু কহিলেন,—"কা'ল রাজাটা শীকারে যাইবে মুই জানি আসিছি।"

জংলা বলিল,—"কিন্তু আর কোনডা যে আসুতে চাহে না"—

জঙ্গুর গম্ভীর ললাটে ক্রোধের রেখা পড়িল—বলিলেন,—"জুমিয়া থাকুলে কি এরূপ বলত? তুইডাকি কি কোন্‌ডা না?"

জংলা থতমত খাইয়া বলিল,—"কিন্তু মুইডা একা।"

"একা তুইডা? একডাকে মারুতে কয়টা চাই? এতদিন বাণ ধরুতে শিখিলি কি লাগিল? জুমিয়া থাকুলে এ পাঁচ বরিষ কি মিছা যায়?"

জংলার চোখে জল আসিল—জঙ্গু বলিলেন—"যদি ডর লাগে ত সেইডা বল, আর যদি ডর না লাগে, যদি যাউতে চাউস ত শুধ্ একা যা। মুরা খুব শিখিনু—মেলা জনডায় শুধুই গণ্ডগোল—আবার কেন লোকজন!"

জংলা বলিল,—"তবে যা বলুস—কাল মুইডা একাই যাউব।"

পিতাপুত্রে সে রাত্রে প্রায় সমস্ত রাত ধরিয়া কার্য্যসিদ্ধির পরামর্শ চলিল। অবশেষে গভীর রাত্রে জঙ্গু আশায়, নিরাশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পুত্রকে বিদায় দিলেন।

জংলা বিদায় হইল, পিতার দিকে চাহিয়া বিদায় হইল—আর কাহারও সহিত দেখা করিয়া গেল না, গৃহের দিকে পর্য্যন্ত ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল না, তাহাতেও যেন তাহার সাহস নাই। যখন পিতার নিকট হইতে দূরে আসিয়া পড়িল—তখন একবার ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু তাহার অন্ধকার হৃদয়ের অন্ধকার ছাড়া তখন আর কিছুই দেখিতে পাইল না। জংলার রুদ্ধ হৃদয় উথলিয়া উঠিল—জংলা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল, চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল—"মুইডা কি করি জুমিয়া হইবু? জংলা মরুতে যাউছে—জংলা মরুবে,—জংলা তবু জুমিয়া হউতে নারুবে। জুমিয়া, তুইডার শক্তি জংলার নাই, তুইডার তেজ জংলার নাই, তুইডার কিছুই জংলার নাই—তবে জংলা যে সে জুমিয়া হউবে কেমনে? যদি জংলা জুমিয়াই হউবে—তবে সে জংলা হইল কেন? বাবাডা, তুই জংলাকে মরুতে পাঠাউছিস—সে মরুবে, তবু সে জুমিয়া হউতে নারুবে।"

জংলা তাহার দুঃখভার লইয়া দ্রুত চলিতে লাগিল, আকাশের তারা আকাশে মিলাইয়া পড়িল, পূর্ব্ব-গগন ঈষৎ আলোকিত হইয়া ক্রমে নানা বর্ণে চিত্রিত হইতে লাগিল, পথিক দু-একজন জংলার পাশ দিয়া চলিয়া গেল, জংলা চারিদিক্ একবার চকিত-দৃষ্টিতে দেখিয়া বনের মধ্যে ঢাকিয়া পড়িল। বনে প্রবেশ করিয়া একটি উচ্চ বৃক্ষে উঠিয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই একদল শীকারী তাহার নেত্রপথে পড়িল, জংলা ত্রস্তে গাছ হইতে নামিয়া গাছের ঝোপের আড়ালে দাঁড়াইল। শীকারী দল নিকটবর্ত্তী হইল, জংলা ঝোপের মধ্য হইতে রাজাকে দেখিতে পাইল, শরীরের সমস্ত শোণিত তাহার চন্‌চন্ করিয়া উঠিল। ইহার জন্যেই তাহাদের এত অস্বস্তি, এত কষ্ট! কতদিন হইতে ইহার জন্যেই তাহারা অপেক্ষা করিতেছে। জঙ্গুর প্রত্যেক

উত্তেজনাবাক্য তাহার মনে পড়িতে লাগিল, একটা অস্বাভাবিক সাহসে হঠাৎ তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। শীকারী দল ঝোপের পাশ দিয়া কিছু দূরে যাইতে না যাইতে রাজার মস্তক লক্ষ্য করিয়া সে বাণ নিক্ষেপ করিল।

শীকারীদের মধ্যে সহসা মহা কোলাহল উত্থিত হইল, চারিদিকে ছুটোছুটি হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল, জংলা এ দিকে বাণনিক্ষেপ করিয়াই গাছের ভিতর দিয়া অলক্ষ্যে ছুটিয়া পলায়ন করিল। বনের মধ্যে এক স্থানে দুজন কাঠুরিয়া-ভীল কাঠ সংগ্রহ করিতেছিল, ছুটিতে ছুটিতে একবার তাহাদের চোখের উপর আসিয়া পড়িল। হঠাৎ একজনকে ছুটিতে দেখিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—"কি হইয়াছে, কি ব্যাপার ?" এই সময় দৈবক্রমে একটা হরিণ সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া গেল, জংলা ছুটিতে ছুটিতে সেই দিকে আঙ্গুল দিয়া উত্তর করিল—"শীকার, শীকার।"

তাহারা বুঝিল, সে ঐ শীকার ধরিতে ছুটিয়াছে। তাহাদেরও কৌতূহল হইল। হরিণ যে দিকে ছুটিয়াছিল, তাহারাও কাঠ ফেলিয়া সেই দিকে ছুটিল। জংলা গতিক মন্দ দেখিয়া পথ বদলাইয়া একটা নিবিড় জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল। কাঠুরিয়া দুই জন শীকারান্বেষণে এদিক্-ওদিক্ খানিকটা ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল, তাহার পর রাজ-সৈনিক কর্তৃক সহসা বন্দী হইল।

১৪

তিনপাহাড়

আজকাল খবর তারে চলে, কিন্তু যখন তারের বন্দোবস্ত ছিল না, তখন যে খবর চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকিত, তাহাও নহে ; তখন খবর বাতাসে চলিত। রাজা যে শীকার করিতে গিয়া নিজে শীকার হইবার উদ্যোগে ছিলেন—এ কথা কাহারও জানিতে বাকি নাই, রাজ্যের সীমা হইতে সীমান্তরে এ কথা রাষ্ট্র হইয়াছে। কেবল রাষ্ট্র নহে, নানাস্থানে নানারূপ অলঙ্কার-বিশিষ্ট হইয়া যাহা নহে, তাহা পর্য্যন্ত রাষ্ট্র হইয়াছে। একে নূতন খবর, তাহার পর আবার এত বড় একটা খবর, সহরে, গ্রামে, মাঠে, ঘাটে, দোকানে, রন্ধনশালায়, শয়নগৃহে, যেখানে সেখানে এই কথা। ক্ষুদ্র তিনপাহাড় গ্রাম (তিন পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম তিনপাহাড়) যেখানে পলাতক জুমিয়া সপরিবারে লুকাইয়া আছে, সেখানেও আজ প্রাতঃকালে এই কথার গুলজার চলিয়াছে, কৃষকেরা,

রাখালেরা গরু লইয়া মাঠে যাইতে যাইতে এই গল্প সুরু করিয়াছে।

একজন বলিতেছিল—"উঃ, এমন ত কখনও শুনিনি? গুজব না ত!"

আর একজন কহিল—"গুজব! যখন মরা রাজাকে প্রহরীরা পুকুর থেকে বার ক'রে তোলে, তখন প্যারীলাল সেখানে দাঁড়িয়ে। কেমন প্যারীলাল?"

গরুর লেজের হাত লেজে রহিল, সকলে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণনয়নে প্যারিলালের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। প্যারীলাল কোন কার্য্যোপলক্ষে সম্প্রতি ইদর গিয়াছিল। সেই কাল রাত্রে এ সংবাদ বাড়ী আনিয়াছে। প্যারীলাল আজ মস্ত লোক, সে গম্ভীরচালে দুই হাত বুকের মধ্যে আঁটিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"না, আমি দাঁড়িয়ে দেখিনি, যে সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তার মুখেই আমি শুনেছি।"

"ঐ তা হলেই হোল!"

"যে মেরেছে, সে ধরা পড়েছে?"

প্যারীলাল একটা হেঁয়ালীর মত একটু মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না—হ্যাঁ—এই ভীল কতকগুলা ধরা পড়েছে—কিন্তু বুঝলে কি না"—

কিন্তু কেহই কিছু বুঝিল না, কেবল বুঝিবার আশায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্যারীলাল বলিল—"অমন মারা কি মানুষের কর্ম্ম—"

"কে মারবে তবে?" চারিদিক্ হইতে এই উৎসুক প্রশ্ন উঠিল।

প্যারীলাল গূঢ় অর্থ-পূর্ণ কটাক্ষে ইতস্ততঃ চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"সঙ্গীন ব্যাপার—সমস্তই ভূতের কাণ্ড!" সকলে অবাক্ হইয়া রহিল, প্যারীলাল বলিল,—"পাহাড়ের চূড়ার উপর তুলে সেখানে মুখ থুবড়ে না কি মেরে ফেলেছে।"

একটা রহস্য ভেদ হইল, সকলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। একজন বলিল,—"পাহাড়ের চূড়ায় তুলে মেরেছে—তবে পুকুরে না?"

প্যারীলাল রাগিয়া উঠিল, বলিল—"আ খেলে যা, সেখানে আর কি পুকুর থাক্‌তে নেই, এ রকম গাঁজাখুরে কথা বল্লে আমায় দেখছি কথা বন্ধ করতে হয়।" এই কথায় কুতূহলী শ্রোতৃবর্গ বড়ই ভীত হইলেন, সকলে একবাক্যে উল্লিখিত মন্দ বক্তার নিন্দাবাদ করিয়া তাহাকে বিলক্ষণ দশ কথা শুনাইয়া দিলেন, ওরূপ আর একটি কথা কহিলে সে হতভাগার যে আর এখানে—এমন কি—আর কোনখানে ঠাঁই নাই, দশজনে মিলিয়া কেহ তাহাকে ইহা বুঝাইতে বাকী রাখিলেন না। এইরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত সহানুভূতি-সিঞ্চিত হইয়া প্যারীলাল যখন আবার প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন, তখন একজন আবার সাহস পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা মানুষে মারেনি, ভূতে যে মেরেছে, এটা ত রাজা জেনেছে?"

আর একজন বলিল—"তা সত্যি ? নইলে বিনিদোষে অন্যেরা মারা যাবে ?"

যে ইতিপূর্ব্বে একবার কথা কহিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিল, আবার সে আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল—"কিন্তু রাজা না মরেছেন ?"

তাও ত বটে ! এবার কেহ রাগ করিল না, গম্ভীরভাবে কেবল একটা ঘাড়-নাড়ানাড়ি পড়িয়া গেল। যেন লাখ কথার এক কথা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। দু একজন বলিল—"তাই ত, তবে বিচার করবে কে ?"

আর একজন উত্তর করিলেন—"রাজা না থাক্‌লেই রাণী বিচার করে। তার জন্য আর ভাবনা কি ?"

প্যারীলাল বলিল,—"বিচার কি আর এখানো বাকী আছে, সে সব হয়ে গেছে।"

কি বিচার হইয়াছে, জানিবার জন্য সকলে উৎসুক হইয়া উঠিল। প্যারীলাল বলিল—"[illegible] ভীল আছে, সবার মাথা নেবার হুকুম হয়েছে।"

সকলে অবাক্ হইয়া রহিল. একজন কেবল বলিল,—"তবে এ যাত্রা বড়ই বেঁচে যাওয়া গেল ! জুমিয়ার কাছে ও বছর আধ মণ গম ধার নিয়েছিনু—এখন সুদে আসলে তিন মণ দাঁড়িয়েছে। বেটা দেখা হলেই সেই গম দাবী করে, এখন আমি তার মাথা দাবী করব—কেমন কি না ? ঐ যে বেটা বল্‌তে বল্‌তে আস্‌ছে !"

প্যারীলাল ইদর হইতে ফিরিয়াছে শুনিয়া জুমিয়া বাড়ীর খবর জানিতে তাহার কাছেই আসিতেছিল। অন্য সময় জুমিয়ার সহিত দেখা হইলেই ঋণদার সরিতে চেষ্টা করিত, আজ সে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু জুমিয়া তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া প্যারিলালকে বলিল, "—বাবাডার সঙ্গে দেখা হউল কি ? যা বলিতে বলিনু বলুছিস্ ?"

সে বলিল,—"না, তাহা পারি নাই—রাজধানীতে বড় গোলযোগ, এখন কি ভীলদের সঙ্গে দেখা করার যো আছে, যে দেখা করে, তাহার পর্যন্ত মাথা যায়।"

বিস্মিত জুমিয়ার কর্ণে ক্রমে সমস্তই উঠিল।—জুমিয়াকে ব্যথিত অবসন্ন দেখিয়া একজন কহিল,—"জুমিয়া ভাবিস্ নে, আমরা থাকিতে তোর মাথা লইতে কেহ পারিবে না। কেন, তুই কি আমাদের মন্দ প্রতিবাসী ?"

কিন্তু ঋণদার গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"তবে কিন্তু আমার ধানের

ভাগটা এই বেলা কমাইয়া দিক্—”

জুমিয়া কাহারো কথায় লক্ষ্য না করিয়া বলিল—“যবার মাথা যায়, মুইডারো যাইবে,—মুইডা আজই ইদর যাইবু।”

ঋণদার বলিল—“গমগুলা?”

জুমিয়া বলিল—“ছাড়ি দিউছি, তোর দিতে হউবে না।” ঋণদার তখন আবার আর এক ভাবনায় পড়িয়া গেল, বলিল—“না, তাহা হইবে না। তোর ঋণ লইয়া আমি মরিব বুঝি? এক সের গম আমি তোকে আনিয়া দিই, তুই তাহা লইয়া আমাকে রেহাই দে।”

ঋণদার মাঠ হইতে বিকালে বাড়ী গিয়াই আগে এক সের গম জুমিয়ার বাড়ী আনিয়া উপস্থিত করিল, কিন্তু আসিয়া যখন দেখিল, জুমিয়া বাড়ী নাই, তখন পরজন্মের ঋণের ভারে নিতান্ত ভারগ্রস্ত হইয়াও ইহজন্মের বোঝা হইতে নিষ্কৃতি বোধ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

জুমিয়া ১৫ দিনের মধ্যেই বাড়ী পৌঁছিল।

১৫

প্রত্যাগমন

জুমিয়া যাহা শুনিয়াছে, তাহা ঠিক নহে, বাণাঘাতে নাগাদিত্যের মৃত্যু হওয়া দূরে থাক, তিনি অক্ষত বাঁচিয়া গিয়াছেন, বাণ তাঁহার কেশগাছি পর্য্যন্ত স্পর্শ না করিয়া কেবল উষ্ণীষ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু জম্বু সেই দিন হইতে শয্যাগত। সেই দিন হইতে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত। সেই দিন যখন জম্বু জানিতে পারিলেন, জংলা অকৃতকার্য্য হইয়াছে—কেবল তাহাই নহে, তাহার উপর আর একটা অনর্থ ঘটিয়াছে, দুইজন ভীল বন্দী হইয়াছে—তখন মুহূর্ত্তমধ্যে সেই যে জম্বু সংজ্ঞাহীন হইয়া কাঁপিয়া পড়িয়া গেলেন, তাহার পর ১৫ দিন ধরিয়া তাঁহার আর সম্যক জ্ঞানলাভ হইল না। যদিও পরে অল্পে অল্পে জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু বাঁচিবার আর আশা নাই। ভগ্ন হৃদয়, নিরাশ প্রাণ, অংশ শরীর লইয়া তিনি যতই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন, ততই তাঁহার কেবল জুমিয়াকে মনে পড়িতেছে। এতদিন যে উদ্দেশ্য, যে আশা হৃদয়ে ধরিয়া তিনি আর সব ভুলিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য, সে আশা হারাইয়া জুমিয়ার জন্য তিনি আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। বুঝি তাঁহার এই আকুলস্মৃতির

গভীরতম প্রদেশে তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটা আশার ক্ষীণরেখা এখনও বহিতে থাকে, তাঁহার এই শেষ সময়ের শেষ-কথা জুমিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না, বুঝি বা এইরূপ একটা লুক্কায়িত বিশ্বাসে জুমিয়ার জন্য তাঁহাকে অধিক পাগল করিয়া তোলে!

ভোর হইয়াছে। পরিষ্কার বসন্তের প্রভাব। জঙ্গুর রুদ্ধদ্বার গৃহে প্রভাতের এ নির্ম্মলতা পূর্ণমাত্রায় প্রবেশ করিতে পারে নাই, দেওয়ালের উঁচু দুইটি ছোট জানালার গহ্বর দিয়া জঙ্গুর বিছানার উপর খানিকটা সূর্য্যকিরণ পড়িয়াছে, তাহার আলোকে সমস্ত ঘরখানি অল্প অল্প উজ্জ্বল হইয়াছে। অনেকক্ষণ হইতে জঙ্গু জাগিয়াছেন, বিছানায় শুইয়া তাঁহার কত কি মনে পড়িতেছে। সেও এমনি একটি সকাল বেলা, এইরূপ আধো আলোক আধো অন্ধকারে বসিয়া জুমিয়ার সহিত শেস কথা কহিয়াছিলেন। আর সকলই তেমনি আছে, দেয়ালের সেই ধনুর্ব্বাণ তেমনি রহিয়াছে, কেবল সেই যে সে চলিয়া গিয়াছে, আর আসে নাই। জুমিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া দ্বারের দিকে চাহিলেন, বাতাসে বন্ধ দ্বার অল্প অল্প নড়িতেছিল, জুমিয়া গৃহে প্রবেশ করিবার আগে আস্তে আস্তে এইরূপে সে দ্বার নাড়াইত। আজকাল বাতাসে যখন দ্বার এইরূপ নড়ে, তাঁহার মনে হয়, জুমিয়া আসিতেছে। এক একবার ইহা এত সত্য বলিয়া মনে হয়, তিনি জুমিয়া জুমিয়া করিয়া ডাকিয়া উঠেন, কিন্তু দ্বার যেমন বন্ধ তেমনি থাকে, আজও কি মনে হইল, হঠাৎ একবার জুমিয়া জুমিয়া করিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, বাহির হইতে শিকলি বন্ধ ছিল, হঠাৎ দ্বার খুলিয়া গেল, আজ সত্যই জুমিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল—জঙ্গুর অসাড় হৃদয়েও রক্ততরঙ্গ উথলিয়া উঠিল—তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, জুমিয়া কাঁদিয়া পিতার শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। অনেকক্ষণে জলপ্লাবিত চক্ষু জঙ্গু উন্মীলিত করিলেন—দেখিলেন, দুইজন স্ত্রীলোক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। পুত্রবধুকে চিনিতে পারিলেন—কিন্তু সেই ক্ষুদ্র বালিকা এখন এত বড় হইয়াছে যে, তাহাকে সহজে আর চেনা যায় না, তাহার দিকে চাহিয়া তাঁহার দৃষ্টি স্তম্ভিত হইয়া গেল, উথলিত অশ্রু শুকাইয়া পড়িল, তাঁহার সম্মুখে একটি দেবীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান দেখিলেন—তাহার লাবণ্য-জ্যোতিতে তাঁহার অন্ধকার হৃদয় হঠাৎ যেন পূরিয়া গেল, নিরাশ হৃদয় যেন আশাপূর্ণ হইয়া উঠিল—তিনি বলিলেন,—"স্নহার এত বড় হউছে! বাছাডা, কাছে আয়।"

স্নহার তাঁহার নিকটে আসিল। জুমিয়ার পানে চাহিয়া এতদিন তাহার

যে তৃপ্তি হইত, বালিকাকে দেখিয়া তাহার সেইরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ হইল, তাহার নয়নে সেইরূপ আশা দেখিতে পাইলেন—তিনি অতৃপ্ত-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

১৬

বিচার

যে দুইজন নিরপরাধ ভীল অপরাধিরূপে ধৃত হইয়াছে—মাসাবধি পরে আজ তাহাদের বিচার। এ দুইজন ছাড়া ইহার মধ্যে যদি আরও কেহ থাকে,—সেই সন্ধান জন্য এতদিন বিচার বন্ধ ছিল। কিন্তু আর কাহারও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বিচারাসনে রাজা, তাঁহার দুই পার্শ্বে সভাসদ্‌গণ, সম্মুখে সশস্ত্র প্রহরি-বেষ্টিত শৃঙ্খলাবদ্ধ ভীল দুইজন দণ্ডায়মান।

আজ বিচারালয় লোকে লোকারণ্য, কিন্তু কাহারও মুখে কথাটি নাই; কুতূহলী দর্শকবৃন্দ নিঃশব্দে নিস্তব্ধে বিচারের শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। রাজা এখনও একটি কথা কহেন নাই. মন্ত্রী অপরাধীদিগকে যাহা বলিতেছেন, রাজা স্তব্ধ-গম্ভীরভাবে অপরাধীদিগের দিকে চাহিয়া তাহা শুনিতেছেন। রাজার দৃষ্টিতে ক্রোধ কিছুমাত্র নাই, একটা বিষণ্ণ করুণ ভাবে তাঁহার মুখকান্তি সুগম্ভীর, ভীলদিগকে দেখিয়া রাজার তাহাদিগকে দোষী বলিয়া মনে হইতেছে না, তাহাদিগকে তিনি যতই দেখিতেছেন, তাঁহার জুমিয়াকে মনে পড়িতেছে। তাহার সেই বলিষ্ঠ মূর্ত্তি, সবল ভাব, অসম সাহস, রাজার প্রতি পরিপ্লুত প্রেমভক্তি সব মনে পড়িয়া যাইতেছে, আর তাঁহার নিজের সেই প্রীতি-বিভাসিত হৃদয়ালোকে জুমিয়ার সমজাতি সমশ্রী অপরাধিগণের মলিন মুখশ্রী পর্য্যন্ত তিনি নির্দ্দোষ বিমল দেখিতেছেন। তিনি যতই দেখিতেছেন যতই ভাবিতেছেন, কিছুতেই তাহাদের অপরাধী বলিয়া মনে হইতেছে না, কেনই বা অকারণে তাহারা রাজহত্যা করিতে যাইবে, তিনি তাহাদের কি করিয়াছেন? পাগল না হইলে বিনা কারণে এরূপ কাজ কেহ করে! তাঁহার পিতামহকে একজন ভীল মারিতে গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার কারণ ছিল। রাজার মুখকান্তি ক্রমশঃই অধিকতর অন্ধকার হইতে লাগিল, মন্ত্রী যখন অপরাধীদিগকে শাসাইতে লাগিলেন, রাজা একাগ্র মনে বলিতে লাগিলেন—

"ভগবান্! সংশয় হ'তে আমাকে দূরে রাখ, যখন ন্যায়ান্যায়-বিচারের ভার দিয়া তোমার প্রতিনিধি করিয়া সংসারে আমাকে প্রেরণ করিয়াছ—তখন তোমার ন্যায়জ্যোতি দিয়া আমার অন্ধ নয়ন ফুটাইয়া দাও, আমি দোষী নির্দ্দোষীকে যেন এক করিয়া না ফেলি, তোমার সত্য করুণা দিয়া আমি যেন বিচার করিতে সমর্থ হই।"

মন্ত্রী যখন বিচার একরূপ শেষ করিয়া মহারাজের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"দেখিতেছেন ত? ইহারা যে অপরাধী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, প্রাণদণ্ডই একমাত্র ইহাদের দণ্ড। এখন মহারাজের অনুমতির মাত্র অপেক্ষা।"—পুরোহিত গণপতি যখন তাহাতে সায় দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"প্রাণদণ্ডই ইহাদের একমাত্র দণ্ড",—বিদূষক যখন তাহার স্বাভাবিক হাস্যভাব গাম্ভীর্য্যে পরিণত করিয়া অস্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, —"তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে,—প্রাণদণ্ড, প্রাণদণ্ড," মহারাজ তখন মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন,—"আগে প্রমাণ, তবে দণ্ডাজ্ঞা. আগেই দণ্ডাজ্ঞা দিতে আমার অধিকার কি?"

মন্ত্রী একটু বিস্মিত হইলেন—বলিলেন,—"মহারাজ, প্রমাণের কি কিছু অভাব দেখিলেন?"

রাজা গম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—"সম্পূর্ণই। উহাদের কি আমার প্রতি তীর ছুঁড়িতে কেহ দেখিয়াছে?"

মন্ত্রী। "না দেখুক, সকল সময় প্রত্যক্ষ দেখিয়া যদি প্রমাণ স্থির করিতে হয়—তবে বিচার একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। যতদূর সম্ভব, তাহাতে উহাদের দোষ সন্দেহ নাই?"

রাজা বলিলেন,—"যতদূর সম্ভব! সম্ভব অসম্ভব আমরা কি বুঝি? পৃথিবীতে সবই অসম্ভব—সবই সম্ভব।"

গণপতি বলিলেন,—"সে কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক।"

মন্ত্রী বলিলেন,—"তা সত্য, কিন্তু আমরা যাহা বুঝি, তাহা লইয়াই ত আমাদের কাজ করিতে হইবে, যতদূর বোঝা গেল, তাহাতে উহাদের প্রতি ত আমার সম্পূর্ণ সন্দেহ হইতেছে।"

রাজা বলিলেন,—"সন্দেহ হইতেছে? কিন্তু সন্দেহ ত আর প্রমাণ নহে।"

মন্ত্রী বলিলেন,—"সন্দেহ প্রমাণ না হউক, প্রমাণ হইতেই এ সন্দেহ!"

রাজার মুখ জ্বলিয়া উঠিল, রাজার প্রথমে যে টলমল ভাবটুকু ছিল, সভাসদ-দিগের প্রতিকূল বাক্যে সেটুকুও রহিল না, বলিলেন—"না, ইহা প্রমাণ নহে,

ইহা যথেচ্ছাচার।"

গণপতি আস্তে আস্তে বলিলেন, "চমৎকার কথা!"

মন্ত্রী ঘাড় হেঁট করিলেন, বুঝিলেন, আজ তিনি ঠিক রাজার মেজাজটা বুঝিয়া চলিতে পারেন নাই, আজ যে প্রমাণের উপর বিচারের নিষ্পত্তি নির্ভর করিতেছে না, তাহা বুঝিলেন; বুঝিলেন এ বিচারের গতি এখন কোন্ দিকে, আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না।

রাজাও সভাসদ্‌দিগের এই গুপ্ত পরামর্শের ফল জানিতে সকলে অধীর হইয়া উঠিল, রাজমুখ হইতে মৃত্যুদণ্ড শুনিবার অপেক্ষায় অপরাধীদিগের হৃৎপিণ্ডে প্রতিক্ষণে রক্তের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতে লাগিল, রাজা অপরাধীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমরা সেদিন আমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলে?"

তাহারা বিচলিত কণ্ঠে বলিল, "না।"

রাজার মুখে একটা জয়ের ভাব প্রকাশ পাইল, এখন যদি কোনক্রমে তাহাদের দোষ প্রমাণ হয় ত সেটা যেন তাঁহারই লজ্জার কথা! তাহাতে যেন তাঁহারই পরাজয়! মহারাজ তীব্রকটাক্ষে মন্ত্রীর দিকে চাহিলেন—যেন এতটা সমস্তই মন্ত্রীর দোষ। মন্ত্রী একটু থতমত খাইয়া বলিলেন—"উহারা যদি দোষী না হইবে, তবে প্রহরীদিগকে দেখিয়া পলায়ন করিল কেন?"

রাজা তীব্রকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"ও সব কথা ত আগেই হইয়া গেছে, উহারা পলায়ন করেন নাই—শীকার দেখিয়া ছুটিয়াছিল।"

মন্ত্রী। অথচ বলিতেছে তীর ছুঁড়ে নাই? শীকার করিতে গিয়া তীর ছুঁড়িবে না—কোন্ কথাটা ঠিক!

রাজা বলিলেন,—"সবটাই ঠিক! তীর না ছুঁড়িয়াও শীকার করা যায়।"

মন্ত্রী। তবে তীর কোথা হইতে আসিল?

মন্ত্রী কয়েদীদিগকে সম্বোধন করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা যদি তীর ছুঁড়িলে না, তবে কে ছুঁড়িল?

উত্তর। তাহা জানি না, একজনকে কেবল আমরা ছুটিতে দেখিয়াছিলাম।

মন্ত্রী। তোমরা একজনকে ছুটিতে দেখিলে—আর সৈনিকেরা দেখিল না! অপরাধিগণ ভড়কিয়া গেল, কোন উত্তর করিল না।

রাজা বলিলেন,—"তাহা উহাদের অপরাধ নহে।"

মন্ত্রী। রাজদ্রোহীকে ছুটিয়া যাইতে দেখিলে—তবে ধরিবার চেষ্টা করিলে না

কেন ?

উত্তর। আমরা মনে করিয়াছিলাম—সে হরিণ শীকারে ছুটিতেছে, সেই সময় একটা হরিণকে ছুটিয়া যাইতে দেখি, তাহা ছাড়া আমরা কিছু জানিতাম না।

রাজা বলিলেন,—"বাস্তবিক তাহারও কোন অপরাধ না থাকিতে পারে, পশুবধ করিতে দৈবাৎ আমার দিকে তাহার বাণ আসিয়া পড়িয়াছিল।"

মন্ত্রী বলিলেন,—"যদি তোমরা নির্দ্দোষ, তবে রাজার প্রহরীদিগের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করিয়াছিলে কেন ?"

উত্তর হইল,—"ধর্ম্মাবতার, আমরা নির্দ্দোষী, বিনা দোষে প্রহরীরা কেন আমাদের বন্দী করিবে ?"

কয়েদীরা এতটা আশ্বস্ত হইয়াছিল যে, অসঙ্কোচে তাহাদের আপত্তির কারণ জানাইয়া দিল। মন্ত্রী কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন—কিন্তু রাজার ইঙ্গিতে নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন।

রাজা বলিলেন,—"কিন্তু সাবধান, এমন কাজ আর করিও না, রাজপ্রহরীর আর কখনও অসম্মান করিলে গুরুদণ্ড পাইবে। ঐ অপরাধে তোমাদের এক মাস কারাবাস, তাহার পর মুক্তি। যাও, প্রহরী, উহাদের লইয়া যাও।"

দাণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া লোকেরা 'থ' হইয়া গেল, কয়েদীদের আহ্লাদে মূর্চ্ছা যাইতে কেবল বাকি রহিল, সভাসদ্দিগের মুখে কোন বাক্য সরিল না। পুরোহিত হরিতাচার্য্য সম্প্রতি তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—তিনি নিস্তব্ধে এতক্ষণ বিচারের শেষ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—রাজার এই অসাধারণ ক্ষমাশীলতায়—এই পুণ্যময় বিচারে উৎফুল্ল হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিবার অভিপ্রায়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

হঠাৎ বিচারালয়ের দ্বারদেশ হইতে একটা জয়ধ্বনি উঠিল। একজন ভীল, দুই হাতে ভিড় ঠেলিয়া উন্মত্ত আহ্লাদে "জয় হউক, জয় হউক", বলিতে বলিতে রাজসিংহাসনের নিকটে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল, রাজা আহ্লাদে বিস্ময়ে মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে নামিয়া শত সহস্র বিস্মিত দর্শকের নেত্রের উপরে, তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। নবাগত ভীল আর কেহ নহে—জুমিয়া। রাজার এই ব্যবহারে হরিতাচার্য্যও বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মুখের আশীর্ব্বাদ মুখেই মিলাইয়া গেল, তিনি স্তম্ভিতভাবে জুমিয়াকে দেখিতে লাগিলেন।

যখন সভাভঙ্গ হইল, দর্শকগণ চলিয়া গেল, জুমিয়া চলিয়া গেল—রাজা

অন্তঃপুরে যাইবার জন্য উঠিলেন—তখন হরিতাচার্য্য নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, আর একটু বসিতে আজ্ঞা হউক, একটি কথা আছে।"

রাজা বসিলেন, মন্ত্রী, বিদূষক ও গণপতিও বসিলেন, হরিতাচার্য্যও আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, ভীলের সহিত এরূপ বন্ধুতা কি রাজোচিত কার্য্য ?"

মহারাজ সহসা ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন—তাহার পর হাসিয়া বলিলেন,—"কেন, তাহাতে ক্ষতি কি ? মহারাজ গুহা ত ইহা রাজানুচিত কার্য্য মনে করেন নাই।"

পুরোহিত বলিলেন,—"কিন্তু আশাদিত্য ভীল কর্ত্তৃক নিহত হইতে গিয়াছিলেন, মনে আছে কি ?"

নাগাদিত্য বলিলেন,—"ঐ ভয়ে যদি জুমিয়ার সহিত বন্ধুতা অনুচিত জ্ঞান করেন, তাহা হইলে আমি নির্ভীক আছি।" পুরোহিতের মুখ গম্ভীর হইল—রাজা হাসিয়া বলিলেন,—"আপনার মুখ দেখিলে কেহ মনে করিবে, আপনি যেন মৃত্যুর সম্মুখে।"

পুরোহিত বলিলেন—"মহারাজ, মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইতে আমার ভয় নাই—আপনার কোন অমঙ্গল না ঘটে, ইহাই আমার ভাবনা।"

রাজা বলিলেন,—"আমার যে অমঙ্গল না ঘটিতে পারে, তাহা আমি বলিতে পারি না—কিন্তু জুমিয়া হইতে কখনই ঘটিবে না।"

পুরোহিত বলিলেন,—"কিন্তু বন্ধুতায় প্রজারা অসন্তুষ্ট হইতে পারে ?"

রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন,—"আমি কাহাকে বন্ধু ভাবি বা না ভাবি, ইহা আমার হৃদয়ের ব্যাপার, রাজা বলিয়া আমার হৃদয়ের স্বাধীনতা আমি প্রজার নিকট বিক্রয় করি নাই।"

পুরোহিত বলিলেন,—"রাজা হইলে তাহাও করিতে হয় বই কি ? রামচন্দ্র কি করিয়াছিলেন ?"

কথাটা রাজার ভাল লাগিল না। কিন্তু সহসা কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, কিছু পরে বলিলেন,—"কিন্তু প্রজারা যখন অসন্তুষ্ট হইবে, তখন সে কথা। এখন পর্য্যন্ত ত তাহা হয় নাই।"

পুরোহিত বলিলেন,—"আমার বিশ্বাস বিপরীত।"

রাজা বলিলেন,—"আপনার বিশ্বাস যাহাই হৌক—কিন্তু আর কেহ ওরূপ বলিবে না,—গণপতি ঠাকুর, আপনার কি মনে হয় ?"

গণপতি বিপদে পড়িলেন, রাজা কি উত্তর প্রত্যাশা করেন, তাহা বুঝিলেন,

তাহার বিপরীত বলিতে সাহস হইল না—একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—
"প্রজারা—অসন্তুষ্ট ত দেখিতেছি না।"

পুরোহিত বলিলেন,—"কিন্তু এই বন্ধুতায় তোমরা কি অসন্তুষ্ট নহ? রাজার এরূপ ব্যবহার কি উচিত বিবেচনা করিতেছ?"

মন্ত্রী রাজার মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার ক্রুদ্ধ কটাক্ষ তাঁহার নিজের নজরে পড়িল—বিচারের সময় তিনি রাজার মতের বিরুদ্ধে চলিয়াছেন—তাঁহার ইচ্ছা, এখন রাজার মনের মত কথা বলেন, তিনি বলিলেন—"রাজা যাহা করেন, তাহাই উচিত।"

পুরোহিত বলিলেন,—"অন্যায় করিলেও?"

রাজা বলিলেন,—"কিন্তু জুমিয়াকে ভালবাসা একটা অন্যায় কাজ নহে।"

পুরোহিত দেখিলেন—তাঁহার মনে যা আছে, যতক্ষণ বলিতে না পারেন—ততক্ষণ রাজা কিছুই বুঝিবেন না—অথচ তাহা খুলিয়া বলিবারও যো নাই—তিনি আর একরূপ করিয়া বুঝাইবার ইচ্ছায় বলিলেন,—"অনেক সময় একটা কাজ আসলে অন্যায় না হইয়াও অন্যায়, যদি—"

রাজার আর ধৈর্য্য রহিল না—এরূপ করিয়া তাঁহার কথার উপর কথা শোনা তাঁহার অভ্যাস নাই—তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কাজটা আসলে অন্যায় না হইলেই হইল—আমি আর কিছু চাই না।" ইহার উপর আর কিছু বলিবার নাই—রাজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

১৭

হরিতাচার্য্য

কমলাবতীর পুত্র ছিল না; সুতরাং তাঁহার কন্যা সত্যবতীর বংশই একলিঙ্গদেবের মন্দিরের অধিকারী। কিন্তু জ্যেষ্ঠানুক্রমে এ অধিকার-প্রাপ্তির নিয়ম নাই। যিনি আজীবন ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে সক্ষম, তিনিই এই মন্দিরের পুরোহিত। এই সন্ন্যাসধর্মাবলম্বী পুরোহিতই ইদররাজদিগের কুলাচার্য্য বলিয়া গণ্য এবং ইঁহাদের গণনা ও পরামর্শ দ্বারাই রাজগণ চালিত হইয়া থাকেন।

মৃত পুরোহিত দেবাচার্য্যের দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন—হরিতাচার্য্য কনিষ্ঠ। নাগাদিত্য শিশুকালে পিতৃ-মাতৃহীন হইলে তাঁহার লালন-পালনের ভার যখন তাঁহার খুল্লতাত বুধাচার্য্যের হস্তে আসে—তাহারই অব্যবহিত পরে দেবাচার্য্যের

মৃত্যু হয় এবং ষোড়শবর্ষের বালক হরিতাচার্য্যের হস্তে উক্ত মন্দিরের পৌরোহিত্যভার আসিয়া পড়ে।

বালক হইলেও হরিতাচার্য্যের পাণ্ডিত্য-যশে ইদর পূর্ণ হইয়াছিল, ইহার মধ্যেই তিনি তাঁহার বংশের শিক্ষণীয় জ্যোতির্বিদ্যা এবং অন্যান্য শাস্ত্রাদিতে দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং বালক বলিয়া ইঁহার মান্যের অভাব ছিল না। রাজ্যভার হস্তে পাইয়াই বুধাদিত্য হরিতাচার্য্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আশাপুরে রাজনিবাস হইলেও ইঁহারা ইঁহাদের মন্দিরে বাস করিতেন, আবশ্যক হইলে রাজ-আহ্বানমাত্র এখানে আগমন করিতেন।

এখন তাঁহাকে ডাকিবার উদ্দেশ্য নাগাদিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ করা। পণ্ডিত আসিলে একটি নির্দ্ধারিত শুভদিনে হরিতাচার্য্যকে একটি নির্জ্জন কক্ষে ডাকিয়া বুধাদিত্য তাঁহার হস্তে নাগাদিত্যের জন্ম-কোষ্ঠী দিলেন, জন্ম-কোষ্ঠী দেবাচার্য্যের দ্বারা গণিত। আচার্য্য কোষ্ঠীচক্র গণনা করিতে লাগিলেন—সহসা গৌরমুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল,—রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখিতেছেন?"

তিনি মুহূর্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—"যৌবনে মৃত্যুভয়! অস্ত্রাঘাত, অস্ত্রাঘাত।"

রাজা বলিলেন,—"সে জন্যই আপনাকে ডাকিয়াছি। গুরুদেব দেবাচার্য্য এই গ্রহ-খণ্ডনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—এখন ইহার প্রতীকার আপনার হাতে—"

আচার্য্যের মুখ অন্ধকার হইল, প্রতীকার কি তাঁহার সাধ্য! তঁাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান যে ইহার পক্ষে নিতান্ত সামান্য! বলিলেন,—"আমি সামান্য মানুষ হইয়া বিধাতার লিপিখণ্ডনে কি সমর্থ হইব?"

রাজা বলিলেন,—"আপনি দেব-পুরোহিত—দেবলিপি-খণ্ডন আপনার সাধ্য না হউক—তাঁহাকে প্রসন্ন করা আপনার সাধ্য; আপনি তাঁহাকে প্রসন্ন করুন, তিনি আপনার লিপি আপনি খণ্ডন করিবেন।"

হরিতাচার্য্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন—রাজা বলিলেন,—"এ গ্রহখণ্ডন যদি সাধ্যাতীত হইত—তবে আপনার জ্যেষ্ঠতাত তাহার ভার লইতেন না,—অবশ্য ইহা সিদ্ধনীয়।"

হরিতাচার্য্য ভাবিলেন—তাহা সত্য,—বলিলেন,—"তাহাই হউক—চেষ্টার ক্রটি হইবে না; পরে যাহা হয়, আপনি জানিতে পারিবেন।

আচার্য্য কোষ্ঠী সঙ্গে লইয়া বাস-গৃহে গেলেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গণনায় প্রবৃত্ত

হইলেন—দেখিলেন, ২০ হইতে ২২ বৎসর পর্য্যন্ত নাগাদিত্যের বিপদের কাল। ২২ বৎসর চৈত্র সংক্রান্তি! অতি ভয়ানক! সাংঘাতিক! অস্ত্রাঘাত! কোথা হইতে অস্ত্র আসিতেছে, স্পষ্ট ধরিতে পারিলেন না। স্ত্রী পুরুষ উভয় হইতেই এ মৃত্যু ভয়, এই পর্য্যন্ত বুঝিলেন, ভাবিলেন—তবে কি বিদ্রোহ? গণনা করিলেন—দেখিলেন—দূরে চিত্রের পার্শ্বে লক্ষ লক্ষ লোকের জনতা-অন্ধকার—কিন্তু রাজার সম্মুখে দুই একটি মনুষ্য! বুঝিলেন, বিদ্রোহ হইতে পারে—কিন্তু তাহাতে রাজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অমঙ্গলের কারণ নাই। রাজার মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ দুই একজন স্ত্রী পুরুষ। ইহার পর আর সব অন্ধকার, আর কিছু তলাইতে পারিলেন না। যদি কারণ সম্যক্ না জানিলেন—তবে প্রতীকার কিরূপে করিবেন? দেখিলেন—এখনও জ্যোতির্ব্বিদ্যা তাঁহার কিছুই শেখা হয় নাই—নিজ বিদ্যার প্রভাবেই জ্যেষ্ঠ-তাত বলিতে পারিয়াছিলেন—গ্রহ খণ্ডিত হইবে, তাঁহার তেমন বিদ্যা কই? তাঁহার অকালে শিক্ষা ভগ্ন হইয়াছে, গুরুর বিদ্যা আয়ত্ত না করিতে গুরু মরিয়াছেন। হরিতাচার্য্য পীড়িত হইলেন, দেখিলেন, তাঁহার উপর লোকের বিশ্বাস কি অসীম, কিন্তু যথার্থ পক্ষে তাঁহার ক্ষমতা কত অল্প! তাঁহার উপর রাজ্য, রাজা—নিজের মঙ্গলামঙ্গল রাখিয়া দিয়াছে, তাঁহার দায়িত্ব কতদূর! হরিতাচার্য্য সেই বিশ্বাসের যোগ্য হইতে সঙ্কল্প করিলেন, রাজপুত্রের জীবন বুধাদিত্য তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন—তাঁহার জীবন-রক্ষা যাহাতে করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ইদরে গিয়া তাহার জন্য প্রতিদিন স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং নিজে রীতিমত আবার জ্যোতির্ব্বিদ্যা-শিক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে দুই চারি বৎসর গেল, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক জ্ঞান লাভ করিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার সন্তুষ্টি জন্মিল না। তিনি চান—রাজজীবনের সমস্ত ঘটনা এবং তাহার কারণ ছবির মত তাঁহার সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিবেন—কিন্তু তাহা দেখিতে পান না, এখনও সমস্ত ধুঁয়া ধুঁয়া, ছায়া ছায়া, আগেকার অপেক্ষা সেই ছায়ার মাত্রা গাঢ়, এইমাত্র উন্নতি। দেখিলেন, গুরুর কৃপা ভিন্ন নিজে শিখিয়া কিছু করিতে পারিবেন না। দক্ষিণের একজন জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের নাম শুনিয়াছিলেন সেইখানে গমন করিলেন। যাইবার সময় বুধাদিত্যকে বলিয়া গেলেন, বালকের মঙ্গল উদ্দেশ্যেই তিনি যাইতেছেন, হয় ত কৃতকার্য্য হইয়াই ফিরিবেন। ৮ বৎসরের বালক নাগাদিত্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন।

হরিতাচার্য্যকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বল্লভাচার্য্য আশ্চর্য্য হইলেন; জিজ্ঞাসা

করিলেন—"তুমি আমার কাছে কি শিখিবে?"

"জ্যোতির্ব্বিদ্যা।"

"জ্যোতির্ব্বিদ্যা তুমি যথেষ্টই জান।"

"তাহাতে আমি সন্তুষ্ট নই। আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ দেখিতে চাই।"

"তাহা হইলে যোগাভ্যাস কর, জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি তোমার যাহা হইবার হইয়াছে; যোগ নহিলে জ্যোতির্ব্বিদ্যার জ্ঞান পূর্ণ হয় না।"

"যোগে কতদিনে সিদ্ধিলাভ হইবে?"

বল্লভ পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন,—"সিদ্ধির কি সীমা আছে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অনন্ত জ্ঞানশক্তির সহিত আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানকে এক করাই যোগ, অনন্তকালে ইহার সিদ্ধি। যোগে তোমাকে এক উন্নতি হইতে আর এক উন্নতিতে, এক সিদ্ধি হইতে আর এক সিদ্ধির পথে অগ্রসর করিবে মাত্র। তবে ইহা বলা যায় যে, যে জ্ঞান তুমি পাইতে ব্যগ্র, ৫ বৎসর যোগাভ্যাস করিলে পাইতে পারিবে, আধ্যাত্মিকভাব তোমাতে প্রচুর বিদ্যমান দেখিতেছি।"

বাল্যকাল হইতে হরিতাচার্য্য সত্যানুরাগী, আত্মজ্ঞানপিপাসিত, অকালে গুরুহীন হইয়া তাঁহার সে পিপাসা মিটে নাই, নিজে রাজগুরু হইয়া গুরুর কর্ত্তব্য অনুসরণ করিতে গিয়া তাঁহার সব আকাঙ্ক্ষা এতদিন নিবৃত্ত রাখিতে হইয়াছিল। তাঁহার কর্ত্তব্য এবং অনুরাগ এখন একই পথে শুনিয়া তিনি আহ্লাদিত হইলেন —বলিলেন, "তবে আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন, আমি যোগ শিক্ষা করিব।"

বল্লভ বলিলেন—"আমি তোমার উপযুক্ত গুরু নহি—তুমি যদি যোগশিক্ষা করিতে চাও ত গুরুর নিকট গমন কর, তিনি গোকর্ণে বাস করেন, কিন্তু এখন তাঁহার দেখা পাইতে হইলে হরিদ্বার যাইতে হইবে, সেখানে তীর্থগমন করিয়াছেন।"

সেইদিনই হরিতাচার্য্য হরিদ্বার যাত্রাব ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বল্লভ বলিলেন,—"কিন্তু একটি কথা, তুমি যে জ্ঞান পাইতে ব্যস্ত, যোগ দ্বারা সে জ্ঞান পাইলে তখন তোমার তাহা কাজে লাগিবে কিনা সন্দেহ! সকল অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য সমান থাকে না, জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে কর্ত্তব্যজ্ঞানও ভিন্নরূপ হইয়া যায়। দেখ অসভ্যদিগের কর্ত্তব্য আত্মপরিবারের মধ্যেই অধিক পরিমাণে অবস্থিত। মানুষ যত জ্ঞানবুদ্ধিতে উন্নত হইয়া সভ্য নাম লাভ করে, ততই প্রতিবাসী হইতে ক্রমে মনুষ্য-সমাজে তাহাদের কর্ত্তব্য স্থাপিত হয়। সেইরূপ

রাজার গ্রহখণ্ডন করিয়া তাঁহাকে জীবনদানই এখন তুমি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছ—কিন্তু যখন তুমি যোগ দ্বারা বিশ্বের মঙ্গলে সর্ব্বমঙ্গল জ্ঞান করিবে, তখন যদি দেখিতে পাও, রাজার প্রাণরক্ষায় বিশ্বের নিয়মভঙ্গ হইতেছে, বিশ্বের যে শক্তিতে রাজার প্রাণ নষ্ট হইতেছে—তাহার উপর হস্তনিক্ষেপ করিলে বিশ্বরাজ্যের অমঙ্গল সাধিত হইবে, তখন তোমার কর্ত্তব্য তোমাকে বিশ্বের নিয়তির পথে দণ্ডায়মান হইতে নিষেধ করিবে, তোমার ইচ্ছা, তোমার জ্ঞান কেবল অনন্ত ইচ্ছা জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া চালিত হইতে চাহিবে। ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্মফলের প্রতি তুমি উদাসীন হইয়া পড়িবে।"

হরিতাচার্য্য স্তম্ভিত হইলেন—যেন কাহার প্রতিধ্বনির মত বলিলেন—"কাজে লাগিবে না!"

বল্লভাচার্য্য বলিলেন,—"সম্ভবতঃ না। কই, এত ত সিদ্ধ পুরুষ আছেন, ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্মে ত তাঁহারা হস্তক্ষেপ করেন না, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন—কিন্তু তাঁহারা যে উদাসীন, অবশ্য ইহার নিগূঢ় কারণ আছে।"

হরিতাচার্য্য খানিকক্ষণ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন—"না দেব, তবে আমি যোগাভ্যাস করিব না। আমি কেবল জানিতে চাই—নাগাদিত্যের নিয়তি-লঙ্ঘনের কোন উপায় আছে কি না,—তাহা কি কেহ বলিয়া দিবেন না?"

বল্লভ বলিলেন—"যাহারা জানিতে পারেন—তাঁহারাই বলিতে সক্ষম। যদি গুরু ইচ্ছা করেন—পারেন। ইহার উপায় কি আছে, আমার সে ক্ষমতা নাই।"

হরিতাচার্য্য তাঁহার উদ্দেশ্যে হরিদ্বার গমন করিলেন, সেখানে গিয়া শুনিলেন—অল্পদিন হইল, তিনি দ্বারকায় গিয়াছেন, হরিতাচার্য্য দ্বারকা যাত্রা করিলেন, সেখানেও তাঁহার দেখা পাইলেন না, শুনিলেন তিনি সেতুবন্ধ-দর্শনে গিয়াছেন। এইরূপে হরিতাচার্য্য তাঁহার অন্বেষণে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল, তবু তাঁহার দর্শন পাইলেন না। তাঁহার দর্শনলাভে নিরাশ হইয়া আর একবার বল্লভ পণ্ডিতের নিকট গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিবেন স্থির করিলেন। যদি দেখার কোন উপায় পান ত ভালই—নইলে সেখান হইতে দেশে ফিরিবেন—এই ভাবিলেন।

পথে কত যোগী সন্ন্যাসীর সহিত সহযাত্রী হইয়া বেড়াইলেন, কেহই তাঁহার

প্রশ্ন-মীমাংসায় সক্ষম হইল না—সকলেই বলে, অদৃষ্ট লঙ্ঘন করা কাহারও সাধ্য নহে।

পথে নাসিক আসিয়া পড়িল, নাসিকে তখন পঞ্চবটীর মেলা,—একদিন মেলা শেষ হইলে তিনি গোদাবরী নদীতে সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করিয়া নদীতীরের একটি নির্জ্জন-স্থানে অগ্নি জ্বালিয়া স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন—তিনি যেখানেই থাকুন, নিয়মিত স্বস্ত্যয়ন করিতে ভুলিতেন না, এই সময় একজন সন্ন্যাসী তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিলেন। ক্রমে স্বস্ত্যয়ন শেষ হইল, অগ্নি নিভিয়া গেল—অগ্নি নিভিয়া লাল অঙ্গারাবশিষ্ট মাত্র রহিল—সন্ন্যাসীর প্রতি তখন তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, সন্ন্যাসী তখন তাঁহার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন। তিনিও মেলা দর্শনে আসিয়াছেন—আগেই হরিতাচার্য্যের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে—নানা কথার মাঝখানে তিনি বলিলেন—"বৎস, তুমি প্রতিদিন স্বস্ত্যয়ন কর কি জন্য ?"

হরিতাচার্য্য আশ্চর্য্য হইলেন, প্রতিদিন যে তিনি স্বস্ত্যয়ন করেন—তাহা সন্ন্যাসী কিরূপে জানিলেন ? বলিলেন—"আপনি কি করিয়া তাহা জানিলেন ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"তুমি স্বস্ত্যয়ন করিতেছ দেখিলাম—তাহা হইতে মনে হইল—প্রতিদিনই স্বস্ত্যয়ন কর, ইহার কোন গূঢ় কারণ নাই।"

তথাপি হরিতাচার্য্যের মন ভক্তিপূর্ণ হইল—তিনি বলিলেন—"ইদর-রাজ নাগাদিত্যের মঙ্গলকামনায় আমি প্রতিদিন স্বস্ত্যয়ন করিয়া আসিতেছি—দেবদেব মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহার গ্রহ খণ্ডন করুন, এই আমার প্রার্থনা।"

তিনি বলিলেন—"বৎস, তুমি কর্ম্মফল মান ?"

হরিতাচার্য্য আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন—"হিন্দু হইয়া কর্ম্মফল মানিব না ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"আমাদের নিয়তি কি কর্ম্মফল ছাড়া আর কিছু ?"

হরি। কিন্তু কর্ম্মফল যিনি দিয়াছেন, ইচ্ছা করিলে তিনি তাহার অন্যথা করিতে পারেন,— বিচারক ইচ্ছা করিলে শাস্তি বন্ধ করিতে পারেন না কি ?

স। পারেন, কিন্তু ন্যায্যরূপে পারেন না। হয় তাঁহার পক্ষপাতিতা করিতে হয়—না হয় নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয়। মানুষ যে অসম্পূর্ণ আত্মা—তাহার ন্যায়ও অসম্পূর্ণ; সেই বিশ্বব্যাপী ন্যায়ের তুলনায় ইহা ধূলিখেলা মাত্র, এখানে কত ন্যায়ের অবিচার নির্ব্বিবাদে পার পাইতেছে, কিন্তু এখানেও যখন বিচারকের ঐরূপ দায়িত্ব, তখন যাহার এই কার্য্যকারণ-নিয়তিতে বিশ্বসংসার চলিতেছে—তুমি কি মনে কর—তোমার পূজা লইয়া তিনি তাঁহার সমস্ত নিয়ম উল্টাইয়া দিতে পারেন ?

হরি। তবে কি স্রষ্টার করুণা নাই?—তিনি কি নিয়তিরূপ বজ্র লইয়া, দীন-হীন সামান্য মনুষ্যের প্রতি কেবলই তাহা শাসাইয়া রহিয়াছেন? তাহাদের তবে নিস্তার কোথা? তিনি মনুষ্যকে পূর্ণজ্ঞান করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, তাহাদের অকর্ম্মের দায়ী কে? তিনিই না কি?

স। এ সমস্তই তাঁহার করুণা। শাস্তির দ্বারা যতই মানুষ সংশোধিত হইতেছে, ততই সে উন্নত জীব হইতেছে। কর্ম্মের জন্য যতই দায়ী হইতেছে, যতই সে কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে, ততই সে উচ্চ হইতেছে। অভিজ্ঞতা জন্মে কিসে? অভিজ্ঞতা কি আমাদের উন্নতির কারণ নহে?

হরি। কিন্তু তবে দেবপ্রসাদ বলিয়া কিছুই নাই? আমরা যখন দুঃখে তাপে কাতর হইয়া ডাকি, আমাদের কি কেহ সাড়া দিবে না? আমরা পাপে তাপে মলিন হইয়া সান্ত্বনা চাহিলে কেহ কি কোলে লইবে না? সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমাদের কি পিতা মাতা কেহ নাই, আমাদের হৃদয়ে প্রেম ঢালিবার কেহ নাই? পাষাণ-নিয়ন্ত্রিত পাষাণ-দেবতা দুঃখক্লেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে টানিয়া চলিতেছেন?

স। না, তাহা নহে বৎস! দেবপ্রসাদ অবশ্যই আছে। কিন্তু সচরাচর আমরা যে উপায়ে তাহা লাভ করিতে যাই—সে উপায় ঠিক নহে। তুমি যদি প্রতিদিন চুরি কর—আর বিচারালয়ে আসিয়া বিচারকের নিকট ক্রন্দন করিয়া তাঁহার প্রসাদ ভিক্ষা কর, তবে কি তাহা পাইতে পার? যদি তাঁহার প্রসাদ পাইতে চাও ত তাঁহার নিয়মের অনুগামী হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কর। একমাত্র কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মফলকে জয় করিতে পার, কেননা, তাঁহার নিয়মানুযায়ী কাজ করিলেই মাত্র তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে পার। বৎস, তুমি জ্ঞানী হইয়া ইহা ভুলিলে কিরূপ? যাহার মঙ্গল করিতে চাও, তাহার কর্ম্মকে সুপ্রসন্ন কর।"

এই সময় অদূরে কে ডাকিল—"গুরুদেব!"

সন্ন্যাসী উঠিলেন—বলিলেন, "যাহা বলিলাম, একটু ভাবিয়া দেখিও, আমি এখন চলিলাম।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন, হরিতাচার্য্যের মনে আরও অনেক প্রশ্ন উদয় হইয়াছিল—কিছুই জিজ্ঞাসা করা হইল না, অতিথি মন্দিরে আসিয়াও আর সে রাত্রে তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, অন্য যাত্রীদিগকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় সকলে আশ্চর্য্য প্রকাশ করিল, বলিল—"উঁহাকে জান না!

উনি সিদ্ধ বাবা।” হরিতাচার্য্য বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন—এতদিন যাঁহার সন্ধানে বেড়াইতেছেন তাঁহার সহিত দেখা হইল—কথা হইল—তবু সব কথা হইল না, ব্যথিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আজ কি আর এখানে আসিবেন ?”

তাহারা বলিল—“না, উঁহার দেখা শীঘ্র পাইবে না—আর এক বৎসর পরে এই মেলায় আবার এইখানে উঁহাকে পাইবে।”

হরিতাচার্য্য তাঁহার অপেক্ষায় আর এক বৎসর বসিয়া রহিলেন। নিয়মিত সময়ে তাঁহার সহিত দেখা হইল, এবার আর তাঁহাকে হতাশ হইতে হইল না, যে জিজ্ঞাসার জন্য তিনি এতদিন দেশে বিদেশে কষ্টক্লেশ তুচ্ছ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন—“বৎস, সে দিন তোমার জিজ্ঞাসা না জানিয়া আমি ত ইহারই উত্তর দিয়াছি। একজন আর একজনের অদৃষ্ট ভাঙ্গিতে গড়িতে পারে না, নিজের কর্ম্ম দ্বারাই মাত্র নিজের নিয়তি ফিরাইতে পারা যায়। একজন কেবল তাহাকে পথ দেখাইতে পারে মাত্র।”

হরিতাচার্য্য বলিলেন—“আপনি সেই পথই দেখাইয়া দিন—যে পথে চলিয়া নাগাদিত্য বিপদুত্তীর্ণ হইবেন।”

সন্ন্যাসী বলিলেন—“পথ একমাত্র আছে—রাজর্ষি জনকের মত নাগাদিত্য যদি আত্মসংযতবান হইতে পারেন, তবেই তিনি বর্ত্তমান অদৃষ্টকে জয় করিবেন। এ নিয়তি তাঁহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। নূতন জীবন লাভ করিলে নূতন কর্ম্মাধীন হইয়া এই নিয়তির খণ্ডন হইতে পারে। দুই উপায়ে নবজীবন পাওয়া যাইতে পারে—এক মৃত্যু দ্বারা, আর এক যোগ দ্বারা, পাপময় প্রবৃত্তির নিধন দ্বারা। যদি তিনি মরিতে না চান তাঁহাকে নিবৃত্তিপথ অবলম্বন করিতে হইবে, তাঁহার অদৃষ্ট এড়াইবার ইহাই মাত্র পথ।”

এতদিন বিদেশে ঘুরিয়া, সন্ন্যাসীর এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া আশাপূর্ণচিত্তে হরিতাচার্য্য স্বদেশাভিমুখী হইলেন। নাগাদিত্যের সেই বালকমুখ যতই মনে পড়িতে লাগিল, তিনি ততই সে মুখে অপার্থিব আলোকজ্যোতি দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় ততই আশ্বস্ত হইতে লাগিল। এই আশা হৃদয়ে ধরিয়া—নাগাদিত্যের বিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি দেশে ফিরিলেন। বিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার প্রকৃত বিপদ্-সম্ভাবনা নাই—সেই জন্যই হরিতাচার্য্য এতদিন বিলম্ব করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি যেদিন দেশে ফিরিলেন—সেইদিনই ভীলদিগের বিচার। সেই বিচারে রাজার

ক্ষমাশীলতা, উদারতা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার আশা এতদূর বর্দ্ধিত হইল যে, তাহার সফলতা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু বিচারশেষে তাঁহার সেই আশালোক সহসা যে ঈষৎ ম্লান হইয়া গেল, সে মলিনতা ক্রমেই দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তিনি বুঝিতে লাগিলেন যে, নাগাদিত্য উদারপ্রকৃতি মহৎচেতা; কিন্তু বিবেচনাশূন্য, আত্মাভিমানী। আত্মাভিমান দ্বারাই তিনি বিশেষরূপ চালিত। তোষামোদকারী সভাসদ্-পরিবেষ্টিত হইয়া দিন দিন তাঁহার এই দোষ বৃদ্ধি হইতেছে, দিন দিন তাঁহার এই প্রবৃত্তিতে আহুতি পড়িতেছে। তাঁহার দোষ-সংশোধনের কেহ নাই, সভায় এক জন এমন কেহ নাই যে, সত্যকথা বলিয়া তাঁহার চোখ ফুটাইতে চেষ্টা করে, তাঁহার যথার্থ বন্ধুতার কাজ করে। আচার্য্য গণপতি—রাজার মঙ্গলই যাঁহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—যিনি রাজাকে চালাইবেন—তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভীরু। পূর্ব্বে আচার্য্য-বংশে যাহা কখনও হয় নাই, এখন তাহাই হইয়া থাকে, রাজা যাহা বলেন, তাহাই তাঁহার শিরোধার্য্য। হরিতাচার্য্য থাকিলে এতদূর ঘটিতে পারিত না, তাঁহার প্রবৃত্তিতে তিনি অন্ততঃ কতক পরিমাণেও বশে রাখিতে পারিতেন, এখন তাহাকে নিবৃত্তিপথে লইয়া যাওয়া একরূপ অসাধ্যসাধন, অদৃষ্ট যেন তাঁহাকে করলস্থ করিবার জন্য চারিদিকে পথ মুক্ত করিয়া আনিতেছে। হরিতাচার্য্য নিরাশ হইয়াও হাল ছাড়িলেন না, নাগাদিত্যের অদৃষ্টের সহিত প্রাণপণ সংগ্রাম-সঙ্কল্প করিলেন

১৮

উপদেশ

প্রভাত হইয়াছে, প্রত্যূষে স্নানান্তে আরতি সমাপন করিয়া হরিতাচার্য্য মন্দিরে আসিয়া বসিয়াছেন, মৃদুল পবন-হিল্লোলে নদীবক্ষে এক একটি বীচি সঞ্চালিত হইয়া ধীরে ধীরে উপকূলে আসিয়া লাগিতেছে, উপকূলে প্রতিহত হইয়া আবার সহস্র তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইয়া সরিয়া সরিয়া পড়িতেছে। হরিতাচার্য্য তাহাই দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন, "এ বিশ্বসংসার সমস্তই বুঝি কালের তরঙ্গ, কালের স্রোত। এ স্রোত চলিয়াছে—চলিয়াছে—কেবলই চলিয়াছে, অদৃষ্ট-নিয়তির উপকূলে প্রতিহত হইয়া খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া কেবল ভাসিয়া চলিয়াছে। এ গতি তাহার কে বা থামায়? কে বা তাহাকে ধরিয়া রাখে?

কোন্ মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিতে—মহান অর্থ পূরণ করিতে কালের এই অনন্তগতি, ভগবান্, তুমিই তাহা জান।"

এখনও ভাল করিয়া রৌদ্র উঠে নাই, নদীতে লোকজনের বেশী ভিড় নাই, মন্দিরের ঘাটের পার্শ্বে কিছু দূরে একটা আঘাটায় কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষমাত্র স্নান করিতেছিল, হরিতাচার্য্য দেখিলেন, তাহাদের মধ্যে একটি বালিকা জল ভাঙ্গিয়া ঘাটের দিকে আসিতেছে। ক্রমে সে ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল, তিনি স্নান করিবার সময় নদীর জলে তিনটি পদ্ম ভাসাইয়া আসিয়াছেন—তাহার দুইটি দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল, একটি নিকটেই ভাসিতেছিল, নিকটেরটিকে সে হাত বাড়াইয়া ধরিল, হরিতাচার্য্য অবাক্-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার স্নিগ্ধ লাবণ্য-জ্যোতিতে প্রভাত যেন ভরিয়া উঠিল, তাঁহার মনে হইল, সে যেন অন্য জগতের অশরীরী একখানি লাবণ্যচ্ছায়া, কোন নন্দন-কাননের একটি সুবাসময়ী ফুল, কোন স্বপ্নের যেন একটি জ্যোতির্ম্ময়ী তারকা মর্ত্ত্যরাজ্যে শরীর ধারণ করিয়াছে। এই সময় গোল উঠিল—রাজা আসিতেছেন—রাজা আসিতেছেন। দূরের আঘাটা হইতে একজন ডাকিল—"রাজা আউছুরে এদিক পানে আয়।" এখনও বালিকার দুইটি ফুল ধরিতে বাকি আছে—জলে শরীর ডুবাইয়া তাড়াতাড়ি সেই দিকে সে পদ বাড়াইল। জলের আঘাত পাইয়া ফুল দুটি একটু সরিয়া গেল, বালিকা ব্যস্ত হইয়া আবার পা বাড়াইল, এই সময় একজন জলে নামিয়া বলিলেন —"সুন্দরি, দাঁড়াও, আমি ধরিয়া দিতেছি।" বালিকা ফুল ধরা ছাঁড়িয়া সচকিতে তাঁহার দিকে চাহিল, দেখিল, পরিচিত স্বরূপ সুন্দর দেবমূর্ত্তি। তাহার পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল—ছেলেবেলা সে তাঁহাকে বর বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিল, মনে পড়িয়া গেল—লজ্জায় মুখটি আরক্তিম্ হইয়া উঠিল, রাজা যখন ফুল দু'টি তাহার হাতে দিলেন, সে আনত-দৃষ্টিতে তাহা ধরিল। এই সময় জুমিয়া ও-ঘাট হইতে এ-ঘাটে আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল,—"সুহাব, রাজাকে প্রণাম কর।" সুহার একটু ইতস্তত: করিয়া জলের উপরেই ঢপ করিয়া মাথাটা নুয়াইল। জুমিয়া বলিল,—"মহারাজ, আমার মেয়ে।"

জুমিয়ার মেয়ে সেই বালিকা। বেল-ফুলের মত সেই ফুটফুটে বালিকাটি এখন পদ্মের মত বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে! রাজার কয়েকজন সভাসদ্ সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিল, দু'একজন জলের উপর দাঁড়াইয়াছিল—জুমিয়ার মেয়ে শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইল—বলিল,—"জুমিয়া, তোমার মেয়ে এত সুন্দরী!"

জুমিয়া কোন কথা কহিল না—কেবল হাসিল। রাজা এতক্ষণ ভাল করিয়া

তাহাকে দেখেন নাই, রাজা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"সত্য! ও হাতে পদ্মগুলিও যেন মলিন হইয়া পড়িয়াছে।" সহসা বালিকার হাত হইতে ফুলগুলি পড়িয়া গেল, রাজা তুলিয়া দিলেন, বালিকা ফুলগুলি লইয়া ধীরে ধীরে তাহার পিতার সহিত অন্য ঘাটে সরিয়া গেল।

পুরোহিত মন্দিরের ভিতর হইতে এ সকল দেখিতে পাইলেন,—একটা অন্ধকার আশঙ্কা তাঁহার মনের মধ্যে ঘনাইয়া আসিল, কা'ল রাজার জন্মতিথির উৎসব আসিতেছে, আজ তাঁহার বিংশ বৎসর পূর্ণ! রাজার ভবিষ্যতের একটা রুদ্ধ দ্বার সহসা যেন তাঁহার চক্ষে উন্মুক্ত হইল! রাজার অষ্টমে শনি-কেতুর দৃষ্টি মনে পড়িয়া গেল, সন্ন্যাসীর কথা—"রাজার সংযতবান্ জিতেন্দ্রিয় হওয়া আবশ্যক—" মনে পড়িয়া গেল, পুরোহিত দুশ্চিন্তা-ভারে প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। রাজা স্নানের পর দেবপ্রণাম করিতে আসিলে হরিতাচার্য্য তাঁহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন,—"বৎস, প্রবৃত্তির মত রিপু আর নাই, তোমার সম্মুখে ভয়ানক বিপদ্ একমাত্র প্রবৃত্তিজয় দ্বারাই তুমি এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইতে পার, সাবধান হও, বৎস, সাবধান হও।"

সহসা এরূপ কথার অর্থ রাজা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইলেন—বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হরিতাচার্য্য বলিলেন,—"বৎস অন্য স্ত্রীর প্রতি আসক্তি মহাপাপ—পুরুষের তাহা হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকাই উচিত—এরূপ প্রবৃত্তি যে দমন না করে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।"

রাজা এইবার তাঁহার কথার অর্থ বুঝিলেন। হরিতাচার্য্যের এই অন্যায় সন্দেহে রাজা বিরক্ত হইলেন, ক্রুদ্ধ হইলেন,—বলিলেন,—"ঠাকুর, আমি বিশুদ্ধ, আপনার ভয়ের কোন আবশ্যক নাই।"

হরিতাচার্য্য বলিলেন,—"নিজের উপর অত বিশ্বাস করিত নাই—আমরা অসম্পূর্ণ জীব, সাবধান না হইলে প্রতি নিমেষেই পদস্খলন হইতে পারে—প্রলোভনের নিকট হইতে আমরা যত দূরে থাকি, ততই ভাল। বৎস, আজ যে বালিকার সহিত তোমাকে দেখিলাম, তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিও, নহিলে অজ্ঞাতে তুমি বিপদের পথে যাইবে, তখন আর ইচ্ছা করিলেও সরিতে পারিবে না।"

বিনা প্রার্থনায় বিনা প্রয়োজনে জোর করিয়া উপদেশ গলায় গুঁজিয়া দেওয়ার মত সংসারে অপ্রীতিকর বস্তু কমই আছে। রাজা পুরোহিত-বাক্যে আর কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। এই সমস্তই তাঁহার বৃথা সন্দেহ মনে

হইল। মনে করিলেন, এত অল্পে যাহারা পাপ সন্দেহ করে, তাহারাই কি ঘোর পাপী নহে? এ কথা মনে করিয়াই সহসা শিহরিয়া উঠিলেন—ইহাতে আচার্য্যের উপর দোষ স্পর্শে! তাড়াতাড়ি মন হইতে এ কথা তাড়াইয়া ভাবিলেন, যাহারা চিরদিন ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস করিতেছে—যাহারা স্ত্রীলোক দেখিলেই সরিয়া যাইতে শিক্ষা করে—তাহারা সহজেই স্ত্রীলোক হইতে আশঙ্কা কল্পনা করিবে, ইহার আশ্চর্য্য কি?

যাহা হউক রাজার মনে হরিতাচার্য্যের কথায় ভাল ফল হইল না।

আকাশের তারা-নক্ষত্রের সহিত মনুষ্য-জীবনের সম্বন্ধ লইয়াই হরিতাচার্য্য ব্যস্ত, শাস্ত্রের কূট যুক্তি লইয়াই হরিতাচার্য্যের মস্তক আলোড়িত; কিন্তু ক্ষুদ্র হৃদয়ের কোন ক্ষুদ্র তারে ঘা পড়িলে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার নিকট লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে—তাহা তিনি বুঝেন না, সে বিজ্ঞানে তিনি অনভিজ্ঞ। সুতরাং সে বিষয়ে কথা কহিতে গিয়া যে তিনি বিপরীত করিয়া বসিবেন—আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু রাজাকে এইরূপ পরামর্শ দান করিয়া তিনি মনে মনে সন্তোষ লাভ করিলেন, রাজা যখন গম্ভীর হইয়া চলিয়া গেলেন, তিনি ভাবিলেন, তাঁহার কথার নিশ্চয়ই গুণ ধরিয়াছে।

১৭

প্রত্যাগমন

স্তব্ধনিশায়, নির্জ্জন মন্দিরে দুইজনের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল।

গণপতি বলিলেন—"দেব, আর প্রতীক্ষা রাখিবেন না, আপনার ভ্রাতা আমাকে শিষ্য করিয়া গিয়াছেন; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সে পদ বজায় রাখুন। আমাকে শিষ্য বলিয়া চরণে রাখুন। গণপতি হরিতাচার্য্যের দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি, হরিতাচার্য্যের অবর্ত্তমানে তাঁহার ভ্রাতার শিষ্য হইয়া তিনি এ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। হরিতাচার্য্য একদিন আসিয়া গণপতির এ অধিকার যে গ্রহণ করিবেন, এ কথা তাঁহার মনেও হয় নাই। এতদিন হরিতাচার্য্যের দেখা নাই, সকলেই ভাবিত, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন তাঁহার অধিকার তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যদি শিষ্য করিয়া যান, তবেই তাঁহার অবর্ত্তমানে গণপতি এই মন্দিরের অধিপতি হইতে পারেন, নহিলে তাঁহার আশা-ভরসা নাই। গণপতির চিরপরিচিত মন্দিরকক্ষাদি আজ আর তাঁহার নহে,

আজ তিনি আপনার রাজ্যে দাঁড়াইয়া পরের অনুগ্রহের ভিখারী, পরিচিতের মধ্যে দাঁড়াইয়া সকলই আজ তাঁহার অপরিচিত। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি ঔৎসুক্য-পূর্ণ-নেত্রে হরিতাচার্য্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; হরিতাচার্য্য বলিলেন,—"পুরোহিতের কাজ তোমার নহে বৎস! পুরোহিতের কর্ত্তব্য রাজার তোষামোদ নহে, তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর করা। তাহা যে না পারে, তাহাকে আমার শিষ্য বলিব কিরূপে?"

গণপতির মুখ মলিন হইয়া গেল—মুখে কথা ফুটিল না। হরিতাচার্য্য আবার বলিলেন—"কেবল শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া লোকের সম্মান উপার্জ্জন করিয়া নিশ্চিন্তে জীবন কাটাইবার জন্যেই একলিঙ্গদেবের পুরোহিত হওয়া নহে। যদি সমস্ত রাজ্যের শুভাশুভের দায়িত্বভার বহন করিতে প্রস্তুত হইতে পার—তবেই পুরোহিত হও।"

গণপতি কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"প্রভু, অবিচার করিবেন না—রাজা যথেচ্ছাচারী হইলে আমাদের কর্ত্তব্যপালনের উপায় কি? তিনি আমাদের উপদেশ গ্রহণ করেন কি?"

পুরোহিত বলিলেন,—"তিনি গ্রহণ করুন না করুন, তাহা তোমার ভাবিবার আবশ্যক নাই, তুমি তোমার কর্ত্তব্য করিয়াছ কি? তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর করিতে কি চেষ্টা করা হইয়াছে?"

গণপতি বলিলেন—"কিন্তু তাহার কিরূপ ফল হয়—আপনি ত দেখিতেছেন, —আপনিই ত পারিতেছেন না।"

হরিতাচার্য্য উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"আমি না পারি—চেষ্টার ত্রুটি করিব না। না পারি, পৌরোহিত্য ত্যাগ করিব।"

খানিকক্ষণ দুইজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। গণপতি খানিক পরে বলিলেন, —"প্রভু, এরূপ শিক্ষা আগে পাই নাই। আমাকে ত্যাগ করিবেন না, আমাকে আপনার মত করিয়া লউন।"

হরিতাচার্য্য খানিকটা ভাবিলেন,—বলিলেন,—"আচ্ছা বৎস, তাহাই হইবে। উপযুক্ত হইতে যদি সমর্থ হও, শিষ্যরূপে গ্রহণ করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তোমার যোগ্যতা দেখিতে ইচ্ছা করি।"

গণপতির যে মনের মত কথা হইল, তাহা নহে উপযুক্ত হইব বলা যেমন সহজ,—উপযুক্ততা দেখান তেমন নহে। তথাপি ইহার উপর কথা কহিতে আর সাহস করিলেন না, বুঝিলেন, তাহা বৃথা। গণপতি তাঁহার নিকট হইতে বিদায়

গ্রহণ করিলেন, তিনিও একটু পরে কক্ষ হইতে উঠিয়া মন্দিরের সোপানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, স্তব্ধ নিশা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত। নিকটের শুভ্র মন্দির শুভ্র প্রাসাদ শুভ্রতর করিয়া, নদীর তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া, পরপারের কৃষ্ণপাহাড়শ্রেণী কৃষ্ণ মেঘের মত সুস্পষ্ট করিয়া, বিশ্বচরাচরকে আপন প্রেমের হাসিতে হাসাইয়া তুলিয়া সেই রজতকৌমুদী কে জানে কোন্ অনন্তের উদ্দেশে ভাসিয়া চলিয়াছে। সেই জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া হরিতাচার্য্য ব্যথিত হইয়া পড়িলেন, কত স্মৃতি তাঁহার হৃদয় দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, বিদেশযাত্রার আগের দিন দুই ভ্রাতায় নদীতীরের একটি নাগকেশর-তলায় বসিয়া যে এইরূপ একটি জ্যোৎস্নাময়ী নিশা যাপন করিয়াছিলেন, তাহা বড় মনে পড়িতে লাগিল। আজ সে নাগকেশরের চিহ্নমাত্র নাই, আর যাঁহার সহিত কথোপকথনে সে রাত্রি মুহূর্ত্তের মত কাটিয়া গিয়াছিল—যাঁহার উৎসাহবাক্য বিদেশে দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাঁহায় কর্ত্তব্যপালনে তাঁহাকে অটল রাখিয়াছিল—সে ভ্রাতা তাঁর কোথায়? আর—আর? সে সব কিছুই নাই। এই দশ বৎসরের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন! কত কি নাই—কত কি নূতন হইয়াছে! সেই কোমল বালক নাগাদিত্য এখন যুবক—যথেচ্ছাচারী রাজা! হরিতাচার্য্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—চারিদিকের এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে সম্মুখের মন্দির-কক্ষটি অনিত্যের চির প্রতিমাস্বরূপ তাঁহার নয়নে বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি বিদেশে যাত্রার সময়—এ কক্ষের যেখানে যাহা দেখিয়া গিয়াছিলেন, আজও তাহাই আছে, কক্ষের কোলঙ্গায় কোলঙ্গায় সেই পুঁথির রাশি—দেয়ালে দেয়ালে সেই দেবদেবীর চিত্রপট, গৃহের মধ্যস্থলে দেবদেব মহাদেব তেমনি অটলভাবে বিরাজিত—এই মন্দিরের কিছু পরিবর্ত্তন নাই। হরিতাচার্য্য একলিঙ্গের সম্মুখস্ত হইয়া প্রণাম করিতে করিতে মনে মনে বলিলেন,—"ভগবান সকলি তোমার ইচ্ছা, ক্ষুদ্র মনুষ্য হইয়া ক্ষুদ্র শক্তি দিয়া কেন তবে অদৃষ্ট অনন্তশক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে এ ইচ্ছা, এ প্রবৃত্তি? যখন বুঝিবার এ প্রবৃত্তি—এ ইচ্ছা রহিয়াছে, তখন অবশ্যই অদৃষ্টের উপর আধিপত্য রহিয়াছে। ভগবান, তুমি জ্ঞান দিয়াছ—ইচ্ছা দিয়াছ—অথচ সে জ্ঞানের কোন সফলতা দেও নাই, অন্ধ অদৃষ্ট দিয়াছ, ইহা কখনও হইতে পারে না। তবে প্রভু, বল দেও—অদৃষ্টকে অধিকারে আনিতে তাহার বল দেও"—করযোড়ে কায়মনে তিনি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; দ্বিপ্রহরের যখন নহবৎ বাজিল, তখন উঠিয়া আরতি আরম্ভ করিলেন।

মজলিস

অন্তঃপুরের খাসমজলিস। বিকালবেলায় সাজসজ্জার পরমহিষী সেমন্তী সখীদিগকে লইয়া প্রমোদগৃহে বসিয়াছেন, যুবতীগণের কাহারও হাতে বীণা, কাহারও হাতে সেতারা, কাহারও কোলে ঢোল, কেহ বা মন্দিরা হাতেকরিয়া বসিয়া আছেন, কেহ বা বসিয়া বসিয়া পায়ে ঘুঙ্গুর পরিতেছেন, এখনি নৃত্যগীতের একটা মহা ধূম পড়িয়া যাইবে, আয়োজন সবই ঠিক, তবু সমস্তই বেঠিক, কোন্ গানটি যে আগে আরম্ভ হইবে, সেই অবধি তাহা ঠিক হইয়া উঠিল না—লক্ষ্মী বলিলেন,—"সেইটে ধর, এ ক্যায়সে পীরিত বঁধূয়া।"

শ্যামা বলিল,—'না, ওটা না, সেইটে, রাধা নামে বাজল বাঁশরী।'

অন্নপূর্ণা বলিল,—'না না, বাজল রুণু-ঝুণু নাচ সহচরী।'

মহিষী বলিলেন,—"আচ্ছা, এইটেই হোক্।"

কিন্তু চম্পা তাহাতে আপত্তি করিলেন,—"ছিঃ ওটা পচা।"

চামেলি বলিলেন,—"তোর কাছে পচেছে, আমাদের পচে নি, ঐটেই হোক।"

এইরূপে কোন্‌টি গাহা হইবে, তাহা লইয়া একের সঙ্গে অপরের সম্পূর্ণ মতের অনৈক্য দাঁড়াইতে লাগিল, অবশেষে সর্ব্ববাদিসম্মত না হউক, একটি গান স্থির করিয়া মহিষী বলিলেন—"ঐটেই গা, আর গোল করিসনে।"

যাহাকে বলিলেন, সে বলিল,—"তুমি আগে গাও।" তখন এক গোল হইতে আর এক গোল পড়িয়া গেল, সকলেই সকলকে বলিতে লাগিল—"তুমি আগে গাও।"

গোলযোগ দেখিয়া মহিষী গাইতে যাইতেছেন, তানপুরায় স্থর দিয়াছেন, এই সময় তাঁর দুই বৎসরের শিশু পুত্র ছুটিয়া আসিয়া তানপুরার কাছে কোলের উপর এক রকম করিয়া স্থান করিয়া লইল। ঘরের কোণে একটা মস্ত পাখোয়াজ ছিল, সেই পাখোয়াজটাকে টানা হেঁচড়া করিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া এতক্ষণ সে কোন প্রকারে এখানে আনিবার উদ্যোগে ছিল, রাণী তানপুরায় স্থর দিবামাত্র পাখোয়াজটা ফেলিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল, তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিল,—"হ্যাঁ গাও।"

কিন্তু ইহাতে কি আর গান হয়? মহিষী তানপুরাটা ফেলিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। শ্যামাকে বলিলেন,—"না, তুই ধর, তোর সঙ্গে

আমি ধরিতেছি।”

শিশু তাহা শুনিয়া আধো আধো স্বরে বলিয়া উঠিল,—“না, তুমি গাও, ধ্যামা গাবে না, হ্যাঁ গাও।”

মহিষী আবার তাহার মুখচুম্বন করিলেন, বলিলেন—“না, ধ্যামা গাবে না, আমার বাপ্প গাবে, গা দেখি একটা।”

বাপ্প বলিল—“না, তুমি গাও।” রাণী বলিলেন—“আচ্ছা, আমি গাইতেছি, তুই আমার সঙ্গে গা।” বাপ্প বলিল—“আচ্ছা।” রাণী গাহিলেন—

মধু বসন্ত সখী রে
যৌবন আকুল—ফুল্ল কুসুমকুল
উলসিত ঢল ঢল শশিকর মাখি রে।
সমীরণ চঞ্চল, যমুনা কল্লোল,
কুহরত কুহু কুহু নিকুঞ্জে পাখী রে।
সুহাসিত যামিনী, সচকিত কামিনী
কম্পিত হিয়াপর ঝর ঝর আঁখি রে।
কাঁহা বৃন্দাবন হরি? কাঁহে মধু বাঁশরী
বাজিল না আজু মরি রাধা রাধা ডাকি রে।

বালক আধো আধো অস্পষ্ট স্বরে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিল, সখীরা আস্তে আস্তে মন্দিরা বাজাইতে লগিল, আস্তে আস্তে তানপুরাতে সুর ধরিল, সেই মধুর সঙ্গীত নিস্তব্ধে সকলে শুনিতে লাগিল। দুই একবার গাহিয়া রাণী থামিলেন, বালক বলিল,—“আর একটা।”

রাণী বলিলেন,—“ঐ শ্যামাকে বল।”

বালক মায়ের গলা জড়াইয়া বলিল,—“না ধ্যামা না, তুমি।”

রাণী বলিলেন,—“তবে শ্যামা রাগ কর্‌বে।”

শ্যামা বলিল,—“হাঁ তবে আমি কাঁদ্‌ব।”

বালক তবুও বলিল—“না, ধ্যামা না, মা গাবে।”

শ্যামা বলিল—“তবে আমি রাগ করলুম, আয় চম্পা, আমরা আর এখানে থাক্‌ব না।”

চাঁপার হাত ধরিয়া শ্যামা গৃহের বাহির হইল, বালক কাঁদিল,—“ধ্যামা ধ্যামা যাবে না।”

শ্যামা বলিল,—"ধ্যামা রাগ করেছে; আর কি ধ্যামা থাকে।"—বলিয়া চাঁপাকে ছুটাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। রাণী বলিলেন—"রকম দেখ, ছেলেকে কাঁদিয়ে গেল।"

তিনি আদর করিতে লাগিলেন, সে আবদার করিতে করিতে তাঁহার কোলে ঘুমাইয়া পড়িল, গানের পালা এইরূপ করিয়া শেষ হইল। সখীরা যন্ত্রাদি যেখানকার যা উঠাইয়া রাখিয়া আপন আপন কাজেকর্ম্মে গেল, রাণী ঘুমন্ত ছেলেকে দাসীর কোলে দিয়া বলিলেন—"তারা গেল কোথায় রে?"

দাসী বলিল,—"কারা মা?"

রাণী বলিলেন,—"শ্যামা আর চাঁপা?"

দাসী বলিল,—"তারা ঐ বাগানে গাছতলায় গিয়া ব'সে আছে।"

রাণীও বাগানে গমন করিলেন, আড়াল হইতে গিয়া একজনের চোখ টিপিয়া ধরিবেন ভাবিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া যাহা শুনিলেন, তাহাতে আর সব ভুলিয়া গেলেন—শুনিলেন, শ্যামা বলিতেছে —"সত্যি, ভীলের মেয়ে এত সুন্দরী, আমাদের রাণী থাক্‌তে রাজা তার রূপে মুগ্ধ?"

চাঁপা বলিল,—"সত্যি না ত কি মিথ্যে? লোকেরা কি বলছে, তা বুঝি জানিস নে?"

" কি বল্ দেখি?"

"ভীলেরা রাজাকে খুন করতে গিয়েছিল, তবুও যে রাজা তাদের ছেড়ে দিলেন, সে আর কিছু না, কেবল ভীলের মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে।"

রাণী আর লুকাইয়া রহিলেন না, নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কি কথা হচ্ছে? তোদের ভীলের মেয়ে কে সুন্দরী?"

রাণীকে দেখিয়া তাহারা জড়সড় হইয়া পড়িল। শ্যামা বলিল,—"ঐ চাঁপা বলিতেছিল।"

চাঁপা বলিল, "মা গো শ্যামা এত জানে, আমি না শুন্‌লে আর কি বলি?"

শ্যামার উপর সে মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেল।

শ্যামা বলিল, "আমি কি বল্‌ছি যে, না শুনে তুই বলেছিস? ও ওর স্বামীর কাছে এ সব কথা শুনেছে।"

চাঁপা একজন সভাসদের পত্নী, রাজমহিষীর কাছে সর্ব্বদাই আসিত। রাণী বলিলেন,—"তা যার কাছে শুনেছিস, তাকে বলিস, এ রকম মিথ্যা কয়ে রাজার

নামে কলঙ্ক দিলে ভাল হবে না। আর তোরা যদি এ কথা বলাবলি করবি তো তোদের মুখ দেখবো না।" রাণী রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

২১

স্বামি-স্ত্রী

সে দিন রাত্রে স্বামি-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। কত দিন হইল, ভীলদিগের বিচার হইয়া গিয়াছে, এত দিন পরে সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা—বৃদ্ধের মত গম্ভীর-ভাবে—রাজার উপর রাজা হইয়া তাঁহার সেই বিচারের বিচার করিতেছিলেন। কথার মধ্যে রাণী কহিলেন,—"দোষীকে শাস্তি না দেওয়া কি অবিচার নহে?"

রাজা বলিলেন,—"দোষের প্রমাণ?"

মহিষী। কেন, যেরূপ অবস্থা—তাহাতে আবার কি প্রমাণ চাও?

রাজা। উহারা যে দোষ একবারেই অস্বীকার করে।

মহিষী বলিলেন,—"রাজার আমাদের খুব বিদ্যে।" দোষ ক'রে আবার কে স্বীকার করে? তা হ'লে কি বিচারালয়ের আবশ্যক হোত?"

রাজা একটু হাসিলেন, বলিলেন, "ভীলেরা মিথ্যা বলে না।"

মহিষী বলিলেন, "না, ভীলেরা মিথ্যা বলে না, যত মিথ্যা আমরাই বলি, আমাদের জন্যই তোমার এই বিচারালয়।"

রাজা দেখিলেন, এরূপে কথা কহিয়া তিনি রাণীর সঙ্গে পারিবেন না—বলিলেন, "আচ্ছা, না হয় আমি দোষীদিগকেই ক্ষমা করিয়াছি। সে ত সুখেরই কথা। দোষীদের লঘু শাস্তির জন্য অন্য সময় তুমি আমাকে কত অনুনয় কর বল দেখি? আজ তোমার স্বভাবে অভাব?"

রাণী দেখিলেন, তিনি হঠিয়া যান, কিন্তু আপাততঃ তাঁহার নিতান্তই ইচ্ছা—রাজার বিচারটা ঠিক হয় নাই, ইহা রাজার মুখ দিয়া স্বীকার করান; সুতরাং ছোট সুন্দর মুখখানি আরো একটু গম্ভীর করিয়া বলিলেন,—

"আমাদের স্ত্রীলোকের প্রাণ, ন্যায়রূপে হউক অন্যায়রূপে হউক—কাহাকেও কষ্ট পাইতে দেখিলে তাহার উপশম করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য—রাজার কর্ত্তব্য এক নহে। এক সময়ে আমরা একজনের সুখ-দুঃখ মঙ্গল-অমঙ্গল ছাড়া ভাবিতে পারি না, তুমি রাজা, সমস্ত রাজ্যের মঙ্গল-অমঙ্গল—সুখ-দুঃখ তোমার হস্তে; সুতরাং রাজ্যের

মঙ্গল রক্ষা করিতে হইলে বিচার-নিয়ম তুমি ভঙ্গ করিতে পার না; একজন দোষীকেও তুমি বিনা শাস্তিতে ছাড়িয়া দিতে পার না।"

রাজা বলিলেন,—"সত্য কথা। কিন্তু এক দিকে আমি যেমন রাজা—অন্য দিকে তেমনি মানুষ। আমার রাজার কর্ত্তব্য আছে, মানুষের কর্ত্তব্য নাই? এক প্রজা হইতে অন্য প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি যখন সিংহাসনে বসি তখন আমি রাজা;—তখন আমি নিয়ম ভঙ্গ করিয়া দোষীকে ক্ষমা করিতে পারি না। কিন্তু আমার নিজের প্রতি যদি কেহ অত্যাচার করে, তাহাকে ক্ষমা করিতে আমার অধিকার আছে; আমি রাজা প্রজার সম্পর্কে; কিন্তু নিজের সম্পর্কে আমি মানুষ, মানুষকে মানুষ ক্ষমা করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছে, তাহাকে আমি যদি শাস্তি দিই—তাহাকে তুমি বিচার বলিতে পার না, তাহা প্রতিশোধ। প্রতিশোধ মনুষ্যের গুণ—ক্ষমা দেবতার। এ সম্বন্ধে আমাকে দেবতা হইতে দাও।"

এ যুক্তির ভুল কোথায়, রাণী ধরিতে পারিলেন না। একটা গর্ব্বময় আহ্লাদে তাঁহার হৃদয় কেবল প্লাবিত হইয়া উঠিল, তিনি তর্ক ভুলিয়া দুই বাহু দিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রাখিলেন—রাজা তাঁহার আহ্লাদ বুঝিয়া হাসিয়া ধীরে ধীরে কপালে চুম্বন করিলেন।

খানিক পরে সহসা রাণী মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, আর একটা কথা শুনিতেছি, কুব্জা না কি রাজমহিষী হইবে, ভীলের মেয়ের রূপে না কি ভুলিয়াছ?"

রাজা মহিষীর অলকগুচ্ছ ধরিয়া ধীরে ধীরে একটু নাড়াইয়া বলিলেন,—"যে ভুলের মধ্যে ডুবিয়া আছি—এইটাই ভাঙ্গুক আগে।"

মহিষী বলিলেন,—"তোমার না ভাঙ্গুক, লোকে যে আমায় ভুল ভাঙ্গাইতে ব্যস্ত।"

রাজা সোহাগ করিয়া বলিলেন,—"লোকগুলা অধঃপাতে যায় না কেন? তাহাদের জীবনে কি আর কাজ নাই?"

রাণী হাসিয়া প্রেমপূর্ণ উথলিত চিত্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—বলিলেন,—"আমার এমন রাগ হয়েছিল? দেখ দেখি, তোমার নামে কি না এই রকম ক'রে বলে।"

রাজা হাসিয়া তাঁহার গাল ধরিয়া টিপিয়া দিলেন। রাণীর সব রাগ গলিয়া জল হইয়া গেল। তিনি সখীদের কথা যাহা শুনিয়াছেন, হাসিয়া গল্প করিতে

লাগিলেন। রাজা শুনিয়া একটু গম্ভীর হইয়া পড়িলেন—কয় মাস পূর্ব্বে পুরোহিত যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল, তাহার পর আবার এই সব! রাজা বলিলেন, "লোক আকাশেও বাড়ী বানাইতে পারে।"

রাণী সোহাগের স্বরে বলিলেন,—"তা বানাক্! তাতে ত আর কারো গায়ে ফোস্কা পড়বে না।"

২২

সঙ্গীত-আহ্বান

কোন কবি গাহিয়াছেন—

"প্রতি দিন শত আঁখি পরে—
কত ফুল ফোটে আর ঝরে,
একদিন একটি সে ফুল,
করি শুধু কবিরে আকুল
বাঁচিয়ে থাকে সে কবিতায়,
অন্যে যবে মৃত্যু-কোলে ধায়।
প্রতিদিন শ্বেত পীত রাঙ্গা
কত শত মেঘ ভাঙ্গা ভাঙ্গা
আকাশে ভাসিছে স্তরেস্তর,
একটি রঙ্গিন শুধু থর
ধরি তায় রাখে চিত্রকর।
ধরামাঝে থাকে সে অমর।
একটি সে মধুর তাকানি
আধো ফোটা দু'একটি বাণী,
কোন্ ক্ষণে কখন্ কে জানে,
কেমনে আসিয়া পড়ে প্রাণে,
কেমনে বাজে গো কানে হায়,
সহসা সে প্রেমে রে ফুটায়।"

মধুর ভাষায় জ্বলন্ত সত্য! একজনের জীবনের পথে কতজন প্রতিদিন আনাগোনা করিতেছে, সে তাহাদের প্রতি চাহিয়াও দেখে না, কিন্তু একদিন

একজনের এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতে একটি সামান্য কথায় তাহার অনন্ত জীবনে যেন বিপ্লব জাগিয়া ওঠে।

রাজা যে কি মুহূর্ত্তে কি মায়ায় পড়িয়া বলিয়াছিলেন, "ও হাতে পদ্মও মলিন হইয়া পড়িয়াছে।" সেই কথাগুলি সেই অবধি সঙ্গীত হইতেও মধুর স্বরে বালিকার কানে বাজিতেছে। সেই কথায় তাহার ছোট্ট প্রাণের মধ্যে একটা নূতনতর সুরের উচ্ছ্বাস তুলিয়াছে।

তাহাকে যে আর কেহ কখনো সুন্দরী বলে নাই, তাহা নহে, বাড়ীর সকলেই তাহাকে সুন্দরী বলে; যে যখন তাহাকে দেখে, সুন্দরী বলে। সম্প্রতি ইদরে আসিয়া অবধি ক্ষেতিয়া ত অষ্টপ্রহর তাহাকে সুন্দরী বলিতেছে, ক্ষেতিয়ার এই অতিরিক্ত স্তুতিবাদ বালিকার নিকট এতই বিরক্তিজনক যে, কেহ সুন্দরী বলিলে বিরক্তির বদলে যে আবার আহ্লাদও হইতে পারে, ইতিপূর্ব্বে তাহার সে জ্ঞান পর্য্যন্ত ছিল না।

আজ তাহার যতই মনে পড়িতেছে, "ও হাতে পদ্মও মলিন"—ততই তাহার হৃদয়ে একটা সুখের উৎস ছুটিতেছে, আর ততই তাহার মনে হইতেছে,—"এ কথা কেন বলিলেন? রাজা কি সকলকে এইরূপ বলেন? ফুলের মত কি কেহ সুন্দরী হয়? এ বুঝি উপহাস?" হউক উপহাস—কি উপভোগ্য উপহাস, এ উপহাস তাহার হৃদয়ে যে নূতন আনন্দ-রাজ্য খুলিয়া দিয়াছে! আজ সে যাহা দেখিতেছে, তাহাতেই তাহার আনন্দ হইতেছে—তাহার প্রতিই তাহার ভালবাসা জন্মিতেছে। অন্য দিন ক্ষেতিয়াকে দেখিলেই সে পালাইবার চেষ্টা করিত, আজ তাহাকে পর্য্যন্ত দেখিয়া সে আহ্লাদ প্রকাশ করিল, তাহার সঙ্গে হাসিয়া গল্প করিতে লাগিল। এমন কি, ক্ষেতিয়া যখন উথলিত হৃদয়ে তাহার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিল, তখনো রাগ না করিয়া বালিকা হাসিমুখে তাহা শুনিতে লাগিল। ক্ষেতিয়া তাহাতে এতদূর আহ্লাদিত, এতদূর আশ্বস্ত হইল, তাহাতে তাহার এতখানি সাহস বাড়িয়া গেল যে, আজ সে অসঙ্কোচে বলিল—"জোয়ানি, মোর গরু-ছাগল তোর হউবে, মোর ঘর তোর হউবে, মুই তোরে শীকার আনি দিবু, মুই তোরে গহনা পরাউব, তুই মোর ঘর করুবি?"

এটা তাহার বিবাহের প্রস্তাব। সুসভ্য ও অসভ্যের প্রথা আর কি এখানে অনেকটা একই রকম। বলা বাহুল্য, সাধারণতঃ অসভ্যদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই, এবং বিবাহে কন্যার সম্মতি আবশ্যক। তবে আজকাল স্থানে স্থানে যে ব্যভিচার দেখা যায়, সে আমাদের সংসর্গের ফল।

বালিকা তখন বড় রাগিয়া উঠিল, বলিল,—"দূর হ তুই" বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল, মায়ের সঙ্গে মিশিয়া ঘরের কাজকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিল, কাজের মধ্যে দশ শ-বার শিশুর মত মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল।

মা বলিলেন,—"এত্তটা বড় হউছে, তবু দেখ না ছেলে মানুষ! যা তোর দাদারে খাওয়ায়ে আয়।" সুহার অন্নব্যঞ্জন লইয়া দাদার কাছে গেল; দাদা খাইতে খাইতে গল্প করিতে লাগিলেন, সে আনমনে শুনিতে লাগিল—শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিল, "ও হাতে পদ্মও ম্লান"—মাঝে মাঝে হৃদয়ে একটা বিদ্যুৎ বহিয়া যাইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে আবার সে নদীতে স্নান করিতে গেল, আগের দিনের মত আঘাটায় নামিল, অনতিদূরেই মন্দিরের ঘাট, আজও জলে কয়েকটি পদ্ম ভাসিতেছে, ঘাটে গিয়া সেই পদ্মগুলি ধরিতে আজো তাহার বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল, কিন্তু কে জানে, হঠাৎ আজ তাহার কেন এ বাধ বাধ ভাব!

বালিকাদিগের হঠাৎ বিবাহের পরদিন যেমন যুবতীর লজ্জার ভাব আসিয়া পড়ে, আগের দিন যে সকল পরিচিত পুরুষের সহিত অসঙ্কোচে কথা কহিয়াছে,—তাহাদের নিকট দিয়া যাইতেও যেমন ঘোমটা না টানিয়া থাকিতে পারে না, সেইরূপ কি এক সঙ্কোচ কি এক লজ্জার ভাবে বালিকা বদ্ধপদ হইয়া দাঁড়াইল। কে জানে কেন, তাহার এ লজ্জা! সে ত শুধু ফুল কুড়াইতে যাইতে চায়—শুধু ফুল তুলিতে? আর কোন কারণে নহে, আর কাহাকে দেখিতে নহে, নিশ্চয়ই নহে, তবে কেন তাহার এত লজ্জা! সে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে, রাজা মন্দির-ঘাটে স্নানে আগমন করিলেন, বালিকার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ঘাটে যাইবে কি—তাড়াতাড়ি সে কূলে উঠিয়া পড়িল। কূলে উঠিয়া একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াইল—তাহার সঙ্গীরা যখন স্নান করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল, তাহাদের সহিত গৃহাভিমুখী হইল।

সেইদিন হইতে প্রতিদিনই সে নদীতে স্নান করিতে যায়, যেদিন রাজাকে দেখিতে পায়, তাহার দেবদর্শনের আনন্দ জন্মে। সেই প্রাণভরা আনন্দ লইয়া মনে মনে সে দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করে, যেদিন রাজা স্নানে না আসেন, সে-দিন ম্লান নিরানন্দ ভাবে গৃহে ফিরিয়া আসে। কিন্তু তাঁহার দর্শনের আনন্দের ন্যায় অদর্শনের এই নিরানন্দও তাহার নিকট উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়, কৃপণের সম্পত্তির মত এই সুখ দুঃখ সে হৃদয়ের নিভৃতে লুকাইয়া ভোগ করে, ইহা ছাড়া এ সম্বন্ধে সে আর কিছু ভাবে না। সে যে রাজাকে ভালবাসিয়াছে, এই ভালবাসাই

যে তাহার সুখদুঃখের কারণ, এ সুখদুঃখ ভোগে তাহার অধিকার আছে কি না, এ ভালবাসা তাহার উচিত কি অনুচিত এ সকল কথা তাহার কখনো মনে আসে না, —কেনই বা আসিবে? দেবতাকে কে না ভালবাসে, কে না তাঁহার দর্শন পাইতে চায়? কিন্তু দেবতাকে ভালবাসিয়া কে আবার সে ভালবাসার ঔচিত্য সম্বন্ধে সমালোচনা করে? সে কথা না কি কখনো কাহারো মনে উদয় হয়?

বালিকার ও-সকল কথা কিছুই মনে আসে না, রাজার দেবমূর্ত্তি সে কেবল সর্ব্বদাই নয়নের উপর দেখিতে পায়। তাহার সেই কথাগুলি কেবল বীণার মতন তাহার কর্ণে বাজিতে থাকে, তাঁহার দর্শন অদর্শনের সুখ-দুঃখ মাত্র সে কেবল তীক্ষ্ণরূপে অনুভব করে, ইহা ছাড়া আর সে কিছু বুঝিতে পারে না, কিছু, ভাবে না। এই বিশুদ্ধ দেবপ্রীতিতে যে কিছু অমঙ্গল ঘটিতে পারে, ইহাতে যে কলঙ্ক লুক্কায়িত থাকিতে পারে, ইহা সে সরল বালিকার বুদ্ধির অতীত, সুতরাং ইহা তাহার মনের ত্রিসীমাতেও পৌঁছে না।

ইহার পর কয়েক মাস চলিয়া গেছে, বালিকাদের কুটীরের নিকটে ভীলগ্রাম যাইবার রাস্তার ধারে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের স্বাভাবিক নিকুঞ্জমধ্যে বালিকা প্রায় রোজই বেড়াইতে আসে, আজও আসিয়াছে। পাহাড়ের একটি অংশ হইতে জল চুঁয়াইয়া এই নিভৃত স্থানে একটি ক্ষুদ্র জলাশয় হইয়াছে, বালিকা সেই জলাশয়ের তীরে আসিয়া বসিল; জলাশয়ের স্ফটিক জলে তাহার মুখখানি প্রতিবিম্বিত হইল। তাহার এলোচুলের রাশি মুখের আশে-পাশে পড়িয়া তাহার চোখ ঢাকিয়া দিতেছিল, বালিকার কি মনে হইল, কে জানে, সে হাতে পাকাইয়া সেই ঘন চুলের রাশ এক রকম করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। অন্য সময় কেহ তাহার চুল বাঁধিয়া দিতে আসিলে, সে ভারী বিরক্ত হইত; মা যদি কোনদিন জোর করিয়া তাহার চুল বাঁধিয়া দিয়া কপালে একখানি আয়নার টিপ বসাইয়া কানে দুটি চাঁপা গুঁজিয়া সাজ-সজ্জা করিয়া দিতেন ত সমস্ত দিন সে মুখ গোমসা করিয়া বসিয়া থাকিত। সাজগোজে তাহার স্বাভাবিক কেমন বিতৃষ্ণা, ছেলেবেলা উল্‌কি পরাইবার নাম করিলে সে মহা কান্নাকাটি জুড়িয়া দিত, সেজন্য এতদিন তাহার উল্‌কি পরা পর্য্যন্ত হয় নাই। তাহা হয় নাই বলিয়া, তাহার বাড়ীর সকলে— বিশেষতঃ তাহার মায়ের বড়ই দুঃখ, এমন সুন্দর রঙ্গে যদি উল্‌কির ফলন না পড়িল, তবে রংই মাটী! কিন্তু আজ বালিকা চুল বাঁধিয়া মাটীর একটা টিপ গড়িয়া কপালে পরিল, দুইটা বাবলার ফুল তুলিয়া কানে দিল—দিয়া জলে মুখ দেখিতে লাগিল; কি জানি দেখিতে দেখিতে কি মনে হইল,—আপন মনে বলিল,—

'সুন্দরী! ছি, এই বুঝি সুন্দর!' বলিয়া টিপটা মুছিয়া বাবলা দুইটা খুলিয়া ফেলিল, চুলগুলি এলাইয়া দিয়া চুপ করিয়া জলাশয়ের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া খানিক পরে সে গুণ গুণ করিয়া গান আরম্ভ করিল, ক্ষেতিয়ার কাছে গানটি শুনিয়া শুনিয়া তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

সখী রে, ক্যাসে বাজাওয়ে কান।
ও নহি রে গীত তান, মুঝ অনুমান!
বাঁশরীকে হিয়া ভরি, নিঠঁর কানাইয়া মরি
অনুখণ সুতীখন হানয়িছে বাণ!
টুটুয়িল্ সরম, আকুলিল মরম
চুর চুর অম্বর প্রাণ!
ও ক্যায়সে নিরদয় কান!

অল্পে অল্পে সেই গানের গুণগুণানি স্পষ্ট হইতে লাগিল; ক্রমে স্বর হইতে রেখাবে, রেখাব হইতে গান্ধারে, গান্ধার হইতে মধ্যমে, মধ্যম হইতে পঞ্চমে, পঞ্চম হইতে ধৈবতে, ধৈবত হইতে নিখাদে উঠিয়া পড়িয়া খেলিতে খেলিতে সেই পাপিয়া-কণ্ঠের সঙ্গীত-লহরী স্তব্ধ অরণ্যের শিরায় শিরায় তরঙ্গিত হইয়া দিক্‌বিদিক্ উথলিত করিয়া তুলিল, বালিকা আপন মনে শুধু গাহিতে লাগিল। সহসা সে চমকিয়া গান বন্ধ করিল। হঠাৎ মনে হইল—জলাশয়ে যেন কাহার ছায়া—ফিরিয়া দেখিল, রাজা তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া। বালিকা বিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইল,—বিস্ময়ে নিস্পন্দ হইয়া একখানি ছবির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজা এখানে একাকী আসেন নাই, সঙ্গে গণপতি। গণপতি বলিলেন,—"দূর হইতে মনে হইতেছিল,—এ কোন দেবকন্যার কণ্ঠধ্বনি স্বর্গ হইতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। সত্য যে এখানে কেহ গাহিতেছে তাহা মনে হয় নাই।"

এই গীতধ্বনিতেই কুতূহলী হইয়া তাঁহারা এখানে আগমন করিয়াছিলেন। রাজা এ কথায় কোন উত্তর করিলেন না, সেই নির্জ্জন নিকুঞ্জে সেই সুন্দরী রমণী-মূর্ত্তি বনদেবীর মত তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল। হরিতাচার্য্যের কথা—রাণীর কথা—তাঁহার মনে পড়িয়া গেল; তিনি মনে মনে বলিলেন—"ভালবাসিবার সামগ্রী বটে।" আর কিছু নহে, শুধু বলিলেন,—"ভালবাসার সামগ্রী বটে।" এ কথা তাঁহার এই প্রথম মনে হইল, তাহার সৌন্দর্য্য তিনি এই প্রথম অনুভব করিলেন। অনেক সময় মিথ্যা ক্রমে সত্য নির্ম্মাণ করে।

সন্দেহ বিশ্বাসের মূল গঠিত করে। এরূপ কথা হয় ত বা রাজার মনেই আসিত না, যদি রাজা না জানিতেন যে, ইহা অন্যের মনে আসিয়াছে।

এই সময় ক্ষেতিয়া কাঠের মোট মাথায় এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অরণ্য হইতে বাড়ী যাইবার সময় বিকালে প্রায়ই সে এখান দিয়া হইয়া যাইত, কেননা, সে জানিত, সুহার বিকালে এখানে থাকে। আজ বালিকার নিকট রাজাকে বনমধ্যে দেখিয়া ক্ষেতিয়ার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল, তীব্রস্বরে সুহারকে বলিল,—"সুহার, বাড়ী যাউবি না ?" অন্য সময় হইলে সুহার তাহাকে একটা ধমক দিয়া উঠিত, কিন্তু আজ কে জানে, কিছু বলিতে সাহস করিল না—আস্তে আস্তে নীরবে তাহার অনুসরণ করিল।—রাজা তাহার পরও কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

২৩

প্রকাশ

কথা আছে প্রণয়ী অন্ধ, যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে দেখিয়া ভালবাসে না। কিন্তু প্রণয়ীর দিব্য চক্ষু ইহাই ঠিক ; সহজে অন্যে যাহা দেখিতে পায় না, প্রণয়ীর নিকট তাহা সুস্পষ্ট। রাজার নিকট ক্ষেতিয়া সুহারকে দেখিয়া বড়ই মুসড়িয়া গেল, তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না— যে, সুহার রাজাকে ভালবাসে। রাজা বালিকাকে যে কোন গুণ-জ্ঞান করিয়াছেন, তাহাতে তাহার সন্দেহ রহিল না, নহিলে এত দেশ থাকিতে রাজার প্রতি তাহার মন পড়িবে কেন! ভীলের চক্ষে সেটা নিতান্তই একটা অসম্ভব ব্যাপার। বালিকা তাহার কথায় যতই বিরক্ত হউক না কেন, কালে তাহাকে যে বিবাহ করিবে, এইরূপ তাহার একটা ধারণা ছিল—কিন্তু আজ সে দমিয়া গেল ; বাড়ী গিয়া তাহার কিছুই ভাল লাগিল না। সন্ধ্যার পর সে বাড়ী হইতে বাহির হইল, শিখরপাড় গ্রামের সেই ভীল গুণী ভীলগ্রামে এখন বাস করেন, তাঁহার নিকট সে যাত্রা করিল। গুণী তাহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া বালিকার সম্বন্ধে যতদূর জানা যায়, আস্তে আস্তে অলক্ষ্যে সব বাহির করিয়া লইয়া, অবশেষে বলিলেন,—"রাজা মেয়েরে গুণ করিয়াছে।" ক্ষেতিয়া তাহাতে একমত হইল। গুণী বলিল,—"জিনিষ জিনিষ —ফুল ফুল, রাজা একদিন মেয়েরে ফুল দিয়াছিল ?" ক্ষেতিয়া তাহার গণনায় বিস্ফারিতচক্ষু হইয়া আশ্চর্য্য প্রকাশ করিল। গুণী বলিল,—"সে গুণ করা

ফুল, তাহাতেই মেয়ে বশীভূত হইয়াছে।" ক্ষেতিয়ার চোখ জলে ভরিয়া আসিল গুণী একটি শিকড় তাহার হাতে দিয়া বলিল,—"ইহা লও; সেই ঘাটে যে ফুল ভাসিয়া যাইবে, সেই ফুলে তিনবার এই শিকড় বুলাইয়া তাহা কন্যাকে দিবে, একদিনে না হউক, প্রত্যহ দিতে দিতে কন্যা বশীভূত হইবে; আর রাজা যে মায়া-ফুল কন্যাকে দিয়াছেন, তাহা কোথায়, খুঁজিয়া পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিবে, গোপনে লইও, যেন কন্যা না টের পায়।"

গুণীর আর কোন গুণ না থাক, মনুষ্যচরিত্র যে কতক পরিমাণে তাহার আয়ত্ত ছিল—তাহাতে সন্দেহ নাই। ভালবাসা দেখাইতে দেখাইতে ক্রমে এক-জন বশীভূত হইবে, এ উপদেশ সাধারণত বিফল না হইবারই কথা। তবে সকল স্থলে যে একই উপদেশ খাটে না, ইহাই মাত্র তাহার বুঝিবার ভুল। যদি তিনি দেখিতেন, বালিকা ভীল নহে,—তাহা হইলে হয় ত এরূপ উপদেশ দিতেন না।

ভীল আহ্লাদিতচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, সমস্ত রাত তাহার ঘুম হইল না, প্রাতঃকালে নদীতীরে গিয়া দেখিল, পুরোহিত স্নান করিতেছেন—তিনি স্নান করিয়া উঠিয়া গেলেন, সে আস্তে আস্তে পূজার ফুলগুলি তুলিয়া লইল, তুলিয়া তাহা মন্ত্রপূত করিল। বালিকা নিয়মিত সময়ে অন্য ঘাটে স্নানে আসিল, তাহার সঙ্গে আর কেহ ছিল না। তাহাকে দেখিয়া ক্ষেতিয়ার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে নিকটে গিয়া সেই ফুলগুলি ধরিল—বালিকা তাহার পানে চাহিল, নয়নে বিরক্তি ভাব প্রকাশ পাইল। ভীল বলিল,—"তুইডার লাগিন আনুছি—তুইডা ফুল ভাল বাস্‌স?"

বালিকা বলিল,—"আমি ফুল ভালবাসি, কে বলিল? এখানেও বিরক্ত করিবি"—বলিয়া ফুল লইয়া সে ছুঁড়িয়া ফেলিল। কাল সে তাহাকে কিছুই বলিতে পারে নাই—আজ তাহার শোধ লইল। ক্ষেতিয়ার মনে বড় কষ্ট হইল, চোখে জল পড় পড় হইয়া আসিল; এমন সময় রাজা স্নান করিতে আসিলেন বালিকা তাহার চোখের জল দেখিতে পাইল না, বালিকা জল হইতে উঠিয়া উপরে গাছের মধ্যে দাঁড়াইল, তাহাকে কেহ না দেখে, সেই যাহাতে দেখিতে পায়, ক্ষেতিয়া তাহা বুঝিল, নিরাশ চিত্তে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল—রাজা স্নান করিয়া চলিয়া গেলেন। সুহার কখন্ চলিয়া গেল, সে উঠিয়া ধীরে ধীরে মন্দিরের কাছ দিয়া ভীলগ্রামাভিমুখে চলিল—আবার সেই যাদুকরের কাছে যাইবে। পুরোহিত তাহাকে ডাকিলেন—তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহার ফুল বালিকা ছুঁড়িয়া উপরে উঠিল। ক্ষেতিয়া দাঁড়াইল। পুরোহিত দেখিলেন,

তাহার মুখে হৃদয়ের গভীর দুঃখ। জিজ্ঞাসা করিলেন—"ক্ষেতিয়া, (পুরোহিত তাহাদের চিনিতেন) ও তোমার কে ?"

ক্ষেতিয়া হাত রগড়াইতে আরম্ভ করিল, খানিক পরে বলিল, "মোর কেউ না, মুইডা বিয়া করুতে চাউল।"

কোথায় অসভ্য ভীল, কোথায় সুন্দরী মোহিনী যুবতী, তাহার এরূপ আকাঙ্ক্ষায় অন্য লোকের হাসি আসিত। কিন্তু পুরোহিত তাহার ঐই দুর্লভ বাসনায় দুঃখিত হইলেন মাত্র ; বলিলেন,—"বৎস, কন্যা তোমাকে বিবাহ করিতে চাহে না বুঝি ?"

ভীল বলিল,—"না।"

তিনি বলিলেন,—"দেখ বৎস, যদি চাঁদকে চাহিয়া না পাও ত তোমার দুঃখ হইবে ? এ বৃথা দুঃখ, এরূপ আকাঙ্ক্ষাই অন্যায়।"

ভীল বলিল,—"মোরে বিয়া করুত না। রাজাডাই সর্ব্বনাশ করুল। রাজাডা ওরে গুণ করুছে।"

ভীলের মুখ রক্তবর্ণ হইল—পুরোহিত বলিলেন,—"কি ?"

সে বলিল,—"রাজাডা তুই—তুইডা ভীলের মেয়ে কেন চাউল ? মন্তর-ফুল দিউস—বনের মধ্যে ঢুঁরিয়া ফিরুস ?"

পুরোহিত বলিলেন,—"বনের মধ্যে !"

ক্ষেতিয়া বলিল,—"হ্যাঁ, বনের মধ্যে ! কাল দেখিনু, দু'জনে বনের মধ্যে।"

"দু'জনে বনের মধ্যে ?"

"হ্যাঁ দু'জনে। রাজা আর পুরাণ পুরুত ঠাকুর।"

"পুরাণ পুরুত ঠাকুর।"

"ঠাকুর, রাজারে বলুস্ তুইডা, মেয়েরে যদি না ছাড়ুবে ত ভাল হউবে না, মোদের ধনে রাজার দৃষ্টি—মোরা কুথায় দাঁড়াই গিয়ে।"

পুরুত ঠাকুর তাহার শাসনের কথা কানে শুনিলেন না, যাহা শুনিলেন—তাঁহার মাথা ঘুরিয়া আসিল। ক্ষেতিয়া চলিয়া গেল, তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কেবল ঐ কথাই ভাবিতে লাগিলেন। বুঝিলেন, রাজাকে সেইদিন যাহা বলিয়াছেন—তাহাতে কোন ফল হয় নাই। আর কিছু বলিলেও যে ফল হইবে, এমনও মনে হইল না, তবে ইহার প্রতীকার কোথায় ? তিনি ব্যথিত হইলেন, উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল, রাণী যদি রাজাকে রক্ষা করিতে পারেন ত তাহাই একমাত্র উপায়। তিনি তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে কথা কহিতে সঙ্কল্প

করিলেন। কিছু পরে গণপতি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, গণপতি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"গণপতি!" গণপতি চমকিয়া উঠিলেন। হরিতাচার্য্য বলিলেন,—"ইতিমধ্যে রাজাকে ভীলকন্যার সহিত বনে দেখা গিয়াছিল?"

হরিতাচার্য্যের সেই ক্রুদ্ধস্বরে গণপতি এতদূর ভীত হইলেন যে, তাঁহার মুখ হইতে কথা নিঃসৃত হইল না। হরিতাচার্য্য বলিলেন,—"আর তুমি তাঁহার সহিত ছিলে, অথচ তাঁহাকে একটি কথা কহ নাই! এই তোমার পৌরোহিত্য?"

গণপতি অর্দ্ধোচ্চারিত ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বলিলেন,—"দেব, কিন্তু—আমি—কিন্তু—রাজা!"

হরিতাচার্য্য বলিলেন,—"আর কিন্তু না, তুমি আমার শিষ্যের উপযুক্ত নহ—আজ হইতে আমি তোমাকে বিদায় দিলাম।"

বলিয়া পুরোহিত মন্দিরের বাহিরে গেলেন। নিরপরাধ গণপতি স্তম্ভিত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

২৪

বিদ্রোহ

ভীলের মেয়ের সহিত রাজাকে একত্র দেখা গিয়াছে, সে কথা রাষ্ট্র হইতে বাকী রহিল না। কথাটা রাজবাটীতেও উঠিল, সখীদের মধ্যে তাহা লইয়া মহা একটা কানাকানি ঘুসাঘুসি চলিতে লাগিল। রাণীর দুঃখে কেহই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে বাকী রাখিলেন না, কেবল যাঁহার দুঃখ, তিনিই এ কথা জানিলেন না, সকলেই তাঁহার কাছে কথাটা প্রকাশের জন্য অস্থির,—অথচ কেহই বলিতে সাহস করে না। অবশেষে কোন রকমে তাঁহার কানেও উঠিল। রুক্মিণী দাসী রাণীর বড়ই প্রিয়, সে তাঁহার বাপের বাড়ীর দাসী, তাঁহাকে মানুষ করিয়াছে, আবার তাঁহার ছেলেকেও মানুষ করিতেছে। সে এ কথা শুনিয়া কোনমতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। একদিন দুপুর বেলা শয়নকক্ষে পালঙ্কে বসিয়া রাণী সেতার বাজাইতেছেন, সে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল। রাণী তাহার ধরণ-ধারণ দেখিয়া বুঝিলেন, তাহার কিছু একটা বলিবার আছে। সেতার রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি রে রুক্মা?"

সে বলিল,—"এ কি শুন্‌তে পাই, রাজা যে ভীলের মেয়ের রূপে মুগ্ধ?"

আবার সেই কথা!

রাণী রাগিয়া বলিলেন,—"কে এ সব কথা উঠায় বল্ দেখি?"

দাসী বলিল,—"উঠাবে আর কে, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে!"

রাণী আরও রাগিয়া গেলেন, বলিলেন, "দেখ, যদি অমন ক'রে বল্‌বি, তোকে এখনি ছাড়িয়ে দেব।"

দাসী বলিল,—"তা ছাড়াবে না কেন? আজ তোমার স্বামিপুত্র হয়েছে, আজ আমি দাসী বই আর কি? যখন কোলে ক'রে মানুষ করেছিলাম, তখন আমি দাসী ভেবে করি নি।"

রাণী অপ্রতিভ হইলেন, বলিলেন,—"অন্যেরা যা বলে বলুক, ও সব কথা তুই বলিস্ কেন?"

দাসী বলিল,—"আরে অবোধ মেয়ে, আমি কি সাধে বলি! তোর ভালর জন্যই বল্‌ছি। রাজার মন যাতে ভাল হয়, এখন থেকে তার উপায় কর, ওষুধ বিষুধ চেষ্টা কর, নইলে পেকে দাঁড়ালে কি সামলাতে পারবি? তুই যদি না কিছু করিস্ ত আমি পুরুত ঠাকুরকে গিয়ে বল্‌ব; এর একটা তন্ত্র-মন্ত্র না কর্‌লে চল্‌বে না।"

রাণী কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, এই সময় একজন দাসী আসিয়া বলিল, "পুরুত ঠাকুর আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন, বারান্দায় আসন দিয়া তাঁহাকে বসাইয়াছি।"

দাসী খবর দিয়া চলিয়া গেল, সেমন্তী রুক্মাকে বলিলেন, "দেখ, তুই যদি পুরুত ঠাকুরকে কি আর কাউকে এ সব কথা ব'লে বেড়াবি, ত তক্ষণি আমি তোকে বাড়ী পাঠিয়ে দেব, খবরদার! এ কথা নিয়ে ঘোঁট ক'রে বেড়াস্ নে।"

দাসী যদিও বুঝিল, রাণীর কথাটা নিতান্তই ভয় দেখান কথা নহে—তাঁহার কথা লঙ্ঘন করিলে সত্যই তিনি তাহাকে মার্জ্জনা করিবেন না, তবুও পুরুত ঠাকুরের নিকট এ কথা প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প সে ত্যাগ করিতে পারিল না। তবে কথাটা গোপনে বলিবে ঠিক করিয়া রাখিল।

রাণী পুরোহিতের নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলে পুরোহিত বলিলেন, —"বৎসে, মঙ্গল হোক, বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?"

রাণী একটু হাসিয়া বলিলেন,—"বিষণ্ণ? না:, বিষণ্ণ না, রাগ ধরেছিল, দাসীগুলোর বাজে কথায় মানুষ কি রাগ না ক'রে থাকতে পারে?"

পুরোহিত একটু হাসিয়া বলিলেন,—"মা আমার বাজে কথা শুনিতে পারেন

না, আমি কিন্তু একটু বিশেষ কাজের কথায় আসিয়াছি, শুনিবার এখন অবসর হইবে কি ?"

রাণী একটু অপ্রস্তুত হইলেন ; বলিলেন—"আপনার কথা শুনিব, তাহার আবার অবসর ! দেখুন—দেখি, আপনি কি বলেন ! সকল সময়েই তাহা শিরোধার্য্য ।"

রাণী উৎসুক হইয়া চাহিলেন, পুরোহিত গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইতে যেন একটু থামিলেন ; আসল কথা, যেরূপ সহজে সে কথা বলিবেন ভাবিয়াছিলেন, —দেখিলেন, বলাটা তত সহজ নহে। একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—"মা, স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, স্বামীকে সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, সে দিকে যেন তোমার লক্ষ্য থাকে।"

রাণী বিস্মিত হইলেন। এই তাঁহার বিশেষ কথা ! ইহা কি রাণী জানেন না ? এই কথাগুলির মধ্য দিয়া পুরোহিতও কি তবে সেই কথাই তাঁহাকে বলিতেছেন ? রাণীর প্রাণে বেদনা লাগিল।

পুরোহিত বলিলেন,—"নাগাদিত্যের প্রতি কুগ্রহের দৃষ্টি দেখিতেছি, রাজা যদি সাবধানে না চলেন ত তাঁহার অমঙ্গল—রাজ্যের অমঙ্গল সন্নিকট।"

রাণী চমকিয়া উঠিলেন ; আর সব কষ্ট তিনি ভুলিয়া গেলেন, বলিলেন,— "কুগ্রহ ! প্রভু, কিরূপে তাহার শান্তি হইবে ?"

রাণী চুপ করিয়া রহিলেন, কিছু পরে বলিলেন,—"দেব, আমি অবলা সামান্য স্ত্রীলোক, আমার কি সাধ্য আমি তাঁহাকে পরিচালিত করি—আপনি এ কথা তাঁহাকে বলুন, তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিন।"

পু। না বৎসে, তাঁহাকে এ কথা কিছু বলিও না, যাহার গ্রহ তাহাকে তাহা জানান বৃথা, তাহাতে বিপরীত ফল ঘটে। মনের মধ্যে আশঙ্কা জন্মাইয়া দিলে সেই আশঙ্কায় গ্রহের দৃষ্টি আরও প্রখর হয়, ভবিতব্য তাহাতে আরও অগ্রসর হইয়া আসে, তাহা ছাড়া আর কিছু ফল হয় না। মা, তুমি আপনাকে সামান্য ভাবিও না, স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে অসাধ্যসাধন করিতে পারে, তোমার এ শুভ ইচ্ছা সাধনে ভগবান্ তোমাকে বল দিবেন।

বলিয়া পুরোহিত উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। রাণী বলিলেন,—"দেব আমাকে বলিয়া দিন, আমি কি করিব, আমার সব অন্ধকার মনে হইতেছে।"

পুরোহিত বলিলেন,—"তুমি তাঁহাকে সত্যের পথে চালিত করিবে, প্রলোভন হইতে দূরে রাখিবে, বুঝিলে—প্রলোভন হইতে দূরে রাখিবে। কিন্তু কি

করিয়া তাহা করিবে, তাহা আমি জানি না, আমা অপেক্ষা তুমি, বৎসে, ভাল বুঝিবে।"

পুরোহিত বিদায় হইলেন, রাণী ভাবিতে লাগিলেন। পুরোহিতের শেষ কথায় তাঁহার অভিপ্রায় সুস্পষ্ট হইয়াছিল—রাজার গ্রহ কি, কাহা হইতে পুরোহিত অনর্থ উৎপত্তির ভয় করিতেছেন, তাহা মহিষী বুঝিলেন, রাণী ব্যথিত হইয়া পড়িলেন, সকলেই এই এক কথা বলিতেছে।

কিন্তু মনের ব্যথা তাঁহার মনেই রহিল। পাছে মনের ব্যথা বাহিরে প্রকাশ পায়, পাছে কেহ মনে করে, রাজার প্রতি তিনি সন্দেহ করিয়াছেন—প্রাণের অশ্রু প্রাণে রাখিয়া তিনি সখীদের সহিত রীতিমত হাসিয়া কথাবার্ত্তা কহিলেন। নিয়মিত সাজসজ্জা করিয়া প্রমোদ উদ্যানে গমন করিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রাজাও প্রতিদিনের মত উদ্যানে আগমন করিলেন। বাগানে ফোয়ারা ছুটিতেছে, গাছে গাছে দীপ জ্বলিতেছে, রাণীর সম্মুখে সখীদের নৃত্যগীত চলিতেছে। রাণী প্রস্ফুটিত ফুল-বৃন্ত বেষ্টিত প্রশস্ত প্রস্তর-বেদীর উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যার আশে-পাশের ফুলের মধ্যে ফুল-রাণীর মত শুইয়া আছেন, এক একটি ফুল দুলিতে দুলিতে তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে। রাজা আসিবার পরও খানিকটা নৃত্যগীত চলিল, তাহার পর তাহারা নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে রঙ্গভূমির অভিনেত্রীদিগের মত একটু একটু করিয়া সরিতে সরিতে ক্রমে বৃক্ষ-নিকুঞ্জের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া সেখানে গান-বাদ্য করিতে লাগিল। সেখান হইতে মধুর গীতধ্বনি কোমলতর মধুরতর হইয়া রাজা-রাণীর কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

সখীরা যখন চলিয়া গেল—রাণীর এতক্ষণকার উথলিত আবেগ তখন আর বাঁধ মানিল না, রাজার কোলে মাথা রাখিয়া রাণী কাঁদিতে লাগিলেন, কি করিয়া রাজা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবেন, রাজা যেন ভাবিয়া অস্থির হইলেন! তিনি বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" বার বার বলিতে লাগিলেন, "আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি?" তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রেমাদরে রাণীর ব্যথা শমিত হইতে লাগিল, হৃদয় দিয়া তাঁহার হৃদয়ের অশ্রু মুছাইতে রাজা প্রয়াসী হইলেন। রাণী যখন দেখিলেন, তাঁহার ক্রন্দনে রাজা কতখানি আকুল সেই আকুলতার মধ্যে কত ভালবাসা, কত মমতা, কত সান্ত্বনা মাখামাখি, তখন রাণীর মনের অন্ধকার ক্রমে একটা আনন্দের আলোকের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

রাণীর বড় বড় চোখের পাতা তখনও অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া উঠিতেছিল, ছোট ছোট ঠোঁট দু'খানি তখনও এক একবার কাঁপিয়া উঠিতেছিল, ধীরে ধীরে এক

একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছিল, মুখের বিষণ্ণতা হৃদয়ের গভীর বিশ্বাসে আরো গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এ অশ্রুজলে, এ গাম্ভীর্য্যে কতখানি মাধুর্য্য, কতখানি আনন্দ প্রকাশ পাইতেছিল! রাত্রের অন্ধকার দূর হইলে প্রথম প্রভাতের যে গাম্ভীর্য্য, গভীর তৃপ্তিতে যে অবসাদ, রাণীর ছোট্ট সেঁউতি ফুলের মত মধুর বিষণ্ণ শুভ্রমুখে রাজা সেই আনন্দের বিষাদ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার হৃদয়ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সোহাগভরে কহিলেন—"সেঁউতি রাণি, বিষণ্ণ হইয়াই কি তুই সৌন্দর্য্য ফুটাইতে চাস?"

রাণী রাজার দিকে চাহিয়া একটু অভিমানের স্বরে বলিলেন,—"এ সব কথা কেন উঠে? আমি শুনিতে পারি না।"

রাজা বুঝিলেন কি কথা। হাসিয়া বলিলেন—"কেন ওঠে, আমিও তাই জিজ্ঞাসা করি।"

রাণী তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিয়া—বড় বড় চোখে একটু তিরস্কারের ভাব পূরিয়া বলিলেন,—"কিন্তু সমস্তটাই কি লোকের দোষ, সত্য কি কিছুই নাই?"

রাজা আশ্চর্য্য হইলেন, তিনিও তিরস্কারচ্ছলে বলিলেন,—"মহিষি!"

মহিষী একটু থতমত খাইয়া একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "না মহারাজ, আমি ও কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি—সব বিষয়ে লোককে উপেক্ষা করিলে কি চলে? রাজা হইয়া তুমি ভীলের সহিত মেশ, বন্ধুর ব্যবহার কর, লোকেরা কেনই বা না নিন্দা করিবে?"

রাজাও তখন একটু গম্ভীর হইলেন, বলিলেন,—"রাজা হইয়াছি বলিয়া আমি ত লোকের দাস হই নাই। আমার মান অপমান আমি নিজে বুঝি, তাহাদের কথায় তাহার মীমাংসা নহে। ধনে যাহারা বড়, তাহাদের আমি প্রকৃত বড়লোক বিবেচনা করি না, গুণেই মানুষ বড়লোক। জুমিয়া আমার সভাসদ্ হইতেও আসলে বড়! ছোট লোকের সহিত আমি বন্ধুত্ব করি নাই।"

মহিষী অধোমুখ হইলেন, বুঝিলেন, রাজা ঠিক বলিয়াছেন, কিন্তু হরিতাচার্য্যের কথা তাঁহার মনে জাগিতেছিল, তাই তবু বলিলেন,—"তবে লোকের কথা আর মিথ্যা হইতেছে কই? ভীল যে সত্যই তোমার এত বন্ধু, তাহা ত আমি জানিতাম না; আমি জানিতাম, তাহারা বাড়াইয়া বলে। একটা সত্য হইলে আর একটাও সত্য হইতে পারে।"

রাজা বলিলেন,—"মহিষি, তুমি আমার নিকট আজ প্রহেলিকা, এ তোমার হৃদয়ের কথা, না মুখের?"

মহিষী বলিলেন,—"কি মনে হয় ?"

রাজা। কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আগে কখনও তোমাকে এরূপ করিয়া বলিতে শুনি নাই,—তাই সমস্তটা একটা হেঁয়ালি বলিয়া মনে হইতেছে।

মহিষী বলিলেন,—"তবে আর প্রহেলিকায় কাজ নাই। মহারাজ, লোকে তোমার নামে মিথ্যা বলে, আমার বড় কষ্ট হয়, তাঁহারা বলিতেছে, ভীলের মেয়ের সঙ্গে তোমাকে বনে একত্র দেখিয়াছে—এ নিন্দা—"

রাণীকে আর কথা কহিতে না দিয়া রাজা একটু অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"মহিষি! তোমাকে আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, সত্যই একদিন ভীলের মেয়ের সঙ্গে বনে হঠাৎ দেখা হইয়াছিল—কিন্তু কি ভয়ানক মিথ্যা নিন্দা!"

রাজা সংক্ষেপে সে দিনকার ঘটনা বলিলেন,—রাণী প্রথমটা চমকিয়া উঠিলেন, —হঠাৎ যেন কেমন ব্যথিত হইলেন,—কিন্তু সে ব্যথা ঠিক অবিশ্বাসের ব্যথা নহে। একটা অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কার ব্যথা। দাসীদের কথা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন,—"লোকে যাহাই বলুক, যাহাতে আমার মনে এ পর্য্যন্ত সন্দেহ নাই ; কিন্তু এইরূপ শুনিতে শুনিতে পাছে তোমাকে কখনও সন্দেহ করিয়া ফেলি, বড় ভয় হয়। মহারাজ, তুমি তাহার পথ দূর কর, আমাকে অঙ্গীকার দেও, ভীলের মেয়ের মুখ আর তুমি দেখিবে না।"

রাণী যাহা বলিলেন,—হৃদয়ের সরল কথা বলিলেন, কিন্তু এই কথায় হঠাৎ রাজা যেন রাগিয়া গেলেন, বলিলেন,—"লোকের কথায় যদি তোমার আমাব উপর হইতে বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া যায় ত সে বিশ্বাস আমি শপথে বাঁধিয়া রাখিতে চাহি না ; স্বতঃ উৎসারিত বিশ্বাস ভিন্ন অন্যরূপ বিশ্বাসের আমি আকাঙ্ক্ষা রাখি না।"

রাজার মনে হইল,—এ সমস্তই পুরোহিতের ষড়যন্ত্র, তিনি এখানে আসিয়াছিলেন, তাহাও জানিতেন। তাঁহার কথায় রাণী এতদূর নীত হইয়াছেন, রাজার তাহা বড়ই খারাপ লাগিল, রাজা গুম হইয়া রহিলেন। রাজার সেই ক্রুদ্ধ ভাবে ক্রুদ্ধ ব্যবহারে রাণীর বিষম আঘাত লাগিল, তিনি কি এমন অন্যায় কথা বলিয়াছেন যে, রাজা তাঁহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারেন। রাণী এতদূর মর্ম্মাহত হইলেন যে, তাঁহার অশ্রুজল বাহির হইল না, স্তম্ভিত বিষাদের ন্যায় তিনি বসিয়া রহিলেন। রাণীর রুদ্ধ যন্ত্রণা রাজা অনুভব করিলেন, কিন্তু তথাপি একটি কথা কহিলেন না। আর কখনও যাহা করেন নাই—সেই বিষণ্ণ কাতর মর্ম্মপীড়িত পত্নীর সম্মুখে বসিয়া নীরব ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া

রহিলেন। গাছের ভিতর দিয়া সন্ধ্যা-তারা আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল; আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, গাছের আড়াল হইতে ধীরে ধীরে মুক্ত আকাশে ভাসিয়া উঠিল, জ্যোৎস্নালোকে ফুলগাছের ছায়া চাঁদের বিষাদের ছায়ার মতই যেন বিছানার উপর পড়িল,—রাজা একটু পরে সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন, মহিষী সেই ছায়ায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনে এরূপ ঘটনা এই প্রথম। তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই প্রথম মনোবিচ্ছেদ। কে যেন বলিতে লাগিল, "তোমাদের এ চিরবিচ্ছেদ, এ বিচ্ছেদ আর কখনও দূর হইবে না।" রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল হইয়া মনের ভিতর মন দিয়া দেখিলেন, তিনি কি রাজাকে সন্দেহ করিতেছেন? দেখিলেন, রাজাকে তাঁহার সন্দেহ নাই,—তবে কেন এরূপ সন্দেহ ভাবের কথা কহিয়া রাজাকে কষ্ট দিয়াছেন? এ ঘটনার জন্য তিনি কি সম্পূর্ণ দোষী নহেন? আবার পুরোহিতের সেই কথা মনে আসিল,—"রাজার অমঙ্গল—রাজার অমঙ্গল—রাজাকে প্রলোভন হইতে দূরে রাখাই রাণীর কর্ত্তব্য।"—রাণীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কি করিতেছেন, কি করিবেন—সমস্তই যেন অন্ধকার সংশয়ের মধ্যে নিহিত; তিনি সেই আঁধার-সমুদ্রের আঁধার তরঙ্গের মধ্যে আত্মহারা, ইহাই অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি রুদ্ধশ্বাস হইয়া উঠিয়া বসিলেন, দেখিলেন, কে একজন যেন কাছে আসিতেছে। রুক্মা তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "রুক্মা, একবার মহারাজকে ডাকিয়া আন।" তাঁহার ভাব দেখিয়া রুক্মার চোখে জল আসিল, সে কথাটি না কহিয়া মহারাজকে ডাকিতে গেল।

২৫

সন্দেহ—সন্দেহ! কেবলই সন্দেহ! রাজা বিরক্ত হইয়া অন্তঃপুরের বাহির হইলেন, রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরের পাশ দিয়া নদীর ধারে আসিয়া পড়িলেন, তোরণ অতিক্রম করিবার সময় প্রহরী বলিল, "মহারাজ, গণপতি ঠাকুর সাক্ষাৎ-প্রার্থনায় আসিয়াছিলেন।"

রাজা বিরক্তভাবে উত্তর করিয়া গেলেন—"কেহ এখন আমার সাক্ষাৎ পাইবে না। কেহ যেন আমাকে খুঁজিতে না যায়।" নদীর ধারে তিনি একটা গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, সুহারমতীর জ্যোৎস্নালোকদীপ্ত সফেন তরঙ্গ তাঁহার

চোখের উপর উথলিত হইতে লাগিল ; নিস্তব্ধ রাত্রে তীরের অন্ধকার গাছপালা— নদীর জ্যোৎস্নাধৌত কালজলে নীলাকাশ—সমস্তই যেন একটা স্বপ্নরাজ্যের বলিয়া মনে হতে লাগিল। তাঁহার হৃদয়ের ক্রুদ্ধ আলোড়িত ভাবের সহিত এই নিস্তব্ধ জগতের কি প্রভেদ ভাব! ধীরে ধীরে রাজার হৃদয় প্রশমিত হইয়া আসিতে লাগিল, ধীরে ধীরে সুষুপ্তির মত তাঁহার হৃদয় জ্যোৎস্না-দৃশ্যের স্তব্ধতায় লীন হইতে লাগিল, ধীরে ধীরে রাজার মনে প্রথম দিনের এই নদীতীরের ঘটনাটি জাগিয়া উঠিল। বাস্তবিক কি সুন্দরী! পদ্মও সে হাতে মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। সে দিন রাজা প্রশংসার মত যে কথা ক'বার কথা ভাবে বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম আজ যেন অনুভব করিয়া বসিলেন। ভাবিতে ভাবিতে রাজা তীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, একেবারে জলের ধারে নামিয়া হঠাৎ একটু হঠিয়া দাঁড়াইলেন, অদূরে নদীব উপরে একটি গাছের তলায় কে যেন বসিয়া। রাজাকে দেখিয়া মূর্ত্তি উঠিয়া দাঁড়াইল,—নিকটে আগমন করিল, রাজা বলিলেন,— "আপনি গণপতি ঠাকুর! এখানে একাকী?"

গণপতি ঠাকুর বিষণ্নস্বরে বলিলেন, —"মহারাজ, আমার আর স্থান কোথা?"

মহারাজ গণপতিকে গুরুর মত ভক্তি না করুন, কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহার সেই বিষণ্ন ভাবে নৈরাশ্যপূর্ণ কথায় ব্যথিত হইলেন—বিস্মিতও হইলেন, বলিলেন,—"কি হইয়াছে?"

গণপতি বলিলেন,—"হরিতাচার্য্য আমাকে মন্দির হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন, আমি আর এখানকার কেহই নই।"

রাজার অপ্রকৃতিস্থ হৃদয় অতি অল্পে আলোড়িত হইয়া উঠিল, ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"কেন?"

গণপতি মৌন হইয়া রহিলেন। রাজা বলিলেন, "শুধু শুধু আপনাকে তাড়াইতে তাঁহার কি অধিকার? আপনি কি দোষ করিয়াছেন?"

গণপতি বলিলেন—"আর কিছু দোষ নহে—দোষ, আপনি আমাকে ভালবাসেন—আমি আপনাকে ভালবাসি!"

রাজা অধীর হইয়া বলিলেন—"ভাল করিয়া বলুন, কি হইয়াছে; আমি আপনাকে ভালবাসি, তাঁহার তাহাতে কি?"

গণপতি বলিলেন—"তিনি চান আমি তাঁহার গুপ্তচর হইয়া আপনার প্রতিদিনকার কথা তাঁহাকে খবর দিই—তিনি চান, আপনার প্রতি কার্য্যে তাঁহার মত সন্দেহ করিয়া আপনার জীবন অসহ্য করিয়া তুলি। তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে,

আপনি ভীল-কন্যার প্রেমে মুগ্ধ, আমি তাঁহার কথায় সায় দিই নাই—আমার এই অপরাধ।"

রাজার অসীম ক্রোধ হইল, খানিক পরে তিনি বলিলেন—"তিনি যেমন মন্দিরগামী, তেমনই থাকুন—আমি আর একটি মন্দির স্থাপন করিব, আপনি তাহার পুরোহিত হইবেন,—আমি আপনাকে কুলপুরোহিতরূপে বরণ করিব।"

পুরোহিত আশাতীত আহ্লাদে বাক্যহীন হইলেন।

রাজা বলিলেন—"এখন আসুন আমার সহিত।" রাজা চলিতে লাগিলেন—গণপতি তাঁহার অনুসরণ করিলেন। দুইজনেই নিস্তব্ধ, স্তব্ধ নিশীথের দুইখানি মেঘের ছায়ার মত ধীরে ধীরে যেন দু'জনে ভাসিয়া চলিয়াছেন। দু'জনেই চিন্তামগ্ন, দু'জনেই নিজের ভাবে অন্যমনা। গণপতি আনন্দের চিন্তায় মুমূর্ষু ক্রোধ ও বিরক্তির ভারে রাজা প্রপীড়িত, তাঁহার ক্রমাগত মনে হইতেছে—"কেবলই সন্দেহ, কেবলই অবিশ্বাস! আমি কি করিয়াছি?"

দূর-শৃঙ্গপরে নীলাকাশে মস্ত চাঁদ, শাল, গাম্ভারী প্রভৃতি বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়া রাস্তার উপর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, জ্যোৎস্নার গায়ের উপর গাছের ছায়া লতাইয়া আছে, ছায়ার গায়ে জ্যোৎস্নার গাযে তৃণ-গুল্মরাশি, বনফুলের রাশি ফুটিয়া রহিয়াছে। সহসা রাজা দেখিলেন—এ সেই তরুপথ, এইখানে বেড়াইতে বেড়াইতে অদূর-নিকুঞ্জে সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন, আর কিছুদূর অগ্রসর হইলেই সেই নিকুঞ্জের ভিতর গিয়া পড়িবেন। সেই সুধা-লহরী ধ্বনি রাজার কানে যেন বাজিয়া উঠিল,—সহসা রাজা চমকিয়া উঠিলেন, নিজের প্রতি নিজের সহসা সন্দেহ উপস্থিত হইল, তিনি বলিলেন—"এ কোথায় আসিয়াছি!" বলিয়াই তিনি ফিরিলেন, তাঁহার মনে হইল, গাছপালার মধ্যে কে যেন বিদ্যুতের মত চলিয়া গেল। সচকিতে চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলেন—কেহই কোথায় নাই,—রাজা দ্রুত পদে বন পার হইলেন। বাড়ী ফিরিয়াই শুনিলেন, মহিষী তাঁহাকে ডাকিয়াছেন।

২৬

প্রমাণ

রুক্মা বাহির-বাটীতে আসিয়া প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহারাজ কোথায়?" প্রহরী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"বেড়াইতে গিয়াছেন?"

রুক্মা বলিল,—"এত রাত্রে—বেড়াইতে গিয়াছেন! যাও, সংবাদ দাও—

মহারাণী ডাকিতেছেন।”

প্রহরী বলিল,—“মহারাণী ডাকিতেছেন—কিন্তু—

রুক্মা রাগিয়া গেল,—বলিল,—“কিন্তু কি রে হনুমান্? তোর দেখছি বড আস্পর্দ্ধা হয়েছে!”

প্রহরী মুস্কিলে পড়িল, বলিল—“কিন্তু—কিন্তু মহারাজ যে যেতে বারণ করেছেন?”

রুক্মা। “মহারাজ যেতে বারণ করেছেন?”

প্রহরী বলিল,—“হ্যাঁ, আমি ঠিক বল্‌ছি রুক্মা—মহারাজ নদীর ধারের দিকে বেড়াতে গেলেন, আর আমাকে হুকুম দিয়ে গেলেন—কেহ যেন তাঁকে খুঁজতে না যায়—রাণীজীকে বলিও—এ দাসের কোন কসুর নেই।”

রুক্মা বলিল,—“বটে, তবে তুই থাক” বলিয়া দ্রুতবেগে সে দ্বার-নিষ্ক্রান্ত হইল।

প্রহরীর কথায় তাহার মনে সন্দেহ জন্মিল। রাজা বাহিরে গিয়াছেন—এত রাত্রে—তা আবার অন্য কাহাকেও নিকটে যাইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন! মনে মনে ভাবিল, “হ্যাঁ রে বোকা মেয়ে, কিছুতেই তুই বুঝিবি নে? কেবল আমাদের উপর রাগ করবি—আর ঘরে বসিয়া কাঁদিবি? তবু একটা উপায় করবি নে? পোড়ারমুখীকে দেশছাড়া না করিলে কোন্ দিন সে যে পাটরাণী হইয়া বসিবে!”

রুক্মা নদীতীরে আসিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে সে রাজার খোঁজ পাইবে—ঠিক বুঝতে না পারিয়া, তীরাভিমুখেই নামিতে লাগিল। হঠাৎ একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, দূরের বৃক্ষতলে যেন দুইটি মনুষ্য-ছায়া!

রুক্মা একটু ঘুরিয়া একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াইল. গাছের ভিতর দিয়া খানিকটা জ্যোৎস্নালোক আসিয়া রাজার মুখে পড়িয়াছিল—রুক্মা রাজাকে চিনিতে পারিল, কিন্তু আর একজনকে সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল না। একটি গাছের ডালের আড়ালে তাহাকে অনেকটা ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল, একেবারে তাহাদের সম্মুখে না গেলে তাহাকে আর ভাল করিয়া দেখিবার যো নাই, কিন্তু রুক্মা তাহার আবশ্যকই বিবেচনা করিল না। যখন দেখিল, এ দুইজনের এক জন রাজা, তখন আর একজন যে কে, তাহাতে তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না। সে নিজে স্বচক্ষে মহারাজের সহিত একত্রে নির্জ্জনে নদীতীরে গাছের তলায়

ভীলকন্যাকে দেখিয়াছে। সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান-লাভে রাগে কষ্টে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে কিছুমাত্র আহ্লাদও যে ছিল না, তাহা নহে। আহ্লাদটা অহঙ্কারের আহ্লাদ, চোরের উপর চুরি করিয়াছে, এই আহ্লাদ।

ইহার পর মুহূর্ত্তমাত্র না দাঁড়াইয়া সে ধীরে ধীরে আবার অলক্ষ্যে উপরে উঠিল, উঠিয়া দ্রুতপদে রাণীর নিকট উপস্থিত হইল।

রাণী আর তখন প্রমোদ-উদ্যানে নাই, তাঁহার শয়নকক্ষে। বাপ্পার ক্রন্দনের কিছু পূর্ব্বেই তিনি প্রাসাদে আসিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় এখন অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে, উপরে আসিয়া তিনি যখন বাপ্পাকে বক্ষে ধারণ করিলেন, তাঁহার চুম্বনে শিশু যখন প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া হাসিয়া হাসিয়া বার বার মা মা করিয়া ডাকিতে লাগিল, আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট দুই হাতে মায়ের মুখখানি ধরিয়া অজস্র চুম্বন করিতে লাগিল, তখন রাণীর হৃদয়ে কষ্টের একটি পবিত্র সান্ত্বনা-স্রোত বহিতে আরম্ভ হইল। বালক তাঁহাকে আদর করিতে করিতে তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়াই আবার ঘুমাইয়া পড়িল, রাণী ঘুমন্ত শিশুকে কোলের কাছে লইয়া বিছানায় শয়ন করিলেন, মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে সে হাসিয়া উঠিতে লাগিল, দু একবার মা মা করিয়া ডাকিয়া উঠিল, মায়ের চুম্বন-স্পর্শ পাইয়া আবার নিশ্চিন্ত নীরব হইয়া গেল। রাণী তাহার ঘুমন্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া তাহার এই ভালবাসা হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিতে লাগিলেন, এই অনুভবে সন্ধ্যাবেলার দুঃখ বহু দিনের বিস্মৃত কষ্টের মত প্রশান্ত হইয়া আসিল। তাঁহার হৃদয়ে রাজার প্রতি অভিমানের আর তখন স্থান রহিল না। যতই তিনি সন্তানের প্রতি স্নেহদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন, যতই সে মুখে রাজার আকৃতি দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় সেই স্নেহ হইতে রাজার স্নেহে লীন হইতে লাগিল। রাজা যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি তখন একেবারে ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয় অভিমান শূন্য হইল, তাঁহার প্রেম—তাঁহার ভালবাসাই তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, —আর ভাবিতে লাগিলেন, "ছি ছি, আমি কি করিয়াছি—মিছামিছি তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছি—তিনি হয় ত ভাবিয়াছেন—আমি তাঁহাকে সন্দেহ করি, কেন আমি এমন কাজ করিলাম! রাজাকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহার মার্জ্জনা ভিক্ষার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার প্রেম প্রকাশের উৎসাহে এতক্ষণকার দুঃখ-তাপ মগ্ন হইয়া পড়িল। এই সময় রুক্মা আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণী বলিলেন,—"মহারাজ কোথা ?" রুক্মার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে

মনে মনে যাহা ভাবিতেছিল, মুখেও তাহাই বলিল। বলিল,—"আরে অবোধ মেয়ে—এখনও বুঝিবি নে? পোড়ামুখীটা যে পাটরাণী হইয়া বসিবে? রাজা তাহার কাছে—এই আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতেছি।"

রাণীর মুখে আর কথা সরিল না, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও তাঁহার সাহস হইল না, জগৎ-সংসার কেবল তাঁহার চারিদিকে প্রবল বেগে ঘুরিয়া উঠিল। তিনি শিশুকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন, ধরিয়া একটা ঘর্ণঝটিকার সহিত যুঝা-যুঝি করিতে লাগিলেন। রুক্মা তাঁহাকে নানারূপ পরামর্শ, নানারূপ উপদেশ দিতে দিতে খানিকটা কান্নাকাটি করিল, অবশেষে মহারাজকে আসিতে দেখিয়া চলিয়া গেল।

রাজা যখন ধীরে ধীরে পালঙ্কে আসিয়া বসিলেন, তখনও রাণী জাগিয়া। কিন্তু নিদ্রিতের মতই নিস্তব্ধভাবে শুইয়া রহিলেন। রাজা দেখিলেন, রাণী ঘুমাইয়া। গৃহ এমন উজ্জ্বল দীপালোকিত নহে যে, তাহার মুখ স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু সেই অস্পষ্ট মলিন আলোকে তাঁহরে ঘুমন্ত মুখে একটি অতি ম্লান-সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছে। প্রশান্ত ললাট কি যেন একটি কষ্টের ছায়ায় রেখাযুক্ত, মুদিত কোরক সদৃশ নয়ন-পুট যেন অশ্রুভারে অবসন্ন হইয়াই মুদিত. ওষ্ঠাধর কি যেন করুণভাবে ঈষৎ বিকম্পিত। রাজা বুঝিলেন, তিনি কি অন্যায় করিয়াছেন, এই কুসুম-কোমল হৃদয়ের প্রতি কি করিয়া তখন অত কঠোর আঘাত দিয়াছিলেন, নিজেই যেন বুঝিতে অক্ষম হইলেন, তাঁহার সেই বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কেমন যেন তাঁহার নিজেকে দোষী বলিয়া মনে হইতে লাগিল; গুরুতর দোষী মনে হইতে লাগিল। তিনি যেন প্রতারক, কি প্রতারণা করিয়াছেন—তাহা তিনি জানেন না, জানিতে সাহসও নাই, তবু যেন প্রতারক। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন—তাঁহার মনে হইল, সে পবিত্র মুখ স্পর্শ করিতে যেন তাঁহার অধিকার নাই। তিনি শুধু একদৃষ্টে সেই মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার দৃষ্টি এত স্থির হইয়া পড়িল যে, রাণী যে নয়ন খুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিতেছেন—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, তিনি শুধু চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার স্থির দৃষ্টিতে ক্রমে সে মুখ আর একরূপ হইয়া পড়িল, ক্রমে যেন একেবারে পরিবর্তন হইয়া গেল, এ কাহার মুখ? আকাশের মত নীলের মধ্যে কাল চ'খের তারা, এ কার? স্বচ্ছ বিষণ্ণ মুখের মধ্যে কাহার এ মুখের ছায়া? সেমন্তী সেমন্তী, তুমি কে? তুমি কি? —রাজা ধীরে ধীরে সেই চক্ষে চুম্বন করিলেন, —রাণীর স্তম্ভিত অশ্রু-রাশি সহসা উথলিয়া উঠিল, রাজা স্বপ্নোত্থিতের ন্যায়

চমকিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাকে ডাকিয়াছিলে ?"

রাণী কথা কহিলেন না। তখন যে ভাবে ডাকিয়াছিলেন, এখন আর সে ভাব নাই। অনুতাপের অশ্রু ফেলিয়া মার্জ্জনা চাহিবার জন্য তখন ডাকিয়াছিলেন—কিন্তু এখন কে অপরাধী ? রাজাকে যখন ভীলকন্যার মুখ দেখিতে বারণ করিয়াছিলেন—তখন সন্দেহ করিয়া সে প্রার্থনা করেন নাই, কিন্তু এখন ? এখন অভিমান, সোহাগের অভিমান নহে, এখন সন্দেহের অভিমানে তাঁহার হৃদয় ভারাক্রান্ত। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডাকিয়াছিলে ?"

রাণী গর্ব্বিতস্বরে বলিলেন,—"ডাকিয়াছিলাম, কিন্তু তখন জানিতাম না, কোথায় ছিলে ?"

রাজা বলিলেন,—"কোথায় ছিলাম ?"

রাণী। যেখানে ভাল লাগে ?

রাজা। নিজেই ত জানি না, কোথায় ভাল লাগে ?

রাণী বিস্মিত হইলেন, বলিলেন,—"কেন, ভীলকন্যা"—এতক্ষণ রাজার হৃদয়ে একটা দোষের ভাব—অনুতাপের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল,—রাণীর এই কথায় তাহা দুর হইল। এই সন্দেহে—এই মিথ্যা অপবাদে তাঁহার হৃদয় বিষাক্ত—ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি নির্দ্দোষ, কিন্তু নিজের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিতে তাঁহার গর্ব্বিত হৃদয়ের অপমান মনে হইল, তিনি কেবল ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন—"মহিষি, এ সব কথা শুনিতে আমার অবসর নাই, আমার কাজ আছে, চলিলাম আজ রাত্রে হয় ত আসিতে পারিব না।"

রাজা চলিয়া গেলেন—মহিষীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। রাণীর মর্ম্মবেদনায় তাহার এই উত্তর—এই ব্যবহার ? একটা সান্ত্বনার কথা কহিয়া, একবার আদর করিয়া রাজা যদি কহিতেন, সব মিথ্যা, তাহা হইলে কি তাহার এই সন্দেহ, এই যন্ত্রণা নিমেষে অন্তর্হিত হইত না ? তবে কি সত্য—সবই কি সত্য ? তাহার প্রতি আর ভালবাসা নাই ? সমস্ত হৃদয় প্রাণ যাহার চরণে ঢালিয়া রাখিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে কি একটা মমতার কথাও আর পাইবার আশা নাই ?

রাণী অসহ্য মর্ম্মবেদনায় আকুল হইয়া সমস্ত রজনী কাঁদিয়া অতিবাহিত করিলেন, পরদিন তাঁহার সেই গভীর বিষাদে একটি উদাস ভাবের ছায়া পড়িল। তিনি আর রাজাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। ভাবিলেন,—"হউক, যাহা হইবে, হউক।" মাঝে মাঝে কেবল হরিতাচার্য্যের কথা রাণীর মনে পড়িতে

লাগিল,—"রাজার অমঙ্গল।" কি অমঙ্গল? ভীলকন্যা রাজমহিষী হইবে, এই কি অমঙ্গল? ইহা রাজারও অমঙ্গল নহে, রাজ্যেরও অমঙ্গল নহে—একমাত্র তাঁহারই অমঙ্গল, রাজার স্নেহ—প্রেম হারাইলে একমাত্র তাঁহারই ক্ষতি; ইহাতে অন্যের কি? তিনি বুঝিলেন, হরিতাচার্য্য তাঁহার কষ্ট নিবারণ অভিপ্রায়ে তাঁহাকে সাবধান করিবার জন্যই ঐরূপ বলিয়াছেন। ইহাতে আর কাহারও অমঙ্গল হইতে পারে না।

গভীর ভালবাসায় আঘাত পাইলে—মর্ম্ম-যন্ত্রণায় আকুল হইলে—যে শূন্যময় অন্ধকারে মগ্ন হইয়া হৃদয় কোন দিকে আর আলোককণাও দেখিতে পায় না, সেই নিরালোক, শূন্য-সমুদ্রে আত্মহারা হইয়া রাণী ভাবিলেন—"আমি কে? আমার আবার মঙ্গল-অমঙ্গল কি? হউক, যাহা হইবার হউক, ভীলকন্যা রাজমহিষী হইবে, হউক!"

২৭

পরামর্শ

রুক্মার কাছে হরিতাচার্য্য সকল কথাই শুনিলেন, রাজার আচরণ, রাণীর মনের কষ্ট, অথচ ইহার প্রতীকারের প্রতি অনাস্থা—সকলই শুনিলেন। হরিতাচার্য্য দেখিলেন, ভবিতব্য অক্ষত পদক্ষেপে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে, তাহাকে বুঝি আর বাধা দেওয়া যায় না। তিনি রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া কহিলেন—

"মা, ইচ্ছা করিয়া কেন এ কষ্টভোগ করিতেছ?"

রাণী বলিলেন—"সাধ করিয়া কে কষ্টভোগ করে?"

পুরো। তবে কেন তুমি ইহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতেছ না? তুমি এইরূপ ঔদাস্যভরে থাকিলে যে সব যায়।

রাণী। ঔদাস্যভরে থাকিতে পারিলে ত আমার ভাল। কেন, নিষ্কাম হইতে আপনারাই উপদেশ দেন।

পুরো। মা, দুঃখ ভোগ করা কি নিষ্কাম হওয়া? দুঃখ দূর করাই নিষ্কাম হইবার উপায়।

রাণী। লোকের দুঃখ দূর করা, কিন্তু নিজে ভোগ করা।

পুরো। না, মঙ্গল নিজের-পরের নাই, যাহাতে নিজের, পরের, বিশ্বসংসারের

মঙ্গল হয়—তাহাই আমাদের করণীয়। নিষ্কাম হইলে পরের মঙ্গলের সহিত নিজের চূড়ান্ত মঙ্গল সাধিত হয়—তাই নিষ্কাম ধর্ম্ম এত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সুতরাং মঙ্গল অভিপ্রায়ে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই নিষ্কাম হইবার উপায়,—কর্ম্মে উদাসীনতা জড়তা মাত্র, তাহা কর্ম্মহীনতা নহে।

রাণী। কিন্তু আমার কি সাধ্য, আমি জগতের মঙ্গল করি? কি আমার কর্ত্তব্য, আমি কি করিয়া বুঝিব? আমি সম্মুখে যে গরীবকে দেখিতেছি—তাহাকেই আগে দান করিতে ইচ্ছা হয়; সত্য বটে, সংসারের সেই দানের আরও যোগ্য পাত্র আছে, কিন্তু তাই ভাবিয়া সেই দান তুলিয়া রাখাই কি আমার কর্ত্তব্য? আমার নিজের মঙ্গলে আর একজনের অমঙ্গল, রাজার মঙ্গলে রাজ্যের অমঙ্গল, আমি রাজ্যের মঙ্গল করিতে গেলে রাজা কষ্ট পান। আমি স্ত্রী, রাজার কষ্টমোচন করাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য।

পুরোহিত স্তব্ধ হইলেন, কিছু পরে বলিলেন—"মহিষি, স্বামীর মঙ্গলসাধনই স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি যাহা করিতেছ, তাহাতে কি তাঁহার মঙ্গল হইতেছে? তুমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তাঁহাকে মোহ হইতে রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য। মোহই অমঙ্গলের মূল, তুমি তাঁহাকে অমঙ্গলের পথে লইয়া যাইবে?"

মহিষী চুপ করিয়া রহিলেন—খানিক পরে বলিলেন—"দেব, কি বলিতেছেন, বুঝলাম না। ভালবাসা যদি মোহ হয়, আমাকে ভালবাসাও ত মোহ? যত দিন সংসারে থাকিবেন, সে মোহ হইতে ত তিনি পার পাইবেন না, তবে কেন আমি তাঁহার পথের কন্টক হইব? আমি রাণী ছিলাম, আর একজন না হয় আমার স্থানে বসিবে!"

পুরো। না দেবি, সংসারী ব্যক্তির পক্ষে সংসারধর্ম্ম মোহ নামের বাচ্য নহে। অধিকারিভেদে ধর্ম্ম। একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে বিবাহ মোহ সুতরাং অধর্ম্ম; কিন্তু সংসারীর পক্ষে বিবাহ মোহ নহে, অধর্ম্মও নহে! তুমি তাঁহার বিবাহিতা পত্নী, তোমাকে ভালবাসা তাঁহার মোহ নহে, কেন না, তাহা হইতে অন্যায় অমঙ্গল উৎপন্ন হইবে না।

রাণী। আর একজনও বিবাহিতা হইবে। রাজা যে এতদিন অন্য বিবাহ করেন নাই, ইহাই ত আশ্চর্য্য!

পুরো। তাহা হইলে ত কোন কথাই ছিল না। কিন্তু এ স্থলে বিবাহ হইবার নহে, রাজা ভীলকন্যাকে ধর্ম্মপত্নী করিতে পারেন না। রাজা নিজের বিরুদ্ধে নিজে কাজ করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে উদ্ধার কর। কেবল তাহাই নহে,

একজন পবিত্র বালিকা কলঙ্কিত হইতেছে—তুমি তাহাকে রক্ষা কর। সে স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোককে না রাখিলে কে রাখিবে?

রাণী। কিন্তু নিজে যদি সে নিজেকে না রাখে ত কাহার সাধ্য তাহাকে রক্ষা করে!

পুরো। সে বালিকা, নিজেকে রক্ষা করা তাহার ক্ষমতা নাই, কিন্তু তুমি চেষ্টা করিলে তাহা পারিবে। রাজার কর্ত্তব্য এখন তোমার পালনীয়।

মহিষী তাহা বুঝিলেন; কিছু পরে বলিলেন,—"করিব—যাহা অদৃষ্টে থাকে করিব, কিন্তু কি করিব?"

পুরো। তাহাকে রাজার দৃষ্টিপথ হইতে দূরে রাখ—আর কিছু করিতে হইবে না।

রাণী বলিলেন,—"কিন্তু—সত্য—যদি—" বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন।

পুরোহিত বলিলেন,—"না মা, আর ইতস্তত করিও না—সময় বহিয়া যাইতেছে।"

পুরোহিত চলিয়া গেলেন। রাণী ভাবিতে লাগিলেন, "সব কি সত্য? কি করিয়া জানিব, এ সমস্ত মিথ্যা নহে? কি করিয়া জানিব, রাজার উপর মিথ্যা সন্দেহ করিতেছি না?" রাজার নিকট হৃদয় খুলিয়া তাঁহার হৃদয়ের কথা শুনিবার জন্য তিনি আকুল হইলেন—সমস্ত মান অভিমান ভুলিয়া তাঁহাকে আজ সব জিজ্ঞাসা করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু এরূপ সঙ্কল্প ত প্রতিদিনই করেন—তবে তাহা পারেন কই?—তাঁহাকে দেখিলে কি যে কষ্টে অভিমানে মুখ বন্ধ হইয়া যায়, সে সঙ্কল্প রাখিতে আর কই পারেন! রাণী দেবতার নিকট বল ভিক্ষা করিলেন, আকুল হইয়া কাঁদিয়া মনে মনে কহিলেন, "দেবদেব মহাদেব, আমার স্বামীর নিকট আমি ঘোর অপরাধী, এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আমায় বল দাও, তিনি স্বামী, তিনি দেবতা, তিনি যাহা করেন, তাহা দোষের হইতে পারে না—ভগবান্ তাঁহার অপরাধ যেন আমার মনে না আসে, আমাকে বল দাও, আমার অপরাধ যেন ভুলিয়া তাঁহার মার্জ্জনা ভিক্ষা পাই।"

নিকুঞ্জপথ

রাজা-রাণী দুইজনেরই হৃদয়ে অসীম বেদনা, প্রাণে ঘোরতর অশান্তি। রাজা ভাবেন, "আমি সন্দেহের কাজ কিছুই করি নাই কেন এ সন্দেহ? যাহাকে অসীম ভালবাসি, তাহার নিকট হইতে এই প্রতিদান?"

এই চিন্তার মধ্যে—এই কষ্টের মধ্যে মাঝে মাঝে সুহারের কথা যদি মনে পড়ে, তাহার সেই ফুলের মত সুন্দর মুখখানি যদি মানস-নয়নে জাগিয়া ওঠে, রাজা যেন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পড়েন—কি যেন একটা লজ্জার ভাবে কি যেন একটা দোষ করিয়াছেন—এই ভাবে নিজের কাজেই নিজে জড়সড় হইয়া পড়েন।

কিন্তু এ অবস্থায় যেমন হইয়া থাকে, অধিকক্ষণ মনে সে ভাব স্থায়ী হয় না। সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ ভাবের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রয়াস জন্মে। যাহাকে দোষ বলিয়া মনে আসিতেছে, তাহাকে অদোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার বাসনা প্রবল হয়—সেই বাসনার অনুযায়ী এমন সকল যুক্তিরাশি আবির্ভূত হইতে থাকে যে, তাহার মধ্যে অল্পক্ষণেব মধ্যেই তাঁহার পূর্ব্বের সঙ্কোচভাব চাপা পড়িয়া যায়। তখন রাজা ভাবেন, "সৌন্দর্য্য দেখিতে কাহার না ভালো লাগে? ফুল দেখিয়া, জ্যোৎস্না দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না প্রীতির সঞ্চার হয়?—কিন্তু তাহাকে কি প্রণয় বলা যায়? না তাহাতে দূষণীয় ভাব কিছু আছে?"

রাজা বুঝেন না, দোষ সৌন্দর্য্যে নহে, দোষ মনে—দোষ বাহিরে নহে, দোষ ভিতরে। সূর্য্যের আলোক সকল সময়েই বিমল উজ্জ্বল নিষ্কলঙ্ক, কিন্তু রঙ্গিন কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে তাহা যেমন বিকৃতবর্ণ হইয়া যায়—বিকারযুক্ত হৃদয় দিয়া দেখিলে সৌন্দর্য্যের বিশুদ্ধতাও তেমনি মলিন হইয়া পড়ে। রাজা যদি ইহা বুঝিতেন, তবে কিরূপ হৃদয় দিয়া তিনি সৌন্দর্য্যকে ভালবাসিতেছেন, তাহাই দেখিতেন; সৌন্দর্য্যকে ভালবাসা দোষের কি না, ইহা বিচার করিতেন না, আত্মপরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তিনি আত্মপরীক্ষা করিতে চাহেন না, তিনি যে নির্দ্দোষ এইটুকুমাত্র তিনি শুধু বুঝিতে চাহেন।

বুঝিতে চাহিলে কি না বুঝা যায়? বুঝিতে চাহিলে প্রকাণ্ড দোষও এমন লঘুতর—ক্ষুদ্রতর আকার ধারন করে যে, সে দোষের আর দোষত্ব থাকে না, রাজা ত সে হিসাবে যথার্থই নিরপরাধ। তাঁহার দোষ এত সামান্য যে, আত্মপরীক্ষারূপ অণুবীক্ষণ দিয়া না দেখিলে তাহার অস্তিত্ব প্রকাশ হইবারই নহে। সুতরাং হঠাৎ

কখনও কখনও রাজার হৃদয়ে উক্তরূপ যে মেঘভার জন্মে, বাসনা-প্রসূত মুক্তির বাতাসে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায়, তখন তাঁহার হৃদয়ের নির্ম্মলতা তিনি অধিক করিয়া উপভোগ করেন, আর রাণীর সন্দেহ শতগুণ অন্যায় বলিয়া বোধ হয়, একটা গর্ব্বিত ক্রোধের ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। কখনও কখনও বা ক্রোধের পরিবর্ত্তে রাণীর প্রতি একটা করুণ মমতার ভাব আসিয়া পড়ে—মনে করেন—"রাণীকে তাঁহার বুঝাইয়া বলা উচিত, এরূপ সন্দেহের কোন কারণ নাই, —লোকের কথায় কেন তাঁহাকে এরূপ সন্দেহ করিতেছেন?"

কিন্তু অন্তঃপুরে আসিয়া যখন রাণীর বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ নয়নে পড়ে, তাঁহার বিষণ্ণ কাতর ভাবে তিনি যখন তীব্র তিরস্কার শুনিতে পান, তাঁহার গর্ব্বিত হৃদয় তখন একটি বিষম সঙ্কোচের ভাবে প্রপীড়িত হইয়া ওঠে। যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, কিছুই আর বলা হয় না, দুই একটি বাজে কথার পর তাঁহার অনেক কাজের কথা মনে পড়িয়া যায়—তিনি বাহিরে চলিয়া যান। যে অশান্তি লইয়া রাণীর নিকট গিয়াছিলেন—তাহা হইতে অধিকতর অশান্তি লইয়া তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসেন—জীবনটা সুখ-শান্তিহীন, শুধু একটা হাহাকার বলিয়া মনে হয়। এই অশান্তি-অন্ধকারের মধ্যে সেই নিস্তব্ধ বাপীতীরের সুন্দর মুখচ্ছবি বড় অধিক করিয়া মনে পড়ে, সেখানকার প্রশান্ততা—সেখানকার সুমধুর নীরবতা অতি গভীররূপে অনুভব করেন—কিন্তু সে দিকে যাইতে আর তাঁহার সাহস হয় না।

রাজা যখন এইরূপে একটি আদরের কথা না কহিয়া—একটা ভালবাসার কথা না কহিয়া চলিয়া যান—রাণীর হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে থাকে। রাণী জগৎসংসার অন্ধকার দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া মনে মনে ভাবেন,—"এ দুঃখে একটা সান্ত্বনা নাই, একটা মমতার কথা পর্য্যন্ত নাই—ওগো, সে এত নিষ্ঠুর—এখন এত নিষ্ঠুর? আমার সেই প্রেমময় করুণাময় স্বামী—একফোঁটা অশ্রুজল যাহার প্রাণে বিদ্ধ হইত, একটু ম্লান দেখিলে যে সহিতে পারিত না—সে আজ এত নিষ্ঠুর? আমার অসীম দুঃখে, অসহ্য যাতনায় আজ সে উদাসীন। সারাদিন কাছে থাকিয়া যাহার তৃপ্তি হইত না—এক মুহূর্ত্ত নয়নের আড়াল করিলে যাহার প্রাণে বিরহ-বেদনা বাজিত, আজ একবার সে ফিরিয়া চাহে না, এত নিষ্ঠুর, সে এত নিষ্ঠুর!"

"প্রভু আমার, স্বামী আমার, ও চরণে আমি কি দোষ করিয়াছি—কেন এ অবহেলা? সত্যই কি তবে তোমার সে ভালবাসা নাই, সত্যই কি তবে তোমার

হৃদয় অন্যের জন্য ব্যাকুল? যদি তাহাই হয়—আমার কি সে কথা শুনিবার পর্য্যন্ত অধিকার নাই, আমি কি তোমার বন্ধুত্বেও অধিকার নহি। সর্ব্বস্ব-ধন, আমি যে তোমার সুখের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, তাহা কি তুমি জান না প্রভু? কিংবা সব দোষ বুঝি আমার। বুঝি সব মিথ্যা—বুঝি সব মিথ্যা। আমি নিজের মনের গুণে নিজের দোষে নরক-অনল ভোগ করিতেছি এবং তাঁহার বিশ্বাস পর্য্যন্ত হারাইতেছি।"

রাণী উৎসুক হইয়া মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করেন, আসিলে মনের সমস্ত কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিবেন। কিন্তু রাজাকে দেখিলে তাঁহার আর সে ভাব থাকে না, কি এক মর্ম্মভেদী অভিমানে মুখ বন্ধ হইয়া যায়; মনের সহস্র আবেগ জমাট বাঁধিয়া আসে—যদিই বা মুখ হইতে কোন কথা বাহির হয়, সে অভিমানের কথা। রাজা তাহা সন্দেহ বলিয়া বুঝেন, রাজা যদি এক মুহূর্ত্ত থাকিতেন, সে কথার পর আর অর্দ্ধ মুহূর্ত্তও থাকেন না—বাণাহতের মত সরিয়া পড়েন।

ঐরূপে দিন যাইতেছে। দিন দিন উভয়েরই যন্ত্রণা বাড়িতেছে, জীবন অসহ্য হইয়া উঠিতেছে,—অথচ কেহ কাহাকেও খুলিয়া বলিবে না—ইচ্ছা করিলেও পারেন না। দৈব যেন অপ্রতিহত প্রভাবে তাঁহাদের মধ্যে পদক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের দু'জনকে তফাৎ করিয়া দিতেছে।

যেদিন পুরোহিতের সহিত রাণীর কথা হইল, সেদিন রাণী হৃদয়ে বজ্রবল বাঁধিলেন, ভাবিলেন, যেমন করিয়াই হউক, রাজাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিবেন।

২৯

অদৃষ্টের বাদ

সেদিন সন্ধ্যাবেলা রাজা অন্তঃপুরে আসিয়া শুনিলেন, রাণী বাগানে। একটু আশ্চর্য্য হইলেন। যেদিন হইতে তাঁহাদের মনান্তর হইয়াছে, সেই দিন হইতে রাণী আর বাগানে যান নাই।

রাজা উদ্যানে পদার্পণ করিবামাত্র সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। বহু দিনের স্মৃতির মত তাহাতে সহসা তাঁহার হৃদয়ে রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। কত দিন—কত দিন পরে এই মধুর জ্যোৎস্নালোকে এই মধুর উপবনে সঙ্গীতের সেই মধুর হিল্লোল! সেই গীতধ্বনি শুনিয়া তাঁহার আগেকার কত প্রেমের

কাহিনী, জীবনের কত সুখের চিত্র মনে জাগিয়া উঠিল। রাজা ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেইখানেই খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন—গানটি সুস্পষ্ট হইয়া তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল।

কেন সখি আসিতে না চায়?
যদি বা আসে গো হেথা
কেন সখি থাকিতে না চায়?
যাই যাই করি করি
কেন বুকে ছুরি বিঁধে নিঠুর কথায়?
সখি—কেমন করিয়া প্রাণ ধরি
তার যদি এতই অসাধ
থাকিতেই বলি বা কি করি?
সখি—হাসিয়া যাইতে তারে বলি,
মনে মনে যাতনায় জ্বলি,
ভয় মনে—সে যাতনা জানিতে না পায়,
পাছে আঁখি উথলায়।
সখি—আমার ত দেখিলে তাহায়
শুধু দেখিলে তাহায়,
শুধু মুখ পানে চেয়ে
হৃদি উঠে উথলিয়ে,
শতবার বুক-মাঝে
বিদ্যুতের লহরী খেলায়।
সদা ভয়ে ভয়ে সারা
বুঝি পড়িলাম ধরা
হৃদয়ের ভাব বুঝি নয়নে প্রকাশ পায়।
কই সখি—বুঝিতে না পারে
শুধু যাই যাই করে;
মম মন না বুঝিলে কে বুঝাবে তায়।
সখি বড় ভালবাসি
সে মুখের হাসি
মলিন দেখিলে মুখ বুক ফেটে যায়।

তবু—কেন সাধ প্রাণে
দেখি সে নয়ানে
ফুটেছে বিরহ-ব্যথা না দেখে আমায়।
এই—ব্যথাটুক তার
প্রাণ যাচে বার বার,
কেন সখি—এ হেঁয়ালি বল কে বুঝায়?

গান শুনিয়া রাজার প্রাণে একটা অনুতাপ উথলিয়া উঠিল—রাজার হৃদয় একটা কোমল ভাবে আর্দ্র হইতে লাগিল, যেন একটা অজানা দুঃখে তাঁহার নেত্র ছল ছল করিয়া আসিল, রাজা ধীরে ধীরে রাণীর নিকট গমন করিলেন। রাণী তখন প্রস্তর-বেদীতে শুইয়া ছিলেন। রাজা তাঁহার নিকট গিয়া বসিলেন। রাণী যখন সচকিত দৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন, সেই আকুলনয়নের দৃষ্টিতে রাজার হৃদয় কি একটা আকুলতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল—রাজা ধীরে ধীরে তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। কিন্তু করিলেন কি? তাহাতে রাণীর হৃদয়ের যত্নরুদ্ধ অশ্রুজল সহসা যেন অন্তরতল ভেদ করিয়া উঠিল, অনন্ত সুখের আবেগে মগ্ন হইয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন—তাঁহার আর কিছুই বলা হইল না। খানিক পরে রাজা বলিলেন, "সেমন্তি?"

সেমন্তী কেবল অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন। রাজা তাঁহার অলকগুচ্ছগুলি আগেকার সময়ের ন্যায় হাতে করিয়া গুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন,—"সেমন্তী, আমি কি দোষ করিয়াছি?"

কাঁদিয়া সেমন্তীর হৃদয়ভার অনেকটা লাঘব হইয়াছিল, রাজার আদরে বহু দিনের পর তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত সুখে পূর্ণ হইয়াছিল—সেমন্তী উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"নাথ, তুমি কি দোষ করিবে? আমিই দোষী, আমাকে ক্ষমা কর।"

রাজা একটু হাসিয়া আদর করিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা, সে কথা থাক দোষ যাহারই হউক, তোমার আর ত সে ভাব ফিরিয়া আসিবে না, সেইটে বল দেখি?"

রাণী একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার এ রকম মুখ দেখিলে আমার কি কিছু মনে হয়? তুমি কেন আগেকার মত আদর কর না?"

রাজা বলিলেন,—"তুমি কেন কথা কহ না?"

রাণী না কথা কহিলে তবে রাজার এখনো কষ্ট হয়! রাণীর মনে বড় আহ্লাদ

হইল, তাঁহার ঐ কথা আবার শুনিতে ইচ্ছা হইল, তিনি অভিমানের ভাবে ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"নাথ, আমার কথা কি তোমার আর ভাল লাগে ?"

এতক্ষণ বেশ চলিতেছিল, এই কথায় হঠাৎ রাজার ভাবান্তর হইল—কথাটা রাজার ভাল লাগিল না—রাজা অবিশ্বাস বলিয়া বুঝিলেন।

কিন্তু রাণী বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস হইতে এ কথা বলেন নাই, তিনি বুঝিয়াছেন, রাজা তাঁহাকে ভালবাসেন। কিন্তু রাজার মুখ হইতে বার বার তিনি সেই কথা প্রাণ ভরিয়া শুনিতে চান, তাঁহার প্রেমাদরে সমস্তক্ষণ লীন হইয়া থাকিতে চান, সেই বাসনা হইতেই তাঁহার উক্ত অভিমানের কথা। কিন্তু সংসারে কেহ কাহারও মন বুঝে না। রাণীর সেই অভিমান, রাজা অবিশ্বাসের অভিমান বলিয়া বুঝিলেন। রাজা দেখিলেন, আবার সেই সন্দেহ! তাঁহার মন একটা নিরাশার ভাবে পুরিয়া গেল। মনে হইল, রাণীর ঐ বদ্ধমূল অবিশ্বাস ভাঙ্গান তাঁহার সাধ্য নহে। বলিলেন, "মহিষি, যদি তাহাই তোমার মনে হয় ত আমার বলিবার কিছুই নাই।"

রাজার কঠোর উত্তরে রাণীর মর্ম্ম বিদ্ধ করিল।—রাণী বলিলেন, "মহারাজ, সত্য সত্যই কি বলিবার কিছুই নাই ?"

রাজা বলিলেন, "না!"

বহুদিন পরে দু'জনে যে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন, বহুদিন পরে দু'জনের হৃদয়ের মেঘ যদি বা অপসারিত হইয়াছিল—আবার সহসা তাহা গাঢ় অন্ধকারে পরিণত হইল, আবার তাহা বজ্রকম্পনে আলোড়িত হইয়া উঠিল। রাজা যখন কিছু পরে উঠিয়া গেলেন, রাণীর সহসা চমক ভাঙ্গিল। করিলেন কি ? সমস্ত সঙ্কল্প বিস্মৃত হইলেন! রাজাকে কিছু বলিলেন না—বলিবার অবসর দিলেন না। কেবল তীব্র কথার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে তাড়াইলেন। রাণীর মনে হইল, তাঁহারই সমস্ত দোষ। তীব্র অনুতাপের দংশনে তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন, তাঁহার নয়নের শতধারা শুকাইয়া গেল। অভিমানের কষ্ট, রাজার অনাদর ভুলিয়া গেলেন। একটি বার রাজার সহিত দেখা করিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষার জন্য ছটফট করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কি করিয়া এখন আবার তাঁহাকে ডাকেন. ডাকিলেও কি তাঁহার এ দোষ ক্ষমা করিয়া রাজা এখনি আর আসিবেন ? তাহাতেও ভরসা নাই, তিনি উঠিলেন।

নিঃসন্দেহ

রাণী খবর নিয়া শুনিলেন, রাজা বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত রাণী ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না, রুক্মাকে সঙ্গে লইয়া দ্বারদেশে আসিয়া প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজা একাকী গিয়াছেন কি না, কোন্ দিকে গিয়াছেন—ইত্যাদি।

প্রহরী তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল,—"হ্যাঁ একাকীই গিয়াছেন—আর ঐ তরুপথের মধ্য দিয়া যাইতে দেখিয়াছি। বোধ হয়, বেশী দূরে যান নাই, তরুকুঞ্জে বেড়াইতে গিয়া থাকিবেন।"

বলিয়া প্রহরী পথ দেখাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। রাণী তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া রুক্মার সহিত সেই দিকে গমন করিলেন। প্রহরী যে ইহাতে কিছু আশ্চর্য্য হইল, তাহাও নহে; এমন ত প্রায়ই হইয়া থাকে। রাজা রাণী উভয়েই রাত্রে ভ্রমণে বাহির হন, সঙ্গে কাহাকেও লইয়া যান না। আর রাজা নিকটে বেড়াইতেছেন শুনিলে তাঁহাকে বিস্মিত করার অভিপ্রায়ে রাণী কখনও কখনও একাকী তাঁহার নিকট গমন করিয়া থাকেন—আজ ত সঙ্গে তবু রুক্মা আছে। আসল কথা, রাজপুরীর চারিপাশের ভ্রমণস্থান এত নিরাপদ যে, রাত্রি বলিয়া ভ্রমণে কাহারও ভয় হয় না।

রাণী খানিক দূর গিয়া যখন তরুপথের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, তখন যেন অস্পষ্ট সঙ্গীতধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। এই সময় অন্য পথ দিয়া একজন কাঠুরিয়া ভীল এই তরুপথে আসিয়া পড়িয়া সহসা উর্দ্ধকণ্ঠ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর বলিল, "সুহার এখনও হেথায়।" বলিয়া তরুকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইল। সে নাম রুক্মাও শুনিল—রাণীও শুনিলেন—সেমন্তীর হৃৎপিণ্ডে দারুণ বেগে শোণিতরাশি উচ্ছলিত হইয়া উঠিল—তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, রুক্মা কাতরকণ্ঠে বলিল, "আর কেন, চল ফিরিয়া যাই।"

রাণী কোন কথা কহিলেন না, কিন্তু না ফিরিয়া অগ্রসর হইলেন, নিজের মৃত্যু উপভোগ করিতে অগ্রসর হইলেন। উপভোগ? হ্যাঁ, উপভোগ বই কি। কষ্টও কি উপভোগ্য নহে? বিশেষ ভালবাসার কষ্ট। এ কষ্ট কেহ পাইতে চাহে না সত্য—কিন্তু পাইলে কেহ ফেলিতেও চাহে না। জানি না, এ কষ্টের কি এত মোহ!

রাণী চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথায় যাইতেছেন, কি করিতেছেন, জ্ঞানহীন হইয়া চলিতে লাগিলেন। সহসা গীতধ্বনি থামিয়া গেল—রুক্মা তাঁহার হাত ধরিয়া একটা গাছের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল—তাহার পর? তাহার পর কম্পমানদেহ, অবসন্ন মহিষী সেই বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন।

৩১

মিলনে বিরহ

যেদিন হইতে সেই নিকুঞ্জমধ্যে জলাশয়তীরে বালিকা নয়নে নয়নে রাজাকে দেখিয়াছে, সেই দিন হইতে তাহার বিকসিত ভাব একটি ম্লানময় গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। এলোমেলো হাসি-গল্প আর তাহার ভাল লাগে না, কথায় কথায় কেমন দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, তাহার শুষ্ক মুখ, নীরব ভাব দেখিয়া বাড়ীর লোকেরা যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করে ত অমনি সুহার চটিয়া উঠে। সুবিধা পাইলেই সে লোকের দৃষ্টি এড়াইতে চায়। প্রতিদিন বিকালে নিয়মিত সেই জলাশয়তীরে বেড়াইতে আসে। কিন্তু আগে এইখানে আসিয়া যেমন তৃপ্তি লাভ করিত, এখন আর তেমন তৃপ্তি লাভ করে না। একটা অতৃপ্তি, অভাবের মধ্যে সে চারিদিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহে। বাতাসের শব্দে যেন চমকিয়া উঠে। কেন তাহার এ অতৃপ্তি? কিসের এ অভাব? আগে রাজাকে দূর হইতে দেখিলেই সে সন্তুষ্ট হইত, এখন তবে কি সুহার রাজাকে নয়নে নয়নে দেখিবার প্রত্যাশা করে? সেই জন্যই কি তাহার এ অতৃপ্তি?

কেন অতৃপ্তি, বালিকা তাহা বুঝে না—তাহার কেবল সেই দৃষ্টি মনে পড়ে, —সেই মোহময় মধুময় দৃষ্টি—সমস্ত জগতে লুক্কায়িত সৌন্দর্য্য যে দৃষ্টিতে মুহূর্ত্ত-মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই দৃষ্টি ভাবিতে ভাবিতে তাহার মরিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আর একবার সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টি রাখিবার জন্য সে ব্যস্ত কি না, তাহা সে জানে না,—সে প্রত্যাশা তাহার পক্ষে বড় অধিক প্রত্যাশা। প্রতিদিন সে যখন জলাশয়তীরে আসে, তাহার বড় ভয় হয়, পাছে মহারাজকে দেখিয়া ফেলে! যখনি তাহার মনে হয়—"যদি মহারাজ আসেন?" অমনি সভয়ে সঙ্কোচে যেন মরিয়া যায়। অথচ যখন আসিয়া দেখে—তিনি নাই—হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে নিশ্বাস উথলিয়া উঠে. নিজের নিশ্বাসে নিজেই চমকিয়া উঠে, নিভৃত বনপ্রদেশ পর্য্যন্ত যেন চমকিয়া উঠে। বালিকা তখন আস্তে আস্তে

জলাশয়তীরে আসিয়া বসে, জলে নয়ন ভাসিতে থাকে। কেন ভাসে, সে তাহা জানে না, রাজাকে দেখিবার জন্য সে যে আকুল, সে তাহা জানে না। রাজাকে দেখিবার আশা যে তাহার দুরাশা! সে আশা মনে আনিতেও তাহার সাহস নাই, তাহার জীবনের সম্মুখে যে কত অনন্ত কাল পড়িয়া আছে, ইহার এক একটি ক্ষুদ্র প্রতিদিন এইরূপ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার কাটিবে—ইহাই সে জানে, তাহার এই দগ্ধ হৃদয় প্রতিদিন এইরূপে তিল তিল করিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইবে, ইহাই মাত্র সে জানে। ইহা ছাড়া আর কিছু তাহার মনে আসে না। কেমন করিয়া আসিবে!

ধূমকেতু আকাশের দেবতা, মর্ত্ত্যের তরুলতার দিকে চাহিয়া চলিয়া যায়, তাহাদের জীবনপথে উদিত হইয়া শুষ্ক করিয়া দিয়া যায়, শূন্যময় দগ্ধজীবন লইয়া তরুলতা অনন্ত কাল ধরিয়া এখানে পড়িয়া থাকে। যে চলিয়া যায়—সে একবার ফিরিয়া চাহে কি? ক্ষুদ্র হৃদয়দিগকে কিরূপ আকুল করিয়া দিয়া গেল, একবার ভাবে কি? সে আকাশের দেবতা আকাশে বিচরণ করে—তাহার দৃষ্টিতে মর্ত্ত্যের কোন প্রাণ দগ্ধ হইয়া গেল কি না, তাহা সে ভাবে না। তরু-লতা শুষ্ক হৃদয় লইয়া মাটিতে মিশাইতে মিশাইতে কাঁদিয়া মরে।

বালিকা আজ জলাশয়তীরে বসিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া গান করিতেছিল। তাহার সেই আকুল দৃষ্টি হইতে, মধুর সঙ্গীতধ্বনি হইতে একটা করুণ কাতর ভাব উত্থিত হইয়া চাঁদের প্রাণ সিক্ত করিতেছিল।

রাজা এতদিন পরে আজ আবার সেই নিকুঞ্জমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, —বালিকার নিকট দাঁড়াইয়া সেই জ্যোৎস্নাচুম্বিত অনুপম মুখের দিকে চাহিয়া তাহার গীত-সুধা পান করিতেছিলেন। ঘুমন্ত জ্যোৎস্নালোকে যেন কোন স্বপ্নরাজ্যের প্রেমময়ী মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে আজ বিরাজিত। এক মধুর শান্তিতে, এক অপরিমিত সুখানন্দে তাঁহার চারিদিক ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি অতীত বিস্মৃত হইয়াছেন, ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হইয়াছেন, বর্ত্তমানের সেই মুহূর্ত্ত ছাড়া আর সকলই বিস্মৃত হইয়াছেন। রাজা যে কতক্ষণ ধরিয়া এইরূপে বালিকার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন—তাহা বালিকা জানে না, বালিকা খানিক পরে গান বন্ধ করিয়া যখন বাড়ী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল—তখন সহসা তাহার রাজার দিকে দৃষ্টি পড়িল, বালিকা চমকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎযন্ত্রের সবল স্পর্শে যেন সর্ব্বাঙ্গ আলোড়িত হইয়া উঠিল, বালিকা লতিকার ন্যায় কাঁপিয়া জলমধ্যে পড়িয়া গেল। রাজাও তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, দেখিতে না

দেখিতে তাহাকে কোলে লইয়া তীরদেশে উঠিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে ভূমিতে নামাইয়া দিলেন।

বালিকার শরীর কাঁপিতেছে, হৃদয় কাঁপিতেছে,—বালিকা অবনত মুখ উন্নত করিয়া তাঁহার দিকে ধীরে ধীরে চাহিল, উভয়ে মুগ্ধের ন্যায় উভয়ের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। বিমল জ্যোৎস্না, বিমল পুষ্পগন্ধময় নিকুঞ্জ, উভয়ের আর্দ্র মুখে মিলনের আনন্দভাব, নয়নে বিরহের অশ্রুজল, দু'জনের প্রাণের ভিতর হইতে ধীরে ধীরে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, দু'জনের নিশ্বাস দু'জনের মুখে আসিয়া লাগিল —এই সময় এক জন ডাকিল,—"সুহার!"

৩২

সমস্যা

ক্ষেতিয়া দূর হইতেই সুহার বলিয়া ডাকিয়াছিল। তাহার ডাকে সুহারের চমক ভাঙ্গিল। রাজা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, সে আস্তে আস্তে সরিয়া দাঁড়াইল। ক্ষেতিয়া যখন জলাশয়তীরে আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাঁহারা তত কাছাকাছি নাই, কিন্তু ক্ষেতিয়া তাহাতেই চমকিয়া উঠিল। এই নির্জ্জন নিকুঞ্জে রাত্রিকালে সুহার একাকী রাজার সহিত? সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে তাহার কাঁপিয়া উঠিল, এই সময় যদি তাহার হাতে বাণ থাকিত, সে রাজার প্রতি অসঙ্কোচে নিক্ষেপ করিতে পারিত। কিন্তু এখন অন্য উপায় অভাবে তাহার সমস্ত ক্রোধরাশি মাত্র তীব্র প্রাণভেদী কটাক্ষে রাজার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সুহারকে রোষগর্জ্জিত স্বরে বলিল,—"সুহার, চলিয়া আয়।" ক্ষেতিয়ার সেই ব্যবহারে সুহারেরও রাগ হইল, কিন্তু যে অপরাধী, তাহাকে পথের লোকের অপমানও সহ্য করিতে হয়, মনের ভাব মনে চাপিয়া লইয়া বালিকা নীরবে তাহার অনুসরণ করিল। একবার ফিরিয়া চাহিতেও সাহস করিল না। পথের মধ্যে দুইজনে কোন কথাই কহিল না—দুইজনেই আপনাপন মনের ভাব বহন করিয়া নীরবে চলিতেছিল। সুহারকে ভালবাসিয়া রাজা যে তাহাকে কলঙ্কের পথে লইয়া যাইতেছেন, ক্ষেতিয়া ইহাই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, এ ভালবাসা তাঁহার ভালবাসা নহে, সুহারের প্রতি অপমান, সুহারের পিতার প্রতি অপমান, তাহার সমস্ত স্বজাতির উপর অপমান! হায়! এ অপমান তাহার নীরবে সহ্য করিতে হইল! রাগে কষ্টে অপমানে সে জ্বলিয়া যাইতেছিল; এই নতুন কষ্টের মধ্যে সুহার তাহাকে ভালবাসে না,

এ কষ্ট আর ক্ষেতিয়ার মনে ছিল না; ক্ষেতিয়ার হৃদয়ে সমুদ্রের আলোড়ন ধরিয়া নীরবে চলিতেছিল। আর সুহার? ক্ষেতিয়ার প্রতি তাহার যে রাগ হইয়াছিল, দুই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সে কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার কেবল রাজার সেই মধুর মূর্ত্তি, সেই মধুর দৃষ্টি, সেই মধুর নিশ্বাসের মধুর স্পর্শ মনে জাগিয়া জাগিয়া উঠিতেছে, ক্ষেতিয়া যে তাহার সঙ্গে আছে, বালিকা তাহা ভুলিয়া গিয়াছে, আপনার চিন্তার মধ্যে আপনি এতখানি সে অভিভূত! কুটীরের দ্বারদেশে পৌঁছিয়া যেন সুহারের হুঁস হইল, ক্ষেতিয়া তাহার সঙ্গে। দ্বারদেশে পৌঁছিয়া ক্ষেতিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, সুহারও দাঁড়াইয়া তাহার দিকে ধীরে ধীরে চাহিল। এ দৃষ্টি ক্রোধের দৃষ্টি নহে, একটি কোমল প্রশান্ত অনুনয়ের ভাব এই দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ। বালিকা কি যেন তাহাকে বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু পারিল না, খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করিল। বালিকা যখন চলিয়া গেল, তখন সহসা যেন ক্ষেতিয়ার প্রাণের রুদ্ধ আবরণ উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, ক্ষেতিয়ার ভীমবল দেহ সামান্য লতার ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল, ক্ষেতিয়া নিকটের বৃক্ষশাখা ধরিয়া দাঁড়াইল, তাহার পরে ধীরে ধীরে তাহার তলে বসিল। তখনও রাত অধিক হয় নাই, উত্তরের সপ্তর্ষিমণ্ডল তখনও ধ্রুবতারার মস্তক অতিক্রম করে নাই, চন্দ্রমা তখনও ক্ষেতিয়ার মাথার উপরে, তারকারাজ মৃগব্যাধ অদ্ভুতাকৃতি মৃগমণ্ডলীর পশ্চাৎ হইতে তখনও তাহার চোখের উপর দক্ষিণে জ্বল জ্বল করিতেছিল, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষেতিয়া ভাবিতেছিল—"ইহার উপায় কি? রাজার হাত হইতে বালিকাকে রক্ষা করিবার উপায় কি? কি করিয়া সুহারকে সাবধান করা যায়? কি করিয়া রাজার উপর হইতে তাহার মন ফিরান যায়? হ্যাঁ মন ফিরান যায়? মন ফিরিলে সে আর রাজার দিকে ফিরিয়া চাহিবে না, নহিলে অন্য উপায় নাই —নহিলে সে বুঝিবে না। রাজা তাহাকে যে অপমান করিতেছেন, সে তাহা বুঝিবে না, সেই অপমানই বালিকা ভালবাসা বলিয়া বুঝিবে,—নির্ব্বোধ বালিকা সে তাহা ভালবাসা বলিয়া বুঝিতেছে।" ক্ষেতিয়া আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল, ভাবিল,—"না, সে-কিছুতেই বুঝিবে না, সে সাবধান হইবে না, আমি তাহাকে ঢের বলিয়াছি, ঢের বুঝাইয়াছি—সে বোঝে না—বুঝিবে না, আমি বলিব —জম্মুকে বলিব, নহিলে উপায় নাই, অনেক দিন চুপ করিয়া আছি, কিন্তু আর না, আমি বলিব, জুমিয়াকে বলিব,—প্রতিশোধই ইহার একমাত্র উপায়,— প্রতিশোধ—রাজার প্রতি প্রতিশোধ, অন্য উপায়ও নাই!"

বালিকার সেই কোমল দৃষ্টি সহসা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল ; সেই আকুল প্রার্থনার দৃষ্টি সে চোখের সম্মুখে দেখিতে লাগিল, সে বুঝিল, বালিকা তাহাকে কি কথা বলিতে গিয়াছিল—কি ভিক্ষা তাহার দৃষ্টিতে প্রকাশ হইয়াছিল। ক্ষেতিয়া কাতর হইয়া পড়িল—মনে মনে বলিল,—"না, বলিব না, সুহার, এ কথা, আমি জঙ্গুকে বলিব না, জুমিয়াকে বলিব না, বলিলে তোমাকে তাহারা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দিবে, তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে, আমি তাহাদের কাহাকেও এ কথা বলিব না, আমি কেবল তোমার মন ফিরাইব, তাহার উপর হইতে মন ফিরাইব তাহাকে দেখিলে তুমি ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিবে, তাহার অপমান তখন আমার মত এমনি করিয়া তুমি বুঝিবে।"

ক্ষেতিয়া তখনি সেই গণৎকারের নিকট গমন করিল। গণক তখন বিছানায় আরাম করিতেছিলেন, বহু কষ্টে সে তাঁহাকে শয্যা হইতে তুলিল—তুলিয়া সমস্ত কথা বলিল। গণক বলিলেন,—"আমি তোমাকে যাহা করিতে বলিয়াছিলাম—সব কর নাই, সেই জন্যই এই সব ঘটিতেছে।"

ক্ষেতিয়া বলিল,—"সব করিনু মুইডা, একডা বাকী শুধু। রাজাডাও যে ফুল দিউছিল, সেডা ফেলুতে নারিনু শুধু।"

গণক। যদি তাহা না ফেলিতে পার ত কোনই ফল হইবে না, আমার কাছে আসা বৃথা।

ক্ষেতিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল,—"কি করি ফেলুব? সুহার যে সেডা কুথায় রাখুছে, খুঁজি কিছুতেই মিলুল না, বলি দে মুইরে কুথায় আছে।"

গণক গণিয়া বলিলেন,—"কোন গুপ্ত স্থানে, তাহার নিজের কোন কৌটাদির মধ্যে বিশেষ করিয়া না খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না।"

ক্ষেতিয়া হতাশ হইয়া বলিল,—"যদি খুঁজি না মিলে, কি করিবু?"

গণক। তাহা হইলে জঙ্গুকে সব খুলিয়া বলিতে হইবে।

ক্ষেতিয়া। ক্ষ্যামা কর মুইরে, সেডা নারিবু, সেডা করুলে সুহার,—মুইডা শুধু ওষুধ চাই।

গণৎকার রাগিয়া গেলেন—বলিলেন,—"ওষুধ চাই? নির্ব্বোধ, হতভাগা, ওষুধ! জঙ্গুকে বলাই ওষুধ। জঙ্গুকে বলিলেই সব ঠিক হইবে। সুহারের মন বদ্‌লাইয়া যাইবে। ওষুধ দরকার হয়, তাহার পর দিব।" ক্ষেতিয়া আর কথা কহিতে সাহস করিল না ; মহা সমস্যায় পড়িয়া আস্তে আস্তে সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

৩৩

বিফল চুরি

রাজা জল হইতে যে কমল তুলিয়া সুহারকে দিয়াছিলেন—বালিকা যে তাহা ফেলিয়া দেয় নাই, তাহা ক্ষেতিয়া জানিত। ক্ষেতিয়ার কাছ হইতে সে কথা জানিয়া লইয়াই গণক সে ফুল ক্ষেতিয়াকে ফেলিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। গণৎকারের বিশ্বাস—সেই ফুলই রাজার ভালবাসা তাহার মনে বদ্ধমূল রাখিতেছে। সেই ফুল প্রথমে তাহার নিকট হইতে সরাইয়া পরে রাজার সহিত তাহার দেখাশুনা বন্ধ করিলে ক্রমে তাহার মন ফিরিয়া যাইবে; আশ্চর্য্য গণনা-শক্তি বটে! তবে আজকালের লোকেরা বিনা গণনাতেও এরূপ অনুমান করিতে পারেন।

বালিকার নিকট সত্যই সে ফুলটি অমূল্য রত্ন। প্রাণের মত করিয়া সে ঐ ফুলটিকে একটি কৌটাতে পুরিয়া কুটীরের বাহির দিকে একটি দেওয়ালে একটি গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিল। প্রতিদিন লুকাইয়া সেখান হইতে ফুলটিকে বাহির করিয়া সে দেখিত, আবার লুকাইয়া তুলিয়া রাখিত। সেই শুষ্ক মলিন ফুলটিতে সে রাজার জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিতে পাইত, দেখিতে দেখিতে সেই ফুলটি হইতে দেবাশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়া যেন তাহার তাপিত প্রাণ শীতল করিত। গণৎকারের কথায় ক্ষেতিয়া সেই ফুলটির সন্ধানে ব্যগ্র হইল।

কয়দিন সে সর্ব্বদাই জুমিয়ার কুটীরে যাইতেছে, সুহারের সঙ্গে দেখাও হইতেছে—কিন্তু দুজনের আর কথাবার্ত্তা হয় না, সুহার ক্ষেতিয়াকে দেখিলে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, কোন কাজের ছুতা করিয়া এদিকে ওদিকে সরিয়া যায়, ক্ষেতিয়ার অবসন্ন প্রাণ তাহাতে আরো অবসন্ন হইয়া পড়ে, কথা কহিবার আর সামর্থ্য থাকে না। তবে একটা সুলক্ষণ এই, কয়দিন হইতে সুহার আর জলাশয়ের তীরে যায় না, সেখানে যাইতে আর তাহার পা সরে না। ক্ষেতিয়া প্রায় সারাদিন তাহাদের কুটীরে থাকে, কয়দিন হইতে সে আর কাঠ ভাঙ্গিতেও বড় যায় না, তাহাকে এড়াইয়া কি করিয়া বালিকা সেদিকে যাইবে? তাহা হইলে সেও সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইবে। সেদিনকার রাতের কথা সে কাহাকেও এ পর্য্যন্ত বলে নাই বটে, কিন্তু আর একদিন যদি সুহারকে সেই দিকে যাইতে দেখে ত সে আর চুপ করিয়া থাকিবে না—সুহার তাহা মনে মনে বুঝিয়াছে। ইহার উপর আবার স্বাভাবিক সঙ্কোচ—রাজা যদি আবার তাহাকে সেখানে দেখেন ত কি মনে করিবেন? ভাবিবেন, বুঝি তাঁহাকেই দেখিতে

আসিয়াছে। ছিঃ, তাহা মনে করিলে লজ্জায় সে মরিয়া যাইবে, তাহা হইতে বরঞ্চ আজীবন সে আর তাঁহাকে দেখিবে না!

এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আর সে দিকে যায় না, যাইবার ইচ্ছায় বুক যেন ফাটিয়া উঠিতে থাকে, তবু সে সেদিকে যায় না, কোনমতে আপনাকে চাপিয়া রাখে। যখন মনে হয়, সে আর আপনাকে সামলাইতে বুঝি পারে না, তখনি তাড়াতাড়ি সেই ফুলটিকে বাহির করিয়া দেখে। এইরূপ ফুল দেখাটা তাহার বড় বাড়িয়া পড়িতেছে, সময় অসময় নাই, সে বাগানের দিকে যায়, যাইয়া যখন তখন লুকাইয়া সেই দেয়াল হইতে কৌটাটি বাহির করে, একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া আবার ভয়ে ভয়ে তখনি রাখিয়া দেয়। এত সাবধান হইয়া সে এ কাজ করে, তবু তাহার মনে হয়, ফুল দেখিবার সময় তাহার যত দূর সাবধান হওয়া উচিত ছিল, ঠিক ততদূর সাবধান হইতে পারে নাই। এমন কি, একদিন সন্ধ্যাকালে ফুলের কৌটাটি রাখিয়া যখন সে ঘরে যাইতেছিল, সে দেখিল, ক্ষেতিয়া বাগান দিয়া আসিতেছে—ছি, এমনি সে অসাবধান! সেই রাত্রে সুহার ভয়ে ভয়ে আর একবার দেওয়ালের নিকট আসিয়া দেখিল—কৌটা আছে কি না? কিন্তু যখন দেখিল—কৌটাটিও আছে, ফুলও আছে, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু ইহার দুই দিন পরে কৌটাটি খুলিয়া সত্যই আর ফুল দেখিতে পাইল না। সে যেন বজ্রাহত হইল। এ কয়দিন সে ক্ষেতিয়ার সঙ্গে একটিও কথা কহে নাই—কিন্তু আজ ক্ষেতিয়া আসিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার ফুল লইয়াছ?" গণৎকার যদিও ক্ষেতিয়াকে বলিয়াছিলেন—তুমি ফুল লইয়াছ—তাহা সুহারকে জানাইও না। কিন্তু মিথ্যা কওয়া ক্ষেতিয়ার অভ্যাস নাই—সে নিরুত্তর হইয়া রহিল। বালিকা আগেই সন্দেহ করিয়াছিল, সেই লইয়াছে—এখন তাহার আর সন্দেহ রহিল না—বুঝিল, ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া সে তাহা চুরি করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় রাখিয়াছিস্?"

ক্ষেতিয়া অপরাধীর মত বলিল,—"ফেলিয়া দিয়াছি!"

বালিকার আর রাগের সীমা রহিল না। ক্ষেতিয়াকে সুহার না ভালবাসুক, তাহাকে অনুগ্রহের চক্ষে দেখিত, তাহার কষ্টে সে দুঃখিত হইত, কিন্তু আজ তাহাকে দেখিয়া ঘৃণায় সমস্ত হৃদয় তাহার জ্বালা করিয়া উঠিল—সে বলিল—"ক্ষেতিয়া, তুই আর এখানে আসিস্ না, আমি তোর মুখ দেখিতে পারি নে।"

বালিকার আর তখন ইহাও মনে আসিল না—ক্ষেতিয়াকে রাগাইলে সে বিপদে পড়িতে পাড়ে—সে রাতের কথা ক্ষেতিয়া তাহার বাবাকে বলিয়া দিতে

পারে। ঐ কথা বলিয়া বালিকা চলিয়া গেল, কষ্টে ক্ষেতিয়ার হৃদয় ফাটিয়া উঠিতে লাগিল। তবু সে অপেক্ষা করিয়া রহিল, গণক বলিয়াছেন, ফুল ফেলিয়া দিলে সুফল হইবে। কিন্তু দিন যাইতে লাগিল—সুহারের ভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় দেখিল না। তাহাকে দেখিলেই সুহারের সেই মধুর সুন্দর মুখ ক্রোধে বিকৃত হইয়া ওঠে, তাহাকে সর্পের মত ভাবিয়া সুহার তাহার কাছ হইতে দূরে চলিয়া যায়। আরও কিছুদিন চলিয়া গেল, ক্ষেতিয়া আর পারিল না; আবার গণৎকারের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। গণৎকার সব শুনিয়া আবার রাগ করিলেন, বলিলেন,—"সমস্তই তোর দোষ। আমি বলিয়াছিলাম, জঙ্গুকে গিয়া বল, সব চুকিয়া যাইবে, তা হইল না! ভোগ—এখন নিজের বুদ্ধির ফল ভোগ!"

ক্ষেতিয়া বলিল,—"তুইডা ত আগে ফুলডা ফেলুতে বল্লি—"

গণক। চুপ কর। তোর মত নির্ব্বোধের সহিত কথা কহা বৃথা।

ক্ষেতিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল,—"একডা মস্ত ভেড়া রাখুছি।"

গণৎকার বলিল,—"শোন তবে, আর বিলম্ব না করিয়া জঙ্গুকে সব কথা খুলিয়া বল। আর আমার নাম করিয়া বল, রাজার সহিত মেয়ের যেন আর দেখা না হয়।"

ক্ষেতিয়া কাতরভাবে বলিল,—"তুইরে দুইডা ভেড়া দিবু, কিন্তু জঙ্গুরে—"

গণৎকার। হাঁ, জঙ্গুকে আমার নাম করিয়া বল, রাজার সহিত মেয়ের যেন আর দেখা না হয়।

ক্ষেতিয়া অঁ্যা অঁ্যা করিয়া যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই,—"রাজার সহিত সুহারের আর দেখা হয় না—সুহার দেখা করিতে যায় না। তবে জঙ্গুকে এ কথা কেন বলা?"

গণৎকার বলিলেন,—"সুহারের সহিত আর রাজার দেখা হয় না? তবে কেন বলিলি ফুল ফেলার ফল হয় নাই? কাল তিনটি ভেড়া আনিবি—বুঝিলি?"

ক্ষেতিয়া বলিল,—"আনুব, কিন্তু সুহার যে মুইডার মুখ দেখুতে চাহে না।"

গণৎকার। সে ক্রমে হইবে। দিনকতক রাজাকে আগে ভুলুক। তবে আবার যদি রাজার সঙ্গে দেখা করে, তখন জঙ্গুকে বলিবি, বুঝিলি?"

ক্ষেতিয়া। কিন্তু বলুলে ত ডর নাই! সুহারের ত—

গণৎকার অধীর হইয়া বলিলেন,—"না না, তাহাতে কোন ভয় নাই। যাহা

বলিতেছি, তাহাতে সব ভাল হইবে। আর কথা কহিস না।”

ক্ষেতিয়া আর কথা না কহিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

গণৎকার উচ্চৈঃস্বরে আবার কহিলেন,—“কাল তিনটি ভেড়া আনিতে ভুলিস্‌নে।”

৩৪

নূতন সঙ্কল্প

যাঁহারা বলেন,—“কামিনী কোমল প্রাণে সহে না যাতনা” তাঁহারা ভুল কথা বলেন। ঠিক বিপরীত। যে যত কোমল, তাহার সহিবার শক্তি তত অধিক। অল্প আঘাতে যে নুইয়া পড়ে, বেশী আঘাতে সে অটুট থাকে। ঝড়ে বড় গাছ ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু ছোট ছোট নরম গাছগুলির কিছুই হয় না। তাহারা মৃদুস্পর্শে প্রাণে ব্যথা পায়, বসন্তহিল্লোলে নুইয়া পড়ে, তাই তাহাদের এমন কঠিন প্রাণ।

রাণী দেখিলেন, সত্যই রাজা তাঁহাকে ভালবাসেন না, কেবল তাহাই নহে, রাজা—তাঁহার দেবতা—বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক, এতদিন তাঁহাকে ছলনা করিয়া আসিয়াছেন, অসহ্য যন্ত্রণায় রাণী আকুল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সেই অসহ্য যন্ত্রণাও তাঁহার প্রাণে সহিল, বুঝি স্ত্রীলোক বলিয়াই সহিল। যে ঘটনার শতাংশের একাংশ কল্পনা করিতেও আগে রাণীর বুক ফাটিয়া যাইত, তিনি আপনার মৃত্যু আপনিই চক্ষের উপর দেখিতেন, সেই কল্পনাতীত স্বপ্নাতীত ঘটনাও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। দেখিলেন, বুঝিলেন, তাঁহার স্বামী আর তাঁহার নহেন, আর একজনের; কিন্তু মরিলেন কই? যাহার প্রাণে একটু অনাদর সহিত না, তাহার প্রাণে এতখানিও সহিল; যে প্রাণে কাঁটা সহিত না, সে প্রাণে বজ্রাঘাতও সহিল।

এমনি হইয়া থাকে, ইহা নূতন কথা নহে। যখন সহিবার কিছু না থাকে, তখন ফুলের আঘাতও প্রাণে সয় না, কিন্তু সহিবার সময় হইলে সেই প্রাণেই আবার সব সয়। তবে রাণী ইহা বুঝিলেন না, তিনি ভাবিলেন, তাঁহার প্রাণ বলিয়াই এতদূর সহিল, তাঁহারই লোহার প্রাণ; বজ্রপীড়নেও তাহা ভাঙ্গে না, বিধাতা তাঁহাকে অমর করিয়া জন্ম দিয়াছেন।

যে রাত্রে রাণী সুহারকে রাজার ক্রোড়ে দর্শন করিলেন, সেই রাত্রি হইতে

রাজা-রাণীর কথাবার্ত্তা এক রকম বন্ধ হইয়াছে। দিনের বেলা ত রাজা আর আসেনই না, রাত্রে রাজা গৃহে আসিয়াই প্রায় শুইয়া পড়েন, রাণীর মৌনভাব ভাঙ্গাইতে আর প্রয়াসই করেন না। একে ত রাণীর অভিমান, কষ্ট, রাজার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহার বড় একটা কিছু আসিয়া যায় না, তাহার পর আবার রাজা নিজের ভাবে সর্ব্বদা বিভোর, আপনার কাছেই অন্যমন, সুতরাং অন্যের মানাভিমান ভাঙ্গিতে তাঁহার অবসরও নাই, সে কষ্ট তাঁহার বড় একটা চোখেও পড়ে না। রাজার যত অনাদর বাড়িতেছে, রাণীর কষ্টে রাজার ঔদাস্যভাব যত সুস্পষ্ট হইতেছে, রাণীরও কষ্ট সহিবার শক্তি তত বাড়িতেছে, তাঁহার হৃদয় যন্ত্রণায় তত সবল হইয়া উঠিতেছে, স্বামীর কোলের কাছে শুইয়া তিনি ততই অবাধে নীরবে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে সক্ষম হইতেছেন।

দিন যাইতেছে, রাজা-রাণীর বিষাদভাব দিন দিন প্রাসাদময় পরিব্যাপ্ত হইতেছে। রাজসভায় আর আগেকার হাসি-তামাসা নাই, রাজার বিষাদগম্ভীর মুখ দেখিয়া বিদূষকের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে আর সাহস হয় না। অন্তঃপুরে সখীদিগের নৃত্য-গীত একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সকলের প্রাণেই কেমন অসুখ। প্রকাশ্যে রাজা-রাণীর মনান্তরের কথা কেহ কয় না, কিন্তু গোপনে গোপনে সকলেই এই কথা লইয়া নাড়াচাড়া করে। পুরোহিত হরিতাচার্য্য এ সমস্ত নীরবে দেখিতেছেন, মহাদেবের নিকট তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ের নীরব প্রার্থনা উঠিতেছে। প্রার্থনায় সবল হইয়া কখনও তিনি আশ্বস্ত হইতেছেন, কখনও নিরাশ হইয়া মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছেন।

গণগৌরী উৎসবের দিন আগতপ্রায়। অন্য বৎসরে এ সময়ে রাজবাটীতে কত আমোদ, কত উল্লাস। এ বৎসর তাহার কিছুই নাই। উৎসবের উদ্যোগ হইতেছে, উল্লাস-আমোদের একটা চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সে সকলের মধ্যেই একটা প্রচ্ছন্ন বিষাদ বহমান।

পূজার আগে অনুষ্ঠান-আয়োজনের বন্দোবস্তের কথা কহিতে যেদিন হরিতাচার্য্য রাণীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন, তাঁহার সেই শুষ্ক বিবর্ণ যাতনাপীড়িত মুখ দেখিয়া সেদিন তিনি চমকিয়া উঠিলেন—ভাবিলেন, রাজা কি ইহাকে দেখিতে পান না! এমন নিষ্ঠুর কে আছে, ইহার এই কষ্টের মুখ দেখিয়া দ্রব না হইবে?

হরিতাচার্য্য! তুমি অসংসারী, মনুষ্য-হৃদয় বুঝ না, তাই এরূপ ভাবিতেছ। মহারাজ নিষ্ঠুর! অন্যের কষ্ট দেখিলে কি তাঁহার প্রাণে ব্যথা লাগে না? তিনি

যদি দেখিতেন, আর এক স্বামী তাহার স্ত্রীর উপর তাঁহারই মত ব্যবহার করিতেছে, তাঁহার হৃদয় কি মমতায় আর্দ্র হইত না? তিনি নিষ্ঠুর! আর একজনের সামান্য কষ্ট দূর করিতেও কি তিনি হৃদয় পাতিয়া দিতে পারেন না? তখন কি এই নিষ্ঠুরই সহৃদয়তার, আত্মবিসর্জ্জনের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইবেন না?

হায়! কে জানে, সংসারে কে নিষ্ঠুর, আর কে করুণাশীল! একই মানুষ যে জগতের পক্ষে করুণার আধার—অন্যের সম্পর্কে যাহার দিব্য চক্ষু, কিন্তু একজনের সম্পর্কে সে এতই ঘোরান্ধ যে, তাহার মর্ম্মান্তিক কষ্টেও সে হৃদয়ের একটি কণাও আর্দ্র হয় না। এমনি প্রকৃতি দিয়া মনুষ্য গঠিত যে, এই অস্বাভাবিকতাই মানুষের স্বাভাবিক, মানুষ নিষ্ঠুর নহে, বহুরূপী তারের একটি যন্ত্র। তাহার যে রূপের তারে যখন ঘা পড়ে—সেই ভাবটি বাজিয়া উঠে। যে বাজায়, তাহার উপরই সমস্ত নির্ভর করে, যে বাজাইবে, তাহার বাজাইবার শক্তি থাকা চাই।

হরিতাচার্য্য রাণীকে যে সকল কথা বলিতে আসিয়াছিলেন—তাঁহাকে দেখিয়া আর কোন কথাই মুখ-নির্গত হইল না।

রাণী বলিলেন,—"দেব, আপনাকে একটি কথা বলিতে ডাকিব ভাবিয়াছিলাম, না ডাকিতে নিজেই আসিয়াছেন।"

পুরোহিত বলিলেন,—"কি কথা?"

রাণী। আমি একবার সেই ভীলকন্যার সহিত দেখা করিতে চাই।

হরিতাচার্য্যের মুখে বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ পাইল; কিন্তু তিনি কিছু না বলিয়া ইহার কারণ শুনিবার প্রত্যাশায় মহারাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মহারাণী বলিলেন, "আপনি বলিয়াছিলেন, নির্দ্দোষ বালিকাকে কলঙ্কের পথ হইতে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। আমি বুঝিয়াছি, তাহা আমার কর্ত্তব্য, তাহা পালন করিতে আমি চেষ্টা করিব—"

পুরোহিত কি একটা কথা বলিতে গেলেন—কিন্তু তাঁহার কথা বাধিয়া গেল, তিনি থামিয়া পড়িলেন। রাণী বুঝিলেন, পুরোহিত বলিতেছিলেন, 'রাজাকে সাবধান করাই ইহার প্রধান উপায়,—উত্তরস্বরূপ বলিলেন,—"না, রাজা মোহান্ধ, তাঁহাকে বুঝাইতে পারিব না, সেই বালিকার উপরই এখন সমস্ত নির্ভর করিতেছে। আমার সঙ্গে একবার তাহার দেখা করাইয়া দিবার উপায় স্থির করুন।"

পুরোহিত খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল, নিরাশা ছাড়া আর কিছুই তিনি দেখিতে পাইলেন না, রাজার মতি যদি না ফেরে, তবে আর ভরসা কোথা? কিছু পরে বলিলেন,—"আচ্ছা, কাল ভোরে একাকী তুমি আমার মন্দিরে যাইও, তাহার দেখা পাইবে।"

ইহার পর পুরোহিত আর কোন কথা বলিলেন না—ভগ্নান্তঃকরণে আশিস্ করিয়া মন্দিরে ফিরিলেন।

৩৫

দুজনে

পরদিন ভোর না হইতে, ঘোর ঘোর থাকিতে থাকিতে রাণী মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাহার আগেই হরিতাচার্য্য স্নানে গিয়াছিলেন, সুতরাং মহিষী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মন্দিরে আর কেহই নাই, দীপালোক-প্রজ্বলিত গৃহে একলিঙ্গদেব একাকী কেবল অধিষ্ঠান। মহিষীর দগ্ধ হৃদয়ের বেদনা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, পিতার চরণে প্রণত হইয়া মহিষী অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিলেন,—"দেব, দেখ দেখ, পিতা হইয়া কন্যাকে যে কষ্ট দিতেছ, চাহিয়া দেখ। যদি কষ্ট দিয়াই তোমার সুখ হয়, দাও, পিতা, তাহাই দাও, তুমি সুখ দিয়াছিলে, এখন দুঃখই দাও, তোমার অভাগী সন্তানের এই মাত্র কেবল প্রার্থনা, যদি দুঃখ দিবে ত দুঃখ সহিবার বলও দাও; এ যন্ত্রণা বুঝি আর সহিতে পারি না, প্রভু!"

কিছু পরে মন্দিরের দ্বার খুলিবার শব্দ হইল, মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মহিষী মন্দিরের দ্বার ভিড়াইয়া দিয়াছিলেন। ভৃত্য ফুলের সাজি হস্তে মন্দিরে প্রবেশ করিল। রাণী শব্দ পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রাণীকে দেখিয়া সে অভিবাদন করিয়া আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিল—তাহার পর নীরবে ফুলরাশি মহাদেবের নিকট রাখিয়া পূজার আয়োজন আরম্ভ করিল, মহিষী বুঝিলেন, হরিতাচার্য্যের আসিবার সময় হইয়াছে। মনে হইল, পুরোহিতের সঙ্গে এখনি ভীলকন্যাও আসিবে, তাঁহার নেত্রজল শুকাইয়া গেল। কেমন একটা ঔৎসুক্যময় আন্দোলনে তাঁহার হৃদয় তরঙ্গিত হইতে লাগিল, তিনি আস্তে আস্তে মন্দিরের পার্শ্বের গৃহে গিয়া বসিলেন। ভীলকন্যাকে না জানি কিরূপ দেখিবেন, তাহার সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিবেন—এই সকল মনে আসিতে লাগিল। তাহার মূর্ত্তি মনে

মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন। তাহাকে তিনি দূর হইতে সেই রাত্রে রাজার ক্রোড়ে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সে দেখা আসলে দেখাই নহে, তাহার মূর্ত্তি স্পষ্ট কিছুই দেখিতে পান নাই। সম্ভবতঃ খুবই সুন্দরী। সম্ভবতঃ কেন, নিশ্চয়ই সুন্দরী। সকলেই তাহার রূপের কথা বলে,—অবশ্যই রূপবতী, নহিলে রাজা মুগ্ধ হইলেন? কিন্তু রূপ থাকিলেই কি সকলে মুগ্ধ করিতে পারে? আর কি কাহারো রূপ নাই—এমন ত রূপবতী আরো আছে—কিন্তু কেন তবে—? মায়াবিনী—সে মায়াবিনী?

রাজার কি দোষ? এত ভালবাসা—এত আদর—এত সব কি অমনি দু'দিনে ভুলা যায়? এ সব কি মায়ার কর্ম্ম নহে, মায়াবিনী—সে মায়াবিনী? তাহাকে তবে রাণী কি বুঝাইবেন? সে বুঝিবে কেন? রাণীর দুটো কড়া কথা—কি মিষ্ট কথা—কি উপদেশের কথা শুনিলে সে কি রাজাকে ছাড়িয়া যাইবে? রাজার ভালবাসা সে ছাড়িবে? তাহাতে উপকার কাহার? লাভ কাহার? তাহার না রাণীর?

রাণী আপনাকে বুঝাইয়াছিলেন—রাজার মঙ্গলের জন্যই তিনি সুহারকে বুঝাইতে আসিতেছেন। কিন্তু এখন তাহাতে তাঁহার সন্দেহ জন্মিল, তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তাঁহাদের স্বার্থ দেখিতে গিয়া তিনি নিজের স্বার্থই খুঁজিতেছেন। তাঁহার হৃদয়ের বল যেন তিনি হারাইতে লাগিলেন। আশায়-নিরাশায় উত্তেজিত পীড়িত হইয়া রাণী বসিয়া রহিলেন, সহসা আবার মন্দিরদ্বার খুলিয়া গেল, রাণী পার্শ্বের ঘর হইতে সৌৎসুক্যে দৃষ্টিপাত করিলেন, হরিতাচার্য্য ভিতরে প্রবেশ করিয়া কাহাকে বলিলেন,—"মা, এস।" শুভ্র শতদলের মত বিকসিত মুখখানি লইয়া সেই উষালোক আলোকিত করিয়া সুহার মন্দিরে প্রবেশ করিল, রাণী অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

৩৬

দেবীদর্শন

সুহার বিকালে আর জলাশয়ের দিকে যাইত না বটে, কিন্তু প্রত্যূষে প্রায়ই নদীতে স্নান করিতে যাইত। রাজাকে দেখিবার এই তাহার সময় ও সুবিধা। এত ভোরে ক্ষেতিয়া প্রায়ই আসে না, কোন কোন দিন আসিলেও তাহাতে ভয়ের কারণ নাই, কেন না, সুহার ত মন্দিরঘাটে স্নান করে না। সে যে

আঘাটায় নামে, মন্দিরঘাট হইতে তাহা অনেকটা তফাতে। ইহার উপর আবার রাজাকে দূর হইতে মন্দিরঘাটে নামিতে দেখিলে সুহার অমনি নদী হইতে উঠিয়া পড়ে। এমন কি, সুহার এ বিষয়ে এতই সাবধান যে, রাজা পর্য্যন্ত জানিতে পারেন না, সুহার প্রতিদিন তাহার এত নিকটে আসে। এ অবস্থায় লোককে তাহার কি ভয়? লোকে কি তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বুঝিবে, রাজাকে মুহূর্ত্তের দর্শনের জন্যই সে রোজ নদীতে স্নান করিতে আসে, লোকে বরঞ্চ ভাবিবে, রাজাকে সে দেখিতে চাহে না। নইলে তাঁহাকে দেখিবামাত্রই কেন সে ঘাট হইতে উঠিয়া পড়ে।

বালিকার 'লোক' আর কেহই নহে, এক ক্ষেতিয়া। সে জানে, একমাত্র ক্ষেতিয়ার লক্ষ্যের উপরেই সে রহিয়াছে, তাহার লক্ষ্য এড়াইলে সে সংসারের লক্ষ্য এড়াইল, সুতরাং ক্ষেতিয়াকে ভুল বুঝানই তাহার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সফলও হইয়াছিল; সত্যই বালিকার এই সতর্কতায় ক্ষেতিয়া ফাঁকিতে পড়িয়াছিল। রাজাকে দেখিলে সুহার যতই পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইত, ক্ষেতিয়া মনে মনে ততই আহ্লাদিত হইত, সে ভাবিত, নিশ্চয়ই ঔষধের গুণ ধরিয়াছে। সুহার ইহাতে জিতিয়াছিল, কিন্তু একটি সে বড় ভুল করিয়াছিল—সে যে মনে করিত, সংসারে একমাত্র ক্ষেতিয়া ছাড়া তাহাকে আর কেহ লক্ষ্য করে না, তাহা ঠিক নহে, আরও একজন প্রতিদিন তাহার নদীতীরে আগমন লক্ষ্য করিতেন, ইনি হরিতাচার্য্য। সেই জন্যই তিনি রাণীকে প্রাতঃকালে তাঁহার মন্দিরে আসিতে বলিয়াছিলেন।

পুরোহিত সেদিন অন্য দিন অপেক্ষাও প্রত্যূষে স্নানে গমন করিলেন, কিন্তু মন্দির ঘাটের পরিবর্ত্তে সুহার যে আঘাটায় নামিত, সেইখানে নামিলেন। সুহার যখন নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাঁহার স্নান-পূজা শেষ হইয়াছে, তিনি কেবল সুহারের জন্যই তখনও নদী হইতে উঠেন নাই। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি জল হইতে উঠিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বলিলেন, "মা, তুমি মন্দিরের এত নিকটে স্নান করিতে এস, কই, একদিন ত দেবদর্শনে আস না?"

বালিকা একটু জড়সড় হইয়া পড়িল, কোন উত্তর করিল না, কিন্তু হরিতাচার্য্যের সেই প্রসন্ন গম্ভীর মূর্ত্তি, সেই করুণ স্নেহের স্বর তাহার হৃদয়ে একটা ভক্তির ভাব সঞ্চারিত করিল। হরিতাচার্য্যও তাহাকে এত নিকটে পূর্ব্বে দেখেন নাই, তাহার সেই সরল সুন্দর বালিকা-মূর্ত্তি দেখিয়া একটি অতি সুকোমল স্নেহে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল, তিনি আবার বলিলেন, "আজ একবার মন্দিরে তোমাকে

যাইতেই হইবে। সেখানে দেবপ্রণাম করিবে, আর দেবীদর্শনও পাইবে। এস মা, আমার সঙ্গে।"

বালিকা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"স্নান না করিয়া দেবপ্রণাম করিব ?"

হরিতাচার্য্য একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তাহাতে ক্ষতি নাই, দেবতাগণ সকল সময়েই প্রণম্য।"

বালিকা তখন তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। ভীলপালিত বলিয়া হিন্দুর দেবভক্তি হইতে তাহার হৃদয় বঞ্চিত হয় নাই। কেন না, ক্ষত্রিয়দিগের সংসর্গে আসিয়া ভীলগণ নিজেই ক্ষত্রিয়দিগের দেবতাকে মাননা করিতে শিখিয়াছিল ; কিন্তু তাহাদের মাননা ও সুহারের ভক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব হইতে উত্থিত হইত। নদী-তীরে আসিয়া মহাদেবের স্তব শুনিলে ক্ষেতিয়া বলিত,—"সুহার, ঐ মন্দিরের দেবতা বড় মস্ত দেবতা, শাল গাছেরই মতন, কিন্তু পাঁঠা বলি লেয় না, এইটিতেই কেমন লাগে তা নাই নিক—প্রণাম হই—আজ যেন মোর শীকার মেলে।"

কিন্তু সুহারের কর্ণে যখন দেববন্দনা, আরতিধ্বনি প্রবেশ করিত, তাহার হৃদয় ভক্তি-দ্রব ও দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, তখন কোন প্রার্থনা, কোন ভিক্ষা তাহার মনে উদিত হইত না, এক প্রেমময় ভাবের স্পর্শ সে শুধু অনুভব করিত, এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ মাত্র তাহার হৃদয় অধিকার করিত। পরে অনেক সময় সে সেই দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিত, তাঁহাকে পূজা করিত, তাঁহাকে মনের কথা কহিত। কিন্তু দূর হইতে মন্দিরের উথলিত বন্দনা-গীত শুনিলে তাহার হৃদয় সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে পরিপূর্ণ হইত, তাহার দেবতার সহিত, তাহার নিজের সহিত কোন স্বাতন্ত্র্য যেন আর সে বুঝিতে পারিত না ; সমস্তই একটা গম্ভীর আনন্দ মাত্র একাকার হইয়া যাইত। সে যখন পুরোহিতের অনুগামী হইল, তখন তাহার হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল, দূর হইতে যাঁহার বন্দনা-গীত শুনিয়া হৃদয় সার্থক করে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিবে, তাঁহার মন্দিরে দাঁড়াইয়া, তাঁহার বন্দনা শুনিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিবে, এরূপ সৌভাগ্য সে কখনো কল্পনাও করে নাই। সে ভক্তি উথলিত হৃদয়ে মন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পুরোহিত পূজার আরতি আরম্ভ করিলেন—ধূপ-ধুনার গন্ধ, শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি, স্তোত্র-ধ্বনি উঠিতে লাগিল, মন্দির সুগন্ধে সুরবে সুমঙ্গলভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সুহার সেই প্রস্তর-মহাদেবের মধ্যে অনন্ত জগতের অনন্ত মঙ্গল আত্মা প্রত্যক্ষ করিল, কতক্ষণ আরতি হইল, সুহার জানে না, সে যখন

প্রণাম করিয়া উঠিল, দেখিল, মন্দির নিস্তব্ধ। সে উঠিয়া দাঁড়াইলে হরিতাচার্য্য বলিলেন,—"বৎসে, এইবার দেবী-দর্শনে চল।"

মহিষী পাশের ঘরে বসিয়াই আরতির সময় দেবপ্রণাম করিয়াছিলেন, তিনি আর এ ঘরে আসেন নাই, সুহারকে সঙ্গে লইয়া হরিতাচার্য্য সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। বালিকা বিস্ময়-দৃষ্টিতে রাণীর দিকে চাহিয়া দেখিল—এক জীবন্ত সৌন্দর্য্য-প্রতিমা। ইনি কোন্ দেবী! বালিকা ত্রস্তে তাঁহার নিকট প্রণত হইল। হরিতাচার্য্য বলিলেন,—"বৎসে, ইনি ইদরের রাণী, মহারাজ গ্রহাদিত্যের মহিষী। তোমরা দু'জনে কথাবার্ত্তা কও, আমি অন্য গৃহে যাই।"

বলিয়া হরিতাচার্য্য চলিয়া গেলেন। বালিকার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, বালিকা সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল।

৩৭

কথোপকথন

সুহারকে ভীত দেখিয়া রাণী কোমল কণ্ঠে বলিলেন,—"ব'স ভদ্রে ব'স—রাণী শুনিয়া ভয় পাইও না, আমাকে বোন বলিয়া মনে জানিও!"

রাণী বিস্মিত সুহারের হাত ধরিয়া কাছে বসাইলেন। কিন্তু রাণীর সেই সাদর ব্যবহারে—সাদর বাক্যে সুহার আরো যেন ম্লান হইয়া পড়িল, তাহার মুখখানি সভয়ে বিস্ময়ে বড় সুন্দর হইয়া উঠিল, তাহার সুগঠিত তনুদেহ, মধুর সুশ্রী মুখে লজ্জাবতী লতার ভাব ফুটিয়া উঠিল। রাণী তাহার দিকে চাহিয়া ভুলিয়া গেলেন, সে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী, ভুলিয়া গেলেন, সেই তাঁহার কষ্ট-দুঃখের কারণ। তাহার সেই ভয়সঙ্কুচিত মুখে তাহার বালিকা-হৃদয়ের লুক্কায়িত প্রেমরহস্য তিনি উদ্ঘাটিত দেখিলেন, রাগ-দ্বেষের পরিবর্ত্তে একটা কোমল কৌতূহলে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। ইহারি মত বয়সে, এইরূপ প্রথম যৌবনে তিনি যে ইহারি মত প্রেমের সর্ব্বাঙ্গ বিকসিত ছবির আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন, এই বালিকাতে সেই ছবিই তিনি দেখিতে লাগিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগিনি, তোমার নাম কি?"

সুহারের নাম যে তিনি জানিতেন না, তাহা নহে—তবে এ জিজ্ঞাসা কেবল কথা আরম্ভ করিবার একটা উপায় মাত্র। সুহার আস্তে আস্তে বলিল—"সুহার!"

রাণী বলিলেন,—"সুহার? কিসের? অবশ্য ফুলের হইবে—নহিলে নামটি

থাটে না। হারটি হৃদয়ে রাখিবারই যোগ্য। তবে কি জানি ভাই, ফুল যে, তাহার হার না হইয়া ফুল থাকাই ভাল। ফুল যতক্ষণ গাছে ফুটিয়া গন্ধ বিকীর্ণ করে, ততক্ষণই তাহার সুখ—ততক্ষণই তাহার আদর। হার হইয়া যদি একবার মানুষের গলায় পড়িল ত অমনই ম্লান হইয়া গেল। মানুষ কি ভাই, ফুলের মর্য্যাদা বোঝে ?"

বালিকা লাল হইয়া উঠিল। রাণী আবার হাসিয়া বলিলেন,—"বিশেষতঃ রাজা-রাজড়াদের কাছে ফুলের আদর নেহাৎ কম। ফুল পাইলে ছিঁড়িয়াই তাঁদের আমোদ। সোনার হার কি পাথরের হার হ'লেই তাঁহাদের কাছে টেঁকে। তোমাকে যথন বোন বলিয়াছি—তথন আর লুকাইব কেন—এই যে আমাকে দেখিতেছ—একদিন কত যত্ন করিয়া রাজা গলায় পরিয়াছিলেন, আজ টানিয়া দূরে ফেলিয়াছেন"—

বালিকা কাঁপিয়া উঠিল—ভাবিল, এত কথা সমস্ত তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে। রাণী হাসিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তবে কি না, আমি সোনার হার—স্বর্ণে কলঙ্ক নাই—স্বর্ণ ম্লান হয় না—তাই ফেলিয়া দিলেও আমি নিজের গৌরবে নিজে আছি—কিন্তু তুমি যেরূপ ফুলটি, তোমার উপর যদি রাজার হাত পড়িত—ত একেবারেই মলিন হইয়া যাইতে।"

বালিকার লাল মুখ নত হইল—ঠোঁট সুস্পষ্ট কাঁপিতে লাগিল। রাণী বলিলেন—"বুঝিয়াছি,—তুমি বলিতেছ—গলায় থাকিয়া শুকাইতেও কি সুখ নাই ? আছে, যদি গলায় থাকা যায়। কিন্তু কণ্ঠে উঠিয়া আবার যদি সেথান হইতে মাটিতে পড়িতে হয় ত তাহার চেয়ে কি আর দুঃখ আছে ? তুমি ভাবিতেছ, তা কি কেউ ফেলিতে পারে ? পারে না ? আমি ত একদিন গলায় ছিলাম —তবে আমার এ দশা কেন ?"

বালিকার নতচক্ষে জল ভরিয়া আসিল, কিন্তু পড়িল না,—তাই রাণী দেখিতে পাইলেন না—তিনি বলিলেন,—"তবে আমি ত বলিয়াছি—আমি সোনার হার অর্থাৎ আমি বিবাহিত। কিন্তু মনে কর, তোমাকে যদি কেহ ভালবাসিয়া গলার হার করিতে চায়, অথচ বিবাহ না—"

বালিকা আর পারিল না, সে কাঁদিয়া ফেলিল। রাণী দেখিলেন, তাহার মনে আঘাত দিয়াছেন, ওরূপ করিয়া বলিয়া ভাল করেন নাই। রাণী ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—

"আমার কথায় কি তোমাকে কষ্ট দিতেছে বোন ? যদি আমার হৃদয়

দেখিতে ত বুঝিতে, কষ্ট দিবার ইচ্ছায় আমি তোমাকে কোন কথা বলিতেছি না। তোমাকে কষ্টের পথ হইতে দূরে রাখাই আমার ইচ্ছা। তোমার অন্ধ নয়ন মুক্ত করিয়া দেওয়াই আমার সঙ্কল্প। ভগিনি, আমি জানি, তুমি কাহাকে ভালবাস কিন্তু তুমি যে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী হইতে পারিবে না, তাহা হয় ত তুমি জান না, তাঁহার সংস্রবে তোমাকে কলঙ্কের পথে লইয়া যাইতেছে, স্ত্রী লোকের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় যে নাম—যথাসর্ব্বস্ব যে ধর্ম্ম, সেই নাম, সেই ধর্ম্ম—"

বালিকা কাঁদিয়া রাণীর হাত ধরিল। হাত ধরিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিল,—"দেবি, সত্যই কি তবে আমি কলঙ্কের পথে যাইতেছি? তাঁহার—তাঁহার ভালবাসা কি সত্যই অপমান? ক্ষেতিয়ার কথা আমি বিশ্বাস করি না—কিন্তু আপনিও যে উহা বলিতেছেন!"

রাণী আর কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহারও নেত্র জলপূর্ণ হইল। বালিকা আবার বলিল—"দেবি—সত্যই আমি ভালবাসি। নিজের অপেক্ষাও ভালবাসি। কিন্তু আমার গৌরবকে, আমার ধর্ম্মকে—তাহা হইতেও অধিক ভালবাসি, এ গৌরব বিনষ্ট হইলে আমার পিতামাতার অপমান হইবে—আমার অন্তর দেবতারও অপমান হইবে—আরো—আরো আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব—যাঁহাকে আমি ভালবাসি, তাঁহারও অপমান হইবে। এ গৌরব নষ্ট হইলে আমি তাঁহাকে ভালবাসিতেও অধিকারী নহি। আমি আর তাঁহার সহিত দেখা করিব না।"

রাণী আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। দুইজনে দুইজনের হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময় হরিতাচার্য্য আসিয়া বলিলেন, "বৎসেরা, মহারাজের স্নানে আসিবার সময় হইয়াছে।"

৩৮

রাজা ও পুরোহিত

সুহারকে জল হইতে উঠাইবার পরদিন সন্ধ্যাকালে আবার রাজা সেই তরুকুঞ্জে আগমন করিলেন।

আজ তেমনি চাঁদ উঠিয়াছে; বনপ্রদেশে, জলাশয়ে তেমনি শুভ্র জ্যোৎস্নার তরঙ্গ বহিতেছে, মহারাজ একাকী তীরে আসিয়া বসিয়াছেন, চারিদিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছেন, কেমন চমকিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন—সব আছে, তবু যেন কিছু নাই! কেবল পূর্ব্বদিনের সেই স্মৃতি, সেই মূর্ত্তি, সেই স্পর্শ তাঁহার

বাসনারুদ্ধ হৃদয় আলোড়িত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। অনেকক্ষণ থাকিয়া গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহারাজ চলিয়া গেলেন, মনের সহস্র কথা, প্রাণের নৈরাশ্য ব্যথা প্রাণেই রহিয়া গেল। পরদিন আবার সেই সময় আশায়-নিরাশায় বিকম্পিত হইয়া নিকুঞ্জে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আজও চারিদিক শূন্য, মহাশূন্য —আজও কোথাও কেহ নাই, মহারাজ মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া পড়িলেন। তরুলতার ঝর্ ঝর্ শব্দ, জলাশয়ের মৃদু হিল্লোল, বনফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ, চাঁদের মধুর হাসি শুধু কেবল তাঁহার প্রাণে অভাব জাগাইতে লাগিল—একটা আকুলতাময় অভাব—একটা বেদনাময় তীব্র অতৃপ্তির মধ্যে তিনি আত্মহারা হইলেন। সন্ধ্যা কাটিয়া গেল, গভীর রাত্রে সুগভীর নৈরাশ্য-বেদনা লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

শয্যাতে শুইয়াও তাহার কথা মনে পড়িতে লাগিল—পরদিন দেখা পাইবেন কি না, সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রা আসিল—তাহার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠিলেন, পাশে সেমন্তী যে কি অসীম জ্বালায় মুমূর্ষু, তাহা তিনি বুঝিতেও পারিলেন না।

এইরূপে প্রতিদিন কাজে-কর্ম্মে, বিশ্রামে-অবসরে কেবল একজনেরই কথা তাঁহার মনে জাগিতে থাকে—প্রতি সন্ধ্যায় তিনি হৃদয়পূর্ণ সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা লইয়া নিকুঞ্জে আগমন করেন, আবার সেই আকুল নিরাশা লইয়া গভীর রাত্রে প্রাসাদে ফিরিয়া যান। প্রতিদিন এইরূপ অভিনয় চলিতে লাগিল। রাজার আর ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই, লজ্জা নাই—তাঁহার উন্মত্ত হৃদয় সুহারের চরণে উপহার দিবার জন্য তিনি উন্মত্ত। রাজা কেবল ভাবিয়া আকুল, কিরূপে তাহার একবার দেখা পাইবেন।

রাজা নিকুঞ্জে সেই গাছের তলে যেখানে সুহারকে নামাইয়াছিলেন—সেইখানে দাঁড়াইয়া কেবল উহাই ভাবিতেছিলেন। "এইরূপে কি দিন যাইবে—প্রতিদিন এই পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া কি কেবল শূন্যকে উপহার দিতে আসিব? আবার নিরাশভাব বহন করিয়া একাকী ফিরিয়া যাইব? দিনের পর দিন যাইবে, আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা কি কখনো পূর্ণ হইবে না? এই আকুল উন্মত্ততা সত্যই কি উন্মাদের কল্পনাতেই বিলীন হইবে? ইহার কি প্রতীকার নাই? কেন এ সঙ্কোচ? যাহাকে হৃদয় দিয়াছি—সর্ব্বস্ব দিয়াছি—হৃদয়ের রাণী করিয়াছি, তাহাকে সিংহাসনের রাণী করিতে সঙ্কোচ? এই জন্য সমস্ত জীবনের সুখ-শান্তি কি লোপ করিব?"

এই সময় কাহার পদশব্দ শোনা গেল—রাজা চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন, —হরিতাচার্য্য আসিতেছেন। হরিতাচার্য্য নিকটে আসিলে তিনি মৌনে অভিবাদন করিলেন। হরিতাচার্য্য আশীষ করিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমাকে গোপনে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া আসিয়াছি—সভায় লোকজনের সাক্ষাতে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি না। শুনিতেছি, গণপতিকে তুমি আমার পরিবর্ত্তে পুরোহিত করিবে, প্রাসাদের পশ্চাতে ঐ নূতন মন্দির হইতেছে?"

গ্রহাদিত্য মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক্ হইলেন—হরিতাচার্য্যের প্রতি তিনি যতই বিরক্ত হউন না কেন, এখনও তাঁহাকে সন্তানের দৃষ্টিতে দেখিতেন—মহৎ লোকের একটি গম্ভীর আকর্ষণভাব আছে, তাহার হাত হইতে সহজে লোকে আপনাকে সরাইয়া লইতে পারে না। একটু পরে বলিলেন,—"ঠাকুর, গণপতিকে নূতন মন্দিরের পুরোহিত করিতেছি সত্য, কিন্তু আপনার পরিবর্ত্তে নহে, আপনি যেমন আছেন, তেমনি থাকিবেন। আপনার অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিতেই বা আমার অধিকার কি?"

হরিতাচার্য্য একটু হাসিয়া বলিলেন,—"অধিকার নাই থাকুক, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমি তোমাকে অধিকার দিয়া নিজেই বিদায় গ্রহণ করিব। কেবল কিছুদিনমাত্র তোমারি মঙ্গলের ইচ্ছায় আমার পৌরোহিত্য রাখিতে ইচ্ছা করি। ভগবান্ করুন যে, তাহার পর তুমি নিজে আমার এই অধিকার অন্যকে দান করিতে পার। কিন্তু যত দিন সে দিন না আসে, আমার পদ আমি ত্যাগ না করি, তত দিন বৎস, আমার অধিকার পূর্ণমাত্রায় যেন ভোগ করিতে পাই, তোমার মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু আমার কর্ত্তব্য—তাহা পালনে আমাকে যেন কুণ্ঠিত হইতে না হয়, তোমার বিরক্তির ভয়ে, তোমাকে মঙ্গল উপদেশ দিতে যেন পরাঙ্মুখ না হই।"

রাজা বুঝিলেন—কোন একটা উপদেশের ইহা পূর্ব্বসূচনা, বড়ই বিরক্তি বোধ হইল, কিন্তু কিছু বলিতে পারিলেন না। পুরোহিত বলিলেন,—"বৎস, কোন কারণে আমি কিছু দিন দেশে থাকিব না, গণগৌরীপূজা হইয়া গেলে তখন ফিরিয়া আসিব। যাইবার আগে আর একবার বলিয়া যাই, বৎস, সম্মুখে নিতান্তই অমঙ্গল, তুমি জাগ্রত না হইলে উপায় নাই।"

রাজা বলিলেন,—"আপনি ত ক্রমাগতই অমঙ্গল কল্পনা করিতেছেন, ইহাতে যতক্ষণ না জাগ্রত হই, ততক্ষণই কি মঙ্গল নহে?—অমঙ্গল সত্যই যদি ঘটে,

তখন তাহার ভোগ ত আছেই—এখন হইতে তাহার কল্পনায় জীবনকে কেন বিভীষিকাময় করা ?”

পুরোহিত। মহারাজ, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য, আমিও তাহা বুঝি, কিন্তু আগে হইতে সতর্ক হইলে এই অমঙ্গল হইতে রক্ষা পাওয়া যায় !

রাজা। “কিন্তু কি অমঙ্গল, তাহা যদি জানি, তবে ত রক্ষা পাইব ? আপনি অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট অমঙ্গলের উল্লেখ করিয়া আমাকে ব্যস্ত করিতে চান। কি অমঙ্গল হইতে আমাকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহা কি বলিয়াছেন ?”

পুরোহিত। বিদ্রোহের একটা লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

রাজা। ও কথা যদি বলেন ত সে লক্ষণ আর কেহ দেখিতেছেন না, অন্ততঃ আমি ত দেখিতেছি না ?

পুরোহিত। তোষামোদপূর্ণ রাজসভায় বসিয়া তুমি তাহা কিরূপে দেখিবে ? কিন্তু আমি দেখিতেছি, ভীলগণ দিন দিন অশান্ত, অসন্তুষ্ট হইতেছে।

রাজা। তা যদি হয়—ত বিনা কারণে হইতেছে, আমি এমন কিছুই কাজ করি নাই, যাহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট হইতে পারে—সুতরাং যাহার কারণ নাই—তাহার কারণ দূর করান অসম্ভব। লোকে যখন নিজের দোষে কষ্ট পায়, তখন দেবতাকে, ঈশ্বরকে গালি দেয়, কিন্তু সে গালি কি তাঁহাকে স্পর্শে ? আমি যদি নির্দ্দোষ হই ত তাহাদের অসন্তোষে কিছুই মনে করি না।

পু। মহারাজ, সত্য কথা, দুঃখ-কষ্ট আমাদের মনের দোষ ; কিন্তু সেজন্য বিধাতাকে দোষী করা পিতার উপর পুত্রের অভিমান, এই অভিমানের অর্থ দুঃখদূরের প্রার্থনা। সে অভিমান, সে প্রার্থনা বিধাতা না শুনিলে কে শোনে ? বুঝিলাম, প্রজারা নিজের দোষে কষ্ট পাইতেছে—কিন্তু তাহাদের দুঃখ তুমি না শুনিলে কে শোনে ?

রাজা। যদি সত্যই তাহাদের কোন দুঃখ থাকে, আমি শুনিতে অনিচ্ছুক নহি—কি বলিতে চান, আপনি বলুন।

হরিতাচার্য্য একটু নীরব হইলেন—তাহার পর বলিলেন,—“মহারাজ ভীলকন্যাকে ভালবাস।”

সেই পুরাতন কথা ! রাজা বুঝিলেন, হরিতাচার্য্য নিজের মন হইতে কথাটাকে নিতান্ত ফাঁপাইয়া তুলিতেছেন। সত্য সত্য এ কথার মধ্যে যে একটা কিছু বিপদ আছে, তাহা ভাবিলেন না। পুরোহিত কথা শেষ না করিতেই তিনি বলিলেন,—“দেব, আমার সব সহে—কিন্তু আমি কাহাকে ভালবাসি না

বাসি, আমার মনের কথা লইয়া টানাটানি করা আমার সহে না। আমার নিজের মনের কথা—সে রাজার কথা নহে, তাহার সহিত প্রজার কোন সম্বন্ধ নাই—আছে কি?"

পু। একটু আছে। ভীলকন্যা প্রজার কন্যা, এটা ভুলিও না। তুমি রাজা, তুমি রক্ষক, কেহ বিপথে পড়িলে তাহাকে রক্ষা করাই তোমার ধর্ম্ম, কিন্তু ভীলেরা ভাবিতেছে, তুমি তাহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিপথে লইয়া যাইতেছ।

ক্ষেতিয়ার কথা হইতে হরিতাচার্য্যের এইরূপ মনে হইয়াছিল।

পুরোহিতের কথা তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, একটা সত্য দ্বার তাঁহার কাছে খুলিয়া গেল—লোকে এরূপও ভাবিতে পারে। তথাপি তিনি রাগিয়া বলিলেন, "রাজার রাণী হওয়া একজন ভীলকন্যার কলঙ্কের কথা?"

পু। কিন্তু তাহা হইবে না, সে ভীল, তুমি ক্ষত্রিয়।

রাজা। সে সঙ্কোচ আমার চক্ষে—ভীলের পক্ষে নহে—আমি যদি তবুও—

পু। তাহা তুমি পার না—সে বিবাহ ধর্ম্ম-বিবাহ হইবে না—তাহাতে তাহার কলঙ্ক ঘুচিবে না।

রাজা। যদি কলঙ্ক হয়, সে কলঙ্ক আমার, ভীলদিগের তাহাতে কলঙ্ক নাই।

ক্ষুদ্র প্রজারও আত্মসম্মান রাজার সম্মান হইতে যে ন্যূন নহে, তাহা রাজা ভুলিয়া গেলেন, তিনি বড় লোক, তাঁহার সম্মানে সকলে সম্মানিত, এইমাত্র তখন তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল।

পুরোহিত বলিলেন,—"মহারাজ, তাহা নহে। তুমি রাজা, তুমি বড় লোক, তোমার কলঙ্ক লোকে দেখিবে না। কিন্তু ভীলগণ সামান্য হইলেও ইহাতে আপনাদিগকে কলঙ্কিত বিবেচনা করিবে। মহারাজ, আপনাকে আপনি ভুলিও না—প্রবৃত্তিকে দমন কর।"

মহা। আমার ভাবনা আমি নিজে ভাবিব, আপনার সে জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না।

মহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন।

পুরোহিত বলিলেন,—"মহারাজ, পাগল হইয়াছ—একটু বুঝিয়া দেখ, কি ভয়ানক কার্য্য করিতেছ, কেবল প্রজাদের ক্ষতি নহে,—আপনার রাজ্য জীবন সমস্ত খোয়াইতে বসিয়াছ।"

মহা। আমি কি চিরকাল মুখোসের ভয় পাইব, এখন আমি বালক নই, ইহা হয় ত আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ ত্রস্তে বিদায়-অভিবাদন করিয়া বাড়ীর দিকে পদক্ষেপ করিলেন।

পুরোহিত কাতর হইয়া বলিলেন,—"গ্রহাদিত্য, গ্রহাদিত্য, তোমার মৃত্যু তুমি নিজে আহ্বান করিয়া আনিতেছ।"

বলিতে বলিতে দেখিলেন, মহারাজ অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছেন—হরিতাচার্য্য থামিলেন। কাতর নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ভগবান্, তোমার লীলা বুঝা ভার! অদৃষ্টের চক্র তোমার হাতে—তাহাকে রোধ করিতে চেষ্টা করা মানুষের বৃথা পরিশ্রম, তবু আমরা না বুঝিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া মরি! কাহাকে তুমি শাস্তি দাও, তুমিই জান! পিতার দোষে পুত্রের শাস্তি। একের পাপে অন্যের প্রতিফল! মন্দালিকের বধের শাস্তি বুঝি আজ নাগাদিত্যকে বহন করিতে হয়!"

হরিতাচার্য্য ব্যথিত-চিত্তে চলিয়া গেলেন। কিয়দ্দিবস নাগাদিত্যের আসন্ন বিপদ খণ্ডন-কামনায় নির্জ্জনে ধ্যান স্বস্ত্যয়নে অতিবাহিত করিতে সঙ্কল্প করিয়া সেইদিনই মন্দিরপুর ত্যাগ করিলেন। তাহা ছাড়া আর অন্য উপায় দেখিলেন না।

৩৯

মূর্চ্ছা

রাণী পূর্ব্বে আর কখনও রাজাকে লুকাইয়া কোন কাজ করেন নাই, সুহারকে রাজার সহিত দেখা করিতে নিরস্ত করা তাহার এই প্রথম। এইরূপ কাজ সুতরাং যতই কর্ত্তব্য জ্ঞানে নীত হইয়া এই কার্য্যে উত্তেজিত হউন না কেন—কার্য্য শেষ হইবার পর হইতেই তাঁহার মনে কেমন একটা অনুতাপের ভাব জাগিয়া উঠিল। সত্য সত্য কাজটা ভাল করিয়াছেন কি না, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ জন্মিতে লাগিল; রাজার মঙ্গল উদ্দেশ্যেই যদিও এইরূপ কার্য্যে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন,—পাছে রাজা মোহান্ধ হইয়া একজন অজ্ঞান বালিকাকে বিপথে লইয়া যান, তাঁহাকে অন্যায়পথ হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই যদিও অনন্যোপায় হইয়া প্রথমে তাঁহার এই সঙ্কল্প মনে উদিত হয়, কিন্তু এখন তাঁহার ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল—নিজের স্বার্থের জন্যই কি তিনি এ সমস্ত করেন

নাই? বাস্তবিক কি রাজা এইরূপ অন্যায় কাজ করিতেন? তাঁহাকে এত দূর অবিশ্বাস করা—তাঁহার মহত্ত্বের প্রতি এত দূর সন্দেহ করা কি তাঁহার উচিত হইয়াছে? রাজা হয় ত বিবাহের আশা করিয়াই সুহারকে ভালবাসেন, সুহার যে তাঁহার ধর্ম্মপত্নি হইতে পারে না—ইহা হয় ত তিনি জানেন না; এ কথা হয় ত তাঁহার মনেই আসে নাই, কেহ তাঁহাকে ইহা বলিতেও হয় ত ভরসা করে নাই। এরূপ জানিলে রাজা নিজেই হয় ত সাবধান হইতেন, রাজাকে সাবধান না করিয়া তিনি কি না সুহারকে সরাইবার চেষ্টা করিতেছেন—স্বামীর কল্পিত সুখের পথে লুকাইয়া লুকাইয়া কন্টক অর্পণ করিতেছেন! এ সম্বন্ধে যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই রাণীর হৃদয়ে বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন,—"রাজা যদি সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারেন, তিনি না জানি কি মনে করিবেন? তিনি কি ভাবিতে পারেন না, ঈর্ষাপরবশ হইয়া নিজের সুখের জন্যই আমি সুহারকে আমার পথ হইতে সরাইতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রকৃত পক্ষে ইহাই কি ঠিক নহে? নিজের সুখের জন্যেই কি আমি লালায়িত নহি?"

রাণীর মনে হইতে লাগিল, তিনি নিজের স্বার্থের জন্যই সমস্ত করিয়াছেন,—রাজার জন্য যে তিনি এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। সেকথা একেবারে অবিশ্বাস করিলেন, তাঁহার মঙ্গল করিতে গিয়া সঙ্গে সঙ্গে শেষে মনে যে স্বার্থের কথা জাগিয়া উঠিয়াছিল—সেই স্বার্থই তাঁহার কার্য্যের একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করিলেন, অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, রাজার নিকট নিজের অন্যায় প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কেবল কিরূপ করিয়া বলিলেন—এই সঙ্কোচে নিতান্ত পীড়িত হইতে লাগিলেন। বলিবার আজকাল তেমন সুবিধাও ঘটে না, রাজা অধিক রাত্রে আসেন, ভোরে উঠিয়া যান—নিজে হইতে প্রায় কথাবার্ত্তা কহেন না,—এরূপ অবস্থায় কি করিয়া এ সব কথাই বা তোলেন! এই নূতন কষ্টে অন্য গুরুতর কষ্টও তাঁহার মনে লঘু আকার ধারণ করিল।

এদিকে গণগৌরী-পূজার উৎসব আগতপ্রায়, চৈত্র মাস পড়িয়াছে। ১০ই চৈত্র সমরাত্র-দিবার দিনে কৃষকদিগের নূতন, শস্য-বপন আরম্ভ হইল—চারিদিকে বসন্তের হিল্লোল শস্য বপনের ধূম। এইদিনে প্রতি সামান্য কৃষকঘরণীও স্বহস্তে একটি ক্ষুদ্র স্থান খুঁড়িয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে লাগিল। তাহাদের বিশ্বাস, সেই অঙ্কুরিত বীজ প্রিয়তমের অঙ্গরক্ষক হইলে সংবৎসর তাহাকে সমস্ত বিপদ

হইতে দূরে রাখিবে—সেই উদ্দেশ্যে অগ্নির উত্তাপে তাহারা বপিত বীজ শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুরিত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল।

রাণীও সহচরীদের সহিত শস্য বপন করিলেন, গান-বাদ্যের মধ্যে বীজ বপিত হইল, সেই আমাদের মধ্যে রাণীর মূর্ত্তি একটি শোকের ছায়া বোধ হইতে লাগিল।

দু চারিদিনে বীজ অঙ্কুরিত হইল, রাণী তাহা রাজাকে উপহার দিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—অনেক রাত্রি হইয়া গেল, দেখিলেন, মহারাজ তখনও অন্তঃপুরে আসিতেছেন না—রাণী আর অপেক্ষা না করিয়া নিজেই তাঁহার বিরাম-গৃহে গমন করিলেন। রাজা সবে মাত্র নিকুঞ্জ হইতে আসিয়া পালঙ্কে শুইয়াছিলেন, রাণী তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বুঝি রাজার চিন্তায় হঠাৎ বাধা পড়িল, তিনি সচকিতে উঠিয়া বসিলেন। গৃহের বাতায়ন মুক্ত, সুতরাং বাহিরে জ্যোৎস্না অল্প অল্প গৃহে আসিয়া পড়িয়াছিল, দীপও জ্বলিতেছিল, সেই মিশ্রিত আলোকে দু'জনের বিষণ্ণ মলিন মুখ দু'জনের চোখে পড়িল, দুজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন,—"দুদিনে কি পরিবর্ত্তন! আজ কেহ কাহাকে দেখিয়া কথা খুঁজিয়া পায় না, মনের কথা মনে থাকে, হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে মিলায়! মহিষী আস্তে আস্তে বলিলেন,—"মহারাজ, তোমাকে অঙ্কুর পরাইতে আসিয়াছি—"

রাজা বলিলেন,—"ওঃ! আজ অঙ্কুর পরিবার দিন, ভুলিয়া গিয়াছি।" রাজা উঠিয়া বসিলেন, শয্যার উপর রাজার মুকুট পড়িয়াছিল—রাণী তাহাতে অঙ্কুর বাঁধিয়া রাজার মাথায় পরাইয়া তাহার পর রাজা না বলিতেই পালঙ্কের একপাশে বসিলেন। রাজা একটু জড়সড় হইয়া পড়িলেন, রাজার মনে হইল, কোন একটা কথা কহা দরকার, কিন্তু কোন কথা যেন তার জোগাইতেছিল না—তিনি একবার ঢোঁক গিলিয়া, একবার গোঁপে তা দিয়া অবশেষে বলিলেন--

"আঃ, দিনটা কি গরম!" মহিষীর গাল বাহিয়া ধীরে ধীরে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, এখানকার এই সম্ভাষণ! এখন আর রাজা কথা খুঁজিয়া পান না!

কিন্তু রাজার এই ব্যবহারে তাঁহার হাসিও আসিল, তিনি হাসিয়া বলিলেন --"হাঁ মহারাজ! এখন ঠাণ্ডা হইবারও বিশেষ সুযোগ দেখিতেছি না—আমি জ্বালাইতে আসিয়াছি"—

এই কষ্টের মধ্যেও ঠাট্টা করিবার ভাব রাণী অতিক্রম করিতে পারিলেন না —বোধ করি, ইহা রমণীস্বভাব। হয় ত নিতান্ত নৈরাশ্যের মধ্যে একটু আশার ভাব যেখানে থাকে, সেইখানে এ বিদ্রূপ স্বাভাবিক, বুঝি ইহার পরিবর্ত্তে একটা

আদরের কথা, একটা ভালবাসার আশ্বাসের কথা শুনিতে ইচ্ছা করে।

কথাটার সত্যতা রাণীর কথাতেই রাজা অনুভব করিলেন, কিছু উত্তর করিলেন না।

রাণী আবার বলিলেন,—"ইচ্ছা করে, জ্যোৎস্নাখানা আনিয়া প্রাণটা ঠাণ্ডা করিয়া দিই।"

রাজা এ কথায় রাগ করিলেন না—একটু শুধু উদাস দৃষ্টিতে চাহিলেন—তাঁহার সেই জ্যোৎস্না মনে পড়িল, জ্যোৎস্নার জ্যোৎস্না মনে পড়িল, তিনি যেন সহসা আর সব ভুলিয়া গেলেন। দৃষ্টি সহসা যেন থমকিয়া গেল—একটা অলস উদাস ভাব ছাড়া সে দৃষ্টিতে আর কোন ভাব প্রকাশ পাইল না। ধীরে ধীরে রাণীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, বুঝিলেন—কিছুতেই আর তাঁহার ধন তাঁহার হইবার নহে, নিতান্ত আপনার লোক একবার পর হইলে বুঝি আর আপনার হইবার আশা থাকে না। তাঁহার বিদ্রূপের ভাব দূর হইল, একটা মর্ম্মভেদী কষ্টমাত্র তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। একটু পরে বলিলেন—"মহারাজ, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব—বলিবে কি ?"

রাজা বলিলেন,—"কি কথা ?"

রাণী অনেকক্ষণ থামিয়া থামিয়া অনেক কষ্টে বলিলেন—"তুমি ভীল কন্যাকে বিবাহ করিতে চাও ?"

যদি কোন কথা রাজা রাণীর সহিত কহিতে না চান ত সে ভীলকন্যার কথা। রাজা স্পষ্ট উত্তর না দিয়া বলিলেন,—"এ আবার কে বলিল ?"

রাণী বলিলেন,—"কেহ বলে নাই, কিন্তু আমার মনে হয়, লোকে এরূপ ভাবে।"

রাজা বলিলেন,—"লোকে কি ভাবে, তাহার উত্তর আমাকে জিজ্ঞাসা কেন ? তাহারা ত আমার সহিত পরামর্শ করিয়া ভাবিতে যায় না—তাহাদের ত জিজ্ঞাসা করিতে পার"—

রাণী বলিলেন,—"না, তাহাদের আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি না, তোমাকেও কেন জিজ্ঞাসা করিলাম, জানি না—আমি শুধু বলিতে আসিয়াছি—শুনিতেছিলাম ভীলকন্যা না কি তোমার ধর্ম্মপত্নী হইতে পারে না"—

রাজা। সে কথাটা কি আমার শুনা এতই আবশ্যক ?

রাণী। আমি ত মনে করি। কেন না, যখন তাহাকে বিবাহ সম্ভব নহে, তখন তাহাকে ভালবাসা দেখাইলে, মহারাজ, তোমার নামে কলঙ্ক উঠিবে।

আবার সেই কথা! মহারাজ রাগিয়া গেলেন—বলিলেন,—"বৃথা কলঙ্কে ক্ষতি নাই।"

রাণী বলিলেন,—"পুরুষের না থাকিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের আছে; তুমি রাজা; স্ত্রীলোকের কলঙ্ক মোচন করা তোমার কর্ত্তব্য—তুমি যদি"—

সমস্তই পুরোহিতের মন্ত্রণা, রাণীর মুখে তাঁহার প্রতি কথা! রাজা বলিলেন—"মহিষি, আমার কর্ত্তব্য আমি বুঝি, অন্য যদি কিছু তোমার বলিবার থাকে বল—উহা আমার ভাবনার বিষয়, আর কাহারও নহে।"

রাজার এরূপ অশান্ত অন্যায় ব্যবহারে রাণীও অপ্রকৃতিস্থ হইলেন, বলিলেন,—"তুমি এ বিষয়ে ভাব না বলিয়াই ত আমায় ভাবিতে হয়। তুমি যে একজন স্ত্রীলোককে কলঙ্কিত করিতেছে, তাহা যদি ভাবিতে, তাহা হইলে কি তোমার এরূপ মতি থাকিত? তোমার মঙ্গল তুমি না দেখিলে আমি অবশ্যই দেখিব, আমার সাধ্যমত আমার কর্ত্তব্য পালন করিব, তোমাকে ও সেই অবোধ বালিকাকে কলঙ্কের পথ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব—"

রাজা। স্বচ্ছন্দে তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিতে পার,—আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই।

রাণী। তোমার অনুমতির আগেই আমি তাহা করিয়াছি—সে আমাকে কথা দিয়াছে, তোমাকে আর দেখা দিবে না—

রাজা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, সেই জন্যই তবে সুহারকে দেখিতে পান না! রাণীরই সমস্ত কারখানা! রাজা আগুন হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"মহিষি, স্বামীই স্ত্রীলোকের আরাধ্য দেবতা—স্ত্রীলোকের সর্ব্বস্ব, স্বামীর সুখের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া যে নিজের ঈর্ষ্যা-পরিতৃপ্তি করিতে পারে—সে স্ত্রীলোক নহে, আজ হইতে তুমি আমার ত্যজ্যা।"

বজ্রের মত এই কঠোর বাক্য মহিষীর হৃদয়ে গিয়া বাজিল—রাণী মূর্চ্ছিত হইয়া পালঙ্ক হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন।

৪০

গৌরীপূজা

রাণী সচেতন হইয়া দেখিলেন, রাজাই তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন, তাঁহার মুখে আর পূর্ব্বের কঠোরতা নাই, বরঞ্চ যেন একটা উদ্বেগ-পূর্ণ করুণ ভাব তাঁহার মুখে ব্যাপ্ত। ইহার উপর আবার যখন তাঁহার পুরাতন কোমল স্বরে তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "মহিষি, এখন ভাল বোধ হইতেছে ?" তখন অশ্রুজলে রাণীর নয়ন ভাসিয়া গেল। সে অশ্রুজলও যেন রাজার মমতা আকর্ষণ করিল ; রাজার মুখে তাহাতে বেদনার ভাব প্রকাশিত হইল, রাণী আশ্চর্য্য হইলেন। কেবল তাহাই নহে, রাণী একটু সুস্থ হইয়া উঠিলে মহারাজ নিজে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন, এমন কি, সে রাত্রে তাঁহার সহিত একত্র শয়ন করিয়া মাঝে মাঝে নীরবে তাঁহাকে একটু একটু আদরও করিলেন। কখনও কখনও বা ভাল আছেন কি না, জিজ্ঞাসাও করিতে লাগিলেন, রাণীর নিরাশ প্রাণেও আশা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সে আশাটুকু না জাগিলেই ছিল ভাল। রাণী মূর্চ্ছিত হইলে রাজার মনে যে সহসা বিপদের আশঙ্কা জাগিয়া উঠিয়াছিল, যখন তাহা দূর হইল, তিনি যখন দেখিলেন—রাণী বেশ আরোগ্য হইয়াছেন, তখন ক্রমে তাঁহার ভাবেরও পরিবর্ত্তন হইয়া আসিল। অল্পে অল্পে তাঁহার করুণা-ভাব পূর্ব্বের কঠোরতায় বিলীন হইয়া পড়িল, দুই চারি দিনের মধ্যেই রাজার অন্তঃপুরে আসা শেষ হইল, রাণীর আশা-ভরসা সমস্তই ফুরাইয়া গেল।

রাণী বুঝিলেন—মিথ্যা আশা, মিথ্যা সব। রাজার ভালবাসা আর তিনি পাইবেন না ; তাহারও অধিক—রাজার মার্জ্জনাও তিনি আর পাইবেন না, রাজার চক্ষে তিনি দারুণ অপরাধী, সে অপরাধ তিনি ভুলিতে পারেন নাই, বুঝি কখনই পারিবেন না।

রাণী বজ্রাঘাতের যন্ত্রণা-ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজার ভালবাসা হারাইয়া ইতিপূর্ব্বে যে কষ্ট পাইতেন, সে কষ্ট যেন ইহার নিকট স্পষ্ট সুখ। মানুষ ভালবাসার সহস্র অনাদর—সহস্র উপেক্ষাও সহিতে পারে, যদি সে বুঝে, আমি যাহার জন্য এত সহিতেছি—তাহার নিকট ভালবাসার প্রতিদান না পাই, তাহাকে ভালবাসিয়া যে আমার এত কষ্ট, অন্ততঃ তাহাও সে বুঝিতেছে। এই বুঝায় সহস্র কষ্টের সান্ত্বনা—এই বুঝাতেই আত্মবিসর্জ্জন সুখময়। কিন্তু রাণী দেখিলেন, রাজা সেটুকুও বুঝিতেছে না, কেবল যে বুঝিতেছেন না, তাহা নহে, বিপরীতই বুঝিতেছেন, তিনি ভাবিতেছেন, তিনি রাণীর প্রতি অন্যায় করেন নাই, রাণীই তাঁহার প্রতি অন্যায় করিয়াছেন, রাণীর নিকট তিনি ক্ষমার পাত্র নহেন, রাণীই তাঁহার নিকট দারুণ অপরাধী, রাণী ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সুখে বাদ সাধিয়াছেন—তাঁহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। এ অবস্থায় রাণীর সুতীব্র জ্বালার উপশম কোথায় ?

রাণীর জীবনে মৃত্যুর ছায়া দিন দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। রাণী-মুমূর্ষু ভাব

লইয়া শূন্য দৃষ্টিতে শূন্য নিরীক্ষণ করিয়া চাহিয়া থাকেন, মাঝে মাঝে বাপ্পা যদি কোলে আসিয়া বসে, গলা ধরিয়া আদর করে, তিনি তাহার প্রতিদান না দিয়া একবার শুধু তাহার দিকে চাহিয়া দেখেন, তাহার পর অন্যমনস্ক হইয়া তাহার কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। মায়ের এরূপ অস্বাভাবিক ভাব বাপ্পার ভাল লাগে না; সে তাঁহার কোল ছাড়িয়া অন্য দিকে চলিয়া যায়। তাহাতে তাঁহার একবার চোখ ছল ছল করে না, একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে না।

সখীগণ অনেক সময় তাঁহার সম্মুখে রাজা ও সুহারের কথা লইয়া অর্দ্ধস্ফুট ভাষায় গল্প করে, রুক্মিণী তাঁহাকে যখন তখন তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ভৎ‍র্সনা করে, তাঁহার চোখ ফুটাইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়া রাজার নামে নানাপ্রকার নূতন গুজবও শুনাইতে ছাড়ে না, কিন্তু রাণী সকলি চুপ করিয়া শুনিয়া যান, কিছুতেই কিছু কথা কহেন না; সখীরা তাঁহার ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়া যায়।

সখীরা আজকাল তাঁহার কাছে নিয়মিত নৃত্যগীত করে, দিন কতক আগে তাহাতে তিনি যেরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন—এখন যে সব কিছুই নাই, তাহারা তাঁহার নিকট আমোদের কথা কহিলেও তিনি তাহাদের থামিতে বলেন না। তাহারা ভাবে, দিন দিন রাণী তাঁহার দুঃখে অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছেন, তাহারা আহ্লাদিত হয়, রুক্মা কেবল তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া কাঁদিয়া মরে। তাহাদের এই আমোদ ও কান্নায় রাণীর মনে কোন ভাবেরই ব্যত্যয় হয় না। কোন সুখ দুঃখ যেন আর তাঁহার হৃদয়ের শূন্যতাকে বিচলিত করিতে পারে না, তাঁহার নির্জীবতাকে জীবন দিতে পারে না, মৃত্যুর আলিঙ্গনেই বুঝি একমাত্র তাহার নবজীবন পাইবার আশা আছে।

কিন্তু এ কথা আমরা বলিতেছি, তাঁহার হৃদয়ে এরূপ কোন আশা-নিরাশার কথাও যেন উদয় হয় না, তাঁহার এ জীবনের একটা পরিণাম যে শীঘ্র আসিতেছে, তাহা তিনি বুঝিয়াছেন, কিন্তু সে পরিণামে আশা কি নিরাশা, আঁধার কি আলোক, তাহা তিনি ভাবেন না, এ কথা মনে হইলে তাঁহার কেবল এই মনে হয়, ইহার পূর্ব্বে তাঁহার একটি কাজ করিবার আছে।

আজ গৌরী-পূজার শেষদিন। রাজবাটীতে আজ মহোৎসব। গৌরী আজ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া রাজ-অন্তঃপুরের রমণীগণ কর্ত্তৃক প্রাসাদ হইতে অবতরিত হইয়া মন্দির-ঘাটে আনীত হইবেন। ইহা মহিলাদিগেরই বিশেষ পর্ব্ব। রাজবাটীর মহিলাগণ আজ সমস্ত নিরানন্দ ভুলিয়াছে। তাহারা গৌরীকে ঘাটে

লইয়া গিয়া পূজার আমোদ, উৎসব করিবে।

পুরুষ যদিও মুখ্যভাবে কেহ এ উৎসবের মধ্যে নাই, তথাপি এ উৎসবে তাহাদেরও যে আনন্দ কিছুমাত্র কম, তাহা নহে। তীরে উৎসব-আসরে পুরুষের গতিবিধি নিষিদ্ধ, সুতরাং অসংখ্য নৌকা নদীবক্ষ আন্দোলিত করিয়া শত শত উৎসুকদৃষ্টি, কৌতূহলউত্তেজিত দর্শক পুরুষদিগকে ধারণ করিয়া আছে। রাজার নৌকা সমস্ত নৌকাসমূহের অগ্রে!

সেতারা-বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার ও রমণীকণ্ঠের গীতধ্বনি ক্রমে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল, দর্শকগণ প্রত্যেকের মস্তকের উপর প্রত্যেকে ঊর্দ্ধমস্তক হইবার চেষ্টায় নৌকা জলমগ্ন করিবার উপক্রম করিয়া তুলিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজোদ্যান নানাবর্ণের ফুলে যেন সজ্জিত হইয়া উঠিল। নানাবর্ণ বস্ত্রে নানারূপ সাজে সজ্জিত নদী অভিমুখী রমণীমণ্ডলীর সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ যেন সহসা নদীবক্ষ পর্য্যন্ত অভিঘাত করিয়া তুলিল, দর্শকবৃন্দ সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল, দাঁড়ির হাতের দাঁড় আর নামিল না, মাঝি হাল চালাইতে ভুলিয়া গেল, অপরিমিতি ঔৎসুক্যপূর্ণ স্থিরদৃষ্টিতে সকলে তীরের দিকে চাহিয়া রহিল। সকলেই জানিতে ব্যস্ত, কে আজ গৌরীর অগ্রগামী হইয়া আসিতেছেন? কোন সৌভাগ্যবতী মৃগনয়নী, কোন্ "নাগিনী অলক" রমণী রাণীর শুভদৃষ্টিতে পড়িয়া রূপসী-শ্রেষ্ঠরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া আজ এই সম্মানের পদলাভ করিয়াছেন? কত স্বামীর, কত পিতার, কত ভ্রাতার, কত আত্মীয়ের হৃদয়-স্পন্দন সহসা যেন বন্ধ হইয়া পড়িল।

সাধারণের কৌতূহলের মধ্যে রাজা এতক্ষণ কেবল নিরুৎসুকভাবে বসিয়া ছিলেন, উৎসবের কথা এতক্ষণ তাঁহার যেন মনেই ছিল না, উথলিত গীতধ্বনি এতক্ষণ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল কি না সন্দেহ, কেন না, তীরের দিকে তিনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত একবার চাহিয়াও দেখেন নাই, নদীর গর্ভে যেদিকে দুএকটি বড় বড় প্রস্তরখণ্ডকে আহত বা প্রতিহত করিয়া সুহারমতীর কৃষ্ণজলরাশি সফেন শ্বেত তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে যাইতেছিল, রাজা সেই দিকে চাহিয়াছিলেন। সেই জলরাশির দিকে চাহিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল, তিনি কাল রাত্রে কি যেন একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—যাহাতে তাঁহার হৃদয় এইরূপ আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বপ্নটি কি, তিনি মনে করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু মনে পড়িতেছিল না; অনেক করিয়া চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই মনে পড়িল না। তিনি ভাবিতে ভাবিতে ঊর্দ্ধমুখ হইলেন, মুখ

উঠাইবার সময় তাঁহার তীরের দিকে দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, রমণীমণ্ডলী নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। এই সৌন্দর্য্য-দৃশ্যে আকৃষ্ট হইয়াই হৌক, কিংবা অভ্যাসবশতঃই হৌক, সহসা তাঁহার স্তিমিত দৃষ্টিতেও উৎসুক প্রকাশ পাইল।

রমণীগণ নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মন্দিরদালান রূপের আলোকে ভরিয়া গেল, নদীর সোপানে গৌরী অবতরিত হইলেন, সহস্র সহস্র কৌতূহল-উদ্দীপ্ত নয়ন দেবমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে সর্ব্বাগ্রে একটি মানবীমূর্ত্তির উপর স্থাপিত হইল। সকলে দেখিল, গৌরীর অগ্রগামী চামরধারিণী জীবন্ত লক্ষ্মীস্বরূপা প্রতিমা কে? সুন্দরীর হস্তস্থিত চামর আন্দোলনে আন্দোলিত হইয়া তাহার মস্তকের ওড়না স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, যুঁই-ফুলে সজ্জিত যত্নবিন্যস্ত কেশভার শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, সেই শিথিল সাজসজ্জা তাঁহার পূর্ণ সৌন্দর্য্যকে দর্শকদিগের চক্ষে যেন উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। রাজা কি দেখিতেছেন, কাহাকে দেখিতেছেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন না। দর্শকবৃন্দ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়া গৌরী-প্রণাম করিল, তিনিও প্রণাম করিলেন, কিন্তু বুঝিলেন না, কাহাকে প্রণাম করিতেছেন, কে দেবী। তিনি যখন প্রণাম করিয়া আবার মুখ তুলিলেন,—তখন সুহারের কেশরাশি একেবারে এলায়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সেই কৃষ্ণ কেশপাশের মধ্যে মহারাজের দৃষ্টি যেন সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল, মহারাজের মনে পূর্ব্ব-রাত্রের স্বপ্নটি সহসা জাগিয়া উঠিল—তিনি আবার সেই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সুহারের কেশরাশির অন্ধকার যেন চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, মহারাজ আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এক দারুণ অন্ধকারের মধ্যে তিনি মগ্ন হইতে লাগিলেন, তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল, সেই অন্ধকারকে সবলে ছিন্ন করিয়া একটি আলোক ধরিতে ব্যগ্র হইয়া সেই অন্ধকারকেই আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। অমনি সেই অন্ধকারের মধ্যে দুইটি মুখ তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইল। একজনের মুখে হাসি, একজনের বিষাদময়ী প্রতিমা। প্রথমটি গণগৌরী মহাদেবী, মহারাজের দুর্দ্দশায় তিনি হাসিতেছেন, কিন্তু বিষাদময়ী প্রতিমাখানি কার, তাহা তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না, যেন তাঁহাকে চেনেন, খুবই চেনেন, যেন হঠাৎ ভুলিয়া গিয়াছেন। রমণীর নেত্র হইতে এক বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, রাজা চমকিয়া উঠিলেন—দেখিলেন, তাহা অশ্রুবিন্দু নহে—রক্তবিন্দু। তখন তিনি সেমন্তীকে চিনিতে পারিলেন। সহসা সেই রক্তবিন্দু একটি রমণীমূর্ত্তিতে পরিণত হইল, রাজা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, তিনি ত অন্ধকারকে আলিঙ্গন করেন নাই —সেই রমণীকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। সে রমণী আর কেহ নহে, সুহার। তখন

তিনি আবার আর সমস্ত কথা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল, জগতে আর কেহ নাই, বিশ্ব কেবল তিনি ও সুহারময়। এই সময় তাঁহার চমক ভাঙ্গিল—স্বপ্নের শেষ অনুভবমাত্র হৃদয়ে লইয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি তীরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, রমণীগণের নৃত্যগীত উৎসব শেষ হইয়াছে, তাঁহারা গৌরীকে ফিরাইয়া লইয়া গৃহে গমন করিতেছেন। মহারাজ সেই রমণীদিগের মধ্যে এক জনকে আর একবার দেখিবার প্রত্যাশায় উদাস দৃষ্টিতে চাহিলেন, ততক্ষণ নৌকা বাচ খেলিয়া তাঁহাকে দূরে লইয়া ফেলিল, তিনি তথাপি সতৃষ্ণ নয়নে উন্মুখ হইয়া রহিলেন। বুঝি বুঝিতেও পারিলেন না, সে ঘাট আর তাঁহার দৃষ্টির মধ্যে নাই।

আর সকলকে গৌরীর সহিত গৃহে পাঠাইয়া সেমন্তী মন্দিরঘাটে অশ্রুহীন নেত্রে তখনও দাঁড়াইয়া ছিলেন। যখন রাজার নৌকা চলিয়া গেল, তখন তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—"নাথ, এখনও কি তুমি মনে করিতেছ, আমি ঈর্ষ্যাবশতঃ সুহারকে তোমার দৃষ্টিপথ হইতে সরাইয়াছিলাম? এখনও কি তুমি মনে করিতেছ, ইচ্ছা করিয়া আমি তোমার সুখে বাদ সাধিয়াছি?"

৪১

প্রতিজ্ঞা

যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই মহিমময়,—সর্ব্বত্র তাহার মাহাত্ম্য—তাহার সমাদর, ইহা সত্য; কিন্তু এ সত্য অনন্তের পক্ষে যেমন অকাট্য সত্য—সংসারের পক্ষে তেমন নহে। কত সত্য সংসার ধারণ করিতে পারে না—কত সৌন্দর্য্য অনাদরে ম্লান হইয়া যায়। বেদের সত্য পুরাণে বিকৃত, বিজ্ঞানের সত্য অজ্ঞানে আবরিত। কত গুণ অমর্য্যাদায় অনন্তের জ্যোতিতে আত্মা মিলাইতেছে—কত রূপ বিষাদের কারার মধ্যে ফুটিয়া অনাদরে ঝরিয়া পড়িতেছে। অনন্ত তাহাদের আদর করিয়া লইতেছে সত্য, তাহাদের মঙ্গল ভাব অনন্তের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে সত্য, কিন্তু সংসার কি তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে? এই শত-সহস্র মহিলাদিগের মধ্যে সহসা যে কয়েকটি সংসারের অনুগ্রহ নয়নে পড়ে—তাহারাই ক্ষণজন্মা,—ক্ষণের গুণেই তাহাদের আদর, মহিমা-গুণে নহে। কেন না, তাহাদের মত কিম্বা তাহাদের অপেক্ষা আরও ত এমন অনেক মহিলা সংসারে জন্ম লইয়াছে কিন্তু তাহারা ত কৈ, এই শুভাদৃষ্টদিগের ন্যায় আদর পায় নাই।

কত শত সুকোমল সুগন্ধ ফুলরাশি কঠোর পদাঘাতে প্রতিদিন দলিত হইতেছে—কিন্তু ঐ যে দেখিতেছ গন্ধহীন শুষ্ক স্খলিতদল মালাগাছি অতি যত্নে এখনও রক্ষিত হইয়াছে—উহা কেবল এক শুভক্ষণের প্রণয়োপহার বলিয়া বৈ ত নয়!

সুহারও বোধ হইতেছে, সেইরূপ একজন ক্ষণজন্মা। মহারাণীর নিকট সৌন্দর্য্য-সম্মান পাইয়া তাহার রূপের প্রশংসায় সহর ধ্বনিত হইতেছে। রাজধানীতে কি আর তাহার মত কেহ সুন্দরী নাই? কেন, মহারাণী নিজে কি কিছু কম রূপসী? কিন্তু ভীলকন্যার সৌন্দর্য্যের কথা ছাড়া আর কাহারও মুখে কোন কথা নাই। যাঁহারা আপনাদিগকে এতদিন প্রসিদ্ধ সুন্দরী বলিয়া জানিতেন—তাঁহারা কেবল এই প্রশংসায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিতেছেন ও মাঝে মাঝে নাসিকা তুলিয়া সুহারের কোথায় কোন্ খুঁৎটি আছে, বাহির করিতে গিয়া আপনাদের ইচ্ছার বিপরীতে তাহার রূপেরই ব্যাখ্যান করিতেছেন।

মহারাণী স্বয়ং কাল ইচ্ছা করিয়া সুহারকে ডাকিয়া লইয়া এই সম্মান প্রদান করিয়াছেন—জুমিয়ার হৃদয় একেই আহ্লাদে ভরিয়া গিয়াছে—তাহার উপর আজ আবার সকলেরই কাছে কন্যার এই সমাদরের কথা শুনিতেছে—জুমিয়া সন্ধ্যাকালে যখন বাড়ী ফিরিয়া গেল, তখন তাহার যেন আর মাটিতে পা পড়ে না। বাহির হইতে আসিয়া প্রতিদিন সে যেমন সর্ব্বাগ্রে জঙ্গুকে দেখিতে যাইত, আজও আনন্দভরা হৃদয় লইয়া প্রথমেই তাহার গৃহে প্রবেশ করিল, কিন্তু গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল,—জঙ্গুর মুখ অতিশয় গম্ভীর, অতিশয় অন্ধকার,—বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবধি জুমিয়া জঙ্গুর এরূপ ভ্রূকুটিবদ্ধ অন্ধকার মুখ দেখে নাই। যেদিন জঙ্গু জুমিয়াকে নাগাদিত্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল, সেইদিন জুমিয়া তাঁহার এইরূপ মুখ দেখিয়াছিল, জুমিয়া চমকিয়া উঠিল, ভয়ে ভয়ে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিল, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবাডা ভাল আছুস্?"

জঙ্গু বলিলেন,—"জুমিয়া, কি শুনুছি কি—পাষণ্ড রাজাডা মুইদের ধরম খোয়াউতে চায়!"

জুমিয়া কিছুই বুঝিল না—অবাক্ হইয়া রহিল।

জঙ্গু সমধিক উগ্রস্বরে বলিলেন, "শুনুছিস্, সেই পাষণ্ড অমনিষ্যি নাগাদিত্যডা—যানারে তুইডা পরাণ-বঁধু ভাবুছিস—সেইডা মোর মেয়েরে ভুলই লউছে।"

জুমিয়ার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, জুমিয়া বলিল—"বাবা, কি বলুস্?"

"সেইডা—তোর পরাণ-বঁধুডা—তোর দেউতাডা, রাতে চুপুচুপি সুহারের

সাথে রোজ দেখা করুছে—তানাডার যাদুতে সুহার ধরম ভুলুল—জ্ঞেয়ান খোয়উল, সেই পাষণ্ডরে সুহার ভালুবাসুছে। তানার লাগিন সে সব করুতে পারে—তানারই লাগি সে ক্ষেতিয়ারে বিয়া করুতে নারাজ। যানার লাগিন তুইডা ধরম খোয়াউলি—সেই বঁধুর লাগিন তোর মেয়েডাও ধরম ভুলুছে।"

বলা বাহুল্য, জঙ্গুকে ক্ষেতিয়া সব কথা বলিয়াছে। সে যখন দেখিল গৌরীর অগ্রগামী হইয়া আবার সুহার রাজার সহিত দেখা করিল, তখন আর সে নীরব থাকিতে পারিল না, সেই গণৎকারের পরামর্শ আর সে অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিল না—পরদিনই সে জঙ্গুকে সব খুলিয়া বলিল।

জঙ্গুর কথা শুনিয়া জুমিয়া পাগলের মত স্বরে বলিল—"মিছা মিছা। এ হউতে নারে ?"

জঙ্গু গৃহের অন্য দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—"ক্ষেতিয়া, কথাডার উত্তর দে। শুন্ছিস তুই মিছা বলুস।"

ক্ষেতিয়া সেই ঘরেই কিছু দূরে বসিয়াছিল, জুমিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই, সে ক্রুদ্ধভাবে নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "মিছা না, সব সত্যি। মুই এই দুই চক্ষে দেখিনু—রাতে সুহার রাজাডার সাথে বেড়াউছে। ইচ্ছা করুস, সুহারকে শুধুই দেখ ; সেডাও এ কথা মিছা বলুবে না।"

জুমিয়ার রক্ত চন চন করিয়া উঠিল, সে দাঁড়াইয়া তাহার বজ্রমুষ্টি ক্ষেতিয়ার দিকে নিক্ষেপ করিল, এ কথা যে মুখে আনে, সেই যেন শাস্তির যোগ্য। কিন্তু মুহূর্ত্তে সেই বজ্রমুষ্টি শিথিল হইল, তাহার মুখের কঠোরতা অসহ্য কষ্টকর ভাবের বিকাশে প্রশমিত হইয়া পড়িল—জুমিয়া বসিয়া পড়িয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। জঙ্গু বলিলেন—"রক্ত, রক্ত, জুমিয়া, কাঁদুবার কাল এডা নয়।"

জুমিয়া বলিল, "রক্ত। রক্তে কি এ কালী ধুইতে পারুবে।"

জঙ্গু সেই বজ্র স্বরে বলিলেন, "হুঁ, রক্ত, রক্ত, সেই পাষণ্ডের রক্ত দিউ এ কালী ধুই ফেল।"

জুমিয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখে আশার ভাব উদ্দীপ্ত হইল।

জঙ্গুর হৃদয়-আশা পরিতৃপ্তির আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। কিন্তু জুমিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "বাবা, বিয়া, বিয়া, রাজার সঙ্গে সুহারের বিয়া, নউলে রক্তের তুফান তুলুলেও এ কালী ধুউবার নয়—"

জঙ্গু তাহার কথায় অবাক্ হইলেন, তিনি কি ভাবিয়াছিলেন—জুমিয়া কি বলিল! তীব্র বিদ্রূপ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "রাজা তুইডার মেয়েকে বিয়া

করুবে ?"

জুমিয়া। বাবা, মোর মেয়ে নাই—তুইডা জানুস, সুহার মোর মেয়ে না—ক্ষেতিয়া-কনিয়া (ক্ষত্রিয়-কন্যা)। মুই রাজাডারে তাই বলুব—

একটু আগে জঙ্গুর দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল, এবার জুমিয়া শোধ লইবে, নিরাশ হইয়া বলিলেন, "কাপুরুষ, যদি বিয়া করে ত তোর মেয়ে বলি করুবে না—তানারে মেয়ে দিবি ? রক্ত রক্ত—এ অপমানডার শোধ রক্ত"—

জুমিয়া বলিল—"যদি বিয়ে না করে, মুইডা এই কিরে (শপথ) করুছি, তানাডার রক্তে এই অপমানডার শোধ লউব, জানুব সে সত্যই পাষণ্ড, মোর বঁধু নয়, শত্রুর।"

বলিয়াই জুমিয়া জঙ্গুকে আর কোন কথা কহিতে না দিয়া দ্রুতবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

৪২

নববিধান

রাজবাটীর মহিলাগণ গৃহে ফিরিয়া গেলে, অন্যান্য বৎসরের ন্যায় রাজা ও সভাসদ্‌দিগের নৌকায় খানিকক্ষণ ধরিয়া বাচ চলিল। কিন্তু এবারকার বাচ বড় জমিল না, কেন না, ইহাতে রাজার উৎসাহ প্রকাশ পাইল না,—সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যেই দাঁড়িমাঝিগণ বাচ বন্ধ করিয়া অন্য অন্য ঘাটের ছোট ছোট সমারোহের নিকট দিয়া নৌকা আস্তে আস্তে কূলে কূলে চালাইয়া লইয়া চলিল। ঘাটে ঘাটে সুন্দরীগণ গান গাহিতে গাহিতে রাজার নৌকা দেখিয়া সসম্ভ্রমে নত হইতে লাগিল, তাহাদের উৎসাহিত হৃদয়ের গীতি-উৎস রাজদর্শনে দ্বিগুণভাবে উথলিত হইতে লাগিল। রাজার নৌকা সেই সকল দৃশ্যের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু সে সকল কিছুই আর রাজার নয়নে পড়িল না।

নিয়মিত সময়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বোট আবার মন্দিরঘাটে লাগিল, রাজা সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তীরের দিকে চাহিলেন, তাহার পর কলের পুতুলের মত ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িলেন। তখনও তাঁহার মনে পূর্ণমাত্রায় তীরের সেই রূপের দৃশ্য জাগিতেছিল সেই পুষ্পসজ্জিত-স্খলিত-কেশ: সচকিত নয়না মূর্তিমতী শ্রীরূপিণী লজ্জাশীলা গায়িকা-প্রতিমা তাঁহার চারিদিকে ঘুরিতেছিল। তাঁহার মনের মধ্যে, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে, আকাশ-পাতালে তাহা বিরাজ করিতেছিল,

রাজার হৃদয় সেই অসংখ্য অনন্ত একই মূর্ত্তির মধ্যে তিল তিল করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজার তাহা ফিরাইবার ক্ষমতা নাই, বিশ্বের মত তাঁহার হৃদয় কেবলি শত তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া সে অনন্ত মূর্ত্তির উপর যেন লীন হইতেছিল। রাজা নদী হইতে উঠিলেন কিন্তু বাড়ী গেলেন না। সভাসদেরা সকলে অভিবাদন করিয়া গৃহে ফিরিল, তিনি সেই উন্মত্ত ঘূর্ণ্যমান মদির-বিহ্বল আলোড়িত মস্তক লইয়া নদীতীরে একাকী বিচরণ করিতে লাগিলেন. কিছু পরে প্রহরীকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—"গণপতি ঠাকুরকে এইখানে ডাকিয়া আন।"

গণপতি এখন আর মন্দিরে থাকেন না. যত দিন নূতন মন্দির শেষ না হয়, তত দিন রাজপ্রাসাদেরই একটি কক্ষে গণপতির আবাস। গণপতি আসিয়া দেখিলেন, মহারাজের মুখ-চক্ষু প্রদীপ্ত অথচ অন্ধকার, ওষ্ঠের উপর শুষ্ক অধর, সজোরে রক্ষিত, কি যেন আবেগভরে বাম হস্ত নবীন শ্মশ্রুজালে ঘন ঘন অর্পিত হইতেছে, দক্ষিণ হস্ত কটিস্থ তরবারিতে মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আছে। গণপতিকে দেখিয়া মহারাজ সহসা যেন বিচলিত হইয়া উঠিলেন, তাহার পর প্রণাম করিয়া তাঁহাকে মন্দির-সোপানে উপবিষ্ট হইতে কহিয়া নিজেও সেই সোপানে উপবিষ্ট হইলেন। খানিকক্ষণ তাঁহাদের মৌনভাবেই কাটিল। রাজা কি বলিবেন, যেন ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। কিছু পরে বলিলেন, "ঠাকুর, আপনার সহিত আমি একটি বিষয়ে পরামর্শ করিতে চাই।"

রাজার অস্বাভাবিক ভাব দেখিয়া গণপতি ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার কম্পমান স্বরে—তাঁহার অসময়ের এই কথায় আরও ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "পরামর্শ! এখনি বলিতে আজ্ঞা হউক।"

রাজা একটু থামিয়া বলিলেন,—"কথাটা এই, আমি জানিতে চাই, রাজার কাজ কি? আপনি কি বলেন?"

গণপতি অবাক্ হইলেন, কি ভাবিয়া রাজা ইহা বলিতেছেন, বুঝিলেন না বলিলেন,—"রাজার কাজ? প্রতিপালন।"

রাজা। প্রতিপালনের অর্থ কি? প্রজাদের স্বচ্ছন্দে রক্ষা করা?

গণপতি। হ্যাঁ, রক্ষা করা।

রাজা। তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের রক্ষার জন্যই দণ্ডবিধির আবশ্যক?

গণপতি। হ্যাঁ, যথার্থ—

রাজা। কেবল দণ্ডবিধি নহে—সমাজবিধিরও আবশ্যক?

গণপতি। অবশ্য, অবশ্য—

রাজা। যখন দেখা যায়—কোন প্রতিষ্ঠিত বিধি সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে হানিকর, তখন সে বিধির পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য বিধি প্রবর্ত্তিত করা রাজার অবশ্যই কর্ত্তব্য ?

গণপতি। অবশ্য, অবশ্য।

রাজা তখন ধীরে ধীরে বলিলেন,—"ঠাকুর, আমি বিবাহ সম্বন্ধে একটি নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত করিতে চাই—"

গণপতি চমকিয়া উঠিলেন,—বলিলেন—"বিবাহ সম্বন্ধে ?"

রাজা বলিলেন,—"হাঁ, বিবাহ সম্বন্ধে। বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের সামাজিক বিধি বড়ই মন্দ—"

গণপতি। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে কি সামাজিক বিধি ? ইহা স্বয়ং ভগবান্ মনু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা অন্যে কি—

রাজা বলিলেন,—"মনু যে বিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আর এখন ধর্ম্ম-বিবাহ বলিয়া চলিত নাই, আমি সেই বিধিই পুনঃ প্রচলন করিতে চাই"—

গণ। তাহাই পুনঃ প্রচলন করিতে চান ?

রাজা। হাঁ, মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন—

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ সা চ বিশঃ স্মৃতেঃ।
তে চ সা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ সা চাগ্রজন্মনঃ॥

কিন্তু এখন কোন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যদি নিজ বর্ণের কন্যা ব্যতীত অন্য বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করেন, তবে তাহা ধর্ম্ম-বিবাহ বলিয়া সিদ্ধ হইবে না,—কি ভয়ানক—"

গণপতি। কলিযুগ—মহারাজ, কলিযুগ !

রাজা। কিন্তু কলিযুগে মানুষও জন্মিতেছে, তাহাদের সুখ-দুঃখও উপেক্ষণীয় নহে—

গণপতি। তাহা সত্য।

রাজা। তাহা যদি সত্য হয়—তাহা হইলে আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আপনার আজ্ঞায় আমি মনুর বিধান পুনঃ প্রচলন করি—

গণ। কিন্তু—

গণপতির সহসা বোধ জন্মিল, এতক্ষণ পরে রাজার হৃদয়ে তিনি প্রবেশ করিলেন, গণপতি কি কথা বলিতে গিয়া সহসা থামিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"মহারাজ, ভীলকন্যাকে আপনি বিবাহ করিতে চান ?—"

রাজা চুপ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গণপতি বলিলেন —"কিন্তু তাহাতে ত নূতন বিধির আবশ্যক কিছু দেখি না, কোন্ গর্ব্বিত ভীল পিতাও না তাহার কন্যাকে আপনার দাসী করিতে সৌভাগ্য জ্ঞান করিবে? আপনার ইচ্ছাপ্রকাশের মাত্র অপেক্ষা।"

রাজা কি বলিতে যাইতেছিলেন—আর বলা হইল না, দেখিলেন, যেন তাঁহাদের দিকে কে অগ্রসর হইতেছে, অল্পক্ষণের মধ্যেই জুমিয়া তাঁহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

৪৩

দিনস্থির

জুমিয়ার দিকে মহারাজ বিস্ময়-দৃষ্টিতে চাহিলেন, জুমিয়ার দৃঢ় মুষ্টিতে বর্শা, মুখ যন্ত্রণাপীড়িত ভীষণ, জুমিয়া বিনা অভিবাদনে সোজা হইয়া তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া, কম্পমান তীব্রকণ্ঠে বলিল,—"মহারাজ, তোর কাছে মুইডা কোন দোষ করুনি, মুই শুধু তুইডারে ভালবাসুছি, পরাণের বঁধু ভাবুছি, এই লাগিন ঢের সহুছি, মহারাজ, এই দোষে কি তুই মোর বুকে ছুরির অধিক মারুলি? মোদের কুলে কালী দিউলি?"

ভীল আর পারিল না—রাজার পদতলে বসিয়া পড়িল, আবার বালকের মত দুই চক্ষু তাহার জলে ভাসিতে লাগিল।

মহারাজ বলিলেন—"মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা!"

জুমিয়া চোখ মুছিয়া শান্ত গম্ভীর হইয়া বলিল—"মিছা ত মুই জানি। মুই তোরে বিশ্ (বিশ্বাস) করি, কিন্তু মুইডার আপন জন কোনডাই ত আর তোর এ কাথাডা বিশ্ করুবে না।"

রাজা উত্তেজিত-স্বরে বলিলেন,—"বিশ্বাস করিবে না, আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না?"

জুমিয়া। না, তা করুবে না, মহারাজ, তোর কাজে মুইদের নামে যে কলঙ্ক রটুছে, তোর কাজেই সে কলঙ্ক ঘুচুবে, তোর কথাডায় না।

গণপতি বলিলেন,—"জুমিয়া, তোর কন্যাকে"—

জুমিয়া তাহাকে কথা কহিতে না দিয়া বলিল,—"মহারাজ, এ কালী মুছুবার উপায় একডা ছাড়া আর দুইডা নাই।"

মহা। কি ?—

জুমিয়া। সুহারেরে তোর বিয়া করুতে হউবে।

রাজা এতক্ষণ বিবাহের জন্য লালায়িত ছিলেন, কিন্তু যখনি জুমিয়া দৃঢ় স্বরে তাঁহাকে বলিল—তাঁহার বিবাহ করিতে হইবে—তখনি রাজা বলিলেন,—"অসম্ভব —তোমরা ভীল, আমরা ক্ষত্রিয়।"

ভীল বলিল,—"না রাজাডা। মুইরা ভীল, কিন্তু সুহার ভীল না, সে ক্ষতিয়-কনিয়া।"

"সে ক্ষত্রিয়কন্যা!" গণপতি ও রাজার মুখ হইতে একসঙ্গে এই বিস্ময়-সূচক কথা উত্থিত হইল।

জুমিয়া বলিল—হুঁ, সে ক্ষতিয়-কনিয়া। সুহারমতীর তীরে তানারে মুই পাউছিনু। মুই এখনো শুনুছি, তানাডার মা বলুছে 'ক্ষতিয়ানীর শিশুকে লও'।"

সুহারের প্রাপ্তিবৃত্তান্ত ভীল সবিশেষ বলিয়া গেল। ভীলের কথায় অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই, সুহার যে ক্ষত্রিয়কন্যা, তাহার মূর্ত্তিতেই তাহার প্রমাণ। রাজার মুখে আনন্দ বিভাসিত হইল।

ভীল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"এহন বল, বিয়া করুবি কি না? এহন এ বিয়া ভাঙ্গুতে যদি চাউস—ত মুইডার শোধ এই—" জুমিয়া বর্শা উত্তোলন করিল।

আবার জোরের কথা, ভয়-প্রদর্শন! রাজার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল, কিন্তু রাজার জীবনে এই প্রথমবার অন্য ভাবের উচ্ছ্বাসে সে ভাব লী·· হইয়া পড়িল। রাজা বলিলেন,—"জুমিয়া, আমি বিবাহ করিব, কিন্তু তোমার ভয়েও নহে, তোমার অস্ত্রের ভয়েও নহে। যদি অস্ত্র দেখাইয়া আমাকে বিবাহ করাইতে চাও, ত বিবাহ হইবার কোন আশা দেখিতেছি না, সুতরাং ও কথা না বলিলেই ভাল।"

ভীল বর্শা কটিতে রাখিয়া বলিল,—"যদি বিয়াই করুবি ত এহনি কর— আজি রাতে।"

গণপতি বলিলেন,—"আজই বিবাহ? জুমিয়া, তুই পাগল হইয়াছিস্?"

জুমিয়া বলিল,—"হুঁ, মুই পাগল হউছি, যতক্ষণ রাজা মুইদের নাম না রাখুছে—(আমার কন্যার কলঙ্ক না দূর করিতেছেন) ততক্ষণ মুইডার মনে সোয়াস্তি নাই, কোনভারেও বিশ্ব নাই! মুইডা যখন বাড়ী যাউব, রাজারে মেয়ে

দিউতে যাউব, নউলে মোর দাঁড়াইবার জমীনটুকুও নাই।"

রাজা বলিলেন,—"গণপতি আমি আজই বিবাহ করিব, রাত্রে আজ লগ্ন কথন্ ?"

গণপতি মুখে মুখে গণনা করিয়াই বলিলেন,—"চতুর্থ প্রহরে লগ্ন আছে, সেই সময় বিবাহ হইতে পারে।"

জুমিয়া। মহারাজ, মোর আর একডা ভিক্ষা। চুপু-চুপি বিয়া হইবে না, রাজার মত জাঁকজমকে বিয়া হউক, রাজসভার সকুলে এ বিয়াতে বরযাত্র আসুক, মুই সবুয়ের সাক্ষাতে মোর নিজের ভিটার উপর দাঁড়ায়ে মোর মেয়েরে দান করুব —এইডা ভিক্ষা।

রাজা বলিলেন,—"তাহাই হউক। ঠাকুর, সকলকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দিন।"

৪৪

বিবাহ-সভা

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজার বিবাহ-বার্ত্তা চারিদিকে ঘোষিত হইল। গৌরী-পূজার উৎসব না থামিতে থামিতে বিবাহের উৎসব আরম্ভ হইল। সকলেই শুনিল, সুহার ক্ষত্রিয়াণী। সৈন্য-সামন্তেরা সজ্জিত হইতে হইতে ভীলকন্যার ও মহারাজের জয়ধ্বনি তুলিল। অন্তঃপুরে রাণীও শুনিলেন, মহারাজের আজ বিবাহ। তিনি বলিলেন,—"মহারাজ নিজে এ খবরটা দিতে আসিলেন না— এই দুঃখ, না দিন, আমি নিজে কন্যা সাজাইয়া বিবাহ-সভায় তাঁহার উপহার লইয়া যাইব।"

রাণী আপনার অলঙ্কার বসন-ভূষণ লইয়া জুমিয়াভবনে গোপনে গমন করিলেন। রুক্মা রাণীর ব্যবহারে অবাক্ হইয়া ঘরে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিয়া গেল এবং সুহারের প্রতি অবিরত অযথা বাক্য বর্ষণ করিতেও ছাড়িল না।

তৃতীয় প্রহরে রাজা সসৈন্য সসামন্ত জুমিয়ার বাটীর মাঠে আগমন করিলেন।

যেমন সহসা বিবাহ, বিবাহের বন্দোবস্তও তদনুযায়ী। জুমিয়ার ক্ষুদ্র বাটীতে বরযাত্রের স্থান নাই, বাটীর সম্মুখের মাঠই বিবাহের সম্প্রদান-সভা। এ সভায় সকলেই অশ্বপৃষ্ঠে আসীন, কন্যা আগমন করিলে সকলে অশ্ব হইতে অবতরণ

করিবে, দণ্ডায়মান অবস্থাতেই কন্যা সম্প্রদানিত হইবে। সকলেই উৎসুক, কখন কন্যা আনীত হইবে? কিন্তু তথাপি জয়ধ্বনি, হাস্য-পরিহাস ও আমোদ-উল্লাসে সকলের সময়ই দ্রুত চলিয়া যাইতে লাগিল, কেবল রাজা প্রতি মুহূর্ত্ত যুগের ন্যায় অনুভব করিতে লাগিলেন, বিবাহের এই আনন্দ উৎসাহের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ই কেবল অজ্ঞাত বিষাদে পরিণত হইল, তিনি সহস্র চেষ্টা করিয়াও আগত মিলন সম্মুখে অনুভব করিতে পারিতেছিলেন না, যেন সেই মিলনের মধ্যে একটা অনন্ত ব্যবধান পড়িয়া আছে, একটা বিভীষিকা আলেয়ার মত তাঁহার নিকট জ্বলন্ত হইয়া উঠিল। যখন চতুর্থ প্রহর শেষ হইল, সৈন্যসামন্তদিগের হস্তের দীপমালা মলিন করিয়া মুক্ত মাঠে ঊষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে চাহিল, পুরোহিত যখন সুহারের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা পূর্ব্বক তাহার ক্ষত্রিয়ত্ব তাহাকে পুনঃপ্রদান করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিবাহ-ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন রাজার হৃদয় চমকিয়া উঠিল। একসঙ্গে শত শত দীপমালার রশ্মি সালঙ্কৃতা সসজ্জা যুবতীর মুখে বিভাসিত হইল, তাহার দিকে চাহিয়া তাহার পশ্চাতের দীন-হীনবেশা বিষাদিনীর প্রতি আর মহারাজের দৃষ্টি পড়িল না। ঠিক এই গাছতলায় বহুদিন আগে ঊষালোকে তিনি একটি বালিকাকে দেখিয়াছিলেন, ঊষার ন্যায় কল্যাণময়ী সেই স্নিগ্ধ মূর্ত্তি রাজার মনে পড়িল, সেই মূর্ত্তিই কি এখন এই প্রখর জ্যোতির্ম্ময়ী যুবতী-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে?

পুরোহিত বলিলেন—"মহারাজ, অবতরণ করুন।"

শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনির মধ্যে মহারাজ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই বৃক্ষতলে আগমন করিলেন, জুমিয়া কন্যার হস্ত ধরিয়া রাজার হস্তে প্রদান করিবে বলিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিল—কিন্তু জুমিয়া আগুয়ান না হইতেই রাণী সুহারের হাত ধরিয়া মহারাজের দিকে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"মহারাজ, আমি ঈর্ষাবশতঃ তোমার সুখের পথে বাধা দিই নাই। নিজ হস্তে আপনার সুখ তোমাকে দান করিতে আসিয়াছি, গ্রহণ কর।"

রাণীর শেষ কথা আর শোনা গেল না, সহসা একটা দারুণ কোলাহল উঠিল, রাণী চমকিয়া চাহিলেন, রাজা, পুরোহিত, জুমিয়া সকলেই চমকিয়া চাহিলেন, দেখিলেন, সৈন্যসামন্ত ঠেলিয়া হরিতাচার্য্য উন্মত্তের মত দ্রুতবেগে এই দিকে আসিতেছেন, আর বলিতেছেন, সাবধান! "সুহার ক্ষত্রিয়াণী নহে, ব্রাহ্মণকন্যা। বিবাহ বন্ধ হউক, বিবাহ বন্ধ হউক।—"

অব্যর্থ-গণনা

বিবাহের বাজনা থামিয়া গেল, হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি নীরব হইল, জনগণের আনন্দকল্লোল থামিয়া গেল, যে যেখানে ছিল, চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। মহিষী এক হস্তে সুহারের, অন্য হস্তে রাজার হাত ধরিয়া উভয় হস্ত এক করিয়া দিতে যাইতেছিলেন, তাঁহার হাতেই উভয়ের হাত রহিয়া গেল, আর এক করা হইল না। ক্রমে তাঁহার কম্পিত হস্ত হইতে রাজার হাত ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িল—সুহার কেবল মহিষীর শিথিল হস্ত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রহিল। গণপতি নীরবে হরিতাচার্য্যের প্রতি অপরাধীর দৃষ্টিতে চাহিলেন, রাজারও মুখে কথা ফুটিল না। নীরবে তাহার ক্রুদ্ধ বজ্র-কটাক্ষ হরিতাচার্য্যের প্রতি নিপতিত হইল। জুমিয়া কেবল সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ক্রুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"কোন্‌টা বলুন—সুহার বামনী? সুহার ক্ষতিয়াণী—বিয়া বন্ধ হইবে না—বিয়া হউক—"

হরিতাচার্য্য বলিলেন,—"সুহার ব্রাহ্মণকন্যা না হয়—আমি নিজে পুরোহিত হইয়া এ বিবাহকার্য্য সমাধা করিব—কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে তুমি আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর, আমি যাহা জানিয়াছি—সত্য কি না বল। তুমি সুহারকে কোথায় পাইয়াছ?"

জুমিয়া। নদীপাড়ে।

হরিতাচার্য্য। কয় বৎসর পূর্ব্বে?

জুমিয়া। ১৩ বৎসর হইবে।

হরিতাচার্য্য। গণপতি, চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বেই কি আমি তীর্থযাত্রায় বাহির হই নাই?

গণপতি। আজ্ঞে হাঁ।

হরিতাচার্য্য। আমি যাইবার পরই কি আমার ভ্রাতা স্ত্রী-কন্যার সহিত শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় জলমগ্ন হন নাই?

গণপতি। হাঁ, তখনি।

হরিতাচার্য্য বলিলেন—"আমার ভ্রাতুষ্কন্যা গৌরী তখন ২ বৎসরের, জুমিয়া, যখন বালিকাকে পাও—তখন তাহার বয়স কত হইবে?"

জুমিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল—

"বয়সডা অমনিই আছুল—তাই বলু স্থহার ব্রাহ্মণী ? মুইডা বলুছি ঠাকুর, স্থহার ক্ষতিয়াণী। স্থহারের মা মুইডারে ওরে সঁপিবার কালীন বলুছিল যে, স্থহার ক্ষতিয়াণী।"

বলিয়া জুমিয়া তাহার প্রাপ্তিঘটনা অনুপূর্ব্বিক বলিল।

হরিতাচার্য্য শুনিয়া বলিলেন, "আর কোন সংশয় নাই, সুহার আমারি ভ্রাতুষ্কন্যা। গৌরীর একজন ক্ষতিয়া ধাত্রী ছিল, তাহাকে সকলেই ক্ষত্রিয়াণী বলিয়া ডাকিত। সে গৌরীকে এত ভালবাসিত যে, তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সকলেই বালিকাকে ক্ষত্রিয়াণীর শিশু বলিত। তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে, অন্তিম সময়ের মোহে ক্ষত্রিয়াণী তোমাকে আমার ভ্রাতা জ্ঞানে তোমার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়াছিল।"

বলিয়া সস্নেহে হরিতাচার্য্য স্থহারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সে দৃষ্টিতে জুমিয়ার প্রাণে অনল বর্ষিত হইল। তাঁহার ন্যায্য অধিকার হরিতাচার্য্য যেন সবলে গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন! জুমিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া স্থহারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। হরিতাচার্য্য তাহার ক্রোধ লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন—

"যখন বালিকাকে পাইয়াছিলে—তাহার হাতে কোন অলঙ্কার ছিল ?"

জুমিয়া কোন উত্তর করিল না। কিন্তু তাহার স্ত্রী স্থহারের কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, "হুঁ। হাতে যখন কষা হইলু, তখন মুই খুলি রাখুল।"

হরিতাচার্য্য বলিলেন—"বৎসে, তাহা লইয়া এস দেখি ? বুধাদিত্য কন্যার শুভ্র হস্তে দুইগাছি নীলা কঙ্কণ পরাইয়া দিয়াছিলেন।" জুমিয়ার স্ত্রী অল্পক্ষণের মধ্যেই কঙ্কণ লইয়া ফিরিয়া আসিল।

হরিতাচার্য্য তাহা হাতে লইয়া বলিলেন—"ইহা সেই কঙ্কণ। এখনও কি কাহারও সন্দেহ আছে, স্থহার আমার ভ্রাতুষ্কন্যা নহে ?"

এতক্ষণে রাজার কথা ফুটিল, রাজা রোষকম্পিতস্বরে বলিলেন,—"এ সমস্তই ষড়্যন্ত্র। স্থহার আমার বাগদত্তা, স্থহার আমার ধর্ম্মপত্নী, স্থহার আর কাহারও নহে।"

পুরোহিত বলিলেন,—"যে বাক্য দিয়াছে, সে ভ্রমক্রমে দিয়াছে। স্থহার ব্রাহ্মণকন্যা হইয়া ক্ষত্রিয়কে—"

জুমিয়া বলিল,—"তুইডা কে ? তুইডা চুপ কর, স্থহার মুইডার মেয়ে—মুই বিয়া দিবু—"

হরিতাচার্য্য বলিলেন,—"কিন্তু শোন জুমিয়া, তুমি দিলেও এ বিবাহ ধর্ম্ম বিবাহ হইবে না। তুমি যাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাস, আপন হইতে যাহাকে আপনার ভাব, তোমার সন্তান-প্রতিমা সেই রত্ন—"

জুমিয়া বলিল,—"বুঝিনু—বুঝিনু—আর বলুতে হইবে না, মুইডা দিবু না—এ বিয়া দিবু না। মোরা মেয়েডা—কুল কনিয়া—এ বিয়া ধর্ম্ম বিয়া না হউলে রাজাডা মোর মেয়েরে ছুঁইতে নারুবে—"

জুমিয়া রাণীর হস্ত হইতে সুহারের হস্ত সবলে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বহস্তে ধরিয়া রাখিল। রাজা ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"জুমিয়া, সাবধান! এ খেলার স্থল নহে।"

জুমিয়া বলিল—"হুঁ মহারাজ—এ খেলাডা নয়"—

বলিয়া কন্যার হস্ত বজ্র-মুষ্টিতে ধরিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। রাজা জ্বলন্ত মূর্ত্তিতে তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন—বলিলেন,—"আর একপদ অগ্রসর হইবে ত এই তরবারি সমূলে তোমার বক্ষে নিহিত হইবে।"

বলিতে বলিতে রাজা কটিস্থ তরবারি উন্মোচন করিলেন। ক্রোধোন্মত্ত জুমিয়া তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া ঘৃণার স্বরে বলিল,—"মহারাজ, সরিয়া যা—তোর তরবারিরে মুই ডরি না।"

বলিয়া সে সুহারের হাত ছাড়িয়া কটিস্থ বর্শা খুলিয়া ধরিল। সুহার মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পড়িতে না পড়িতে জুমিয়ার স্ত্রী তাহাকে কোলে তুলিয়া কুটীরাভিমুখী হইল। বিপদ্ দেখিয়া হরিতাচার্য্য ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও করিয়া রাজা ও জুমিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময় দুর্ব্বল জন্তু—কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"জুমিয়া, তুইডার 'কিরে' ভুলুলি? রক্ত, রক্ত জুমিয়া, রক্ত!"

জুমিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল,—"মহারাজ, সরিয়া যা—এই বর্শা এহনি বুকে পড়ল!"

মহারাজ সচকিতে বিবাহক্ষেত্রে সমবেত অল্পসংখ্যক সশস্ত্র সৈন্যদিগকে নিকটে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিতে আদেশ করিয়া অসি ধরিয়া বলিলেন,—"জুমিয়া, সরিয়া যাও, নহিলে এই তরবারি তোমাকে তফাৎ করিয়া দিবে।" আবার চীৎকার রব উঠিল—"রক্ত, জুমিয়া রক্ত," জুমিয়ার বর্শা সহসা উন্নত হইল, মহিষী এতক্ষণ প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া ছিলেন, সহসা করুণ চীৎকার করিয়া উঠিয়া উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইলেন। জুমিয়ার আর তখন হস্ত সংবরণের ক্ষমতা নাই—রাজার

তরবারি চালিত হইতে না হইতে বর্শা সজোরে রাণীর হৃদয় ভেদ করিয়া মহারাজের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল—উভয়ে ভূমে লুটাইয়া পড়িলেন।

আবার চীৎকার রব উঠিল—"রক্ত, রক্ত।"

দলে দলে ভীলগণ খড়্গ, ধনুর্ব্বাণ, যষ্টি হস্তে রাজসৈনিকদিগকে আক্রমণ করিল—তাহাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল—তাহারা কোথায় পলাইবে—কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না—সমস্ত ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল,—বিদ্রোহ আরম্ভ হইল।

৪৬

শেষ কথা

জুমিয়ার বর্শাঘাতে রাজা রাণী দুই জনে যখন ভূমিশায়ী হইলেন—তখন বজ্রাঘাত পাইয়া সহসা যেন জুমিয়ার জ্ঞানলাভ হইল। নিজের নৃশংস নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে তীব্র অনল-যন্ত্রণা অনুভব করিতেই যেন সে জ্ঞানলাভ করিল। সে কল্পনা-আগোচর, অসীম যন্ত্রণাজনক ভয়ঙ্কর দৃশ্য সম্মুখে করিয়া মুহূর্ত্ত সে নিস্পন্দ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল—তাহার পর বিদ্যুৎবেগে রাজার নিকটস্থ হইয়া তাঁহার বক্ষোনিহিত বর্শা উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে হস্তের উপর উঠাইয়া লইল। তাহার ব্যবহারে স্তম্ভিত হরিতাচার্য্যও লব্ধসংজ্ঞ হইয়া রাণীকে তুলিয়া লইয়া জুমিয়াকে বলিলেন,—"আমার সঙ্গে এস।" জুমিয়া নিরুত্তরে রাজাকে বক্ষে করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল।

চারিদিকে আক্রমণ, চীৎকার, যুদ্ধ, রক্তপাত—তাঁহারা দুইজনে বহু সাবধানে বিদ্রোহোন্মত্ত ভীলগণের পাশ কাটাইয়া নিভৃত নদীতীরে আসিয়া, স্রোতস্বিনীর অতি নিকটে এক পাহাড়ের পাদদেশে শ্যামল পুষ্পশয্যার উপর দুইটি দেহভার নামাইলেন। রাণীর মৃত্যু হইয়াছিল রাজার বক্ষ তখনও যেন ঈষৎ কাঁপিতেছিল, হরিতাচার্য্য তাঁহার অঙ্গাবরণ খুলিতে লাগিলেন, জুমিয়া নদীতে বস্ত্র ভিজাইয়া আনিয়া তাঁহার আহত বক্ষে জলসিঞ্চন করিতে লাগিল।

তখন পরিপূর্ণ প্রভাত, পাহাড়তল ছায়াময়, কিন্তু নদীবক্ষে সূর্য্য-কিরণ ঝলমল করিতেছে, তাহার প্রতিফলিত উজ্জ্বলতা বিকম্পিত হইয়া রাজার বিবর্ণ মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। রাজাকে শুশ্রূষা করিতে করিতে বিদীর্ণপ্রাণ জুমিয়া সেই মুখের দিকে চাহিতেছে। রাজার অর্দ্ধমুদ্রিত নয়ন সহসা একবার উন্মুক্ত

হইয়া দুইটি মুমূর্ষু নয়নের বিহ্বল কটাক্ষ জুমিয়ার সেই কাতর দৃষ্টির উপর স্থাপিত হইল, জুমিয়া আর পারিল না—উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল,—"মহারাজ, মোর আপন হাতে তুইডারে খুন করিনু—" রাজা স্খলিতবচনে ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"জুমিয়া, আমি দোষী, তুমি না—আমাকে ক্ষমা কর।" জুমিয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া আকুলকণ্ঠে কহিল,—"মুইডা ক্ষমা করিবু কারে? মোর ক্ষমা লইবু কে? তুইডারে না, মুইডারেই মুই ক্ষমা করুব—যে বর্শা তোরে বিঁধুল, সেই বর্শা মুইরেই ক্ষমা করুবে"—রাজা মুমূর্ষুর সম্পূর্ণ বল আয়ত্ত করিয়া কহিলেন,—"আমার অনুরোধ, তুমি মরিও না। আমার শিশু সন্তান রহিল তাহাকে রক্ষা কর—রাজ-পরিবারগণ রহিল—তাহাদের—" রাজা আর পারিলেন না, তিনি নির্ব্বাক হইয়া পড়িলেন, প্রাণ বায়ু তাঁহাকে ত্যাগ করিল।...রাজার মৃত্যুকালীন আদেশ জুমিয়াকে বজ্রবল প্রদান করিল। রাজার মৃত্যুর পর সে অশ্রু-হীননেত্রে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। হরিতাচার্য্য বলিলেন,—"কোথা যাও?" সে বলিল,—"রাজপুত্ত্ররে বাঁচাউতে।"

হরিতাচার্য্য বলিলেন,—"তুমি রাজ-অন্তঃপুরে সহজে প্রবেশ পাইবে না, ইহাদের সৎকারের জন্য মন্দির হইতে লোক পাঠাইয়া অগ্রে আমি রাজবাটীতে গমন করি—ততক্ষণ তুমি শব রক্ষা কর। তাহারা আসিলে—তাহাদের হস্তে সৎকারভার দিয়া তুমি আমার সহায়তায় আসিও।"

হরিতাচার্য্য চলিয়া গেলেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই মন্দিরভৃত্যগণ কাষ্ঠ প্রভৃতি সৎকারদ্রব্যাদি আনয়ন করিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই চিতা প্রস্তুত হইল, রাজা-রাণী একত্র তাহার উপর শায়িত হইলেন, চিতায় অগ্নি অর্পিত হইল, ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, জুমিয়া তখন শেষবার সেই জলন্ত চিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দ্রুতপদে বাটীর অভিমুখীন হইল।

ইত্যবসরে হরিতাচার্য্য শিশুকে লইয়া দ্বারদেশে আসিয়া দেখিলেন, রাজোদ্যান ভীলে সমাকীর্ণ। তিনি ফিরিয়া অন্তঃপুরের এক ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া মন্দিরের নদীতীরে আসিয়া পড়িলেন, সেখানে জুমিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইল।

হরিতাচার্য্য বলিলেন,—"আমি শিশুকে আনিয়াছি। তুমি শীঘ্র যাও—গিয়া রাজ-পরিবারদিগকে রক্ষা কর।"

জুমিয়া বলিল,—"মুইডা চলিনু। যদি না ফিরি, সুহারডা তোর।"

হরিতাচার্য্য চলিয়া গেলেন, জুমিয়া দ্রুতগতিতে রাজবাটীর দ্বারে আসিয়া

শত সহস্র ভীলের তরঙ্গ একাকী রোধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। জুমিয়াকে রাজ-পরিবারের পক্ষে দেখিয়া অনেক ভীল তাহার পক্ষ অবলম্বন করিল, অনেকে তাহার বিপক্ষ হইয়া উঠিল।—তাহাদের ক্ষণিক আত্মসংগ্রাম আরম্ভ হইল, এই সুযোগে ক্ষত্রিয় সেনাদল অনেকে দলবদ্ধ হইয়া স্ত্রীকন্যাদিগকে সরাইতে লাগিল—অনেকে ভীলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই আত্মরক্ষাপরায়ণ ক্ষত্রিয়দিগকে সাহায্য করিতে করিতে বাণাহত হইয়া জুমিয়া ধরাশায়ী হইল।

উপসংহার

বিদ্রোহ শেষ হইয়াছে, ভীলেরা জয়ী। ইদর হইতে ক্ষত্রিয়গণ পলাইয়াছে—ভীলের রাজ্য ভীল পুনরায় পাইয়াছে, মহা উৎসবের মধ্যে জুমিয়ার ভ্রাতা রাজসিংহাসনে বসিয়াছে।

কিন্তু এখন সুহার কোথায় ?

অপরিচিত দূর-রাজ্যে, নির্জ্জন বনপ্রদেশে, একটি ভগ্ন মন্দিরপ্রাঙ্গণে এক ঘুমন্ত শিশুকে কোলে করিয়া একজন যুবতী বসিয়াছিল। অপরাহ্ণের সূর্য্য কিরণ প্রাঙ্গণস্থিত অশ্বত্থের নিবিড় পত্রশাখা ভেদ করিয়া যুবতীর বিষণ্ণ মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল। বিহঙ্গের কোলাহলধ্বনিত অরণ্যের মস্তকের উপর—অল্প বিস্তৃত মুক্ত আকাশতলে মেঘের বিচিত্র স্তর ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতেছিল। যুবতী অশ্রুপূর্ণ নয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া কোন দূর স্বপ্নরাজ্যে, স্মৃতিরাজ্যে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা ক্রোড়ের শিশু ঘুমঘোরে চমকিয়া কাঁদিয়া উঠিল—যুবতী অমনি নতদৃষ্টি হইয়া—তাহাকে চুম্বন করিল, মুক্তার ন্যায় দুই ফোঁটা অশ্রুতে বালকের কপোল অভিষিক্ত হইল। সেই চুম্বনে বালক মাতৃস্নেহ অনুভব করিয়া হাসিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল। যুবতীর মুখে এক অপূর্ব্ব আনন্দ বিভাসিত হইল। এই যুবতী যে সুহার আর শিশু যে মিবার-সিংহাসনের ভবিষ্যৎ অধিপতি বাপ্পা, তাহা সম্ভবতঃ পাঠককে বলিবার আবশ্যক নাই।

এই বালকই এখন সুহারের প্রেম-বন্ধন, তাহার স্মৃতির আনন্দ, তাহার রক্ষাতেই, তাহার পালনেই সুহার আপন জীবন-যৌবন সমর্পণ করিয়াছেন।

এইখানেই প্রেমের নিঃস্বার্থতা; প্রেমের আদর্শভাব। এইরূপ জীবনদানেই প্রকৃত আত্মবিসর্জ্জন, আত্মহত্যায় নহে। যে প্রেম দুঃখে সহিষ্ণু করিয়া

মঙ্গলকার্য্যে রত করে, সেই প্রেমই মহৎ প্রেম, তাহাতেই প্রেমের প্রকৃত বল। এই মঙ্গলময় আত্মবিসর্জ্জন প্রথমে দুঃখের হইলেও পরে প্রকৃত সুখের। তবে ইহা মহতের ধন, ক্ষুদ্রের উপভোগ্য নহে।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, গাছের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের গায়ে গায়ে দু একটি তারা জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল—গাছের শাখায় শাখায়, পাতার গায়ে গায়ে দুই একটি খদ্যোত জ্বলিয়া উঠিল, যুবতী উঠিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক শিশুকে শয্যাশায়িত করিয়া গৃহে প্রদীপ প্রজ্জ্বালিত করিল। এই সময় একজন পুরুষ ফল-মূল ও দুগ্ধপাত্র হস্তে গৃহে প্রবেশ করিল। এ ব্যক্তি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ক্ষেতিয়া। এই অসভ্য নিঃস্বার্থ প্রেমের আর একটি দৃষ্টান্ত। সুহার রাজার প্রেম-স্মৃতি হৃদয়ে ধরিয়া তাঁহার বালকের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছে,—ক্ষেতিয়া সুহারকে ভালবাসিয়া তাহার দাসত্বে, তাহার ভক্তিপূজায় জীবন সমর্পণ করিয়াছে। সুহার বালকের মাতৃপ্রেমে রাজার প্রেম প্রতিদান পাইয়াছে, তাই তাহাকে মন-প্রাণ দিয়া তাহার পূর্ণানন্দ; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্ষেতিয়ার সুহারের তাচ্ছিল্য উপহার পাইয়াও তাহার দাসত্বে সুখী।

কাহার প্রেম আদর্শতর—মহত্তর?

হরিতাচার্য্য এখন এই মন্দিরের অদূরবর্ত্তী স্থানে যোগনিমগ্ন। যাহার জন্য তিনি যোগবিরত হইয়াছিলেন, সে আর নাই, সুতরাং তাঁহার আজীবনবাঞ্ছিত এই উদ্দেশ্যসাধনে আর কে বাধা দিবে?

বাপ্পা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইঁহারই নিকট দীক্ষিত হইয়াছিল এবং ইঁহারই প্রসাদে নানা বিপদুত্তীর্ণ হইয়া মিবার-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল।

———

কাহাকে ?

উপহার

কাহাকে ?

করুণা সে চাহে কৃতজ্ঞতা
ভালবাসা চাহে ভালবাসা,
তব প্রেম অতুল মহান্,
শুধু দান নাহিক প্রত্যাশা !
নিষ্কাম চরণে তব দেব,
প্রীতিময় এ পূজা, প্রণতি,—
স্বার্থপূর্ণ দীন সকামের
আত্মহারা বিস্ময়-ভকতি ।

———

কাহাকে ?

১

Man's love is of Man's life a thing apart
'Tis woman's whole existence.

এ কথা যিনি বলিয়াছেন, তিনি একজন পুরুষ। পুরুষ হইয়া রমণীর অন্তর্গত প্রকৃতি এমন হুবহু ঠিকটি কি করিয়া ধরিলেন, ভারি আশ্চর্য্য মনে হয়। আমি ত আমার জীবনের দিকে চাহিয়া অক্ষরে অক্ষরে এ কথার সত্যতা অনুভব করি। যতদূর অতীতে চলিয়া যাই, যখন হইতে জ্ঞানের বিকাশ মনে করিতে পারি, তখন হইতে দেখিতে পাই—কেবল ভালবাসিয়াই আসিতেছি, ভালবাসা ও জীবন আমার পক্ষে একই কথা; সে পদার্থটাকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে জীবনটা একেবারে শূন্য অপদার্থ হইয়া পড়ে—আমার আমিত্বই লোপ পাইয়া যায়

তখন আমার বয়স কত? সাল তারিখ ধরিয়া এখনি তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না। আমাদের দুই বোনের কাহারো জন্মকোষ্ঠী বা ঠিকুজি নাই, তাই ইচ্ছামাত্র সময়ে অসময়ে এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারি না। একবার একখানা গানের খাতার কোণে তারিখটা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু খাতাখানা খুঁজিতে গিয়া শৈশবের বড় বড় মক্সওয়ালা ক খ লেখা কাগজপত্রের কাঁড়িগুলা পর্য্যন্ত মিলিল, কেবল সেইখানাই পাওয়া গেল না। পুরুষে সম্ভবতঃ আমার সারল্যে অবিশ্বাস করিয়া ইহার মধ্য হইতে গূঢ় অভিপ্রায় টানিয়া বাহির করিবেন, কিন্তু স্ত্রীলোক বুঝিবেন, বাস্তবিক পক্ষে সাল তারিখ মনে করিয়া রাখা আমাদের পক্ষে কিরূপ কঠিন ব্যাপার। বরঞ্চ ঘটনার ছবি হইতে তাহার আনুষঙ্গিক বার তিথি আমরা ঠিক ধরিতে পারি, কিন্তু তিথি নক্ষত্র আগে মনে

করিয়া যদি ঘটনা মনে করিতে হয়, তাহা হইলে ঘটনাটির কালাশুদ্ধি হইবার ষোল আনাই সম্ভাবনা। যেমন দিদির বিবাহ যখনি মনে পড়ে—তখনি উৎসব-সমারোহপূর্ণ ফাল্গুন মাসের সেই বিশেষ পূর্ণিমা নিশিটিও চোখের উপর জলজীবন্ত দেখিতে পাই, কিন্তু সালের মূর্ত্তিতে আর ফাল্গুনের বসন্তে বা পূর্ণিমার সে জ্যোৎস্নালোকে উপরঞ্জিত নহে। কাজেই ছবিগত সাদৃশ্য বা অসাদৃশ্য ধরিবার মাস তিথির মত সাকার চিত্রে এক সাল হইতে অন্য সালের তফাৎ মনে করিতে পারি না! নিরাকার নিরূপ ধ্যানের ন্যায় ধ্যান সহকারে এখনকার সাল ধরিয়া দশ বৎসর পূর্ব্বের সে সালটা গণিয়া তবে ঠিক করিয়া লইতে হয়। কিন্তু এ নিয়মে অর্থাৎ স্মৃতির সাহায্যে ত আর নিজের জন্মসাল নির্ণয় করা যায় না, বিধাতা পুরুষ তাহা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। সৃষ্টির এ কি এক অপূর্ব্ব রহস্য বুঝিতে পারি না—মানব জন্মগ্রহণ করে ধরাতলে, অমনি আকাশের তারা নক্ষত্ররাশি তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়া লইয়া তাহার ভাগ্য রচনা করিতে বসে, আর মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ আত্মীয় যে স্মৃতি, তাহাকে সে তখন একেবারে হারাইয়া ফেলে, অন্ততঃ সে সময় স্মৃতির সহিত মানুষের কোন সম্পর্কই থাকে না। এখানে তাই কেবল নিতান্তই অঙ্কের সঙ্কেতে অর্থাৎ সালের খাতিরে সালটা মনে রাখিতে গিয়াই যত মুস্কিল বাধিয়াছে, তাহা ১২৮২ বা ৮৩ ক্রমাগতই ভুল হইয়া যায়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে এ ভুলে ক্ষতি কাহার? আমারো নহে, পাঠকেরো নহে। অবশ্য এ রকম একটা ভুলে জীবনে যদি সুদীর্ঘ তিনশত পঁয়ষট্টি দিন ও বারটা মাসওয়ালা একটা বৃহৎ সংবৎসরের ব্যবধান পড়িত, তাহা হইলে ক্ষুদ্রজীব একজন মনুষ্যের পক্ষে তাহাতে বিস্তর তফাৎ করিয়া তুলিত, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে আমি হাজার ভুলি না কেন, কাল আমাকে কিছুতেই ভুলিবে না, বয়স আমার সর্ব্ব অবস্থাতেই কড়ায় গণ্ডায় ঠিকটি থাকিয়া যাইবে, আর পাঠকের পক্ষে—আমি উনিশ না হইয়া যদি বিশ হই কিংবা বিশ না হইয়া যদি একুশই হই —সব সমানই কথা। যতদূর বুঝিতেছি, তিনি কেবল বিষয়টার একটা শেষ নিষ্পত্তিতে আসিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, নিষ্পত্তিটা ঠিক বা বেঠিক হউক, তাহাতে কি এত আসিয়া যায়? এ প্রকৃতি পুরাতত্ত্ববিদেরই একচেটিয়া নহে। তবে ধরিয়া লওয়া যাক্, আমার বয়স তখন আঠার উনিশ, আমি এখনো অবিবাহিত।—শুনিয়া কি কেহ আশ্চর্য্য হইতেছেন? কিন্তু আশ্চর্য্য হইবার ইহাতে কি আছে? আজকাল ত এমন অনেকেই ইহার চেয়েও অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকেন, আমিও না হয় আছি। ইহাই যদি বিস্ময়জনক হয়,

তবে অধিকতর বিস্ময়ের কথা পরে আসিতেছে। আমি ভালবাসি, বিবাহের পূর্ব্বেই ভালবাসি, তিনি যে স্বামী হইবেন, এমনতর আশা করিয়াও ভালবাসি নাই। কেবল তাহাই নহে, এই ভালবাসাই আমার একমাত্র প্রথম এবং শেষ ভালবাসা নহে। আমি ইহাকে যখন ভালবাসি নাই, তাহাকে ভাল বাসিয়াছিলাম আর তাহাকে যখন বাসি নাই, তখনো আমার হৃদয় শূন্য ছিল না। মাকে মনে পড়ে না, শিশুকালেই মাতৃহারা, কিন্তু শৈশবে বাবাকে যেমন ভালবাসিতাম, কোন সন্তান মাকে যে তাহার অধিক ভালবাসিতে পারে, এরূপ আমি কল্পনাও করিতে পারি না। অনেকেরই সংস্কার আছে, পিতৃমাতৃপ্রেম ও দাম্পত্যপ্রেম পরস্পর নির্লিপ্ত পৃথক দুই বস্তু, একের সহিত অন্যের তুলনাই অসঙ্গত, অসম্ভব। তুমি আমার সহিত মিলিবে কি না, জানি না, আমার কিন্তু ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, আমার অভিজ্ঞতায় শৈশবের মাতৃপ্রেমে ও যৌবনের দাম্পত্যপ্রেমে অল্পই তফাৎ। যৌবনে প্রণয়ীরই মত, শৈশবে পিতামাতা আমাদের একমাত্র নির্ভরের সামগ্রী, পূজার সামগ্রী, ভালবাসার সামগ্রী, পিতামাতা রক্ষক, দেবতা, প্রণয়ী, একাধারে সর্ব্বস্ব। উভয় প্রেমেই—সেই আসঙ্গলিপ্সা, সারাদিন চোখে চোখে রাখিতে সাধ, প্রাণে প্রাণে আপনার করিবার ইচ্ছা, সম্পূর্ণভাবে দখল করিয়া রাখিবার বাসনা, না পাইলে পরম অতৃপ্তি, তাহার সুখে সুখ, তাহার সুখের জন্য কষ্ট স্বীকারে আনন্দ, এ সমস্ত একই রকম।

আমরা দুই বোন, কিন্তু দিদির সঙ্গে আমার তেমন ভাব হইতে পারে নাই। তিনি বয়সে আমার চেয়ে ৪।৫ বৎসরের বড়, তাহা ছাড়া তিনি বেশীর ভাগ পিসীমার কাছে কলিকাতাতেই থাকিতেন। তবুও দিদিকে খুব ভালবাসিতাম; তিনি বাড়ী আসিলে আনন্দ হইত, কিন্তু বাড়ী আসিয়া দিদি যদি বাবাকে দখল করিতেন বা তাঁহার কোন কাজ করিয়া দিতেন, আমার ভাল লাগিত না। সন্ধ্যাবেলা আহারান্তে বাবা বিছানায় শুইয়া গুড়গুড়ি টানিতেন, দিদি যখন থাকিতেন, তখন আমরা দুই বোনে দুই পাশে গিয়া শুইতাম, কিন্তু বাবার গলা জড়াইয়া থাকা আমার একচেটিয়া ছিল। দুই হাতে কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কানে কানে কথা হইত—"বাবা, তুমি কাকে ভালবাস? মনের মধ্যে পূর্ণ বিশ্বাস, আমাকেই ভালবাসেন, তিনি কিন্তু তাহা বলিতেন না, বলিতে· "দু'জনকেই ভালবাসি।" উত্তরে সন্তুষ্ট হইতাম না, অসন্তুষ্টও হইতাম না; কেন না, তিনি যাহাই বলুন, আমার মনে হইত, আমাকেই ভালবাসেন। আমি কানে কানে বলিতাম—"দিদি রাগ করবেন বুঝি।" বাবা হাসিতেন, আমার বিশ্বাস মনে আরো দৃঢ় হইয়া আঁটিয়া বসিত।

তখন আমার বয়স কত জানি না—বোধ হয় ৫।৬ বৎসর হইবে। শীতকালে বাবার গায়ে যথেষ্ট গরম-কাপড় থাকিলেও আমার গায়ের ছোট রুমালখানি দিয়া যতক্ষণ তাঁহাকে না ঢাকিতাম, ততক্ষণ মনে হইত, তাঁহার শীত ভাঙ্গিতেছে না। গরমী-কালে টানা পাখা যতই হউক না কেন, মাঝে মাঝে হাতপাখা না করিলে আমার তৃপ্তিবোধ হইত না। দাসদাসীর অভাব নাই, কিন্তু আমি সুবিধা পাইলেই কুটনা কুটিবার আড্ডায় গিয়া একখানা বঁটি টানিয়া আলুটা পটলটা যাহা সম্মুখে পাইতাম, তাহার উপরেই আঁচড় পড়িবার অভিপ্রায়ে আঙ্গুলের আঁচড় পাড়িয়া বসিতাম, আর রান্না ঘরে গিয়া বামুনদিদির ভাতের কাঠী কাড়িয়া লইয়া ডাল, মাছের ঝোল, অম্বল নির্ব্বিচারে সবই ঘুঁটিবার প্রয়াস পাইতাম, কখনো বা ব্রাহ্মণীকে স্তুতি-মিনতিতে বশ করিতে পারিলে তাহার নুন-মসলাটা নিজে হাতে করিয়া হাঁড়িতে ফেলিবার মহানন্দও অদৃষ্টে ঘটিত। এইরূপে রান্নাঘরে কত দিন যে হাত-পা পুড়াইয়াছি, তাহার ঠিক নাই। হইলে কি হয়,—আমার বিশ্বাস ছিল, অন্ন-ব্যঞ্জনে আমি কাঠী দিলেই বাবার পক্ষে তাহা সুখাদ্য হইবে, কেন না, রান্নাটা তবেই আমার হইল। পান সাজিবার সময় বাবার পানে মসলা দিতে আমাকে না ডাকিলে আমি আর সেদিন রক্ষা রাখিতাম না। বাবা ত ভাত খাইয়া তাড়াতাড়ি অফিসে চলিয়া যাইতেন, তাহার পর সেদিন আমাকে সাধিয়া ভাত খাওয়ান অন্য কাহারও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত।—বাগানের ফুলে আঁর কাহারো অধিকার ছিল না—ভোর না হইতেই যত ভাল ফুল তুলিয়া আনিয়া বাবার কাছে হাজির করিতাম। জ্যেঠাইমার পূজার ফুল অল্পই অবশিষ্ট থাকিত, কোনদিন বা মোটেই থাকিত না ; সেদিন তিনি বাবার কাছে নালিস করিতে আসিয়া তাঁহার ফুলগুলি সব লইয়া যাইতেন। আমার এমন রাগ ধরিত! একবার আমার অসুখ করিয়াছিল, দিদি তখন বাড়ী ছিলেন, তিনি আমার বদলে বাবাকে ফুল তুলিয়া দিতেন, অসুখের কষ্ট তেমন অনুভব করিতাম না—যেমন সেই কষ্ট! আমি দুষ্টামি করিলে আমাকে জব্দ করিবার জন্য তেমন কোন সহজ উপায় ছিল না—যেমন "আজ সন্ধ্যেবেলা তোকে চাবী দিয়ে রাখব, বাবার কাছে শুতে দেব না" এই কথা। সহস্র দুষ্টামি এই শাসনে তখনকার মত আমার বন্ধ হইয়া যাইত। এক কথায় আঁমার সেই ক্ষুদ্র শৈশবজীবন কূলে কূলে তখন তাঁহাতেই পরিপূর্ণ ওতপ্রোত ছিল। তাই বলিয়াছি, শৈশব ও যৌবনপ্রেমে তফাৎ অল্পই। বস্তুতঃ আমার মনে হয়, কি মাতৃপ্রেম, কি ভাইবোনের ভালবাসা, কি বন্ধুত্ব, কি দাম্পত্যপ্রেম, সকলরূপ গভীর ভালবাসারই মূলগত ভাব একই। একের সহিত

অন্যের পার্থক্য কেবল সে ভাবের স্থায়িত্ব ও প্রবলতার তারতম্যে। যাহাকে ভালবাসি, তাহার সুখে সুখবোধ ও তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিবার ইচ্ছা প্রেমের এই যে নিঃস্বার্থ অথচ সর্ব্বেসর্ব্বা ভাব—পিতামাতার স্নেহেই ইহার প্রথম স্ফূর্ত্তি এবং ভ্রাতাভগিনী সখাসখীর ভালবাসার মধ্য দিয়া প্রণয়ে ইহার চরম পরিণতি। আসলে প্রেম-মাত্রে একই বস্তু, কেবল বিকশনে ও ভিন্নাধারে ভিন্নাকার।

আমি যেমন শিশুকালে যে আমি ছিলাম, এখনও সেই আমি আছি, তথাপি দেহ জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশে স্বতন্ত্র আকারও হইয়া পড়িয়াছি, সেইরূপ শৈশবপ্রেমই যখন যৌবন মহাকারে বর্দ্ধিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে, তখন আর পূর্ব্বের পরিমিত ক্ষুদ্র ভাবগুলিতে তাহার পরিধি পূর্ণ করিতে পারে না, সে তখনকার শিক্ষাজ্ঞান আকর্ষণ আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ আধারে আপনাকে পরিব্যাপ্ত বিকশিত করিতে চাহে। তখন যাহা দেখিয়াছি, জানিয়াছি, পাইয়াছি, তাহাতেই মন তৃপ্তি মানে না—কেন না, যাহা দেখি নাই, জানি নাই, এমন মহাসুন্দর ভাব কল্পনায় আমাদের মনে আবির্ভূত হইয়াছে; সেই জন্য তখন এই উভয় ভাবের সম্মিলনে সর্ব্বসুন্দর সর্ব্বপরিতৃপ্তিকর মানসদেবের আরাধনায় সাকারে নিরাকার পূজার জন্য মনপ্রাণ ব্যগ্র আকুল হইয়া উঠে। সে রমণীই ধন্য—যে তাহার মনোদেবতার সন্ধান পাইয়া এই পরিপূর্ণ উথলিত আবেগময় প্রাণের পূজায় জীবন সার্থক করিতে পারে; আর সেই পুরুষই ধন্য, যে এই পূজারতা হৃদয়ের দেবতারূপে বরিত হইয়া তাহার পূজায় জীবন উৎসর্গ করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে, আর সেই প্রেমই প্রকৃত প্রেম, যাহা এই উভয়ের আত্মহারা পূজায় অধিষ্ঠিত হইয়া প্রবলভাবে চিরবিরাজমান।

আমি পিতাকে এখন খুব ভালবাসি, তাঁহার সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত নহি—কিন্তু তিনি এখন আর আমার জীবনের একমাত্র সুখদুঃখ আশ্রয় অবলম্বন, আকাঙ্ক্ষা কামনা পূজা আরাধনা, দেবতাসর্ব্বস্ব নহেন। অধিক দিন তাহাতে উক্ত সর্ব্বেসর্ব্বা প্রেমভাব স্থায়ী হয় নাই। এইখানেই প্রণয়ের সহিত ইহার মূলগত পার্থক্য। যৌবনের বহুপূর্ব্বে শৈশবের বাবার এ ভালবাসার ভাগীদার জুটিয়াছিল।

এতক্ষণ বলি নাই, আমাদের বাড়ী কোথায়। কথাটা না পাতিয়া চলিলে বলিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এখন দেখিতেছি, আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ঢাকা জেলার লোক, বাবার জমিদারী সম্পত্তি কিছু আছে, কিন্তু প্রধান

আয় চাকরীতে, তিনি একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। যতদিন বাড়ী বসিয়া কাজ পাইয়াছিলেন, ততদিন সকল বিষয়ে আমাদের বেশ সুবিধা ছিল। কিন্তু আমার বয়স যখন আট নয়, তখন এক সাবডিবিসনে তাঁহার বদলী হইল। পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি, বিদ্যাশিক্ষার জন্য দিদি পিসীমার কাছে কলিকাতায় থাকিতেন। আমি কিন্তু কখনও বাবাকে ছাড়িয়া থাকি নাই, এখনও থাকিতে পারিব না জানিয়া জ্যেঠাইমাকে ও আমাকে সঙ্গে লইয়া বাবা কর্মস্থলে আসিলেন। এখানে সরকারী স্কুল বা বালিকা-বিদ্যালয় কিছুই ছিল না, জমিদার কৃষ্ণমোহন বাবুর বাড়ীতে তাঁহার বাড়ীর ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য একটা স্কুল বসিত, পাড়ার শিশুগণও অনেকেই এখানে পড়িতে আসিত, আমিও আসিতাম। কলিকাতায় এরূপ প্রথা আছে কি না, জানি না; পাড়াগাঁয়ের অনেক স্থলেই এক পাঠশালায় শিশু বালক বালিকাগণ একত্রে পড়ে। সেখানে সকলেরই সঙ্গে আমার খুব ভাব হইল, কিন্তু সকলের চেয়ে ছোটুর সহিত। ইহার আসল নাম কি, জানি না, বাড়ীর মধ্যে ছোট বলিয়াই বোধ হয় সকলে ইহাকে ছোটু ছোটু করিয়া ডাকিত। তখন ভাবিতাম, ইহাই তাহার একমাত্র নাম। ছোটু কৃষ্ণমোহন বাবুর ভাগিনেয়; বাবা না থাকায় মামারবাড়ী প্রতিপালিত। ছোটুর সহিত বেশী ভাব হইবার প্রধান কারণ, সে স্কুলে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, বোধ হয়, বার তের হইবে। বাল্যকালে বয়স্য-বয়স্যাদিগের অপেক্ষা বয়োধিকদের সহিত কিরূপ আকর্ষণ, তাহার অভিজ্ঞতা বোধহয় অনেকেরই আছে; দ্বিতীয়তঃ ইনি পণ্ডিত মহাশয়ের প্রধান পড়ো, নিম্নক্লাশের ছাত্রছাত্রীগণের পড়া দেখিবার ভার ইঁহার উপর সমর্পণ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় নিজের পরিশ্রম অনেকটা লাঘব করিতেছেন। স্কুল বসিত কৃষ্ণমোহন বাবুর বাহিরের একখানা আটচালা ঘরে প্রাতঃকালে সাড়ে সাতটার সময়, আর ভাঙ্গিত সাড়ে দশটায়। কিন্তু আমরা সকলে সাড়ে ছটার মধ্যে স্কুলে গিয়া হাজির হইতাম। আর এমন একদিনও যায় নাই যে, আমরা গিয়া ছোটুকে বেঞ্চের উপর বসিয়া থাকিতে দেখি নাই। পণ্ডিত মহাশয় আসিতেন সাড়ে সাতটায়, কোনদিন বা আটটায়, ততক্ষণ ছোটু আমাদিগকে পড়া বলিয়া দিত, কপি-বুকে অক্ষর লিখিয়া দিত, পকেট হইতে মুড়ি-মুড়কি বিতরণ করিত, বোধ করি, ইহা তাহার প্রাতরাশের অবশিষ্ট, আর বাকি সময় বই হাতে করিয়া মনে মনে নিজের পড়া মুখস্থ করিত ও মুখে গুন গুন করিয়া গান গাহিত; এই তাহার এক বিশেষ অভ্যাস ছিল। আমরা কোন কোন সময়ে যদি ধরিয়া পড়িতাম, কি গাহিতেছ, স্পষ্ট করিয়া গাও, তা কখনও গাহিত না। একদিন

কেবল আমরা তাহার গানের দু' এক লাইন স্পষ্ট শুনিয়াছিলাম। আটচালায় প্রবেশ করিতে যাইতেছি, তাহার গুণগুণানি একটু স্পষ্টতরভাবে কানে গেল। প্রভা বলিল—তাহার সকলের চেয়ে দুষ্টবুদ্ধি বেশী যোগাইত, "ছোটু গান করছে, এইখানে দাঁড়িয়ে শুনি, তা'পর শিখে গিয়ে বলব, কেমন শুনে নিয়েছি।' দু' এক দিন আগে কৃষ্ণমোহন বাবুর ছেলের পৈতে উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে কলিকাতার নাচ আসিয়াছিল। আমরা থিয়েটারকে নাচ বলিতাম। আমরাও দেখিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু কি যে দেখিয়াছিলাম, কি যে অভিনব হইয়াছিল, তাহা যদিও জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিব না। আমি সমস্ত ক্ষণই প্রায় জ্যেঠাইমার কোলে মাথা দিয়া ঘুমাইয়াছিলাম। একবার কেবল একটা ভয়ঙ্কর চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া দেখি, জরীর পোষাক পরা একজন রাজার ছেলে ভারী রাগিয়া গেছে, রাগিয়া জোরে জোরে তক্তার উপর লাথি মারিতেছে আর তরবারি উঠাইয়া চীৎকার করিতেছে। দেখিয়া ভারী ভয় হইল, তাহার পর আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। আর একবার জ্যেঠাইমা আমাকে জাগাইয়া দিয়াছিলেন। সে বার দেখিলাম, কতকগুলি পরী শূন্যে ঝুলিতেছে। সে দৃশ্যটি বড় ভাল লাগিয়াছিল। সেই থিয়েটারেই বুঝি ছোটু গান শিখিয়া থাকিবে, সে গাহিতেছিল—

"হায়! মিলন হোলো,
যখন নিভিল চাঁদ, বসন্ত গেলো!
হাতে ক'রে মালাগাছি, সারাবেলা ব'সে আছি
কখন্ ফুটিবে ফুল, আকাশে আলো—"

এইটুকু শুনিয়াই আমরা হাসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম। পরে এমন আপশোষ হইয়াছে—কেন গানটি শেষ পর্য্যন্ত শুনি নাই। অনেক উপন্যাস প্রহসন গীতিনাট্যে গানটি খুঁজিয়াছি, কিন্তু পাই নাই। আমরা ঘরে ঢুকিয়া হাসিয়া বলিলাম, "কেমন তোমার গান শুনে ফেলেছি," ছোটু ভারী লজ্জিত হইল। গানটির সেই ক'লাইন একবার শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কখনও আর ভুলি নাই, আর পরের ভাল করিয়া মুখস্থ করা গানও কত ভুলিয়াছি, তাহার ঠিক নাই।

আগেই বলিয়াছি, ছোটু আমাদিগকে মুড়িমুড়কি দিত। মুড়িমুড়কি বাড়ীতে যে আমাদের কাহারো দুষ্প্রাপ্য ছিল, তাহা নহে, কিন্তু হরির লুটের বাতাসার মত তাহার হাত হইতে মুড়িমুড়কি পাইতে আমাদের ভারী আমোদ হইত।

কথা ছিল, দুষ্টামি না করিলে, ভাল করিয়া পড়া বলিতে পারিলে ছোটু মুড়িমুড়কি দিবে। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা ভিন্নরূপ হইয়া পড়িয়াছিল, দুষ্টামি

করিলে ছোটু যদি বকিত, আমার চোখও অমনি জলে ভরিয়া উঠিত, হাসিখুসি খেলাধুলা সমস্ত বন্ধ হইয়া পড়িত, ছোটু তখন আদর করিয়া আমাকে ঢের বেশী করিয়া মুড়িমুড়কি দিত। এই আদরের লোভে অথবা বেশী মুড়িমুড়কির লোভে জানি না আমার দুষ্টামিটা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছিল। পড়া জানিলেও অনেক সময় ভুল উত্তর দিতাম—লেখা দেখিতে আসিলে কালীর ফোঁটা হাতে ফেলিয়া দিয়া হাসিয়া কুটি-কুটি হইতাম, বোর্ডে আঁক কষিয়া শিখাইতে গেলে খড়িমাটী মুছিয়া তাহার মাথায় ঘষিয়া দিয়া দূরে পালাইতাম, ইহাতে যদি সে রাগ করিত ত কাঁদিতে বসিতাম,—আর রাগ না করিয়া সেও যদি হাসিয়া খেলায় যোগ দিত—ভুল পড়া বলিলে যদি হাসিয়া বলিত—চালাকি করা হচ্ছে,—হাতে কালী দিলে হাসিমুখে যদি কলমটা লইয়া আমাকে ফোঁটা পরাইয়া দিত, কিংবা আমার কপিবুকে নাম লিখিতে বসিত, খড়িমাটী চিত্রিত হইলে ফুল ছিঁড়িয়া যদি আমাদের মাথায় বর্ষণ করিত, তাহা হইলে আমার আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিত না। তাহার এরূপ খেলার ভাব দেখিলে সেদিন কেবল একা আমি কেন—আমরা স্কুলের যত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সকলে মিলিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতাম।

বাবা আর একলাই বাগানের ভাল ভাল ফুল পাইতেন না, ছোটুর মুড়িমুড়কির বদলে তাহাকে আমি রোজ ফুল আনিয়া দিতাম। কাহাকে ফুল দিতে বেশী ভাল লাগিত—বাবাকে বা তাহাকে, আর কাহার সঙ্গই বা বেশী ভাল লাগিত—বাবার বা তাহার, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। কোন একটি ভাল ফুল দেখিলে একবার মনে হইত, বাবাকে দিই, একবার মনে হইত, তাহার জন্য লইয়া যাই; যে দিন দেখিতাম, বাবা উঠিয়াছেন সেদিন ফুলটি তাঁহাকেই দিতাম, আর যে দিন দেখিতাম, তিনি উঠেন নাই, সেদিন ছোটুর জন্য লইয়া যাইতাম। সকালে যেমন ছোটুর কাছে যাইতে ব্যগ্র হইতাম, সন্ধ্যাবেলা তেমনি আগ্রহে বাবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম, যাহার কাছে যখন থাকিতাম, তাহাকেই তখন বেশী ভালবাসি বলিয়া মনে হইত। ছোটুর কাছ হইতে বাবার কাছে আসিয়া প্রায়ই তাঁহাকে বলিতাম—"বাবা, তোমাকে খুব ভালবাসি!" বাবা যেন সন্দেহ করিয়াছেন।

তিনি বলিতেন, "সত্যি ?"

আমি বলিতাম—"হ্যাঁ, সত্যি বলছি।"

বাবা হাসিয়া চুম্বন করিতেন; আমিও করিতাম—ভাবিতাম, ছোটু ত

আমাকে চুম্বন করে না; তবে বাবার মত আমাকে ভালবাসে না, আমি কেন তবে ভালবাসিব ? কে বলে ভালবাসা ভালবাসার প্রত্যাশা করে না ? ছেলেবেলাও এই যে ভাব, ইহা ত আমাকে কেহ শিখায় নাই !

দুই বৎসর আমরা একত্র পড়িয়াছিলাম, তাহার পর অনেক চেষ্টা-যত্ন করিয়া নিজ ঢাকাতেই বাবা বদলী হইলেন। এই সময় দিদির বিবাহ হইল। সেই দুই বৎসরের প্রতি প্রাতঃকাল কিরূপ আনন্দে কাটিয়াছিল, মনে করিতে হৃদয় এখনো আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার পর আট দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তাহার পর আমি ভালও বাসিয়াছি, শৈশবের স্নিগ্ধ কোমল ভালবাসা নহে, যাহাকে লোকে বলে প্রেম—যৌবনের সেই জ্বলন্ত অনুরাগ—তাহারও অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, জীবনে কত বড় বড় আশা ভাঙ্গিয়াছে, গড়িয়াছে, কত প্রবল আনন্দ নিরানন্দ জীবনের গ্রন্থিগুলি যেন দলিয়া পিষিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু শৈশবের সেই অপরিণত ক্ষুদ্র প্রেমে কি ইহা অপেক্ষাও কম সুখ, কম নিঃস্বার্থ ভাব ছিল ? তখনকার সেই ছোটখাট সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার প্রতি আমার মমতা আকর্ষণ কি এখনো কিছু কম। তাহা আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তবে কি—কে জানে কি ! তোমরা শুনিলে হয় ত বুঝিতে পারিবে, কি। আমার নিজের নিকট ত নিজের জীবন প্রকাণ্ড একটা প্রহেলিকা !

২

"তাহাকে" প্রথম দেখি দিদির বাড়ী—টেনিস পার্টিতে ! ভাগনীপতি বিলাতফেরত ব্যারিষ্টার, ইংরাজীয়ানা চালে চলেন; টেনিস খেলা উপলক্ষে হপ্তায় হপ্তায় তাঁহার বাড়ীতে ছোটখাট একটি স্ত্রী-পুরুষসম্মিলনী হইয়া থাকে। "তিনিও" বিলাতফেরত; ভগিনীপতির সহিত একটু কি রকম সম্পর্ক আছে, ভগিনীপতির ভগিনীপতির দূরসম্পর্কীয় ভাই, কি এই রকম একটা কিছু !

প্রথম দর্শনেই কি আমি প্রাণসমর্পণ করিয়াছিলাম ? মোটেই নহে; আমি উপন্যাস লিখিতেছি না। বরঞ্চ বিপরীত আলাপ হইবামাত্র একটু পরে তিনি একটু টেপা হাসি হাসিয়া দিদির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—যদিও জনান্তিকে—"এমন মণিকে আপনি এতদিন খনির মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন ?" আমার নাম মৃণালিনী, আমাকে সকলে মণি বলিয়া ডাকে। কথাটা আমি শুনিতে পাইলাম এবং এই প্রশংসার মধ্য হইতে কেমন একটা বেতর বেসুরো স্বর খট

করিয়া কানে বাজিল। ভগিনীপতি আবার ইহার পর ঠাট্টা করিয়া প্রকাশ্যেই বলিলেন—

Full many a gem of parest ray serene

The dark unfathomed caves of ocean bear

Full many a flower is born to blush unseen

And waste its sweetness on the desert air.

দিদির নন্দাই সংস্কৃতে এম, এ দিয়াছেন, তিনিই বা বিদ্যা ফলাইবার এমন সুযোগ ছাড়িবেন কেন? তিনিও গোঁপে তা দিতে দিতে বলিলেন—"ন রত্নমন্বিষ্যতে মৃগ্যতে হি তৎ—রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না, তাহাকে অন্বেষণ করিয়া লইতে হয়।"

সকলের মুখেই বেশ একটু হাসি ফুটিল; এইরূপে হাস্যাস্পদ হইয়া ইহার কারণকে যে আমি বিশেষ প্রীতির নজরে দেখিয়াছিলাম, এমনটা ঠিক বলিতে পারিতেছি না—কিন্তু এ ঘটনা হয় টেনিস খেলার আগে,—খেলার পরে একটু অবস্থান্তর ঘটিল। উদ্যান হইতে সকলে গৃহে সম্মিলিত হইলে তিনি গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইয়া প্রথমে গাহিলেন ইংরাজী গান; দিদির তাহাতে মন উঠিল না, দিদি ধরিয়া পড়িলেন—"বাঙ্গালা গান গাহুন";—অনেক আপত্তি প্রকাশ করিয়া, অনেক ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে নাচারে পড়িয়া তিনি বাঙ্গালা গানই আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এ যে ছেলেবেলার ছোটুর সেই গান।

হায় মিলন হোলো—

যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো।

কেবল ছোটুর অস্পষ্ট গুণগুণানি নহে। দিদি তাহার গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাইতেছিলেন, পিয়ানোর তানে লয়ে তাঁহার পূর্ণ কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া গৃহে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল; আমি ত মুগ্ধ অভিভূত হইয়া শুনিতে লাগিলাম। পিপাসিত ব্যক্তির জলপানের ন্যায় গানের প্রতি শব্দ ছত্র সোৎসুকে গ্রাস করিতে করিতে রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহার শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু আশা-আকাঙ্ক্ষা যতই সামান্য হউক, যদি মর্ম্মান্তিক হয়, তবে বুঝি তাহা সহজে পূর্ণ হয় না, ইহাই বুঝি সংসারের অব্যর্থ নিয়ম। দুই লাইন শেষ হইতে না হইতে মিষ্টার কর সস্ত্রীক সপুত্রিক গৃহে প্রবেশ করিলেন। অভ্যর্থনা-সমাদরের সাধারণ একটা হিল্লোল-প্রবাহের মধ্যে গান-বাজনা থামিয়া গেল;

গায়ক বাদক উভয়েই উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন সম্ভাষণ করিলেন। স্বাগতগণ তাঁহাদের পালায় আবার সকলের সহিত যথাবিহিত ভদ্রতানুষ্ঠান শেষ করিবার পর যদিও সেই অসমাপ্ত গীত-বাদ্যের পুনরারম্ভ প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু গায়ক আর তাহাতে সম্মত হইলেন না। মিস কর একজন সুগায়িকা, তিনি তাঁহাকেই গাহিতে অনুরোধ করিলেন। কেবল আমার ছাড়া গৃহশুদ্ধ অন্য সকলেরই সেইরূপ ইচ্ছা,—অতএব কুসুম তাঁহার সুলোভন শীলতাপূর্ণ আপত্তি প্রকাশের সুখভোগ পর্য্যন্ত কাল-ব্যয় করিতে অবসর না পাইয়া তখনই পিয়ানোর কাছে আসিয়া বসিতে বাধ্য হইলেন। আবার গান-বাজনায় গৃহ গম-গম করিয়া উঠিল; কুসুমের সুকণ্ঠ সুতানে মুগ্ধ হইয়া শ্রোতৃগণ অবিরাম একটি গানের পর আর একটির ফরমাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার কর্ণে তাহার কোনটিই প্রবেশ করে নাই, আমার মাথায় সেই একই গান একই সুরে কেবল ঘুরিতেছিল।

হায়! মিলন হলো!
যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো!

গানবাদ্য গল্পস্বল্পের পর নিয়মিত সময়ে নিমন্ত্রিতগণ যখন বাড়ী চলিয়া গেলেন, গৃহ নিস্তব্ধ নির্জ্জন হইয়া পড়িল--তখনও আমার কানে সেই গান বাজিতে লাগিল। রাতে ঘুমাইয়াও তাহা স্বপ্নে দেখিলাম। ছেলেবেলার সেই আটচালা ঘর, তাহাতে দিদির এই ড্রয়িংরুম—সমারোহে—ছোটু গাহিতেছে—তাহার গুণগুণানি সুরে নহে—সুস্বরে সুতানে পূর্ণ কণ্ঠে গাহিতেছে—আমার দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া গাহিতেছে--

সেই মিলন হোলো—
যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো!

সেই মধুময় গীতধারায়, সেই প্রেমময় দৃষ্টি-প্রবাহে আমার সর্ব্বাঙ্গ বিদ্যুৎ-কম্পিত হইয়া উঠিল আর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—দেখিলাম, ভোর হইয়াছে।

বড় আশা ছিল, দ্বিতীয় হপ্তায় টেনিস পার্টির দিনে গানটি শুনিব, কিন্তু তিনি আর সেদিন আসিলেন না। রাত্রিকালে ডিনার টেবিলে আমি বলিলাম—"মিষ্টার ঘোষ যে আজ এলেন না?"

দিদি বলিলেন, "হ্যাঁ, আমিও ঐ ভাবছিলুম—তিনি যে আজ এলেন না?"

ভগিনীপতি ঠাট্টার সুরে বলিলেন, "তাই ত, রমানাথ কি জানে, এ দিকে এমন প্রলয় উপস্থিত, তা হ'লে অবশ্যই আসত—তা ডাকব নাকি?"

ঠাট্টা আমাকে স্পর্শ করিল না, আমি সত্যই গায়কের প্রতি আকৃষ্ট হই নাই, আমার অনুরাগ গানের প্রতি ; অতএব আমি তাঁহার ঠাট্টায় না দমিয়া বেশ সহজ ভাবেই বলিলাম, "ডাক না, তিনি বেশ গাইতে পারেন—আর একদিন শুনতে ইচ্ছা আছে।"

আমার মনে কোন লুকান অভিপ্রায় ছিল না—কিন্তু তাঁহাদের মনে ছিল। তখন যদিও তাহা বুঝি নাই, পরে বুঝিয়াছি।—সুতরাং আমার কথাটা তাঁহারা লুফিয়া লইলেন। দিদি বলিলেন, "রমানাথ অনেকদিন 'কল' করেছেন, কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত তাঁকে ডিনারে বলা হোল না, একদিন খেতে নিমন্ত্রণ করা যাক।" ভগিনীপতি বলিলেন, "তথাস্তু! তোমার ইচ্ছাতেই আমার ইচ্ছা। যেদিন ইচ্ছা বলিয়া পাঠাও।"

ডিনারের দিন তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমটা যেন একটু নিরাশ হইয়া পড়িলাম,—পূর্ব্বে একদিন মাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছি—একদিনেই যে তাঁহার মূর্ত্তি মানসপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, এমন নহে, বরঞ্চ ১০।১২ দিন চেহারাটা এতদূর ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, তাঁহাকে মনে করিতে সেই স্বপ্নের চেহারাই মনে পড়িতেছিল, তাই চাক্ষুষ প্রভেদ প্রত্যক্ষ করিবামাত্র একটু ক্ষুন্ন হইলাম। আমার স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ যে দেবতার ন্যায় সুপুরুষ, এমন বলিতেছি না—সত্য কথা বলিতে সে মুখও আমার তেমন সুস্পষ্ট মনে ছিল না, মনে ছিল কেবল স্বপ্নের সেই দৃষ্টি।—আর এখন যাহাকে দেখিলাম, তিনি কিছু মন্দ দেখিতে না, দিব্যি নাক-মুখ, বেশ পরিপাটি করিয়া বড় কপালে চুল ফেরান, ঘন গোঁপের বেশ বঙ্কিম বাহার, সবশুদ্ধ বেশ ভালই দেখিতে। যদিও গোঁপের এ বাহার প্রথমে চোখে লাগে নাই—ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম—প্রথমে বরঞ্চ একটু বেশী ঘন বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কিন্তু আমার স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের মত তাঁহার নয়নে সেই প্রাণস্পর্শী পরিপূর্ণ সরল—অথচ প্রেমময় দৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিলাম না ; তাহার সন্ধান করিতে গিয়াই নিরাশ হইয়া পড়িলাম। কথাবার্ত্তাতে মাঝে কেমন একটু খট্‌কা লাগিতে লাগিল। তাঁহার টানাবোনা রসিকতা এক একবার যেন ভদ্রতার সীমানা ছাড়াইয়া উঠিতেছে, মনে হইতেছিল।—অথচ স্পষ্ট করিয়া এরূপ মনে করিতেও ভরসা হইতেছিল না। ইংলণ্ডে best manners যিনি শিখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার সুরুচি বা ভদ্রতার অভাব সম্ভবে? আমারি অমার্জ্জিত অশিক্ষিত রুচিবশতঃ তাহা ঠিক উপলব্ধি করিতেছি না।

তিনি আসিতেই দিদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি যে

বৃহস্পতিবারে এলেন না? আমরা শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ভাবছিলুম, আপনি আসবেন।"

তিনি বলিলেন, "মিষ্টার করের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। I refused them so many times before, that I had not the heart to do so again, so sorry—but did you really expect me? If I had only known it, I would have sacrificed a thousand—"

ভগিনীপতি বলিয়া উঠিলেন—"I say R don't be so very eloquent it might make me jealous you know—"

দিদি বলিলেন, "সেদিন ডিনারের পর আপনাদের কি গান হ'ল? মিস্ কর কি সুন্দর গাইতে পারেন?"

মিষ্টার ঘোষ একটু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, এইরূপ শোনা যায় বটে—অন্ততঃ তাঁহাদের ত এইরূপ বিশ্বাস। What a lovely colour! It suits the complexion beautifully."

আমার সাড়ীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ কথাটা বলা হইল। ডিনার-টেবিলে অবশ্য আমি তাঁহার পাশে বসিয়াছিলাম, কিন্তু মনে রাখিবার মত এমন কিছু বিশেষ কথা হয় নাই। ভগিনীপতিতে তাঁহাতে বেশী সময় পলিটিক্স লইয়াই তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছিল, মাঝে মাঝে আমার সহিত যা কথাবার্ত্তা, অধিকাংশই তাহা প্রশ্নোত্তর। আমি গাহিতে পারি কি না, কবিতা পড়ি কি না—কাহার কবিতা আমি বেশী ভালবাসি, কতদিন এখানে থাকিব, ইত্যাদি। আমি নিজে হইতে কথা কহিবার মধ্যে তাঁহার গানের প্রশংসা করিয়াছিলাম, আন্তরিক প্রশংসা, ইংরাজী কম্প্লিমেন্ট নহে। বোধ করি, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, প্রশংসা শুনিয়া বলিলেন, "বাঙ্গালা গান আমি বেশী জানি না, এবার দেখছি শিখতে হবে।"

তাঁহার সমস্ত কথার মধ্যে এই কথাটি আমার ভাল লাগিয়াছিল; মনে হইল, তিনি হৃদয়ের সহিত বলিতেছেন। খাবার পর আবার তিনি সেই গানটি গাহিলেন—

হায়! মিলন হোলো!
যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো।
হাতে ক'রে মালাগাছি, সারা বেলা বসে আছি
কখন্ ফুটিবে ফুল, আকাশে আলো,—

আসিবে সে বর-বেশে, মালা পরাইব হেসে,
বাজিবে সাহানা তানে বাঁশী রসালো !—
আসিল সাধের নিশা, তবু পূরিল না তৃষা—
কেমন কি ঘুমে আঁখি ভরিয়ে এল—
হায় মলিন হোল !

গানটি এইখানে শেষ হইল, তিনি থামিলেন, কিন্তু মনে হইল, এখনো যেন অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত রহিয়া গেল, কি যেন আরো বলার ছিল, বলা হইল না ; শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম, অথচ পরিতৃপ্ত হইলাম না ! কিন্তু গান শেষ হইলে নিকটে আসিয়া তিনি যখন বলিলেন—"I wish I was a painter to paint you like this" তখন পূর্ব্বের মত আমার বিরক্তি বোধ হইল না—মনে হইল, তিনি যেন আর আমার অপরিচিত নহেন। সে সময় স্বপ্নের মূর্ত্তিতে তাঁহার মূর্ত্তিতে মিশ্রিত হইয়া আমি দেখিতেছিলাম—তাঁহাকে না কাহাকে ?

৩

মেশমেরাইজ করিলে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি। আমি যেন সেইরূপ মন্ত্রপূত হইয়া পড়িলাম। তিনি যখন আমাদের বাড়ীতে আসিতেন, তাঁহাকে যখন প্রথম দেখিতাম, তখন আমার বেশ সহজ অবস্থা, অন্য একজন সাধারণ আলাপীর সহিত দেখা-শুনা কথাবার্ত্তায় যতটুকু আনন্দ, তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাতেও তদপেক্ষা অধিক কিছুই নহে। কিন্তু গানটি গাহিলেই সমস্ত বিপর্য্যয় হইয়া পড়িত। অন্য সময়ে এমন কতবার পণ করিয়াছি—সে গান আর শোনা হইবে না, তাঁহাকে আর গাহিতে বলিব না, কিন্তু সময়কালে সে সঙ্কল্প কিছুতেই বাঁধিয়া রাখিতে পারিতাম না, শুষ্ক পত্রের মত যেন আপনা হইতে ছুটিয়া আসিয়া পড়িত ! গানটির যে কি মোহ ছিল জানি না, শুনিতে শুনিতে বাল্যের স্মৃতিধারা পূর্ণ প্রবাহে উথলিয়া কুমারী-হৃদয়ের অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে স্ফীত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল। সঙ্গীতধ্বনি সুরে তানে উঠিয়া পড়িয়া যতই মধুরতা বর্ষণ করিত, ততই সে আকাঙ্ক্ষা তীব্র আকুলতর হইয়া প্রবল স্রোতোচ্ছ্বাসে তাহার চিরপরিচিত অথচ চির-নূতন কে জানে কোন্ অজানা প্রেমময় সাগর-দেবতার অন্বেষণে ধাবিত হইত—তাহাতে আত্মবিলীন করিতে চাহিত। এই সুমধুর সুকোমল তীব্র অতৃপ্তির আতিশয্যে

ক্রমশঃ যেন আপনা হারাইয়া ফেলিতাম, সেই অপরিচিত মধুর গীত-সম্ভাষণে মুগ্ধ স্মৃতি-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া গায়ক ক্রমে আবার মনে নয়নে পরিচিত প্রিয়জনের মূর্ত্তিতে বিভাষিত হইয়া উঠিতেন ; নূতনে-পুরাতনে, অতীতে-বর্ত্তমানে, স্মৃতি বাসনায় তখন একাকার হইয়া পড়িত—আমি জাগিয়া যেন স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করিতাম।

তিনি চলিয়া যাইবার পরেও সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কেমন মেঘাচ্ছন্ন থাকিতাম—স্বপ্নে জাগরণে ঐ একইরূপ ভাব আমাকে অভিভূত করিয়া রাখিত ; পরদিন নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে সে ভাব অল্পে অল্পে দূর হইয়া যাইত। তিন চারিদিন পরে, কখনও সপ্তাহ পরে আবার তিনি যখন আসিতেন, তখন আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ,—তখন আর সে ভাবের চিহ্নমাত্র নাই ; তাঁহাকে দেখিলে পূর্ব্বভাবের স্মৃতিতে এমন লজ্জাবোধ হইত। কিন্তু আবার গান আরম্ভ করিলেই যে কে সেই। এ কি অপরূপ রহস্য, জানি না, সূর্য্যের উদয়াস্তে পৃথিবী যেমন দ্বিমূর্ত্তি ধারণ করে, উক্ত ভাবের উদয়াস্তে আমি সেইরূপ দুই আমি হইয়া পড়িতাম।

ক্রমশঃ আমার এই মন্ত্রপূত ভাব স্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল, অর্থাৎ সময়ে অসময়ে সকল সময়েই আমার তাঁহাকে আত্মীয় বলিয়া মনে হইতে লাগিল ; এইরূপ হইবার নূতন কারণ ঘটিল এই, চারিদিক হইতেই আমি শুনিতে লাগিলাম, বুঝিতে লাগিলাম, তিনি আমার স্বামী হইবেন, কোন বঙ্গবালার মনে এই বিশ্বাসের কিরূপ প্রবল প্রভাব, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক আছে কি ? স্বামী যেমনই হৌন, তিনি রমণীর একমাত্র পূজ্য আরাধ্য দেবতা, প্রাণের প্রিয়তম, জীবনের সর্ব্বস্ব—এই বাক্য, এই ভাব, এই সংস্কার আজন্মকাল হইতে আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া বসিতেছে, সুতরাং বিশেষ কারণে স্পষ্ট বীতরাগ না থাকিলে এই বিশ্বাসই প্রেমাঙ্কুরিত করিবার যথেষ্ট কারণ।

কিছুদিন হইতে আমরা যেখানে যাই, কেবল ঐ কথা, যিনি আসেন, কেবল ঐ কথা। বয়স্যারা ঠাট্টাচ্ছলে আমার কাছে গোপনে ঐ প্রসঙ্গ তোলেন, বয়োজ্যেষ্ঠারা দিদির কাছে আমার সাক্ষাতেই প্রকাশ্যে ঐ আলোচনা করেন, আর দিদি, ভগিনীপতি ত সুবিধা পাইলে যখন তখন ঐ কথা তুলিয়া, কখনো ঠাট্টা করিয়া, কখনো গম্ভীর ভাবে আমার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য-কল্পনায় আনন্দ প্রকাশ করেন। এ কল্পনা যে কখনো সত্যে পরিণত না হইয়া কল্পনাতেই অবসিত হইতে পারে, এ কথা কিন্তু কখনো তাঁহাদের মনে উদয় হয় না। কেনই বা হইবে ? যাঁহাকে লইয়া এত কথা, এত আলোচনা, তিনি দিন দিন এই বিশ্বাস

আমাদের মনে গভীররূপে বদ্ধমূল করিতেছেন, তাঁহার যাতায়াতও বাড়িতেছে, এবং কথাচ্ছলে, ভাবে-ভঙ্গীতে তাঁহার অনুরাগও দিন দিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে, এখনো যে কেবল সুস্পষ্ট বাক্যে তিনি বিবাহ প্রস্তাব করিতেছেন না, সে যেন শুধু আমাদের মনোগত অভিপ্রায় আরো স্পষ্টরূপে বুঝিবার অপেক্ষায়।

রমণী-হৃদয়ে প্রীতিতে যেমন প্রীতির উদ্রেক করে, এমন কি, অন্য কোন গুণে যদি হৃদয় অন্যপূর্ব্ব না থাকে বা কোন কারণে কেহ নিতান্ত বিদ্বেষভাজন না হয়, —তাহা হইলে সে আমাকে প্রাণপণে ভালবাসে—এইরূপ বিশ্বাসস্থলে যদি প্রকৃত প্রেম দিবারও ক্ষমতা না থাকে, অন্ততঃ গভীর করুণাও তাহার স্থানাভিষিক্ত হইয়া ক্রমশঃ প্রেমমূর্ত্তি ধারণ করে। আত্মদানে অন্যকে সুখী করিব নারী-প্রকৃতির এই যে সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছাপ্রবণতা, নারীপ্রেমের শিরায় মজ্জায় যে আকাঙ্ক্ষা শোণিতাকারে প্রবাহিত বর্ত্তমান, তাহার সফলতাতেই, তাহার বিশ্বাসেই রমণী-হৃদয় পরিপূর্ণ, বিকসিত, জীবনজন্ম সার্থক, চরিতার্থ; আবার এ বিশ্বাসেই সে ভ্রান্ত, কলঙ্কিত, মহাপাপী। প্রেমময়ী রমণী ইহার জন্য কতদূর আত্মত্যাগ করিতেছে; আর কতদূর না করিতে পারে?

তাঁহার প্রীতিময় ব্যবহারে, রূপে-গুণে আমার নয়নে তিনি সর্ব্বসুন্দর হইয়া উঠিলেন; আপনাকে এই সর্ব্বগুণধর সুপুরুষের সুখের কারণ ভাবিয়া আমি অতি উপাদেয় গর্ব্বময় আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতে লাগিলাম। বেশী দিন এরূপে দিন কাটিল না, ভাবে-ভঙ্গিতেই তাঁহার অনুরাগ আবদ্ধ রহিল না, একদিন তিনি স্পষ্ট করিয়া তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। সেই প্রার্থিত প্রত্যাশিত দিন আসিল—কিন্তু?

বিকাল বেলা বাগানে ফুল তুলিতেছিলাম। বৃষ্টির পর চারিদিক সুন্দর সুদৃশ্য নবীন হইয়া উঠিয়াছে, আকাশের লাল আলো তরল মেঘের উপর, গাছ পাতা ফুলের কোমলতার উপর অতি মধুর উজ্জ্বলতা বিস্তার করিয়াছে। আমি একটি গোলাপ বোঁটাশুদ্ধ ছিঁড়িতে চেষ্টা করিয়াও ছিঁড়িতে পারিতেছিলাম না, সহসা হাত বোঁটাতেই রহিয়া গেল, কম্পাউণ্ডে গাড়ী-জুড়ি প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহাতেই নয়ন আকৃষ্ট, আবদ্ধ হইয়া পড়িল। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া আমাকে বাগানে দেখিয়া নিকটে আসিলেন, গোলাপটি ছিঁড়িয়া দিয়া বলিলেন, "কাহার জন্য ফুল তুলিতেছেন।" আমিও ফুল তুলিতে তুলিতে ভাবিতেছিলাম, —তখন ছোটুকে কেমন অসঙ্কোচে ফুল দিতাম, আর ইহাকে দিতে ইচ্ছা করিলেও কেন পারি না।" তাঁহার জিজ্ঞাসায় উত্তর করিলাম—"দিদির জন্য।"

একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস শুনিতে পাইলাম। আর একটি সুন্দর গোলাপ ছিঁড়িয়া তিনি আমার হাতে দিতে দিতে আস্তে আস্তে আওড়াইলেন—

"A lamp is lit in eyean'
That souls, else lost on earth
remember angels by."

তখন আমি লজ্জিতভাবে বলিলাম—"ঘরে চলুন।"

তিনি বলিলেন, "চলুন না, আপনি গেলেই আমি যাই; মনে আছে, আজ আপনি আগে গা'বেন বলেছেন ?"

আমরা উপরে উঠিলাম, তখনো ভগিনীপতি বাড়ী ফিরেন নাই, দিদিও এদিকে আসেন নাই, আমি চাকরকে বলিলাম—"দিদিকে খবর দাও", বলিয়া তাঁহার সহিত ড্রয়িংরুমে বসিলাম। তিনি বলিলেন—"আপনি পিয়ানোর কাছে বসুন, 'এমন যামিনী মধুর চাঁদিনী' এই গানটি গান্—"

আমি বলিলাম, "সে রাত্রের গান কি বিকালে গাওয়া যায় ?" তিনি বলিলেন—"তবে যা ইচ্ছা গান—sing sweet bird beauty sing—জানেন ত কবিতাটি—

To me there is but one place,
in the world
And that, where thou art ; for
wherever I be
Thy love doth seek its way
into my heart,
As will a bird in to her secret nest,
Then sit and sing, sweet bird
of beauty sing."

আমি বলিলাম, "আপনি সেই গানটি গান, আমার ভারি শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।"

তিনি এ কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন—"শেলির একটি কবিতা আমার বড় সুন্দর লাগে, আপনি অবশ্য পড়েছেন ?"

"We—are we not med as notemes of
music are,
For one another though dissimillar,
Such difference without discord
as can make,

Those sweetest sounds in which
all spirits shake,
As trembling leaves in a
continuous air."

আমি কোন উত্তর করিলাম না, তিনি একটু পরে আবার বলিলেন,—"আগে ভাবতুম, ভাল কবিতা যাকে বলা যায়, more or less, সে সবই ফাঁকা—মিথ্যা, তার মধ্যে সত্য কিছু নেই, কেবল বাজে কল্পনা, এখন দেখছি ভুল। আপনার কি মনে হয়?"

আমি বললাম—"আমি অমন ক'রে ভেবে দেখি নি—পড়ি ভাল লাগে, শুধু এই জানি।"

তিনি বলিলেন, "কিন্তু সত্য ব'লে না মনে বসলে তার কি প্রকৃত রসটুকু উপভোগ করা যায়? আমি আগে নভেলে first sight এ love যেখানে পড়তুম এমন খারাপ লাগতো—কেন না, তা নিতান্তই মিথ্যা অসম্ভব ব'লে মনে হোত, এখন দেখছি,

There are more things in heaven
and earth Horatio,
Than are dreamt of in your
philosophy,—

কে জানত ঐ মিথ্যা আমার জীবনের পক্ষে একদিন পূর্ণ সত্য হয়ে দাঁড়াইবে?"

বলিয়া বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"To see her is to love her,
And love but her for ever.
For nature made her what she is.
And never made another.

আরো কি স্পষ্ট ক'রে বলবার আবশ্যক আছে?

To see you is to love you
And love but you for ever."

ভগিনীপতি এই সময় গৃহে আসায় তিনি হঠাৎ এইখানেই থামিয়া পড়িলেন।

ভগিনীপতি বলিলেন, "হ্যালো, কতক্ষণ, finishing stroke oh ! Final proposal in poetry is seems, Hurrah ! Let me congratulate you both !"

তিনি যেন একটু সলজ্জভাবে গোঁপ ফিরাইয়া বলিলেন,—"I say you are very late in returning to-day We were whiling away our time as best we could. By the bye did you win that murder case of yours ? Have you got poor fellow off ?"

ব্যারিষ্টারদের নিকট তাঁহাদিগের মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় গল্পের মত প্রীতিজনক গল্প আর নাই, উপরোক্ত প্রশ্নে ভগিনীপতি পূর্ব্ববর্তী কথা ভুলিয়া গেলেন। ঐ প্রসঙ্গে উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, আমি এতক্ষণ যেন কেমন স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলাম—একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিবার অবসর পাইলাম। এই ত তিনি স্পষ্ট করিয়া তাঁহার মনোভাব বাক্যে প্রকাশ করিলেন, আমি কি নিতান্তই সুখে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি ? মনের মধ্যে মন দিয়া অন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, —না, তাহা ঠিক নহে, সর্ব্ব প্রথম তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া যেমন হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার এই অনুরাগ-বাক্যে আজও কেমন যেন সহসা সুমধুর সঙ্গীত-স্বরে একটা বিষম বেসুরো স্বর কানে বাজিল, অমৃতভাণ্ডে একবিন্দু তীব্র বিষক্ষেপের ন্যায় সুখের মধ্যে প্রাণ যেন কেমন আকুল হইয়া উঠিল। আশার কোণে কোণে নৈরাশ্যের ঘন ছায়া জমাট বাঁধিল,—মনে হইতে লাগিল যেন, যাহা চাহিয়াছিলাম, এ তাহা নহে ; যাহা বুঝিয়াছিলাম, এ তাহা নহে।

আমি ভাবিতেছি। তাঁহারা দুইজনে গল্প করিতেছেন, চাকর আসিয়া খবর দিল, একজন মক্কেল আসিয়াছে, আর হাতে করিয়া একখানি 'কার্ড'-পাত্র সম্মুখে ধরিল। ভগিনীপতি তিনখানি টিকিট হাতে উঠাইয়া লইয়া বলিলেন—"ডাক্তার বোস, আমাদের উপর কল করতে এসেছেন দেখছি। আচ্ছা, এইখানে আসতে বল।—মণি, তুমি যাও—তোমার দিদিকে ডেকে আন।"

আমি চলিয়া গেলাম, গৃহ পার হইয়াই প্রায় তখনি নূতন কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম, কৌতূহল-বশবর্ত্তী হইয়া ভাবিলাম—লোকটার চেহারাখানা কি রকম একবার দেখিয়া যাওয়া যাক। দরজার আড়ালে নিজে অদৃশ্য থাকিয়া নবাগতকে দেখিবার প্রয়াস করিলাম। আপনাকে ভাল করিয়া ঢাকিয়া তাঁহাকে দেখিবার তেমন সুযোগ হইতেছিল না—এদিকে একবার, ওদিকে একবার ফেরাফেরি করিতে করিতে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা কানে যাইতে লাগিল। তখন দর্শন-

কৌতূহল-বিরহিত হইয়া শ্রবণ-কৌতূহলে বাঁধা পড়িলাম। ভগিনীপতি ডাক্তারকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়াই মুহূর্তের জন্য বিদায় লইয়া মক্কেলের সহিত দেখা করিতে গেলেন। দুই জনে একাকী হইবামাত্র ডাক্তার বলিলেন—

"By the way I meet Miss K. just before leaving England. She seemed very anxious to know whether you had arrived safely and why you did not send her the money you had promised for her passage out to India. You know her people will have no nothing to do with her since her engagement to you, so the poor girl—"

আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, দেয়ালে ঠেস দিয়া আমি প্রাণপণে বলসংগ্রহ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তিনি বলিলেন—Nonsense, there was never any formal engagement between us, I thought that affair was over and done with long ago. For goodness sake don't being that up before anybody here—all my friends would think I was vilian of the deepest dye.

ডাক্তার। And what alse do you make yourself out to be? Do you think it is very honourable conduct to forsake a helpless girl who has trusted you implicitly? Before God you are man and wife"—

ইহার কিছু পর আর কিছুই জানি না, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

৪

যখন জ্ঞান হইল, দুইটি সোৎসুক নয়নের সস্নেহ দৃষ্টি নয়নে স্থাপিত দেখিলাম। বুঝিলাম, আমার সেই মোহের অবস্থা—যে অবস্থায় আমি আত্মহারা হইয়া অতীতে বর্ত্তমানে মিশাইয়া ফেলি, বাল্যের স্মৃতিপঠিত যৌবনস্বপ্নে একে অন্যে ভ্রম করে,—এ আমার সেই স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থা; তাই মিষ্টার ঘোষের নয়নে আমার বাল্যসখার স্নেহদৃষ্টি নিরীক্ষণ করিতেছি। কিন্তু তখনি সে ভ্রম ভাঙ্গিল, বুঝিলাম, ইনি তিনি নহেন—ইনি ডাক্তার। আমাকে সজ্ঞান দেখিয়া ডাক্তার বলিয়া

উঠিলেন " 'Thank God the danger is past, she is all right now."

দিদি আমার পাশেই বসিয়াছিলেন, তিনি এক চামচ ঔষধ আমার মুখের কাছে ধরিয়া স্নেহকণ্ঠে বলিলেন,—"মণি, এইটুকু খেয়ে ফেল।"

আমি বলিলাম, "আমার হয়েছে কি,—ওষুধ খাব কেন ?"

ভগিনীপতি বলিলেন,—"না, কিছুই হয় নি—ওষুধ না—সরবৎ দেওয়া হচ্ছে খেয়ে ফেল দেখি,—I say Doctor—রমানাথ একবার এখন দেখতে আস্‌তে চায়, আসতে পারে কি ?"

ডাক্তার বলিলেন, "এখনও বোধ হয় কিছুক্ষণ disturb না করাই ভাল,—If she gets a little sound sleep her nervous system will recover its natural tone, এখন আমরাও যাই—আমারো আর এখানে থাকার আবশ্যক দেখিনে। আপনার স্ত্রী উঁহাকে এখন ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করুন। যদি বলেন, কা'ল আমি বরং একবার এঁকে দেখতে আসব—আসতে পারি কি ?"

ভগিনীপতি বলিলেন,—"নিশ্চয়ই। আজ আপনি না থাকলে কি বিপদেই পড়তে হোত—I don't know how to thank—"

আর শুনিতে পাইলাম না, তাঁহারা চলিয়া গেলেন। এতক্ষণ যেন কি একটা অজ্ঞাত জ্বলন্ত লৌহভার আমার হৃদয়ে রুদ্ধ হইয়া ছিল, সহসা অশ্রুস্রোতে গলিয়া বাহির হইয়া উঠিল, আমি দুইহাতে দিদির কটিদেশ বেষ্টন করিয়া—তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলাম—"দিদি, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি ?" দিদি আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আদর করিয়া বলিলেন,—"লক্ষ্মীমণি, আর কথা ক'সনে—ডাক্তার ঘুমুতে বলেছে—চুপ ক'রে থাক—এখনি ঘুম আসবে।"

আমি থামিলাম, কিন্তু অশ্রুধারা থামিল না, শত ধারায় উথলিয়া উঠিতে লাগিল, অথচ এ দুঃখ যে কেন—কেন যে কাঁদিতেছি, তাহা কিছুই বুঝিলাম না ; সুখ-দুঃখ কিছুরই অনুভূতি আমার তখন ছিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে—ছেলে মানুষের মত কাঁদিতে কাঁদিতে দিদির স্নেহাদরের মধ্যে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া কাটিল, অথচ সুনিদ্রা নহে ; ঘুমাইয়াও মনে হইতেছিল, যেন জাগিয়া ঘুমাইতেছি, মাথার মধ্যে কত রকম দৃশ্য, কত রকম ঘটনা ছায়াবাজির মত একটির পর একটি কেমন অবিশ্রান্ত গতিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছিল। এই যেন কি ছিল, কে নাই ; একজনের সহিত গল্প করিতেছিলাম—সে আর একজন হইয়া পড়িল,—কাহার বাড়ীতে যেন নিমন্ত্রণে যাইব—

সাজসজ্জা করিতেছি—কিছুতেই সজ্জা শেষ হইতেছে না, বাড়ীর বাহির হইয়াছি, গাড়ী খুঁজিতেছি, কিছুতেই খুঁজিয়া মিলিতেছে না, অবশেষে পায়ে চলিতেছি, পথ ফুরাইতেছে না, যদি বা পথ ফুরাইল, কাহার বাড়ী যাইতে কাহার বাড়ী আসিয়াছি,—এই রকম সব হিজিবিজি স্বপ্ন; বা শেষে স্বপ্নটি কেবল বেশ স্পষ্ট —এত স্পষ্ট যে, তাহা এখনো আমার জ্বলন্তরূপে মনে আছে। স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আমার বিবাহ হইতেছে, আমি আগ্রহদৃষ্টিতে বরের দিকে চাহিলাম, কিন্তু মনে হইল, এ সে নহে; নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে চক্ষু নত করিলাম, তাঁহার চরণে দৃষ্টি পড়িল—অমনি হৃদয় আনন্দে মগ্ন হইয়া উঠিল—আমি আহ্লাদের আবেগে বলিয়া উঠিলাম,—"এ সেই সেই!" ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিলাম, বেশ আলো হইয়াছে। এইরূপ স্বপ্নময় ঘুম সত্ত্বেও জাগিয়া অনেকটা সুস্থ বোধ করিলাম।

মনে পড়িল, দু'জনের এক একটি কথা আবার যেন নূতন করিয়া অদ্যোপান্ত শুনিতে লাগিলাম। চারিদিকে বায়ুমণ্ডলে পরিবর্ত্তন অনুভব করিলাম,—আপনাকে আপনি ভিন্ন বলিয়া অনুভব করিলাম;—বুঝিলাম, কা'ল যাহা ছিল, আজ আর তাহা নাই—কা'ল যে আমি ছিলাম,—আজ সে আমি নহি! হৃদয়ে নৈরাশ্য বেদনা জাগিল; কিন্তু এ নৈরাশ্যে ঔপন্যাসিক করুণ কষ্টের দারুণতা, অসহনীয়তা উপলব্ধি করিলাম না; কিংবা সে যেমনই হৌক, তবু আমার দেবতা —তবু তাঁহার চরণে হৃদয় বিকাইব, মনে এমনতর ভাবেরও উদয় হইল না। পরিপূর্ণ বিশ্বাসে প্রতারিত বোধ করিয়া এ যেন প্রত্যাখ্যাত ভিক্ষুক দুর্ব্বাসা মুনির ন্যায় গর্ব্বাহত নিরাশক্ষুব্ধ হইলাম, প্রতারকের উপর ভীষণ ক্রোধের উদয় হইল। কেবল তাহার উপর নহে, নিজের উপরেও ক্রুদ্ধ হইলাম—কি করিয়া আমি এমন লোককে দেবতা মনে করিয়াছিলাম! সঙ্গে সঙ্গে বিকটতর একটা আনন্দ জন্মিল—এই যে, সে ভ্রান্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি। তুলনায় ডাক্তারের প্রতি খুব শ্রদ্ধা জন্মিল—তাঁহার করুণ সহৃদয় ভাবে পুরুষোচিত মহত্ত্ব দেখিতে লাগিলাম।

আমাকে সুস্থ দেখিয়া দুপুরের পর দিদি অসুখের কথা পাড়িলেন। "অনেক দিন তোর হিষ্টিরিয়া হয় নি, ভেবেছিলুম, একেবারে সেরে গেছে, আবার রাত জেগে নভেল পড়েছিলি বুঝি? তোর সঙ্গে যদি কিছুতে পারা যায়! আচ্ছা, নিজের জন্য না হোক, আমাদের কষ্ট মনে ক'রেও কি সাবধান হ'তে নেই?"

আমি বলিলাম, "কই অসাবধান ত আমি মোটেই হই নি—"

দিদি। তবে হঠাৎ অমনতর হোস কেন? কা'ল যে ভাবনা গেছে—তা

আর বলবার নয়। দরজার কাছে গিয়েই দেখি—তুই প'ড়ে। চেঁচিয়ে উঠতেই এরা ওঘর থেকে এসে পড়লেন। ভাগ্যিস ডাক্তার কাছে ছিল—তাই রক্ষে। আহা রমানাথ বেচারার যে মুখ শুখিয়ে গিয়েছিল, সে আর কি বলব! তার পর তোকে ত ঘরে উঠিয়ে আনা গেল, সে একবার দেখেই যেতে পারলে না, শুনলুম নাকি ভারী বিষণ্ণ হয়ে বাড়ী গেছে।"

আমি বললাম,—ক্রুদ্ধ বিদ্রূপের স্বরে বলিলাম,—"বিষণ্ণ হয়ে বাড়ী যেতে পারেন, কিন্তু সে আমার অসুখের জন্য নয়—নিজে ধরা পড়েছেন—সেই জন্যে। দিদি, আমরা নিতান্তই ভুল বুঝেছি, প্রতারিত হয়েছি—"

বলিতে বলিতে নয়ন অশ্রুতে ভাসিয়া উঠিল; অগ্নিস্বর ক্রোধাশ্রুতে ভাসিয়া উঠিল। দিদি উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন—

"তোর কথা ত কিছুই বুঝিতে পারছিনে—কা'ল কি তোকে ঐ ভাবের কথা কিছু বলেছে নাকি? কাঁদিসনে আবার অসুখ করতে পারে—স্থির হয়ে সব বল দেখি, কি হয়েছে!"

স্থির হইয়া না পারি, অস্থির ভাবেই খুলিয়া বলিলাম। দিদি শুনিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন—"তবু ভাল, এই ব্যাপার? আমার এমন ভয় হয়েছিল —যে, না জানি কি।"

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলাম—"না জানি কি! একজনের সঙ্গে বিবাহে প্রতিশ্রুত হয়ে অন্য জনের সঙ্গে প্রেমের ভান—এ কি সামান্য ব্যাপার হোল?"

দিদি। "না, ভান হতেই পারে না, তোকে যে সে ভালবাসে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ও বিলাতের কথা ছেড়ে দে। প্রথমতঃ কথাটা কতদূর সত্যি মিথ্যে, তার ঠিক নেই। তারপর ধর, যদি কারো সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েই থাকে, কিন্তু বিয়ে ত আর হয় নি—তা হ'লে আর এত রাগের কারণ কি? সব দেশেই ত এমন কতশত engagement গড়েছে, আবার ভেঙ্গেছে; এই সেদিন যে আমার মামাতো দেওরের গায়েহলুদ হয়েও বিয়ে ফিরলো, আর এ ত বাঙ্গালী ইংরাজের engagement দু'জনের স্বভাব দু'জনের অবস্থার পার্থক্য একবার ভেবে দেখ দেখি। কোন একটা মোহের মুহূর্ত্তে দু'জনে আজন্ম একত্র শপথ করতে পারে,—কিন্তু তার পর-মুহূর্ত্ত থেকেই অনুতাপ করবার কথা—বিয়ে করার যথার্থ উদ্দেশ্য যা পরস্পরের সুখ এ বিয়েতে আমার ত মনে হয় তার সম্ভাবনা একেবারে শূন্য। এ অবস্থায় আমি ত বলি, কথা রাথার চেয়ে ভাঙ্গাই ভাল। নিজের আহাম্মুকীতে যেন নিজেকেই সে অসুখী করলে, কিন্তু আর একজনের চিরজীবনের

সুখাসুখও যখন—"

আমি শেষ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে শুনিতে পারিলাম না, বলিয়া উঠিলাম—"কিন্তু তার সুখদুঃখ ভেবেই কি এ বিয়ে ভাঙ্গা হয়েছে ? যে ভ্রান্ত নারী সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে এখনো পূর্ণ বিশ্বাসভরে তার পথ চেয়ে আছে, সেই বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে গোপনে যে পুরুষ আর একজনকে ভালবাসা জানায়, বিবাহ-প্রস্তাব করে সে খুব সাধু পুরুষই বটে ! দিদি, তুমি এখন প্রশান্তভাবে এ ঘটনা কি ক'রে যে দেখছ, আমি ত ভেবেই পাইনে।"

দিদি বলিলেন, "আমার ভিতরকার কথাটা কি জানিস, আমি অন্তর থেকে তাকে এতে দোষী ব'লে বিশ্বাস করতে পারছিনে ! বিলাতের মেয়েদের কুহক ত প্রসিদ্ধ কথা, আমার মনে হচ্ছে, নেহাৎ কোনরূপ একটা পাকে-চক্রে পড়ে বেচারার এমনতর বিভ্রাট ঘটেছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলেই এর এমন একটা সদুত্তর পাওয়া যাবে যে, তখন সে মেয়ের চেয়ে তার উপরেই বেশী মায়া করবে !"

আমি। তুমি বুঝি ভেবেছ, এ সব কথা আমি তার কাছে তুলতে যাব ?

দিদি। তোর তুলতে হবে না, সে নিজেই তুলবে, সেজন্য ভাবনা নেই, না হয় আমরা জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু যার সঙ্গে বিয়ে স্থির হয়ে গেছে—তার সঙ্গে বুঝি আর এ কথা তোলা যায় না ?

আমি। বিয়ে স্থির এখনো হয়নি, আমার মোটেই ইচ্ছা নেই।

দিদি বিস্ময়ে রাগে বলিলেন, "তুই ক্ষেপেছিস্ নাকি, এ সামান্য কারণে বিয়ে বন্ধ হবে ! ও কথা মনেও আনিস্ নে, তা হ'লে সমাজে কি কলঙ্কের সীমা থাকবে ? সে পুরুষমানুষ, তার কি, তোর সঙ্গে না হ'লে এখনি অন্য আর একজন সেধে মেয়ে দেবে, আর তোর নামে এ থেকে এত কথা উঠবে যে, পরে বিয়ে হওয়াই ভার হবে।"

আমি। নাই বা বিয়ে হ'ল, আমি ত সেজন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত নই।

দিদি। তা ছাড়া এটাও ভেবে দেখ, তুই যে এমন ক'রে নিজের চিরজীবনের সর্ব্বনাশ করতে চাচ্ছিস্, সে কি কোন একটা ন্যায়ের অনুরোধে ? তুই যে জন্য তাকে দোষী করছিস্—এতে তোরও ঠিক সেই একই রকম অন্যায় করা হচ্ছে না ? যে তোকে প্রাণপণে ভালবাসে, মিথ্যা কারণে তাকে কি তুই চির-অসুখী করতে চাচ্ছিস্ নে ?

আমি। মিথ্যা কারণ !

দিদি। নিশ্চয়ই। আমি বেশ জানি, তার কাছে আসল ঘটনা শুনলে বুঝতে পারবি—তেমন দোষ নেই। অন্ততঃ তার এতে কি বলার আছে, সেটা শোন—শুনে তারপর যা হয় স্থির করিস্। খুনী যে, তারও বক্তব্য না শুনে বিচার হয় না, আর যে তোকে এত ভালবাসে, তার পক্ষে তুই একটা কথা না শুনে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে যাচ্ছিস্? তোর দেখছি নিতান্তই কঠিন প্রাণ।

আমি নিরুত্তর হইয়া গেলাম। কি করিয়া আমার মনের ভাব তাঁহাকে বুঝাইব; তিনি সাংসারিক চক্ষে এ ঘটনা দেখিতেছেন, তাঁহার অভিজ্ঞ হৃদয় বলিতেছে, "সংসারে এরূপ ঘটিয়াই থাকে। দোষগুণে মানুষ, অতএব দেবতা চাহিলে তোমাকে নিরাশা সার করিতে হইবে। তুমি শুধু দেখ, সে নিতান্ত ঘৃণ্য দোষ করিয়াছে কি না? যদি না করিয়া থাকে, তবেই সে ক্ষমা পাইবার পাত্র।" আমার কিন্তু নিদাঘ-নিশীথের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, নয়নে আর টিটানিয়ার প্রেমদৃষ্টি নাই, যাহার বলে কুরূপ সুরূপ হইবে, পাপে তাপে, দোষে মলিনতায়, কাঁদিয়া তবু তাহাকে আমারি ভাবিতে পারিব। এখন আমার নিরপেক্ষ বিচারসক্ষম নবীন হৃদয় উচ্চতর কল্পনাপূর্ণ উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা আদর্শে মাত্র জাগ্রত। মনে এখন, যে আমার ক্ষমার পাত্র, সে আমার প্রণয়ী আমার স্বামী হইবার যোগ্য নহে; আমার স্বামীতে আমি সূর্য্যের মত জ্যোতিষ্মান গৌরবমণি দেখিতে চাই। সংসার যেমনই হৌক, পৃথিবীতে সে আমাকে স্বর্গ দেখাইবে, আমি তাহাতে দেবতা পাইব। অন্যে শুনিলে ইহা বৃথা কল্পনা বলিয়া উপহাস করিবে—কিন্তু আমার অনভিজ্ঞ হৃদয়ে ইহা আকাশ-কুসুম নহে; প্রকৃত সত্য, কিন্তু এ সত্য আমি অন্যকে কি করিয়া বুঝাইব? কেবল তাহাই নহে, আমার স্বামীর বর্ত্তমানটুকু লইয়াই আমি সন্তুষ্ট নহি, অতীতে, বর্ত্তমানে, ভবিষ্যতে তাঁহার সমস্ত জীবনে আমি আপনাকে বিরাজিত দেখিতে চাই, তাঁহার জীবনের কোন ভাগ যে আমাছাড়া ছিল বা কখনো তাহার সম্ভাবনা আছে, আমার সর্ব্বগ্রাসী প্রেমাকাঙ্ক্ষা এ চিন্তা সহ্য করিতে পারে না, এ সম্বন্ধে আমার হৃদয় পুরুষের ন্যায়, পুরুষ পত্নীতে যেরূপ অক্ষুণ্ণ অমর পবিত্রতা, অনাদি অনন্ত নিষ্ঠতা চাহেন, আমি তেমন আমার স্বামীর সমস্ত জীবনই আমার বলিয়া অনুভব করিতে চাহি।

আমার এ আকাঙ্ক্ষায় সহানুভূতি কে করিবে? আমি কি করিয়া বুঝাইব যে, আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারি, বিবাহ করিতে পারি—তিনি আমার স্বামী হইতে পারেন। কিন্তু আমার হৃদয়ের আদর্শ আকাঙ্ক্ষা তিনি পূর্ণ করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে হৃদয়মন্দিরে স্থান দিতে গিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহা

ভ্রমক্রমে, মোহভঙ্গে পরিত্যক্ত বিসর্জ্জিত ভগ্ন অঙ্গহীন মূর্ত্তিকে হৃদয়ে স্থাপন করিলে হৃদয়ের শোভা হইবে না, জীবন পর্য্যন্ত তাহাতে বিকৃত বিরূপ হইয়া পড়িবে। রমণীতে এরূপ পৌরুষিক হৃদয়ভাবের কি সহানুভূতি আছে? তাই নিরুত্তর হইয়া গেলাম।

৫

দিদি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল, তিনি আমাকে দেখিতে আসিয়া নিজেই সে কথা পাড়িলেন। বলিলেন—"ডাক্তার আমাকে যা বলছিল,—তুমি তা শুনেছিলে—না?" এই প্রথম আমাকে তিনি 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিলেন; কালিকার বিবাহ-প্রস্তাবের পর আর আপনি বলিয়া সম্ভাষণ বোধকরি তাঁহার সঙ্গত মনে হইল না। অথবা এইরূপ সম্বোধনে এখন অধিকার জন্মিয়াছে বিবেচনা করিলেন! আমি নীরবে ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলাম, শুনিয়াছি। তিনি তখন বলিলেন, "তুমি বোধ হয় ভেবে নিয়েছ, ভারী একটা মহামারী কাণ্ড ক'রে বসেছি, I am so sorry. কিন্তু আসলে তেমন কিছুই নয়—flirtation মাত্র; বিলাতে ত এমন আখ্‌সারই হয়ে থাকে—"

আমি ক্রোধ চাপিয়া সহজে গম্ভীরভাবে বলিলাম, "কিন্তু ডাক্তারের কথায় ত উল্টোই মনে হ'ল!

Oh! the meddling fellow—He is a puritanic hypocrite of the first water! অন্যের সম্বন্ধে একটা কথা পেলে হয়—তিলকে তাল ক'রে তোলে।"

আমি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলাম না, বলিলাম, "একজন পরিত্যক্ত অসহায় রমণীর পক্ষ গ্রহণ করে যে, সে হিপক্রিট, তবে যে, বিশ্বস্ত-হৃদয় রমণীকে ফাঁকি দেয়, তাহাকে অভিধানে কি নামে সম্বোধন করে—বোধ করি Honorable man!"

কথাটা বোধ করি, অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ হইয়াছিল, বলিয়াই আমি অনুতপ্ত হইলাম। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন তাহার পর বলিলেন,—"আমি ফাঁকি দিই নি, যদি বিবাহ করতুম, তা হ'লেই বরঞ্চ ফাঁকি দেওয়া হ'ত। কেন না, আমি তাকে কোন জন্মেই ভালবাসতে পারতুম না।"

"তবে engaged কেন হলেন?"

"ঠিক engaged হই নি, তবে—একটা ভুল বোঝা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে আমার দোষ নয়। বলতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যখন তুমি এতদূর শুনেছ, না বল্লেও উপায় নেই।"

বলা বাহুল্য, তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে সেই ইংরাজ-ললনারই উপর বর্ত্তমান সমাজপ্রথার দোষ অধিক পৌঁছায়। সেই তাঁহাকে প্রথমে অনুরাগ দেখাইয়াছিল—তাঁহাকে তাহাদের বাড়ীতে ক্রমাগত যাইতে বলিত, না গেলে দুঃখ করিত, কোথাও যাইবার আবশ্যক হইলে তাঁহার সঙ্গ প্রার্থনা করিত ইত্যাদি। একজন পুরুষের পক্ষে এরূপ আহ্বান উপেক্ষা করা নিতান্ত অসৌজন্যের কাজ, তিনি তাই এইরূপে তাহার ফাঁদে পড়িয়া গেলেন, অবশেষে যখন বুঝিলেন, তাহার প্রত্যাশা বড় অধিক, সে বিবাহ আশা করে, তখন ক্রমশঃ সরিয়া পড়িলেন। তাঁহার কথার এই সারমর্ম্ম। জানি না, এই বিবরণের জন্য সকলে সেই মুগ্ধা অভিযুক্তা রমণীকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, আমার কিন্তু এ কথায় তাঁহার উপর বরঞ্চ মমতা হইল এবং অভিযোগীর উপর যে বড় শ্রদ্ধা বাড়িল —তাহাও নহে।

আমি বলিলাম, "কিন্তু আপনি তাকে ভুল বুঝতে দিলেন কেন? আপনার পক্ষে যা flirtation, তার পক্ষে তা জীবন্ত অনুরাগ, আপনার খেলা তার মৃত্যু, এরূপ স্থলে বিবাহই আপনার উচিত কার্য্য।"

"তুমি কি মনে কর দৈবাৎ একটা অন্যায় করেছি বলেই সেই অন্যায়কে চিরস্থায়ী করা কর্ত্তব্য? আমি যদি তাকে বিবাহ করি, কেবল আমার কষ্ট নয় আমার ভাই, বোন, পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজনের চিরকষ্ট, দেশের সহিত আজন্ম বিচ্ছেদ এবং এই সমস্ত দুঃখ কষ্ট বহন করব যার জন্য, তারো চিরকষ্ট, কেন না, তার প্রতি আমার এমন ভালবাসা নেই, যাতে তাকে সুখী করতে পারি। এ অবস্থায় তুমি কি আমাকে বিবাহের পরামর্শ দিতে?"

কথাটা ঠিক বলিয়া মনে হইল, বলিলাম—"কিন্তু তবে সে কেন এখনো বিবাহের প্রত্যাশা করে?—অন্ততঃ তাকে পরিষ্কার ক'রে মনের ভাব জানিয়ে মুক্তি লওয়া উচিত ছিল।"

"আমি ত মনে করেছিলুম, যথেষ্ট স্পষ্ট ক'রে মনের ভাব জান্‌তে দেওয়া হয়েছে, তবে এখনো যদি ভুলভ্রান্তি থাকে, আমাদের বিবাহের খবর পেলেই তা ভেঙ্গে যাবে।"

কথাটা বড় খারাপ লাগিল, বাস্তবিক সে যদি ইঁহাকে ভালবাসে, তার

বিবাহের আশা করে, তাহা হইলে এই খবরে তাহার কিরূপ হৃদয়দাহ হইবে! তাহার ভালবাসা আমার আগে, তাহার অধিকার আমার আগে, আমি কোন্ প্রাণে তাহার এরূপ যন্ত্রণার কারণ হইব! আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, "আপনি ন্যায়-অন্যায় কি করেছেন জানি নে, তার বিচারক ভগবান্, আমরা নই, তবে যে রমণী আপনাকে এতদূর ভালবাসে, তাহার সুখের পথে আমি কাঁটা হব না, নিশ্চয় জানবেন্।"

তিনি যেন বজ্রাহত হইয়া খানিকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। আমার কাছ হইতে এরূপ কথা শুনিবেন, ইহা তাঁহার কল্পনার অতীত। কিছু পরে বলিলেন, "তুমি আমাকে ছলনার অভিযোগ দিচ্ছ, আমি আর যাকেই ছলনা ক'রে থাকি, তোমাকে করি নি। কিন্তু তুমি আমাকে ছলনা করেছ, তুমি আমাকে না ভালবেসেও ভালবাস, এইরূপ বুঝতে দিয়েছ। যদি সত্য সত্য আমাকে ভালবাসতে, তা হ'লে কখনই এই সামান্য অপরাধে বিবাহ ভাঙ্গতে চাইতে না, আমার অবস্থা বুঝে বরঞ্চ মমতা করতে। Oh my god—have I live her this!"

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করিয়া রহিলাম,—যখন দিদি আসিলেন, তখন তাঁর সহিত দুএকটা কথা কহিবার পর তিনি বলিলেন, "আজ-রাতেই একটা মোকদ্দমায় মফঃস্বলে যেতে হচ্ছে ; হয় ত হপ্তাখানেক সেখানে থাকতে হবে। আশা করি, চিঠিপত্র পাব।"

বলিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বিদায়-গ্রহণ উপলক্ষে আমার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে আমাকে বলিলেন—অতি ব্যথিত করুণকণ্ঠে বলিলেন, "কি আর বলব, my life and death are in your hands—এই বুঝে বিবাহ ভাঙ্গবার কথা মনে করো।"

ইহার পর তিনি চলিয়া গেলেন।

৬

দিদি বলিয়াছিলেন, তাঁহার স্বপক্ষের বক্তব্য শুনিলে আমার রাগ থাকিবে না, ফলে বিপরীত ঘটিল। নিজের দোষক্ষালন অভিপ্রায়ে তিনি যাহা কিছু বলিতে লাগিলেন, তাহাতেই উত্তরোত্তর ধাপে ধাপে আমার রাগটা ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রথমেই রাগ ধরিল, বিলাতের ঘটনাকে নিতান্ত

তুচ্ছতাচ্ছিল্যভাবে সামান্য Flirtation মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করায় রাগটা আরো জ্বলিল, ডাক্তারকে গালি দিতে শুনিয়া, অবশেষে ক্রোধের যেখানে যতটুকু বাকি ছিল, সর্ব্বাংশে বেশ হুহু করিয়া ধরিয়া উঠিল। যখন বলিলেন, তিনি আমাকে ছলনা করেন নাই, আমি তাঁহাকে ছলনা করিয়াছি, না ভালবাসিয়াও ভালবাসা জানাইয়াছি, নহিলে এত সামান্য কথায় তাঁহাকে এতদূর অপরাধী করিতাম না। যেন ভালবাসিলে লোকে ন্যায়ান্যায় জ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, অন্যায়কে—দোষকে পূজা করাই যেন ভালবাসা ! আমি তাঁহাকে যেরূপ ভাল লোক মনে করিয়া ভালবাসিয়াছিলাম—তিনি যে তাহা নহেন, সে যেন আমারি দোষ ! তিনি যে আপনাকে আমার আদর্শরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে আমারি ছলনা বটে ! কি চমৎকার যুক্তি-চাতুরী ! আমার এতদূর ক্রোধ হইল যে, তাহার একটি স্ফুলিঙ্গকণাও বাহিরে আসিয়া পড়িলে যেন সমস্ত বিশ্বকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারিত। অথচ এই প্রজ্বলন্ত মহাক্রোধও তাঁহার বিদায়কালের সেই কাতর করুণ উক্তিতে মুহূর্ত্তে অতি সহজে ভস্মাকারে নির্ব্বাপিত নিষ্ফল হইয়া পড়িল ! রমণী সব পারে—যথার্থ প্রেম উপেক্ষা করিতে পারে না, বিধাতা বুঝি এইখানেই স্ত্রীপুরুষের স্বভাবগত বিশেষ পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যথিত স্বরে, তাঁহার মর্ম্মোত্থিত বাক্যে, তাঁহার গভীর প্রেম অন্তরে উপলব্ধি করিলাম, হৃদয়ের স্তরে স্তরে তাহাতে করুণাতান বিকম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার নৈরাশ্য-ব্যথা আমি নিজের মত করিয়াই অনুভব করিতে লাগিলাম। তাঁহার যে কথায় পূর্ব্বে ক্রোধাভিভূত হইয়াছিলাম, সেই কথা মনে উদয় হইয়া নিজের প্রতি সন্দেহ আনয়ন করিল,—সত্যই কি তবে আমি ইঁহাকে ছলনা করিয়াছি, না ভালবাসিয়া ও ভালবাসা জানাইয়া ইঁহার চিরজীবনের সুখদুঃখ আপনাতে ন্যস্ত করিয়াছি ?

প্রাণভরা করুণাপূর্ণ অনুতাপ বেদনা লইয়া আমি নীরবে বসিয়া, দিদি আমার দিকে সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া কি যেন জিজ্ঞাসা করিবেন ভাবিতেছেন, এই সময় ভৃত্য আসিয়া খবর দিল, "ডাক্তার আসিয়াছেন।" এই সংবাদে সহজেই ভিন্নমনা হইয়া পড়িলাম—চিন্তাবেগ শমিত হইল, ডাক্তার যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন, স্পষ্ট আনন্দ অনুভব করিলাম।

ডাক্তার আসিয়া প্রথমে আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া পরে সকালে আসিতে না পারার কারণ জানাইয়া তজ্জন্য ক্ষোভ প্রকাশ-পূর্ব্বক আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দিদি বলিলেন, "ভালই আছে, রাত্রে ঘুমও বেশ হয়েছে—আর

বোধ হয় ওষুদের আবশ্যক নেই।"

পশ্চিমের জানালা দিয়া আমার কৌচের উপর রৌদ্র পড়িয়াছিল, ইতিমধ্যে তিনি জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া আমার নিকটে একখানি চৌকিতে আসিয়া বসিলেন, বসিয়া আমার হাত দেখিয়া বলিলেন, "না, এখনো বেশ সবল বোধ হচ্ছে না—টনিকটা বন্ধ করবেন না।"

আমি বলিলাম, "না, অমন বিশ্রী ওষুদ আমি আর খাব না।"

ভগিনীপতি কোথা হইতে আসিয়া বলিলেন,—"কার সঙ্গে অভিমান আবদার হচ্ছে? ডাক্তারের সঙ্গে না ওষুদের সঙ্গে।"

আমি লজ্জিত হইলাম, তাই ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম, "এ বুঝি আবদার হোল? একবার ওষুদটা খাও দেখি?"

ভগিনীপতি বলিলেন, "তাতে যদি তোমাদের আবদার কিছু কমে, তা হ'লে একশিশি কেন, যত শিশি বল খাচ্ছি। I say doctor এমন পজিটিভ প্রমাণ থাকতে মেয়ে পুরুষের intellectual superiority সম্বন্ধে এখনো এত বাগ্‌বিতণ্ডা চলে কেন, তা ত বুঝতে পারিনে!"

দিদি বলিলেন,—"পজিটিভ প্রমাণটা কি, আর কোন্ পক্ষে শুনি?"

ভগিনীপতি বলিলেন,—"মেয়েরা যদি আর কারো সঙ্গে অভিমান করতে না পায়, তখন ভাগ্যের সঙ্গে অভিমান করতে বসে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস—অটল অচল অদৃষ্টকেও তারা চোখের তাপে গলিয়ে একেবারে জল ক'রে ফেলবে।"

দিদি বলিলেন, "অদৃষ্ট যদি এমনই অটল অচল হয়, তা হ'লে তার সঙ্গে যারা লড়াই করতে যায়, তারাই বা কি মহাবুদ্ধিমান্?"

ডাক্তার বলিলেন,—"বেশ বলেছেন, আমি সম্পূর্ণভাবে আপনার সঙ্গে একমত!"

ভগিনীপতি বলিলেন,—"তুমি শুদ্ধ দলে মিশলে—তবে দেখছি, আর এখানে পোষাল না আমার, আমি চললুম, নীচে মক্কেল এসে ব'সে আছে। যাবার সময় দেখা ক'রে যেও হে।" ভগিনীপতি চলিয়া গেলেন, ডাক্তার বলিলেন, "আচ্ছা, ওষুধটা যদি আপনি খেতে না পারেন, একটা সুস্বাদু টনিক লিখে দিচ্চি।"

এই সরল সহানুভূতি আমার বড় ভাল লাগিল, আমি আনন্দ-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলাম।

এ স্থলে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক না হইলেও একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। যাহারা স্ত্রীলোকের আবদার সহ্য করিতে না পারিয়া খড়্গহস্তে তাহার দমন

করিয়া থাকেন, মুহূর্ত্তের জন্য যদি কেবল তাঁহারা দিব্যহৃদয় লাভ করিয়া অনুভব করিতে পারেন, সামান্য নির্দ্দোষ ছোটখাট অভিমানগুলির সম্মান রক্ষায় অতি সহজে তাঁহারা নিজের এবং পরের কিরূপ অপরিমিত গভীর সুখের কারণ হইতে পারিতেন, কেবল একটুখানি সহানুভূতির অভাবে এই সুখের স্থলে কত অসুখ বৃদ্ধি করিতেছেন, কত কোমল হৃদয় নিষ্পেষিত কঠোর করিয়া তুলিতেছেন,—তাহা হইলে জানি না তাঁহাদের সুখ বাড়িত কিংবা দুঃখ বাড়িত, তবে সংসারের রূপ এবং স্ত্রীলোকের ভাগ্য যে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই!

গৃহের এককোণে টেবিলে লিখিবার সরঞ্জাম ছিল, ডাক্তার নূতন একটি প্রেস্‌ক্রিপসন্ লিখিয়া দিদির হাতে দিয়া বলিলেন, "আর বোধহয় আমার আসার আবশ্যক নেই।"

দিদি বলিলেন, "এখন ত ভালই আছে, আর অসুখ না করলেই বাঁচা যায়।" ডাক্তারের আসিবার কথার উত্তরে আর কোন কথাই বলিলেন না, আমার সেটা নিতান্ত অভদ্রতা বলিয়া মনে হইল; দিদির উপর মনে মনে একটু রাগ হইল; কেন, তিনি কি বলিতে পারিতেন না, মাঝে মাঝে খোঁজখবর লইয়া যাইবেন, অথবা কখনো কোন দিন সুবিধামত দেখা করিতে আসিলে সুখী হইব—এমনতর কোন একটা ভদ্রতার কথা? কিন্তু রাগটা মনেই চাপিয়া লইলাম! দিদির কথার উত্তরে ডাক্তার বলিলেন,—"আশা করি, এখন ভালই থাকবেন।" বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় গৃহকোণে যে ছোট টিপাইটির উপর একটি ফুলদানীতে কতকগুলি সুগন্ধি ফুল সাজানো ছিল, সেই টিপাইটি আমার কাছে আনিয়া রাখিয়া বলিলেন—"ফুলের গন্ধ nervous systemএর পক্ষে খুব উপকারী"—বলিয়া আর একবার good bye বলিয়া চলিয়া গেলেন; আমার সহসা বাল্যকালের সেই আটচালা ঘর মনে পড়িল—ছোটুকে আমি যে ফুলগুলি দিতাম, সে সযত্নে একটি ভাঙ্গা গ্লাসে পড়ার টেবিলের উপর কেমন সাজাইয়া রাখিত, আমি মাঝে মাঝে তাহার উপর ঝুঁকিয়া ফুলগুলির গন্ধ লইতাম; শুঁকিয়া বলিতাম, "বাঃ, কেমন গন্ধ আমি বাড়ীতে যে সাজাই, তার ত কই এমন গন্ধ হয় না।" ছটু হাসিয়া সগর্ব্বে মাথা নাড়িত। সে ঘটনার সঙ্গে আজিকার এ ঘটনার বিশেষ যে কিছু সাদৃশ্য ছিল, এমন নহে; তথাপি আমার মনে হইল,—এ যেন ছোটু আমাকে তাহার সেই ফুলদানী আনিয়া দিল। আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে গেলাম,—"আপনি কি ছোটু?" সহসা

আত্মস্থ সচেতন হইলাম, যেন নিদ্রাভঙ্গে জাগিয়া উঠিলাম, ততক্ষণ তিনি দ্বার পার হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার সহসা মনে হইল, আমি কি ইঁহাকে ভালবাসিতেছি? মিষ্টার ঘোষের গান শুনিয়া যে মোহ জন্মিত, ইঁহাকে দেখিয়াও কি সেইরূপ মোহের উদয় হইতেছে না? এ কিরূপ চাঞ্চল্য, কিরূপ হীনতা। এই দুদিন আগে যাঁহাকে ভালবাসিয়াছি, তাঁহাকে ভুলিলাম? আমার প্রতি যাঁহার ভালবাসা অটল অচল, তাঁহাকে ভুলিলাম? আর কি জন্য? কাহার জন্য? যাহাকে জীবনে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, একদিনের মাত্র যাহার সহিত সাক্ষাৎ, তাহার জন্য? এই জন্যই কি তাঁহাকে দোষী করিয়াছিলাম? নিজের ভালবাসা গিয়াছে বলিযাই কি তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা গিয়াছে? তাঁহার কথাই সবে সত্য? আমি তাঁহাকে ছলনা করিতেছি, তিনি নহেন। নহিলে যথার্থ ভালবাসিলে এ ঘটনায আমার দুঃখ হইত, অভিমান হইত, কিন্তু এরূপ ক্রোধ হইত না, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবাব ভাব আসিত না।

আমার অন্ধ নয়ন যেন খুলিযা গেল, আমি সত্যলোক দেখিতে পাইলাম, নিজের দোষ অতি তীব্রভাবে অনুভব করিলাম, অনুতাপে হৃদয় দাহ হইতে লাগিল। দিদি ডাক্তারকে আসিতে না বলায় রাগ হইয়াছিল, এখন তাহাতে খুসী হইলাম; ভাবিলাম, তাঁহার সহিত আর কখনও দেখা করিব না, যাঁহাকে একবার স্বামী মনে করিয়াছি—তিনিই আমার স্বামী হইবেন। তাঁহাকে বিবাহ করিব—কিন্তু প্রতারণা করিব না, আমার মনের ভাব খুলিয়া বলিব, যদি ইহাতেও তিনি আমাকে বিবাহ করিতে চাহেন, আমি তাঁহারি। সমস্ত শুনিযাও অবশ্যই তিনি আমাকে বিবাহ করিবেন, তাঁহার প্রেম অটল অচল, আমি যাহাই হই, তিনি দেবতা, তাঁহার প্রেমে তিনি পতিত—আমাকে উদ্ধাব করিবেন।

দিদি যখন সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার সঙ্গে কি কথা হ'ল?" তখন বিবাহ করিতে আমি দৃঢ়সঙ্কল্প। আমি বলিলাম, "বুঝেছি, তাকে বিয়ে না করে কোন দোষ করেন নি।"

"তাকে যে খুব ভালবাসে, তাও বুঝেছিস?"

"বুঝেছি।"

"এখন বিয়েতে আপত্তি আছে কি?"

বলিলাম "না।"

দিদি ভারী খুসী হইয়া বলিলেন, "এক হপ্তা পরে সে আসবে—না?"

৭

ময়মনসিংহ হইতে একখানি পত্র পাইলাম। চিঠিখানি একান্তই প্রীতি ও মিনতিপূর্ণ। পড়িয়া যেমন আর্দ্র হইলাম, তেমনি আত্মগ্লানি অনুভব করিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, এখানি ইংরাজী পত্র; ইঙ্গবঙ্গ যুবা—যাঁহার জীবনই ইংরাজী অনুকরণ, তাঁহার প্রণয়পত্র যে মাতৃভাষায় লিখিত হইবে—বোধ করি, আমি খুলিয়া না বলিলেও, এমন আজগুবি ভুল কেহ করিতেন না।

আমি অবশ্য ইংরাজীতেই উত্তর লিখিতে বসিলাম। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের সুশিক্ষিতনামা কোন বঙ্গবালা হইতে যে আমার ইংরাজী ব্যুৎপত্তি প্রতিপত্তি কিছু কম, তাহা নহে, আমিও লোরেটো কন্‌ভেণ্টে শিক্ষালাভ করিয়াছি, বাবাকে, জ্যেঠাইমাকে ও পিসীমাকে ছাড়া আর কাহাকেও চিঠিপত্র লিখিতে হইলে ইংরাজীতেই লিখিয়া থাকি; সখীদিগের সহিত কথাবার্ত্তাও অনেক সময়ে ইংরাজীতেই চলে, আমি এ পর্য্যন্ত যে কত শত ইংরাজী কবিতা উপন্যাস মস্তিষ্কজাত করিয়াছি, তাহার ত ঠিক-ঠিকানাই নাই। সত্য কথা বলিতে কি, দেশের ভাষা হইতে এই পরদেশী ভাষাটাকে অধিকতর আয়ত্তীভূত করিয়া লইয়াছি বলিয়াই, বরঞ্চ এতদিন মনে মনে একটা গর্ব্ব অনুভব করিতাম, কিন্তু এ চিঠি লিখিতে বসিয়া সে ভুল আমার ভাঙ্গিল! এ ধরণের পত্র লিখিবার প্রয়াস এই আমার প্রথম। এক একটি মনোমত শব্দের চিন্তায়, ভাব ও ভাষায় সুন্দর সঙ্গতিতে এক একটি সুললিত পদবিন্যাসের প্রয়াসে উৎকণ্ঠিত গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিলাম। চিঠিখানি কতবার লিখিলাম, কতবার ছিঁড়িলাম, তাহার ঠিক নাই। যেখানির ভাব ঠিক হয়—তাহার ভাষা ঠিক হয় না, যাহার বা ভাষা পছন্দ হয়— তাহাতে আমার মনের ভাব সুস্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দৈবক্রমে কোনখানিতে ভাব ও ভাষায় একরূপ নির্দ্দোষ সমন্বয় হইলেও তখন ভাবনা জন্মে, ইহা ঔপন্যাসিক রসযুক্ত সুরচনা হইয়াছে কি না? এমন কি, একটা in এবং to শব্দের স্থানান্তর সংঘটন-সন্দেহে বহুযত্নে, বহু সময় ধরিয়া লিখিত প্রায়-সমাপ্ত পত্রখানিও মুহূর্ত্তে শতছিন্ন হইয়া পড়ে,—এ অবস্থায় কি চিঠি শেষ হয়? এই চিঠি লিখিতে বসিয়া প্রথম আমি মাতৃভাষার সহজ গৌরব উপলব্ধি করিলাম। দশ এগার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রীতিমত যা বাঙ্গালা শিখিয়াছিলাম, তাহার পর কলিকাতা আসিয়া লোরেটোতে ভর্ত্তি হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা চর্চ্চার মধ্যে প্রধানতঃ কথা কহা, দ্বিতীয়তঃ মাঝে মাঝে ভাল উপন্যাস কবিতা পাইলে যা পড়িয়া থাকি; তাহার সংখ্যাও ত নখাগ্রে গণনা করা যায়। কিন্তু

তথাপি আমি যদি এ চিঠি বাঙ্গালাতে লিখিতাম, তাহা হইলে কি কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, ভাববাচ্যের সুপ্রয়োগ নিরূপণে, বিশেষ প্রতিশব্দ নিচয়ের সূক্ষ্ম ভাবার্থভেদ বিচারে, —সমাপক অসমাপক ক্রিয়ার স্থিতিগতির বৈচিত্র্য নির্দ্ধারণে অথবা সামান্য একটা অব্যয় শব্দের যথা সন্নিবেশ-চিন্তায় মস্তিষ্ক এতদূর আলোড়িত বিলোড়িত করিতাম! এক কথায় চিঠি লেখার উদ্দেশ্য ভুলিয়া সুরচনার উদ্দেশ্যে একটা বিব্রত হইয়া পড়িতাম—অথবা শব্দ, ভাষার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যাহা বলিবার আছে, বিনাড়ম্বরে সহজভাবে সেইটুকু বলিয়া লইয়া চিঠিখানি ডাকে ফেলিয়া দিয়াই যথেষ্ট সন্তোষলাভ করিতাম? বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালা ভুল করিলে তাহাতে আমাদের লজ্জা করে না—কিন্তু ইংরাজীর একটা সামান্য ভুলে আমরা লজ্জায় মরিয়া যাই! বিপদে পড়িলেই মধুস্থদনকে মনে পড়ে; সেই দিন আমার জ্ঞান জন্মিল, এই ইংরাজী পত্রখানির জন্য যতটা পরিশ্রম করিলাম, তাহা নিতান্তই বৃথা হইল; কিন্তু বাঙ্গালা লিখিবার জন্য এতটা পরিশ্রম করিলে আমি বঙ্গ দেশের মধ্যে একজন সুলেখক হইতে পারিতাম না কি? সেই জ্ঞানের ফল আজ পাঠককে উপহার দিতেছি, তিনি ইহার মীমাংসা করিবেন।

কিন্তু তাহাও বলি—নিতান্তই কি ভাষারই দোষ! মনের দোষ কি ইহাতে কিছুই ছিল না? লোকের যখন বিশেষ কোন হৃদয়ের কথা বলার না থাকে, সে তখন বেশ অসঙ্কোচে অনর্গল বলিয়া বা লিখিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য সত্যই বলিবার কথা বিশেষ কিছু থাকিলেই তাহা তখন বলা দায় হইয়া উঠে, তখনই সে কথা কি ভাবে প্রকাশ করিব, কিরূপ আকৃতিতে তাহা সুস্পষ্ট অথচ নিখুত হইবে —এই চিন্তায়, এই সঙ্কোচে, প্রকাশে শত-সহস্র বাধা আসিয়া পড়ে। তাই একবার মনে হয়—ইংরাজীতে না লিখিয়া বাঙ্গালাতে লিখিলেই কি তাঁহার হাতে পত্রখানি পৌঁছিত? কে জানে!

সপ্তাহ কাটিতে চলিল, তাঁহার আসিবার সময় হইয়া আসিল; দিস্তা-দিস্তা কাগজ নষ্ট করিলাম, তবু আমার চিঠি শেষ হইল না। বিরক্ত হইয়া লেখা বন্ধ করিলাম—মনকে বুঝাইলাম, তিনি শীঘ্রই আসিবেন, আর লেখার সময়ই বা কৈ, আবশ্যকই বা কি? দেখা হইলে মুখেই সব বলিব, চিঠিতে কি অত কথা বলা যায়? কেন লিখি নাই, কারণ শুনিলে তিনিও ইহাতে কিছু মনে করিবেন না।

এক সপ্তাহ মাত্র তাঁহার মফঃস্বলে থাকিবার কথা—দশ বার দিন হইল, তবু তিনি ফিরিলেন না। দিদি একদিন রাত্রে ডিনার পার্টি হইতে ফিরিয়া পরদিন সকালে আমার সহিত প্রথম দেখা হইবামাত্র সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার

চিঠিপত্র পেয়েছিস্ ?”

কি জানি, প্রসঙ্গক্রমে যদি দিদি জানিতে পারেন যে, সে চিঠির এখনো উত্তর দেওয়া হয় নাই, তাহা হইলে, একে নিজের মনের জ্বালায় জ্বলিতেছি, তাহার উপর কর্ত্তব্য-ত্রুটির উপদেশে ক্ষত স্থান লবণ-জর্জ্জরিত হইয়া উঠিবে, এই ভয়ে আমি কথাটা কোন রকমে এড়াইয়া অন্য কথা পাড়িবার অভিপ্রায়ে বলিলাম,—“গানটান কা'ল কেমন হোল ?”

দিদি বলিলেন—“গাইয়ে লোক কাল তেমন কেউ ছিল না। কুসুমরা সব এখনো ময়মনসিংয়ে—গান জমে কি ক'রে বল ? চঞ্চল একবার টিম টিম ক'রে গাইলে, আমিও গেয়েছিলুম ; কিন্তু মনটা কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল—মোটেই ভাল ক'রে গাইতে পারলুম না—”

“ডিনার পার্টিতে গিয়ে মন আবার খারাপ হোল কেন ?”

“কি গুজব উঠেচে জানিস, তোর সঙ্গে রমানাথের বিয়ে ভেঙ্গে গেছে, কুসুমের সঙ্গে তার বিয়ে। ময়মনসিংয়ে নাকি তাদের বাড়ীতেই সে ছিল।”

“সেই জন্যেই আর কি গুজবটা উঠেচে। লোকদের তো খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, পরচর্চ্চার একটা সুযোগ পেলে হয়। ত্রেতাযুগে বাল্মীকি রাম-নাম হ'তে রামায়ণ সৃষ্টি করেছিলেন—এ যুগে সে ক্ষমতাটুকু ত কারো নেই,—তাই অহর্নিশি তার চেষ্টাটাই চলেছে। একটা গুজব শুনে তুমি অত মুসড়ে গেলে কেন ?”

কথাটা নিতান্ত গুজব ব'লে মনে হচ্ছে না,—চঞ্চলের মা'র কাছে সব শুনলুম। তারা নাকি মেয়েকে ৫০ হাজার টাকা যৌতুক দেবে।

চঞ্চলের মা কুসুমের কাকীমা। যাতৃ দুইজনের মধ্যে প্রীতি-সদ্ভাব কিছুমাত্র নাই,—আত্মীয়তা স্থলে কলহ-বিবাদ হইলে যাহা ঘটিয়া থাকে, কাহারো গুণ কেহ দেখিতে পান না, তিল দোষ পাইলে তাল করিয়া তুলিয়া তাহার সমালোচনায় উভয়ে পরমানন্দ লাভ করেন। আমি বলিলাম,—“তিনি যখন বলেছেন, তখন ত কথাটার মধ্যে কোন সত্য না থাকারই বেশী সম্ভাবনা।”

“কিন্তু শুনেছি, রমানাথ পরশু এসেছে—কা'ল এখানে এল না কেন ? আগে হোলে কি তা করত ?”

আমার মনে এখনো তাঁহার ভালবাসার প্রতি পূর্ণবিশ্বাস, তাঁহার বিদায়কালের কাতরোক্তি তখনো মনে সুস্পষ্ট বাজিতেছে, তাঁহার পত্রের প্রীতিময় বাক্য তখনো হৃদয় অনুকম্পিত ব্যথিত করিতেছে, আমি কি বাহিরের সামান্য একটা গুজবে বা

একদিন তাঁহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সে মহা বিশ্বাস হারাই? আমি বলিলাম, "দিদি, তুমি যেন কি? কাল আসতে পারেন নি, আজ আসবেন এখন, তাতে আর এতই হয়েছে কি? কিছুদিন আগে তাঁর সৌজন্যে তোমার এতটা গভীর বিশ্বাস ছিল—আর সামান্য একটা গুজবে সমস্ত হারিয়ে ফেল্লে। যদি তাঁর ভালবাসা মিথ্যা না হয়, তা হ'লে এ গুজব সত্য হ'তে পারে না। আর গুজবটা যদি সত্যি হয়, তা হ'লে ত তাঁর ছলনা হ'তে মুক্তি পাওয়া গেল। তাতে দুঃখ করার কি আছে বল?"

দিদি চুপ করিয়া গেলেন। ভক্ত ঐশ্বরিক প্রেমে বিশ্বাস করিয়া যে আনন্দ লাভ করে, আমি তাঁহার প্রেমে বিশ্বাস করিয়া যেন সেইরূপ আনন্দপূর্ণ হইলাম। যিনি ভুক্তভোগী, তিনিই মাত্র জানেন—এ ভক্তি-বিশ্বাস জগতে কিরূপ অমূল্যধন, এ বিশ্বাস কি পরমানন্দ। অপ্রেম হৃদয়ে ইহাতে প্রেম ফুটায়; সপ্রেম হৃদয় ইহাতে চির-প্রেমময় হইয়া উঠে, আর এই বিশ্বাসের অভাবে প্রজ্বলন্ত প্রেমও ক্রমে নিস্তেজ, নির্ব্বাপিত, শীতল হইয়া পড়ে।

৮

ডিনারে রাত জাগিয়া দিদি তাঁহার ঘরে দিবানিদ্রায় মগ্না ছিলেন, আমি ড্রয়িংরুমের জানালার পাশে ইজিচেয়ারে বসিয়া নভেল পড়িবার চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু কিছুতেই তাহাতে মন বসিতেছিল না। কিছুদিন পূর্ব্বে পরীক্ষার রাশি রাশি পাঠের মধ্যেও ফাঁকি দিয়া যখন নভেল শেষ করিতাম—তখন মনে হইত, সারা জীবন যদি উপন্যাসের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলেই আমার জীবনের পরম ও চরম সুখ লাভ হয়—আমি আর সংসারে অন্য কিছু চাহি না। কত অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের সুখের কল্পনা পরিবর্ত্তিত হয়! এক বৎসরও তাহার পর অতীত হয় নাই!

চোখের উপর খোলা কেতাব—যন্ত্রের মত হরফগুলি নিঃশব্দে আওড়াইয়া যাইতেছি, অথচ খানিক পরে, আত্মস্থ হইয়া দেখিতেছি, এক অক্ষরও তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই—আসলে পড়িতেছি না, ভাবিতেছি, কিন্তু কি ভাবিতেছি, তাহারও একটা ঠিক-ঠিকানা নাই; অস্পষ্ট অসংযত বিশৃঙ্খল ভাবনা—মনের মধ্যে একটা কেমন অশান্ত বিদ্রোহী বাসনা, উপস্থিতের উপর বিতৃষ্ণা, অনুপস্থিতের জন্য আগ্রহ, কিন্তু সে অনুপস্থিত যে কি, তাহার আকৃতি কিরূপ, স্থিতিই বা

কোথায়, তাহা সে ভাবনার মধ্যেই নাই। মাঝে মাঝে এক একবার পূর্ব্বাকাশে দৃষ্টি পড়িতেছিল—উদার স্তব্ধ সৌন্দর্য্যদৃশ্যের মধ্যে আমার উদাসচিত্ত স্বপ্নের মত যেন, সহসা আবার তাহা হইতে যেন জাগিয়া উঠিয়া পুস্তকে চক্ষু ফিরাইতেছিলাম। ঠুং ঠুং করিয়া চারিটা বাজিল, আকাশে চাহিয়া দেখিলাম, সুন্দর লাল মেঘের শোভা ; সমুদ্র মনে পড়িল, এই প্রশান্ত সুরঞ্জিত আকাশের দিকে চাহিয়া কটকে যাইবার পথে ঝটিকা-তরঙ্গিত যে ভীম সমুদ্র দেখিয়াছিলাম, তাহাই মনে পড়িল, কে জানে এ দৃশ্যের সহিত তাহার কি যোগ ? অমনি বহুপূর্ব্বে পঠিত একখানি উপন্যাসের কয়েক লাইনও মনে পড়িয়া গেল—In certain places and certain periods the aspect of the sea is dangerous—fatal ; as at times is the clance of a woman," যখন পড়িতেছিলাম, তুলনাটা বেশ ভাল লাগিয়াছিল, তাই বোধ হয়, স্মৃতির কোণে ইহা সুপ্ত ছিল—আজ সহসা জাগিয়া উঠিল। যদিও বইখানির নাম কিংবা তখন ইহার কিরূপ অর্থ বুঝিয়াছিলাম, তাহার কিছুই এখন মনে পড়িল না। ভাবিলাম, সমুদ্রের সহিত যে দৃষ্টির তুলনা হয়, তাহা অবশ্য ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হইবে, স্ত্রীলোকের সক্রোধ দৃষ্টি কি পুরুষের নিকট এই ভয়জনক ? আমি ত পুরুষ নই, সে ভাবটা ঠিক আত্মস্থ করিতে পারিলাম না, কেবল পুরুষের কাপুরুষতা ভাবিয়া মনে মনে একটু হাসির উদ্রেক হইল। কই, আমি ত পুরুষের এমন ক্রুদ্ধদৃষ্টি ক্রুদ্ধভাব কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে আমাকে ভয়কম্পিত অপ্রকৃতিস্থ করিয়া তোলে। আমাকে ত লোকে এত কোমলস্বভাব বলিয়া জানে, বাস্তবিকই আমি অল্পেতেই আর্দ্র হই, পরদুঃখ দেখিতে পারি না, বিশেষতঃ ভালবাসা স্থলে সহজেই নিজের প্রবল ইচ্ছাও বিসর্জন করিতে পারি, কিন্তু ক্রোধে কি আমাকে বশ করিতে পারে ? সেদিন যদি তিনি আমার কথায় রাগ করিয়া রূঢ়বাক্যে আমাকে অভিসম্পাত দিতেন, প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া শাসাইতেন, তাহা হইলে কি তাহার বেদনা আমি অনুভব করিতাম, না তাহা নিবারণের জন্যই এত ব্যাকুল হইতাম। সম্ভবতঃ তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা অভক্তিরই উদ্রেক হইত, প্রেমের আশঙ্কাই প্রবল আশঙ্কা। যে ভালবাসে, যাহাকে ভালবাসি—তাহাকে ব্যথা দিয়ে প্রাণে যেমন বাজে, এমন আর কিসে ? ক্রুদ্ধদৃষ্টি নহে, প্রেমময় করুণদৃষ্টিই প্রকৃত পক্ষে fatal-dangerous তাঁহার বিদায়কালে সেই সকরুণ দৃষ্টি মনে জাগিল। লেখকও যে শেষ অর্থে এ তুলনা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে আমার আর তখন সন্দেহ রহিল না। সময়ে সময়ে জোয়ার আসিয়া শুষ্ক তীরস্থিত বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে যেমন সহসা ভাসাইয়া

লইয়া যায়—এই সকরুণ দৃষ্টিও সেইরূপ নিঃশব্দে হৃদয় অধিকার করে—তখন লোকে বিপদ জানিয়া শুনিয়াও আর ফিরিতে পারে না, অধিকাংশ সময় ফিরিতে চাহেও না, ইচ্ছা করিয়া তাহাতে আপনাকে ভাসাইয়া দেয়, সেই জন্যই ইহা অধিক ভয়জনক।

জুতার শব্দে চিন্তাভঙ্গ হইল, চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলাম, দেখিলাম, তিনি। তাহার ভাব তেমন সহাস্য নহে, গম্ভীর বিষণ্ণভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া নীরবে হাত বাড়াইয়া দিলেন, নীরবে সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া নিকটের একখানি চৌকিতে বসিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া আমিও দমিয়া গেলাম, বুঝিলাম, চিঠি না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, অথচ, তাঁহাকে প্রফুল্ল দেখিলে আমি যেরূপ সহজভাবে সব খুলিয়া বলিতে পারিতাম, এখন তাহা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এরূপ অবস্থায় কি শত ইচ্ছাতেও কথা ফোটে।

কিছু পরে তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার চিঠি পেয়েছিলেন আশা করি?" সম্বোধনের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার এই অনাত্মীয় ভাব, অনুতপ্ত শীতল-কঠিন ভাষা, আমার হৃদয়কে কেমন তুষারজমাট করিয়া আনিতে লাগিল; আমিও অস্বাভাবিক রুদ্ধ-গম্ভীর স্বরে বলিলাম—"পেয়েছি, শীঘ্র আসবেন ব'লে উত্তর দিই নি।"

"উত্তর কি এখন প্রত্যাশা করতে পারি?"

"অবশ্যই পারেন।" আমিও ত বলিবার জন্য প্রস্তুত, কিরূপে সমস্ত খুলিয়া বলিব, এতদিন ধরিয়া অনবরত মনে মনে তাহার রিহার্‌সেল দিয়া আসিতেছি, অথচ এখন বলিতে গিয়া দেখিলাম, বলা কত কঠিন! কি যে বলিব—কি কথা হইতে আরম্ভ করিব, কিছুই মনে করিতে পারিলাম না, মাথার মধ্যে কথার রাশি এলোমেলো ভাবে সবেগে ঘুরপাক খাইতে লাগিল। ঘূর্ণ মস্তিষ্ক রুদ্ধাবেগ লইয়া আমি বলিলাম, "আমি—আমি কি বল্‌ব আপনার দোষ।—"

তিনি বলিলেন, "এখনো সেই ভাব,—সেই উত্তর—আমারই দোষ!"

আমি যদিও তাহা বলিতে যাই নাই—বলিতে গিয়াছিলাম, আপনার দোষ নাই—আমার দোষ ইত্যাদি; কিন্তু কথাটা এইখানেই তিনি ধরিয়া লইয়া উত্তর করিলেন। উল্লিখিত কথার পর বলিলেন, "দোষ আমারি তবে হ'ক, কিন্তু এ দোষ জেনেও কি আমাকে বিবাহ করতে পারবেন? আমি নিতান্তই স্বার্থপর হয়ে এ কথা বলছি মনে করবেন না। এ বিবাহ ভেঙ্গে গেলে আপনার পক্ষেও কিরূপ ক্ষতি, তা বিবেচনা করবেন। আমি ভালবাসি, না বিবাহ হ'লে আমার কষ্ট হবে,

এরূপ ভেবে মতামত স্থির করবেন না, নিজের মঙ্গলামঙ্গল ভেবে যা ভাল, তাই স্থির করুন।"

কথাটা খুবই নিঃস্বার্থ ভাবের কথা, কিন্তু আমার সমস্ত প্রকৃতি ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যে কারণে আমি তাঁহার সমস্ত দোষ ভুলিয়াছিলাম,—সে কারণ ইহার মধ্যে কোথা ? এই আশপাশ-আঁটা বুদ্ধি-বিবেচনা-যুক্ত কথার মধ্যে প্রেমোচ্ছাস ব্যাকুলতা কই ? তবে যে গুজব শুনা গিয়াছে, তাহা কি সত্য ? কয়েক হাজার সামান্য রৌপ্য-মুদ্রা তাঁহার প্রেম জয় করিয়াছে ? আমার নিদ্রিত গর্ব্ব জাগিয়া উঠিল, আমি অসঙ্কোচে সুস্পষ্ট স্বরে বলিলাম, "আমার ক্ষতির জন্যে আমি ভাবি নে—আপনারো ভাববার আবশ্যক নেই,—সুবিধার জন্য আমি বিবাহ করতে চাই নে—আপনার সুখ যখন এর উপর নির্ভর কচ্ছে না—তখন আমি অব্যাহতি প্রার্থনা করি।"

তিনি শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "তবে তাই হোক।"

৯

দিদি সব শুনিয়া আমার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন,—আমাকে দোষ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—"এখন বোঝা যাচ্ছে, কুসুমের সঙ্গে তার বিয়ের গুজব উঠেছে কেন, তোরই দোষে দেখছি তা ঘটেছে। আমি কি ক'রে জানব—ভিতরে ভিতরে এত কাণ্ড হয়েছে। আমি ভাবছি—ভালয় ভালয় সব গোলযোগ মিটে গেল—বাঁচা গেল। মিটমাট যে শুধু তোর মনে মনে, তা ত আর বুঝি নি তখন ; সে বেচারাই বা কি ক'রে তা বুঝবে বল ? প্রথমে ত তাকে স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিলি বিয়ে করবিনে, তার পরে সে তার জীবন-মরণ মিনতি জানালে যখন, তখনও একটি কথা কইলিনে, মফঃস্বলে গিয়েও সাধ্যসাধনা ক'রে চিঠি লিখলে, চিঠির এক লাইন উত্তর পর্য্যন্ত দিলিনে, এতে মানুষ কি ভাবে বল দেখি ? তার ত মানুষের প্রাণ—না সে পাথর ? এত উপেক্ষার পর তবুও যে সে আবার এ বাড়ীতে এসে তোর সঙ্গে দেখা ক'রে বিয়ের সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করেছে, এতে আমি ত তাকে খুবই ভাল বলি, তার ভদ্রতা সৌজন্যের পরিচয় এতে খুবই পাওয়া যাচ্ছে।"

আমি বলিলাম, "তা হ'তে পারে—কিন্তু যে রকম ক'রে তিনি মত জিজ্ঞাসা করেছেন, তাতে ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যাচ্চে কি ?"

"ভালবাসার অভাব আমি ত এতে কিছুই দেখছিনে। হাজার ভালবাসলেও যদি জানা যায়, সে আমাকে চায় না—তা হ'লে যার একটু আত্মসম্মানজ্ঞান আছে—সে কি আর প্রেমের দোহাই দিয়ে কথা কইতে পারে ?"

"কিন্তু তিনি যখন বল্লেন—এ বিয়ে না হ'লে আপনার কিরূপ ক্ষতি, তাই বিবেচনা ক'রেই বিয়ে করা না করা স্থির করুন,—আমি ভালবাসি—বা না বিয়ে হ'লে আমার কষ্ট হবে, এরূপ ভাববেন না—তখন কি আমি বলব নাকি—হ্যাঁ, আপনি ভাল বাসুন বা না বাসুন, তাতে কিছু আসে যায় না, আমার মঙ্গলের জন্যই আমি বিয়ে করতে প্রস্তুত! তাঁরই আত্মসম্মানজ্ঞান আছে—আর আমার কিছুমাত্র নেই!"

"তুই-ই তার প্রতি অন্যায় করেছিস, তার মনে আঘাত দিয়েছিস, সেজন্য তুই যদি নিজের ভুল, নিজের দোষ স্বীকার ক'রে তার কষ্ট দূর করতে যেতিস, তা হ'লে তাতে কি ক'রে যে তোর আত্মসম্মানের হানি হোত, তা ত আমি বুঝতে পারিনে। তবে সত্যি যদি এড়াবার অভিপ্রায়েই সে তোকে অমন ক'রে ব'লে থাকে, তা হ'লেও তাকে সে কথা স্পষ্ট ক'রে বলবার অবসর দেওয়া উচিত ছিল। এখন দাঁড়াচ্ছে এই,—তোর ইচ্ছা নেই ব'লেই বিয়েটা ভাঙ্গতে সে বাধ্য হোল; দোষটা সমস্ত এক তরফেরই।"

আমার দিকটি দিদির কিছুতে চোখ পড়িল না। তিনি কেবল দেখিতে লাগিলেন,—আমিই তাঁহাকে অন্যায়রূপে উপেক্ষা করিয়া অকারণে আমার নিজেরই সুখসৌভাগ্য বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি! সুপাত্রে ন্যস্ত হওয়াই কন্যাজীবনের চরম সৌভাগ্য, পরম সার্থকতা। গুণবান্ স্বামীর সোহাগে যে সোহাগিনী—তাহার নিকট অন্য আকাঙ্ক্ষণীয় প্রার্থনীয় বিষয় আর কি আছে? স্বামীর সোহাগের শত দুঃখও দুঃখের নহে—আর ইহার অভাবে তাহার জীবন জন্ম নিতান্তই দুঃখময় নিরর্থক বলিয়া অনুভূত। দিদি তাঁহার এই স্ত্রী-স্বভাবসুলভ দৃষ্টি দিয়া এখন কেবল এক পক্ষই দেখিতেছেন,—তিনি আমার কিরূপ উপযুক্ত পাত্র, তিনি আমাকে কিরূপ ভালবাসেন, তাঁহাকে বিবাহ করিলে আমি কিরূপ রূপবান্ গুণবান্ স্বামীর প্রেমে সুখী হইতে পারিতাম, আর আমাদের মিথ্যা ছেলেমানুষী সেণ্টিমেণ্টের চাপল্যে তাঁহাকে এবং তাঁহার সেই অমূল্য প্রেমকে উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের কিরূপ ঈর্ষণীয় অবসর হারাইতেছি। এ অবস্থায় আমার মনোভাবের গাম্ভীর্য্য কি করিয়া প্রকাশ করি,—কি করিয়া দিদিকে বুঝাই, তাঁহার ওরূপ করিয়া বলার পর আমার আর ভুল-স্বীকারের পথ ছিল না,

তখন দোষ স্বীকার করিলে আমার হীনতাই প্রকাশ পাইত। দিদির স্নেহ হইতেই যদিও এই কঠোরতা—এই নির্ম্মমতার জন্ম, কিন্তু আমি কি তখন সেই স্নেহ, সেই মমতা উপলব্ধি করিয়াছিলাম,—না তাহা করিলেও তাহাতে আমার ব্যথা লাগিত না ? দিদির এই সহানুভূতিহীন দোষারোপে আমার প্রকাশের শক্তি পর্য্যন্ত কমিয়া আসিতে লাগিল, অশ্রুজলে অবরুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃই ভাষার শক্তি—ভাষার স্বর ক্ষীণতর হইয়া পড়িতে লাগিল।

আমাদের দুজনের বাগ্‌বিতণ্ডা শেষ না হইতে হইতে ভগিনীপতি আসিয়া বিস্ময়-ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "কুমু! what is this ?" বলিয়া একখানা খোলা চিঠি দিদির কোলের উপর ফেলিয়া দিলেন! দিদি নীরবে চিঠিখানা পড়িয়া আমাকে দিলেন। অক্ষর দেখিয়া বুঝিলাম—তাঁহার চিঠি। পড়িয়া দেখিলাম, যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদের বিবাহভঙ্গের কথা এবং আমার ইচ্ছাক্রমেই এরূপ হইয়াছে, তাঁহাকে যেন দোষী না করা হয়,—এইরূপ সৌজন্য প্রকাশ।

চিঠি পড়া আমার তখনও শেষ হয় নাই—ভগিনীপতি বলিয়া উঠিলেন— "Blackguard! Rascal! Scoundrel! মিস্ করকে বিয়ে কর্ত্তে চায়—তাই এই সব excuse! I will bring a suit against him, I will upon honour!"

দিদি বলিলেন, "তা পার কই, যা বলেছে, তা ত আর মিথ্যা বলে নি ; মণির কথাতেই ত বিয়ে ভেঙ্গেছে।"

"মণির কথাতেই বিয়ে ভেঙ্গেছে ? You mean মণির ইচ্ছাতে ? বিলাতে সেই engagement ব্যাপার নিয়ে ? তুমি ত বলেছিলে সে সব মিটমাট হয়ে গেছে! Is she mad or what new freak of hears is this now ?"

"আমি তাই ভেবেছিলুম যে, মিটমাট হয়ে গেছে, কিন্তু এখন দেখছি ঠিক মেটেনি।"

"Oh Frailty thy name is woman!'—কথাটা দেখছি খুবই ঠিক! সামান্য অপরাধে এত কেন ? এই ত তোমাদের শিক্ষার উদারতা! স্বাধীনতার ফল! I don't know what to do, I think I shall go mad."

এইরূপ তিরস্কার, এইরূপ অপবাদ নীরবে আত্মসাৎ করিতে আমার নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, আমার দোষেই এইরূপ ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু সমস্ত অবস্থা জানিলে ভগিনীপতিও কি এ দোষ অমার্জ্জনীয় ভাবিতেন ; তাঁহার

পুরুষের দৃষ্টিতেও কি ইহার মার্জ্জনীয় দিক্ প্রকাশিত হইত না? কিন্তু কি করিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ খুলিয়া বলি? দিদিকে বলা আর তাঁহাকে বলা ত আর এক কথা নহে। তথাপি আমি প্রাণপণে বলসংগ্রহ করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলাম, "আমি কি করব! তিনি যখন বল্লেন—বিবাহ না করলে আপনার ক্ষতি হবে কি না, কেবল তাই বিবেচনা ক'রেই স্থির করুন, বিবাহ করবেন কি না—তখন আমি আর কি বল্‌ব? তিনি যদি এর চেয়ে একটুখানি কোমলভাবে, একটুখানি হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা আমাকে জানাতেন, তা হ'লে আমি কি অগ্রাহ্য করতে পারতুম?"

ভগিনীপতি বদ্ধভ্রূকুটি হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"কি, আপনার ক্ষতি হবে কি না ভেবে স্থির করুন! If this a proposed! I see there is a trick in it!"

দিদি বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু আসল ব্যাপার আগে শোন! মফঃস্বলে যাবার আগে সে নিতান্তই অনুনয়-বিনয় ক'রে বিয়ের প্রস্তাব করছিল, তাতে একটা আশার কথা শোনে নি। মফঃস্বল থেকেও সাধ্যসাধনা ক'রে চিঠি লিখেছিল; কিন্তু তারও এক লাইন উত্তর পর্য্যন্ত পায় নি। এর পরে মানুষ আবার কি ক'রে তবুও feeling দেখায় বল? তারও ত সহের একটা সীমানা আছে। আমি বলি, তুমি তাকে স্পষ্ট ক'রে তার মনের ভাব জিজ্ঞাসা কর,—যদি বাস্তবিক তার এড়াবার ইচ্ছা হয়—তাও বুঝবে—আর যদি উভয়তঃ ভুল বোঝার জন্য এরূপ ঘটে থাকে, তাও সহজে মিটে যাবে—"

আমি আস্তে আস্তে সজলনেত্রে দিদিকে বলিলাম, "দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তাঁর কাছে আর এ কথা পাড়তে বলো না; এ কি কেনা-বেচা যে, আপনার সুবিধা বুঝে ক্রমশঃ দর কমাতে হবে? যদি তিনি সত্যি ভালবাসেন ত তিনিই আবার বল্‌বেন। বারণ করো—তাঁকে কোন কথা বল্‌তে।"

ভগিনীপতি চিন্তিতচিত্তে গৃহে পদচারণ করিতেছিলেন; আমার কথায় দিদি কোন কথা কহিবার আগেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "Well! আমি কি করব, ঠিক বুঝতে পারছিনে! I am disgusted with the whole thing I must say দেখা যাক, সে আপনা হ'তে আর কিছু বলে কিনা; এ দিকে আমিও তার সম্বন্ধে যতটা পারি সব information নেব এখন। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কা'ল টেনিসে আসতে বলেছি, বিলাতের ব্যাপারটাও তাকে জিজ্ঞাসা করা যাবে—তা হ'লে লোকটার ভাব অনেকটা ঠিক ধর্‌তে পারব। কিন্তু কথা হচ্ছে আর একটা, কা'ল বারলাইব্রেরীতে ঢুকব কি ক'রে?"

দিদি বলিলেন, "আমি ভাবছি বাবার জন্যে। তাঁর কানে কথাটা উঠলে তাঁর না জানি কিরূপ কষ্ট হবে।"

আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম, এত ভাবনার মধ্যে সেই ভাবনাতেই আমাকে অধিকতর কাতর করিয়া তুলিয়াছিল।

১০

চারিদিকেই অশান্তি, অসুখ, নিরানন্দ ভাব। দিদি স্তব্ধ, গম্ভীর, ভগিনীপতি অকারণ ক্রুদ্ধ, ভৃত্যদিগের প্রতি অযথা ভর্ৎসনাপরায়ণ, দাসদাসীগণ শশব্যস্ত, ত্রস্ত, ভীত, এমন কি, বাড়ীর গাছপালা, ঘরদরজা প্রভৃতি অচেতন জড়পদার্থগুলা পর্য্যন্ত যেন তাহাদের স্বাভাবিক প্রিয়দর্শনতা-শূন্য, সমস্ত বায়ুমণ্ডলে কেমন যেন একটা স্তব্ধ অস্বস্তি, বিষাদ-বিকম্পিত। আমিই ইহার কারণ, আমার মনে কি অন্ধকার গুরুভার! এমন দিনে আবার পিসীমা তাঁহার কন্যা প্রমোদাকে লইয়া এখানে মধ্যাহ্ন ভোজনে আসিলেন। মনের ভাব মনে চাপিয়া আমরা যথাসাধ্য তাঁহাদের মনোরঞ্জনে তৎপর হইলাম। প্রমোদা প্রশ্নে আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিল, "কি হইয়াছে? এত রোগা কেন? এমন বিমর্ষ শুক্‌নো কেন? তিনি মফঃস্বলে গিয়াছেন বলিয়া বুঝি? শীঘ্রই আসিবেন, সে জন্য এতটা কেন? বিবাহ ত হইবেই, একটু কি সবুর সয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এখন আর সেকাল নেই, অন্যান্য অনেক আচার-অনুষ্ঠানের ন্যায় সখীদিগের নিকট মন খুলিয়া মনের জ্বালা নিবারণ করিবার প্রথাও নিতান্ত পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে, এ কালের মেয়েদের মনের দুঃখ সহজে মুখে ফুটিতে চাহে না; বিশেষতঃ এমনতর দুঃখ, ইহা ত কিছুতেই প্রকাশের নহে, আমি মনের কথা মনে রাখিয়া কাষ্ঠহাসি এবং বাক্‌চাতুরীতে তাঁহাকে ক্রমশঃ নিরুত্তর করিলাম।

বেলা কাটিল, টেনিসের দল সমাগত হইলেন, বাহিরের ও বাড়ীর লোকে মিলিয়া আমরা সবশুদ্ধ দশজনে বাগানে সমবেত হইলাম। যদিও একটি মাত্র কোর্ট, কিন্তু লোক অধিক না হওয়ায় তাহাতে খেলার তেমন সুবিধা হইল না। পিসীমা খেলেন না—আমিও শারীরিক অবসন্নতার দোহাই দিয়া প্রথম হইতেই দর্শক-শ্রেণীভুক্ত, অন্যেরা একদলের বিশ্রামে অপরদল খেলিতে লাগিলেন।

ডাক্তারও আসিয়াছিলেন, খেলার অবসরে নিকটে আসিয়া বসিলেন, স্বাভাবিক মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনাকে ভারি দুর্ব্বল মনে হচ্ছে! আপনার দিদি

বলছিলেন, আপনি ভারী careless, স্বাস্থ্যের দিকে আপনার মোটেই নজর নেই, নভেল পেলে খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত ভুলে যান।"

আমি বলিলাম, "কই! আজকাল ত পড়া-শুনা একরকম ছেড়ে দিয়েছি বল্লেই হয়।"

প্রমোদা আমার কাছে বসিয়া ছিল, সে বলিল, "পড়াশুনা ছেড়েছে কি না, জানি না, তবে খাওয়া-দাওয়া যে ছেড়েছে, তার সাক্ষী আমি দিতে পারি। ডাক্তার মহাশয় ওকে একটা ওষুধ দিন না।"

ডাক্তার বলিলেন, "gladly! আজই একটা প্রেস্‌ক্রিপসন লিখে দেব এখন, কিন্তু খাবেন ত?"

আমি গল্প করিতেছিলাম, কিন্তু আমার দৃষ্টি ছিল টেনিস খেলার দিকে, ডাক্তারের প্রশ্নে আমি একটু হাসিয়া তাহার দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, তাঁহার দৃষ্টি স্নেহপূর্ণ, অতি মধুর, তাহাতে আমার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত ভরিয়া গেল, ব্যথিত অন্তরদেশ হইতে ধীরে ধীরে, সুখের দীর্ঘ নিঃশ্বাস উঠিল, হৃদয়ের পাষাণভার দ্রব হইয়া অশ্রুতে উথলিয়া উঠিতে চাহিল, কণ্ঠাগ্রে এই কথাগুলি আসিয়া আবার মিলাইয়া পড়িল, "আপনার ওষুধে কি আমার মনের অসুখ তাড়াতে পারবেন?"

মনের কথা মনে, চোখের জল চোখে চাপিয়া নতমুখী হইলাম। এই সময় তাঁহার ডাক পড়িল। "I say Doctor,—come on. You are wanted here to make up a new sect."

তিনি ইহাতে কোন উত্তর না করিয়া আমাকে বলিলেন, "আরবারে আপনাকে যে টনিক দিয়েছিলুম, তাতে কি উপকার হয়েছিল? কত দিন"—

ভগিনীপতি আবার ডাকিলেন, "I say come on"—চঞ্চল নিকটে আসিয়া বলিল, "আপনি আসবেন না? আপনার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি।" তিনি একটু যেন থতমত খাইয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—

"I am really making yon all wait? Oh it is too bad of me."

বলিতে বলিতে তিনি চলিয়া গেলেন। প্রমোদা বলিল, "ডাক্তার খুব ভাল লোক;—ভাল না?" আমি কোন উত্তর করিলাম না। তীব্র রোগাবসানে দুর্ব্বল দেহমনে নবস্বাস্থ্যের সঞ্চারে আবার জগতের দিকে চাহিয়া, আত্মীয়-স্বজনের স্নেহাদর অনুভব করিয়া যে অবসাদময় স্বপ্নময় সুখ, তাহার আস্বাদ যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি আমার তখনকার মনের অবস্থা অনুভব করিতে পারিবেন।

১১

অন্য সকলে চলিয়া গেলে ভগিনীপতি ডাক্তারকে ডিনারে থাকিতে বলিলেন। সন্ধ্যার পর আমরা গৃহকর্ম্ম সারিয়া ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি একাকী টেবিলের নিকট বসিয়া আমার সেই পরিত্যক্ত নভেলখানি লইয়া পড়িতেছেন। আমরা একেবারে নিকটে আসিতে তাঁহার যেন হুঁস হইল, বইখানি বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দিদি বলিলেন, "বসুন। এমন অজ্ঞান হয়ে কি পড়ছিলেন? মিডলমার্চ্চ? আমরা এসে ত আপনার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গালুম না?"

আমরা উপবিষ্ট হইলে ডাক্তারও বসিলেন, বসিয়া ঈষৎ উদ্‌গ্রীব হইয়া তাঁহার সুকোমল, পাণ্ডুবর্ণ, বালোপম, মসৃণ চিবুক ও কপোল-প্রান্তস্থ কর্ণমূল-বিলুণ্ঠিত আকুঞ্চিত বিরল শ্মশ্রুগুচ্ছে বামহস্তের অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিতে করিতে, সূক্ষ্ম স্বর্ণরজ্জু-গ্রথিত আইগ্লাসের মধ্য হইতেই আমাদেব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "মাপ করবেন, সত্যিই এ একটা আমার ভারী Weakness; জর্জ্জ এলিয়েটের নভেল একখানি হাতের কাছে পেলে আর লোভ সামলাতে পারিনে। দেখুন না, এই বইখানা কতবার পড়েছি—তার ঠিক নেই,—তবুও এখন মনে হচ্ছিল,—যেন নতুন বই পড়ছি, নতুন জ্ঞান—নতুন আনন্দের মধ্যে ডুবে আছি। আপনি অবশ্য পড়েছেন বইখানি?"

দিদি। পড়েছিলুম অনেকদিন আগে; মন্দ লাগেনি। কিন্তু মাঝে মাঝে যে লম্বা-লম্বা লেক্‌চার —সেইগুলোতে কেমন যেন প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে।

ডাক্তার। হ্যাঁ, তাতে গল্পের interest তেমন নেই বটে, কিন্তু লেখকের Ideal তা থেকে বেশ স্পষ্ট মনে বসে। বল্‌তে কি, জর্জ্জ এলিয়েটের একটি লাইনও আমার বাদ দিতে ইচ্ছা করে না, অনাবশ্যক বা অপ্রীতিকর ব'লে মনে হয় না, যে পাতাই ওল্টাই, যেখান থেকেই পড়ি—পড়তে পড়তে একটা জ্বলন্ত সহানুভূতির ভাবে হৃদয় যেন সতেজ হয়ে উঠে—পৃথিবীর জীবনসমষ্টির মধ্যে নিজেকে অতি ক্ষুদ্রবল মনে হয়—এবং সেই মহাসমষ্টিতে আপনার সুখদুঃখ বিসর্জ্জন দিয়ে সুখী হ'তে ইচ্ছা করে।

দিদি। আপনি কি বলেন! মিডলমার্চ্চের হিরোইন ত দুবার বিয়ে করেছিল? আত্মত্যাগের কি চূড়ান্ত আদর্শই তাতে দেখালে!

ডাক্তারের ওষ্ঠাধরে একটু যেন হাসির রেখা দিতে না দিতে মিলাইয়া পড়িল, তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনারা হয়ত ভুলে যান, নভেলিষ্ট আর নীতিশিক্ষক এক নন। তিনিও নীতিশিক্ষা দেন বটে—কিন্তু তাঁর প্রণালী

স্বতন্ত্র, তিনি চিত্রকর। বিশ্বের অভঙ্গ অব্যর্থ নিয়মের মধ্যে, সমাজের ভঙ্গপ্রবণ ক্ষণিক নিয়মের মধ্যে নিয়তির এবং স্বভাব-চক্রের গতিতে চরিত্রভেদে মানুষ কিরূপ বিচিত্র মূর্ত্তিতে ফুটে ওঠে—তাই ছবির মত এঁকে দেখানই নভেলিষ্টের কাজ। জর্জ্জ এলিয়েট মানুষের মনুষ্যত্ব ছুঁতে চান না, তাকে জড় বা দেবতা করিতে চান না। সহানুভূতিতে, ভালবাসাতে সেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ করিতে চান মাত্র। ডরথিয়া ideal রাজ্যেই বাস করে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা সমস্তই অসাধারণ; সভ্য জগতের সংস্রবে এরূপ স্বভাবের লোক কিরূপ ভুল করে, লেখক তার ছবিতে তাই দেখিয়েছেন। তার জীবনের এই failureএর মধ্যেও কি খুব একটা pathos নেই?

দিদি। তার উপর মমতা হয় বটে, কিন্তু ভারি রাগ ধরে—আবার শেষে ও অমন একটা অপদার্থকে ভালবাসলে?

আমি বলিলাম,—"কেউ কেউ বলেন, ডরথিয়া, ম্যাগি, নাকি লেখিকার চরিত্রের ছায়া?"

ডাক্তার বলিলেন,—"এইরূপ শোনা যায় বটে। তাঁর জীবনের উচ্চতম আশা-আকাঙ্ক্ষা আদর্শে তিনি যেমন বিফল—"

ভগিনীপতি আসিয়া পড়ায় কথাটা থামিয়া গেল। দিদি বলিলেন, "এত দেরী যে!"

ভগিনীপতি বলিলেন,—"মক্কেলটাকে আর কিছুতে তাড়াতে পারি নে! discussion চলেছে হে—জর্জ্জ এলিয়েট? Oh! she is a great creator we must admit that, I am sorry to say."

ডাক্তার। What a reluctant admission? Does not you man's nature take delight in glorifying such genius in a woman? What a grand intelect she had combined with the sympathetic heart and subject instinct of true woman! মানুষের সামান্য অসামান্য প্রত্যেক কার্য্যটি, তার অন্তর স্বভাবের কিরূপ নিগূঢ় উদ্দেশ্য, কিরূপ সূক্ষ্মতম ভাব থেকে প্রসূত, তিনি যেমন তা চুলচিরে দেখিয়েছেন, এমন কোন পুরুষ নভেলিষ্ট পেরেছেন কি?"

ভগিনীপতি। There I quite disagree. Do you mean to say she is as great a genius as Shakespeare, or even modern—

ভগিনীপতির কথা শেষ করিতে না দিয়াই ডাক্তার খুব সতেজে বলিলেন—

"Of cours3, why not ? Though as first I spoke of novelists only, yet if you chooso to bring in Shakespeare's namo I have not the slightest hesitation in pronouncing her to be as great in her sphere, as Shakespeare is, in his."

এমনতর আস্পর্দ্ধাপূর্ণ মূর্খামির কথায় ভগিনীপতিকে নিতান্তই বিচলিত করিয়া তুলিল। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—

What a monstrous proposition ? Quite blasphemous to my mind. I never heard of such a ridiculous comparison ! She is no more a Shakespeare than you are my dear fellow—however cleverly sho might have written her novels."

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন,—"Of course sho isn't—how could she possibly be Shakespeare ! Did I really say such a foolish thing ? what I meant to say, and would go on repeating till the end of my life is this that the genius shown in the works of George Eliot is in no way inferior to that of any renowned poet or novelist of England, dead or alive."

ভগিনীপতি। But it comes to the same thing. Well, prove in what way she is as great a creative genius as Shakespeare ?

ডাক্তার বলিলেন,—"But the burden of proof lies on you my friend."

এই সময় ডিনারের ঘণ্টা পড়িল, আমরা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম ! তাঁহাদের বাগ্‌যুদ্ধ যে কোথায় গিয়া দাঁড়ায়—এই ভাবিয়া আমরা মহাভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম।—দিদি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"তর্কটা এখন রেখে দিলে হয় না—ডিনারের ঘণ্টা পড়েছে।"

তাঁহারাও উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—কিন্তু ভূতে পাইলে সে যেমন মানুষকে ছাড়িতে চাহে না, তর্ক পাইলে মানুষ তেমনি তাহাকে ছাড়িতে চাহে না। উঠিয়া দাঁড়াইয়াও ভগিনীপতি বলিলেন,—"You must give me good reasons my dear fellow, or else you must admit that she was not a Shakespeare."

ডাক্তার বলিলেন,—"All right, that I easily admit. As she was

a woman and called George Eliot she could not be a man or Shakespeare either ?"

ভগিনীপতি হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—"The premises being granted the conclusion must follows as the night the day, that her genius also could not be on a bar with Shakespeare's. Now let us shake hands in the name of Shakespeare who was the principal cause of this never-ending discussion which has nowever ended happily to the satisfaction of all parties. Vivela Shakespeare the great man !"

ডাক্তার ভগিনীপতির হাত সজোরে ঝাঁকাইয়া বলিলেন,—"Vivela George Eliot the great woman !"

ভগিনীপতি। All right ? I have no grudge against her you will see. Three cheers for Shakespeare—Three cheers for George Eliot !"

ডাক্তার। And viceversa. Three cheers for Shakespeare ?

দুজনে মিলিয়া ইহার পর একসঙ্গে 'হুরে হুরে' করিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম—

"আর আমাদের লেখকেরা বুঝি বাকি থাকিবেন ?

দিদি। তা ত বটেই। বঙ্কিমচন্দ্রের জয় সর্ব্বাগ্রে।

ভগিনীপতি সুর করিয়া গাহিলেন—

"জয় every lady-র জয়, জয় every gentlemanএর জয়, জয় জয় ভারতের জয়।"

কে জানিত, রুদ্ররস এমন হাস্যরসে পরিণত হইবে, তাঁহাদের উক্ত গানের কোরসে আমাদের ক্ষীণ হাসির কোরস তেমন ফুটিল না, কিন্তু আমরা হাসিতে হাসিতে ভোজনগৃহে সমাগত হইলাম।

১২

সে তর্কের ঐখানেই সমাপ্তি। টেবিলে বসিয়া অন্য নানা কথা—বেশীর ভাগ বিলাতের গল্পই চলিল। প্রথমে উঠিল, ইংলণ্ডের শীতের কথা, তাহা হইতে বরফে স্কেট করার বর্ণনা। শুনিয়া দিদি বলিলেন—"আমাদের নিতান্তই কৃপার পাত্র মনে করবেন না, এ দেশে ব'সেও আমরা জমাট বরফ দেখেছি। সেই নইনিতালে—কেমন মণি ?"

দিদি ডাক্তারের গল্পের উত্তরে এ কথা বলিলেন—আমিও তাঁহার উত্তরস্বরূপ বলিলাম—"কিন্তু আপনি যে রকম বলছেন, এ সে রকম নয়—এ শুধু বরফের একটা প্রকাণ্ড স্তূপ। দুই পাহাড়ের মাঝখানে, শীতের সময় বরফ পড়েছিল, তারি খানিকটা মাটী চাপা প'ড়ে গরম কালেও আর কি গলতে পায় নি। একটা পাশ শুধু গলে গিয়ে মস্ত একটা বাড়ীর মত দেখতে হয়েছে—সে দিকটা যেন তার খোলা দরজা। এক জায়গায় নীচে থেকে বরফ গলে সুন্দর বরফের সেতু হয়ে আছে।"

দিদি। জায়গাটি কি নিরিবিলি ! কেবল ঝরনার শব্দ ধ'রে ধ'রে আমরা সেখানে পৌঁছেছিলুম।

আমি। বাস্তবিক জায়গাটি বড় সুন্দর। লতা-পাতা, ফুল, পাহাড়, ঝরণা, নদী, বরফ প্রভৃতি প্রকৃতির যত কিছু সুন্দর বস্তু—সব যেন একত্র জোট বেঁধে লোকচক্ষু এড়াবার অভিপ্রায়ে সেই একটুখানি অপ্রশস্ত স্থানে ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে আপনাদের সৌন্দর্য্য ছড়াচ্ছে। সেই নিভৃত সবুজ পাহাড়ের কুঞ্জে শাদা বরফের ঘরবাড়ী যখন সহসা চ'খে পড়ে—মনে হয়, এ কোন পরীর রাজ্যে এসে পড়লুম।

দিদি। ঠিক বলেছিস্ ! মণি কিন্তু বেশ বলে। আমি এমন বর্ণনা ক'রে বলতে পারিনে !

এই অযাচিত অকাল-প্রশংসায় লজ্জিত বিরক্ত হইয়া আমি চুপ হইয়া গেলাম, —ভগিনীপতি দিদিকে বলিলেন—"তোমার আর কি আমারি মত দশা। যা দেখেছ, তা এক রকম ভুলে ব'সে আছ, তা বর্ণনা করবে কি বল ?"

দিদি। আমার মনে ত আর দিনরাত মক্কেলের ভাবনা জাগছে না যে, অন্য সব ভুলে ব'সে থাকব ?

ভগিনীপতি। আচ্ছা, বল দেখি, তবে বরফটা কেমন দেখতে ?

দিদি। না, তা কি বল্‌তে পারি? কিন্তু তোমাকে ত আমি আর পরীক্ষা দিতে বসিনি।

ভগিনীপতি। তবে আমিই পরীক্ষা দিই। কি চমৎকার সাদা ধবধবে! The sublimest, beautifulest grandest—

দিদি। আর চালাকি করতে হবে না।

ডাক্তার বলিলেন—"২৪ ঘণ্টা হাতে পেয়েও তোমার যে আশ মেটে না দেখছি হে, এই আধ ঘণ্টা ফাউটুকুও দখল করতে চাও। সমস্ত গল্পটা নিতান্তই যে একচেটে ক'রে নিচ্ছ।"

ভগিনীপতি। I beg you pardon I shall keep as quiet as a dummy.

দিদি। সেই ভাল। তুমি চুপ ক'রে থাক, আমরা গল্প করি। বরফটা জানেন, দেখতে আমাদের খাবার বরফের মত মোটেই নয়। বাইরেটা ঠিক যেন তার নুনের গুঁড়ো জমাট বাঁধা—আর ঘরের ভিতরের দেয়ালগুলো মোমের মত চমৎকার মোলায়েম আর একটু কাল কাল। মাটীর সঙ্গে মিশেছে কি না।

ভগিনীপতি। গিন্নিদের আবার তখন খেয়াল হোল—বরফ খানিকটা ভেঙ্গে বাড়ী আনতে হবে।

দিদি। তুমি আর ভাঙ্গনি—তবে সে কথা আবার তোল কেন? আমরা দুবোনে ভাঙ্গতে চেষ্টা করলুম, তা পারব কেন। হাতে কেবল নুনের মত গুঁড়ো উঠে আসতে লাগলো।

ডাক্তার। আমি থাকলে নিশ্চয়ই আপনাদের হুকুম তামিল করতুম—বরফ খানিকটা ভেঙ্গে সঙ্গে আনতুম।

দিদি। (ভগিনীপতিকে) দেখ্‌লে! এঁর কাছে শেখো, মেয়েদের কেমন ক'রে প্রসন্ন কর্ত্তে হয়।

ভগিনীপতি। Good Gods! ওঁর কাছে আমি শিখতে যাব! আমি কি আর আমার সময় ওসব করিনি? বিয়ের আগে হাতে কত কাঁটা বিঁধিয়ে গোলাপ ফুল তুলে দিয়েছি—এরই মধ্যে সে সব ভুলে গেছ?

দিদি। (সলজ্জে) আচ্ছা বেশ, থাম থাম। (ডাক্তারের প্রতি) তারপর আপনি গল্প করুন। বাস্তবিক নদীনালা বরফে জমাট বেঁধে মাটীর মত শক্ত হয়েছে,—তার উপর দলে দলে সব সুন্দর-সুন্দরীরা পরীর মত স্কেট করছে—সে না জানি কি চমৎকার দেখতে! আপনি বোধহয় দেখে খুবই মুগ্ধ হয়ে

গিয়েছিলেন ?

ভগিনীপতি। কি দেখে! স্কেটিং না বরফ,—না সুন্দর-সুন্দরী ?

দিদি। সমস্তই। কিন্তু তোমাকে ত আর জিজ্ঞাসা করছিনে।

ডাক্তার। হঁ্যা, মুগ্ধ হয়েছিলুম বোধ হয়,—হবারি ত কথা।—তবে সে দেশের ভিতরের সৌন্দর্য্য আমাকে এতই মোহিত করেছিল যে, বাইরের কোন দৃশ্য আর তেমন আশ্চর্য্য মনে হয়নি! সেখানে কি জ্বলন্ত স্বাধীনতা, কি অদম্য উদ্দাম উৎসাহ! আমাদের দেশের মত অলস বিশ্রাম যেন তারা জানে না। এক জন দশ জনের কাজও করে, দশ জনের আমোদও করে। আমার কলেজের প্রায় প্রত্যেক ছোকরাকেই দেখতুম—যথাসময়ে লেকচার শোনে—surgical operation শেখে,—পালায় dutyতে থাকে, রাত জেগে পড়াশুনাও করে,—আবার ফুটবল, হকি, বোটরেস—সকল রকম খেলাতেই যোগ দেয়; ডিনার পার্টি, বল, থিয়েটার ঘুরতেও বাকি রাখে না। আমি তো তাদের energy দেখে প্রথম প্রথম অবাক্ হয়ে যেতুম।

ভগিনীপতি। নইলে আর ইংলণ্ড ইণ্ডিয়ার তফাৎ হবে কেন বল ?

ডাক্তার। সে দেশে সব কাজেরই এমন একটা সুচারু শৃঙ্খলা যে, তাতে ক'রে কাজও ঢের সহজ হয়ে আসে; আর বেশী কাজও করা যায়। জীবনগুলো সে দেশে যেন ঠিক ঘড়ির কাঁটার চালে চলে। নিমন্ত্রণ খেতেই যাও,—দেখাশুনা করতেই যাও, সব তাতেই যেন ট্রেন ধরতে যাচ্ছ—এমনি ভাবে সময়ের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। কোন একটা engagement থাকলে প্রথম প্রথম আমি এমন অস্থির হয়ে পড়তুম, late হবার ভয়ে হয় ত বা আধঘণ্টা আগে থাকতেই হাজির হয়ে দরজার কাছে পাচালি ক'রে বেড়াচ্ছি।

আমি। বিলাতের গল্প শুনলে আমার এখন সে দেশে যেতে ইচ্ছা করে।

ডাক্তার। আমার ত মনে হয়, শিক্ষিত স্ত্রীপুরুষ সকলেরি একবার ক'রে অন্ততঃ সে দেশে যাওয়া উচিত। সেখানকার সেই মুক্ত স্বাধীন বায়ু নিশ্বাসে গ্রহণ করলেও আমাদের মত নির্জ্জীব জীব নতুন জীবন পায়, তারও যেন জীর্ণ-সংস্কার হয়! সে সব idea এ দেশে ব'সে কল্পনাতেও পোষণ করতেও লজ্জা বোধ হয়, সে দেশে ব'সে সেই সবই সত্য সাধনার বিষয় ব'লে মনে হোত। এখন বলতেও লজ্জা করে কিন্তু আমারই তখন মনে হোত, আমি একলাই যেন দেশটাকে ওলট-পালট করতে পারি। এ দেশের বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলোকে দুটো কথার

জোরে—বারুদের মত তোড়ে ওড়াতে পারি। এখন দেখছি, নিজের বিশ্বাস রক্ষা করাই কত কঠিন—তা আবার দেশশুদ্ধ reform করব!

ভগিনীপতি। বিধাতা আমাদের মেরেছেন—তার উপায় কি? ইংলণ্ডের মত ক্লাইমেট যদি ইণ্ডিয়ার হোত, তা হ'লে আর আমাদের এমন দশা হয়?

দিদি। না, এমন কালোরূপ নিয়েই জন্মাই? শোনা যায়, এককালে নাকি আমরাও সুন্দর ছিলুম—যখন প্রথমে পঞ্চনদ পার হয়ে এ দেশে বাস করতে আসি! বাস্তবিক যখন সামনের মাঠটায় ইংরাজের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পুতুলের মত মুখগুলি দেখি—তখন আর চোখ ফিরাতে ইচ্ছা হয় না। ভগবান্ আমাদের জাতকে কেন অমন সুন্দর কর্‌লেন না? তারা যেখানে থাকে, যেন তারা ফোটায়!

ভগিনীপতি। এত দুঃখ কেন? কালো রূপেও ত ভুবন মজেছে। তোমাদের—

দিদি। সুন্দররূপে আরো মজে!

ভগিনীপতি। তা বলা যায় না। কি বল হে? সে সূর্য্যের দেশ থেকেও ত বিনা ফোস্কায় তাজা ফিরে এসেছ, এখন দেখ, এ দেশে এসে চাঁদের আলোতে স্থির থাক কি না? আমার দশা ত দেখতেই পাচ্ছ।

দিদি। তা নয় গো তা নয়। সূর্য্যের আলোতে ঝলসে উঠলেই তখন চাঁদের আলোতে ঠাণ্ডা হ'তে আসে। নইলে কি আর দেশকে মনে পড়ে? বাস্তবিক সে দেশে যেতে যেতেই সবাই কি ক'রে তার নিজের দেশ, আত্মীয়স্বজন সব ভুলে যায়—আমার ভারি আশ্চর্য্য মনে হয়।

ভগিনীপতি। আমার কি মনে হয় জান? সে দেশের এত charm সত্ত্বেও তবুও যে তারা একেবারে দেশ ভোলে না, তবুও যে বাঙ্গালী থাকে,—দেশে ফেরে, বিয়ে না ক'রে ফেরে, আর ফিরেই বিয়ে করে—এইটেই বেশী আশ্চর্য্য!

দিদি। তা যাও না, তোমাকে ত কেউ বারণ করে নি, কেউ ত পা বেঁধে রাখেনি।

ভগিনীপতি। এই এই! জানছেন কি না, তা হবার যো নেই—একেবারে শিকলী বাঁধা।

তাঁহাদের মানাভিমান চলিল,—আমি বলিলাম,—"তার পর আপনার আর কি ভাল লাগত সে দেশে?"

ডাক্তার। সবচেয়ে আমার কি ভাল লাগত শুনবেন? সে দেশের

স্ত্রীলোকদের।

ভগিনীপতি। সৌন্দর্য্য! God heavens! আমি যে আর এক রকম বোঝাচ্ছি।

দিদি। আপনি ত দিব্যি! আমাদের মুখের উপর ও কথাটা বলতেও বাধলো না আপনার ?

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন,—"মাপ করবেন,—কিন্তু ও কথাটা আমি বলিনি—আপনার স্বামী বলেছেন। আমি বল্‌ছিলুম—আমার সবচেয়ে ভাল লাগত সে দেশের মেয়েদের স্বাধীনতা, আত্মনির্ভর ভাব। দিন দিন সে দেশে স্ত্রীলোকের কার্য্যক্ষেত্র বাড়ছে—এমন কি, পলিটিক্সে পর্য্যন্ত তাহারা হস্তক্ষেপ করেছে। পুরুষেরা এ জন্য বিরক্তি প্রকাশ ক'রে ঠাট্টা-তামাসা করে—অথচ আসলে এ জন্য সম্মানের চক্ষেই দেখে, তাদের হাতের কলের পুতুলের মত নাচে। দেশের উপর—প্রতি জীবনের উপর স্ত্রীলোকের কিরূপ influence এবং এই influence সমাজের পক্ষে কিরূপ আবশ্যক, কিরূপ হিতকর, এর অভাবে আমরা এ দেশে কিরূপ পশুজীবন বহন করি,—সে দেশে না গেলে তা বোঝা যায় না।

আমি। কিন্তু আমাদের দেশের লোক ত আর এ দেশে স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেশে না ; আর সেখানে গিয়ে সম্পূর্ণ নূতন রকম অবস্থায় পড়ে, প্রথমটা তাদের কি রকম অবস্থা হয় না জানি ?

ডাক্তার। অন্যের কি হয় জানিনে। আমার কথা আমি বলতে পারি। আমার বড় শোচনীয় অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। যে সামান্য ভাসতে পারে—তাকে যদি সরু দড়িতে বেঁধে মাঝগঙ্গায় ছেড়ে দেওয়া হয়, তাতে সে যেমন হাবু-ডুবু খেতে খেতে তীরে ওঠে—এর আর কি অনেকটা সেই রকম ব্যাপার।

দিদি হাসিয়া বলিলেন,—"কি রকম ?"

ডাক্তার। না জানি তাদের চাল-চলন, ধরণ-ধারণ, আদব-কায়দা, এমন কি, ভাষা পর্য্যন্ত আমরা শিখেছি বইএর ভাষা,—ফিলজফি পড়েছি, সায়েন্স পড়েছি, হিষ্ট্রী পড়েছি, সে সম্বন্ধে কথা উঠলেই বরঞ্চ একঘণ্টা বকে যেতে পারি ; কিন্তু ছোট ছোট সেন্টেন্সে, প্রশ্নের উপর উত্তরে, কথার উপর কথা ঘুরিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে রসিকতা ক'রে গল্প চালান, তা ত শিখিনি। স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে nervous হয়ে এমন awkward feel করতুম। কি কথা কব, ভেবেই পেতুম না। শুধু তাই নয়, এত দিন দেশে ডিক্সনারী দেখে দেখে সামান্য একটা অ্যাক্‌সেন্টের বিশুদ্ধতা ধরে এত হেঙ্গাম ক'রে যে ইংরাজী উচ্চারণ শিখেছি—

তাতে দেখি লাভ হয়েছে এই যে, ইংরাজী মুখের উচ্চারণ ভাল ক'রে সব বুঝতেই পারিনে। আর এক জ্বালা থেকে থেকে শুনতে পাই—'তুমি অমুককে cut করেছ সে তোমাকে রাস্তায় nod করছিল—তুমি টুপি ওঠাও নি?' Good heavens! কে আমাকে কখন্ nod করলে। আমি ত কিছুই দেখিনি। প্রতিদিন এই রকম excuse করতে করতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। আসল কথা, একে রাস্তার কোন দিক্ না দেখে চলাই আমার অভ্যাস—তার পর সাদা মুখগুলো সবই এমন একসা ব'লে মনে হয় যে, বিশেষ আলাপ পরিচয় না থাকলে এক আধ বারের দেখা-সাক্ষাতে মুখ চিনে নেওয়াই শক্ত। অন্য রকম বিপদও আবার আছে। দোকানে এক পেনির একটা বো কিনতে গিয়ে, ঘরে ফিরে এসে টাকা মিলিয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখি, এক পেনির জায়গায় অনুরোধের দায়ে ৫ পাউণ্ড খুইয়ে এসেছি। বেশ gracefully 'না' বলতে শেখাটা সেখানে বিশেষ আবশ্যক। নইলে আর বিপদের শেষ নেই। এই রকম প্রতিপদে কত পড়ে উঠে—তবে যে সে দেশের মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখেছি—তা কি আর কহতব্য?

দিদি। শেষ আর কি, সব বিষয়েই খুব পাকা হয়ে উঠেছিলেন?

ডাক্তার। তা ঠিক্ বলতে পারিনে,—আমার বাঙ্গালী বন্ধুরা শেষ পর্য্যন্ত আমাকে বলতেন—নেহাত কাঁচা।

ভগিনীপতি। তুমি সেখানে রমানাথকে কতদিন থেকে জানতে?

ডাক্তার। তিনি দেশে ফেরার অল্পদিন আগে মাত্র, আমাদের একটি বন্ধুর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

ভগিনীপতি। সত্য কি সে engaged হয়েছিল?

ডাক্তার একটু থতমত খাইয়া বলিলেন—"সেই রকম শুনেছিলুম বটে—কিন্তু আমি নিশ্চয়—But I am afraid it is not a fit subject for the dinner table!"

ভগিনীপতি তাঁহার সঙ্কোচ দেখিয়া বলিলেন, "You are right, let us keep it for some other time. I have certain reasons of course for asking you about him."

সে কথা থামিল—আমি বাঁচিলাম।

সেদিন আকাশে পূর্ণচাঁদ,—জ্যোৎস্নায় দিগ্‌দিগন্ত ভাসিয়া যাইতেছিল—আহারান্তে আমরা তাই ছাদে বসিলাম; দিদি বলিলেন,—"ইংলণ্ডে ত

আপনার সবই ভাল,—কিন্তু এমন চাঁদের আলো পেতেন ?”

ডাক্তার। সেটা rare ছিল বটে,—সেইজন্যই বোধহয়—যখন জ্যোৎস্না ফুটিত, বড় যেমন বেশী সৌন্দর্য্য ছড়াত।

দিদি। আপনি দেখছি—একেবারে মজে গেছেন। ইংলণ্ডের সুন্দরীরাই ভাল আমরা জানতুম, আবার চাঁদের আলোও এ দেশের চেয়ে বেশী সুন্দর ? আপনি যে সেই চাঁদের দেশে থেকে, তার অনন্ত আকর্ষণ এড়িয়ে ফিরেছেন—এ একটা পরমাশ্চর্য্য ব'লে মনে হচ্ছে।

তিনি তাঁহার কপোল-প্রান্তের শ্মশ্রুগুচ্ছে অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিয়া, একটু হাসিয়া বলিলেন,—“জানেন যে, সংসারে আশ্চর্য্যই বেশী ঘটে ! যেখানে সম্ভাবনা যত প্রবল, সেখানে দেখবেন, প্রায়ই নৈরাশ্য, আর সেখানে আপনি least সম্ভাবনা আছে ভাবছেন, least প্রত্যাশা করেছেন—সেইখানেই দেখবেন তা ঘটছে।”

বলিতে বলিতে তিনি যেন চকিত নয়নে আমার দিকে চাহিলেন, জ্যোৎস্নাবাহিত সেই নীরব দৃষ্টি হইতে কি এক অশ্রুত মধুর রব ধ্বনিত হইল, তাহার পুলক কম্পনে হৃদয়ের অন্তঃপুর স্তরে-স্তরে কম্পিত, আলোড়িত করিয়া সুদীর্ঘ নিশ্বাস উত্থলিত করিয়া তুলিল।

১৩

যেমন হইয়া থাকে, ডাক্তার চলিয়া যাইবার পর তাঁহাকে লইয়া আমাদের মধ্যে সমালোচনা চলিতে লাগিল। দিদি বলিলেন—“লোকটাকে লাগল মন্দ না।”

ভগিনীপতি বলিলেন—“Yes—he's not a bad fellow—hasn't got much common sense though—too much of a woman worshipper I should say.”

দিদি। সে ত ভালই।

ভগিনীপতি। মন্দ কে বলছে ? Poor fellow, I pity him—he's quite lost in admiration of the fair six. Fancy an intelligent and educated man like him firmly believing in the possibility of

a woman's ever coming up to the Shakespeare in intellectual power!

দিদি। সেটা কি এমনি অসম্ভব ব্যাপার?

ভগিনীপতি। And what is work still—feeling no hesitation whatever in expressing this outrageous opinion of his before others and making fool of himself. The man has absolutely no sense of the indicrous.

আমি বলিলাম,—"তাঁর যে strength of conviction খুব আছে—এতে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।"

তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"You are right it shows his sincerity and to tell you the truth, I like him all the better for this out spoken foolish enthusiasm of his."

দিদি। লোকটা বেশ সহৃদয়।

ভগিনীপতি। He has the manners of a perfect gantleman—

তাহার পর সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, মণির সঙ্গে তার বিয়ে হ'লে কেমন হয়?

দিদি। সে ত engaged।

ভগিনীপতি। Good gods! কে বল্লে! আমি ত ভেবেছিলুম, he was rather saw—never mind what, but— কে বল্লে?

দিদি। চঞ্চলের মা বলছিলেন।

ভগিনীপতি। এরই মধ্যে পাকড়া করলে কে? কথাটা ত গুজবও হ'তে পারে?—

দিদি। না, ডাক্তারের মায়ের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন, গুজব হবার নয়। তবে পাত্রীটি যে কে, তা আর আমি জিজ্ঞাসা করিনি, অন্য কথা এসে পড়লো, আর জেনেই বা আমার লাভ কি বল?

ভগিনীপতি। Bad luck everywhere oh! তবে চল এখন শুতে যাওয়া যাক, স্বপ্নে এই happy pairকে congratulate করা যাবে এখন!

কি ভাগ্য, ইহা রাত্রিকাল; তাই আমার সহসা পরিবর্ত্তিত বিবর্ণ মূর্ত্তি ইহারা দেখিতে পাইলেন না।

শয়নগৃহে আসিয়া জানালার ধারে কৌচে বসিলাম। বিছানায় যাইতে ইচ্ছা

হইল না। নয়নপথে মুক্তাকাশখণ্ডে শ্বেত কৃষ্ণ মেঘের উপর দিয়া স্তরে-স্তরে, তরঙ্গে-তরঙ্গে, তর-তর বেগে পূর্ণ শশধর ভাসিয়া যাইতেছিল ; তাহার দিকে চাহিয়া আমার সন্ধ্যার সেই মুখ মনে জাগিতে লাগিল ; আর ব্যথিত অশ্রুধারা হৃদয় ভেদ করিয়া নয়নে উথলিয়া উঠিতে লাগিল।

সবই কি আমার কল্পনা। ইহার নয়নে যে সুমধুর দৃষ্টি দেখিলাম, ইহার সাধারণ কথার মধ্যে যে অসাধারণ হৃদয়-কথা পড়িলাম, তাহার মধ্যে কি সত্য কিছুই নাই ? সমস্তই কি আমার মনের ছায়া—আমার মনের ভাব মাত্র ? সন্দেহ নাই ! আমি কে ? আমি কি নিতান্ত ক্ষুদ্র, নিতান্ত অযোগ্য, মুহূর্ত্তের জন্যই বা কিরূপে অতদূর আত্মহারা হইলাম ? এ দুরাশা কেন মনে উঠিল ? তাহা কখনো নহে ; কখনো হইবারও নহে,—সমস্তই আমার ভ্রম। আমার কল্পনা।

বাহিরে তেমনি পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না ; অন্তরে তেমনি মধুর দৃষ্টি, কেবল সন্ধ্যার সেই আনন্দের পরিবর্ত্তে সমস্তই এখন নিরানন্দ, বিষাদ, ম্লান ; হৃদয়ের নবজাগ্রত মধুর বসন্ত মুহূর্ত্তে মরুবিলীন।—

তাঁহাকে মনে পড়িল। যাঁহার ভালবাসা উপেক্ষা করিয়াছি, তাঁহাকে মনে পড়িল। শুনিতে পাই, সংসার কর্ম্মফলে চলিতেছে, ইহাও কি কর্ম্মফল ? তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছি, তাই এ কষ্ট। কিন্তু আমি কি তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া কষ্ট দিয়াছি ? অবস্থাচক্রের উপর কি আমার হাত আছে ? তাহা হইতে আমার হৃদয় যে দূরে পড়িয়াছে, সে কি আমার দোষে ? সহস্র চেষ্টাতেও কি আর সে প্রেম ফিরাইতে পারি ? না আবার ইচ্ছাক্রমেই এই নবপ্রেম আমার হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছে ? সাধ্য থাকিলে এই মুহূর্ত্তে কি ইহা বিলোপ করিতাম না ? যে কর্ম্মের উপর আধিপত্য নাই, তাহারও ফল আছে ? সে জন্যও মানুষ দায়ী ! তাহার নিমিত্ত এই ভয়ানক শাস্তি ! তবে মানুষকে এত ক্ষুদ্র, এত তুচ্ছ, এত দুর্ব্বল করিয়া গড়িয়াছ কেন প্রভু ! দুর্ব্বল অসহায়ের প্রতি তোমার করুণা কোথায় তবে ? অবশ্যই আছে ! কেবল কর্ম্মফলে সংসার চলিলে এতদিন ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। আমিই বা আজ কোথায় থাকিতাম ! যে করুণায় বাল্যে, কৈশোরে অসংখ্য রোগশোক দুঃখ-তাপের অবসান করিয়া জীবনে সুখশান্তি বিধান করিয়াছে, হে নাথ, করুণাময় তোমার সেই অনন্ত করুণা-বারিবর্ষণে—"

প্রার্থনা অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল ; কি ভিক্ষা করিতে যাইতেছি ! ঈশ্বরের করুণা আহ্বান করিয়া যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে পাইতে চাই ! আমার সুখের জন্য, অন্যের সুখে অভিসম্পাত প্রার্থনা করিতেছি। প্রার্থনার সহজ উচ্ছ্বাস সহসা

স্তম্ভিত হইয়া গেল, করপুট শিথিল হইয়া পড়িল, আমি সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া অধীর বেদনায় মনে মনে কহিলাম,—"তোমার করুণা! প্রভু, তোমার করুণা? আমার মঙ্গলের জন্য যে কষ্ট, যে দুঃখ বিধান করিতে চাহ, আমি যেন ধীরভাবে তাহা সহ্য করিতে পারি; করুণা করিয়া এই বল দাও নাথ!" কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রার্থনা করিতে করিতে সেই অবস্থাতেই কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম, জানি না। যখন জাগিয়া উঠিলাম, তখন পূর্ব্বরাত্রের সেই বেদনাময় অনুভূতি লইয়াই জাগিয়া উঠিলাম। সেই ছবি, সেই দৃষ্টি মনোনেত্রে দেখিতে দেখিতেই জাগিয়া উঠিলাম।

১৪

একই রকমে দিন কাটিতে লাগিল। প্রতিদান পাইবার আশা নাই, ভরসা নাই, ইচ্ছাও নাই। নিরাশার মধ্যেও তথাপি অন্তঃশীলা আশা প্রবাহিতা, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাসনা বিদ্রোহী, মনের বিরুদ্ধে মন সংগ্রামরত, নিজের সহিত অনবরত যুদ্ধে হৃদয় রক্তাক্তক্ষত-বিক্ষত। এমন অবস্থায়তোমরা কেহ কি কখনো পড়িয়াছ? জানি না, কিন্তু মনে হয়, এ বিশাল সংসারে এ জ্বালা শুধু আমিই জানি।

ভাবিতে গেলে মহা বিস্ময়ের মধ্যে মগ্ন হইয়া পড়ি!—কেবল দুই চারি দিনের দেখা, কেবল দুই চারিটা কথাবার্ত্তা। তাহাতেই কিরূপে আমাকে এমনতর পাগল করিয়া তুলিল; সেই ক্ষণিক মিলনের মধ্যে জগতের যত কিছু সৌন্দর্য্য-মধুরতা, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, যত কিছু হলাহলভরা অভাব, বেদনার অভিজ্ঞানে জীবনের অভিজ্ঞতা যেন সম্পূর্ণ।

তাঁহাকেও ত ভালবাসিয়াছিলাম; কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সে এ রকমের অনুভব নহে। সে শুধু গানের মোহ, স্মৃতির ব্যথা; এমন মর্ম্ম-বিজড়িত আকুল আকাঙ্ক্ষাময় আত্মদান নহে। সে শুধু বিশ্বাসের-উচ্ছ্বাস, প্রীতির অনুভবে মর্ম্মান্তিক সহানুভূতি, তাই যখন বিশ্বাস ফুরাইল, যখন মনে হইল, তাঁহার ভালবাসা সত্য নহে, তখন সে ভালবাসাও ফুরাইল। কিন্তু এ সন্দেহে, এ অবিশ্বাসে সে ক্রোধ কোথা? সে বিরক্তি কোথা? সে বিস্মৃতই বা কোথা? নৈরাশ্যসিঞ্চনে এ প্রেম আরও কেবল মনে দৃঢ়-বদ্ধমূল হইয়া বসিতে লাগিল।

প্রাণের মধ্যে সারাদিন কি যে আগুন জ্বলিতেছে, কাজে-কর্ম্মে, গল্পে, কথায় তাহার নিবৃত্তি নাই। যতই ভাবি আর না আর না, ততই ইহাকে ভাবি,

ভুলিতে চেষ্টা করিয়া দর্শন-তৃষায় আরও ব্যাকুল হইতে থাকি, বায়ুর শব্দে নিরাশ-মনে বাতুল আশা জাগাইয়া তোলে—মোহভঙ্গে দগ্ধ হৃদয়ে বেদনাধ্বনি ওঠে—একবার—একবার কি আর দেখা পাইব না। আর কিছু না—যদি শুধু মাঝে-মাঝে দেখা পাইতাম। হৃদয়ভাগিনী নহে—যদি সামান্য বন্ধুত্বভাগিনীও হইতে পারিতাম! তাহা হইলেই কি আমার জীবন-জন্ম সার্থক হইত না? কোথায় সে গর্ব্বিত অপমান বোধ!

এইরূপ দাবানল হৃদয়ে বহিয়া দিন কাটে। ভবিষ্যতে কি হইবে, কে জানে, কালে ইহার শান্তি আছে কি না, জানি না, কিন্তু পুড়িতে পুড়িতে জ্বলিতে জ্বলিতে এখন মনে হয়—এমনি নিরাশাময় আশা, বেদনাময় আকুলতায় জীবন জ্বলিয়া-পুড়িয়া যখন ভস্মসাৎ হইবে, তখনি মাত্র ইহার শান্তি। সুদীর্ঘ জীবনের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠি। ইহাই কি প্রেম? যে তৃষ্ণায় তৃপ্তি নাই, যে আকাঙ্ক্ষায় নিবৃত্তি নাই, যে আশায় সফলতা নাই, তাহাই কি প্রেম? কে জানে।

ইহার তিন চারিদিন পরে চঞ্চলের সহিত দেখা। তাহাদের বাড়ীতেই দেখা। আমাদের দু'জনে খুব ভাব। বেশী না হউক, অন্ততঃপক্ষে সপ্তাহে একবার করিয়া, দিনান্ত ধরিয়া, আমরা দুজনে একত্র কাটাই! কোনবার বা সে আমাদের বাড়ী আসে, কোনবার বা আমি তাহাদের বাড়ী যাই। তাহার নজর এড়াইতে পারিলাম না; আমাকে দেখিবামাত্র, আমার শুষ্ক বিষণ্ণ ভাব লক্ষ্য করিয়া সমবেদনার স্বরে চঞ্চল বলিয়া উঠিল—"আর তুমি কি না বল, সে জন্য তোমার কিছুই আসে যায় না; এ কি চেহারা হয়েছে? আমার তার উপর এমন রাগ ধরছে! কি ক'রে যে কাকারা দিদির সঙ্গে তার বিয়ে—"

"দিলেই বা!"

"আচ্ছা, ঠিক বলছ, তুমি তাকে আর ভালবাস না! বিয়ে ভেঙ্গে গেছে ব'লে দুঃখিত হওনি?"

"তুমি কি মনে কর, তোমাকে আমি অঠিক কিছু বলব! কোন কথা তোমাকে বলতে না পারি, কিন্তু যা বলব, তা বেঠিক বলব না,—এ বেশ জেনো।"

চঞ্চল খুসী হইয়া আমার গাল টিপিয়া বলিল, "সই লো, আমার তোকে কিন্তু ভাই বড় কেমন কেমন দেখাচ্ছে। তা এতটা একজনকে বিশ্বাস করেছিলি,—সে বিশ্বাসটা ভাঙ্গলো, সে জন্যও ত কষ্ট হয়?"

"হয়েছিল অবিশ্যি, তা ত জানই। কিন্তু তাই ব'লে যদি ভাব, আমি সেই কষ্টে এখনো মারা যাচ্ছি—তা হ'লে—"

"আমি হ'লে ত যেতুম। আমি যদি বিলাত থেকে এক হপ্তা চিঠি না পাই, এমন ভয় হয়, কি বলব!"

"তোর যে বিয়ে হয়ে গেছে, তোর স্বামী ভুলেও তোর ভোলার পথ বন্ধ, আর ভোলাটাই আমাদের পক্ষে যুক্তি, কেন না, তাতেই আমাদের মুক্তি।"

চঞ্চলও হাসিল, হাসিতে হাসিতে বলিল—"তা ঠিক! দিদিও (কুসুম) ত দেখছি বেশ আছে! আমি নিজের ভাব থেকেই দেখছি উলটো বুঝে মরি। শুনেছ অবিশ্যি, দিদির বিয়েও ভেঙ্গে গেছে?"

"না। ভাঙ্গলো কেন?

"তা ত জানিনে। তাঁরা ত আর আমাদের কাছে কিছু প্রকাশ করেন না। বাইরে বাইরে অমনি শুন্‌ছি যে, হবে না নাকি। বোধ করি, রমানাথই ভেঙ্গেছে, কেন না, দিদির শুনেছি ইচ্ছা ছিল। লোকটা যা হ'ক, গুণপণা আছে—নইলে দিদি পর্য্যন্ত ভোলে?"

আমি একটু স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম,—একটা অনুতাপ গ্লানি হৃদয়ে বহিয়া গেল। এ বিবাহে তিনি অসম্মত হইলেন কেন? আমি কি তাহাতে লিপ্ত?

চঞ্চল বলিল—কি ভাবছ?

আমি বলিলাম—"তোমার দিদি কি সত্য তাঁকে ভালবেসেছিলেন? আমার তাঁর জন্যে বড় মায়া করছে, সাধ্য থাকলে কোন রকমে বিয়েটা ঘটাতুম!"

"তোমাকে কে মায়া করে ঠিক নেই—তুমি মায়া করছ দিদিকে! আমি ত তার বড় একটা দরকার দেখছিনে। আত্মাদর দিদির যথেষ্ট আছে—নিজের মূল্য সে বেশ বোঝে, কেনই বা না বুঝবে? রূপগুণের কিছু কসুর নেই, তার উপর টাকা। যে বিয়ে করবে, রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব এক সঙ্গে পাবে। কত লোক তার জন্য হা-হুতাশ ক'রে মরছে, তার ত ঠিক নেই। যদি দুঃখ করতে হয়, তাদেরই জন্য বরঞ্চ কর। দিদির যদি সামান্য একটুকু আঁচড় লেগে থাকে ত এতদিনে তার দাগ বেশ মিলিয়ে পড়েছে!"

"তা কি ক'রে জানলে? যারা সহজে ভালবাসায় পড়ে না, তারা ভালবাসলে বরঞ্চ সহজে না ভোলারই কথা!"

"হ্যাঁ, যদি তেমন ভালবেসে থাকে। কিন্তু সে রকমটা ত মনে হয় না। লোকটা একটু চটকে রকম, কথাবার্ত্তায় খানিকটা চমক লাগাতে পারে—কিন্তু তার উপর যে কারো গভীর ভালবাসা হবে, তা ত আমি মনে করতে পারিনে। নিদেন আমার হ'লে ত হোত না, আর দেখা যাচ্ছে, তোমারো হয়নি। তা

হ'লে দিদিরই কি হবে ?"

"বস্! খুব ত লজিক দেখছি।"

"ইংরাজী নভেলে প্রায়ই ত দেখা যায়, first love অনেক সময়েই অনভিজ্ঞ হৃদয়ে একটা শুধু উচ্ছ্বাস, তেমন গভীর ভালবাসা নয়। দিদিরও এটা খুব সম্ভব সেই রকম একটা ফেনা উঠে জল বুদবুদের মত আবার মিলিয়ে পড়েছে। যথার্থ ভালবাসা হৃদয়ের একটা শিক্ষা, সেটা শুধু আবেগ নয় ; তার উপযুক্ত পাত্রও চাই। হ্যাঁ, ডাক্তারকে কেউ ভালবাসছে শুনলে সেটা বোঝা যায় বটে। আজকাল ত আমরা দিদিকে এই কথা নিয়ে ঠাট্টা করি, তিনি কি না ঘরাউ ডাক্তার হয়েছেন। আর মনে হয়, ডাক্তার বেশ একটু ধরা পড়েছে—"

আমার হৃৎপিণ্ডে শোণিত বেগে বহিল ; মনে হইল, মুখে চোখে তাহা উছলিয়া উঠিতেছে, বুঝি বা এখনি ধরা পড়ি ; কিন্তু চঞ্চল লক্ষ্য করিল না— বলিয়া উঠিল, "এই যে দিদি, অনেকদিন বাঁচবে, নাম করতে করতে হাজির।"

অনেকদিন পরে কুসুমের সহিত দেখা। মনে হইল, সে যেন পরিবর্ত্তিত। তাহার নয়নে সেই বিদ্যুদ্দাম প্রস্ফুরণ চাপল্যের যেন অভাব, অধরে আত্মন্তরীময় সদা প্রস্ফুটিত হাস্যরেখা যেন নিমীলিত। আমার মায়া করিতে লাগিল। পাছে সে ভাবে, আমি তাহার প্রতি অপ্রসন্ন, আর সেরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণও বর্ত্তমান, "এই যে কুসুম ! অনেকদিন পরে দেখা।"

কুসুম একটু চাপা ভাবে উত্তর করিল—

"হ্যাঁ, কত দিন ভেবেছি, দেখা করতে যাব, কিছুতেই কেমন ঘটে ওঠেনি। তোমরাই কোন্ আমাদের বাড়ী আস ?"

ইহার উত্তর যোগাইল না, বলিলাম, "আমি দেশে যাচ্ছি।"

চঞ্চল বলিয়া উঠিল, "মনের দুঃখে বনবাস আর কি !"

আমি অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম ; ছি ! কুসুম কি ভাবছে ? চঞ্চলও বলিয়া বোধহয় বুঝিল, কথাটা কুসুমের মনে লাগিতে পারে। তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িল, বলিল, "তারপর দিদি, ডাক্তারের খবর কি ?"

কুসুম বলিল, "তার খবর আমি কি জানি ! মণি সম্ভবতঃ বলতে পারে ; ওদের ওখানে না প্রায়ই যান ? কেন, মনের দুঃখ কিসের ? মণির মত সৌভাগ্য আমাদের হ'লে আমরা ত বেঁচে যেতুম।"

উদ্দেশ্য অবশ্য ঠাট্টা, কিন্তু ইহার মধ্য হইতে সত্যের আভাষ প্রকাশ পাইল। বলিতে বলিতে কুসুমের চাপা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। সে নিশ্বাসে ঈষৎ যেন

ঈর্ষামাখা নৈরাশ্য-বেদনা ব্যক্ত হইল, বুঝিলাম, কুসুম ভালবাসে, সত্যই ভালবাসে; কিন্তু কাহাকে? তাঁহাকে না ইঁহাকে? মিষ্টার ঘোষকে—না ডাক্তারকে?

১৫

কাহাকে? তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? চঞ্চল কি জানে? তার সব অনুমান বই ত নয়! মিষ্টার ঘোষ যে এমন সুবিধার বিবাহ আপনা হইতে ছাড়িবেন, তাহা হইতেই পারে না; কেন ছাড়িবেন, তাহার যখন কোন কারণই নাই। কুসুমই এ বিবাহে অসম্মত হইয়াছে। যতক্ষণ চন্দ্রোদয় না হয়, ততক্ষণ নক্ষত্র দীপ্তিশালী, চন্দ্র উঠিলে কি আর তারার আলো চোখে লাগে? ডাক্তারের সহিত পরিচিত হইয়াই কুসুম মন পরিবর্ত্তন করিয়াছে—কুসুমের সহিতই ডাক্তার engaged, নহিলে ইহার নাম শুনিবামাত্র কুসুম ওরূপ বিহ্বলতা প্রকাশ করে কেন! বেচারা রমানাথ! তাঁহার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল।

স্তব্ধ নিশায় শয্যাশায়ী একাকী আমি নির্ব্বোধে চিন্তামগ্ন হইয়া এইরূপ মীমাংসা করিতে করিতে আর একটি কথা সেই সঙ্গে বারংবার এই ভাবিতেছিলাম —"কুসুম কি ভাগ্যবতী! ইহার মধ্যে কি ঈর্ষা লুকান ছিল? নিশ্চয়ই। লোকে বলে, এমন স্থানে ঈর্ষা না হইয়া যায় না—আমি কি আর সৃষ্টিছাড়া; তবে এ ঈর্ষা নিতান্তই নিরীহ ঈর্ষা, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা-উত্থিত নৈরাশ্য-বেদনা;—আকুল দীর্ঘনিশ্বাসে মাত্র তাহার বিকাশ ও তাহাতেই তাহার অবসান, বিকৃত বিরূপ বিদ্বেষপূর্ণ অভিশাপ ইহাতে ছিল না। থাকিবার কথাও নহে।—যেখানে অধিকারে, উপভোগে কেহ অপহারক, সেখানে সেই অপহারকের প্রতি ক্রোধে বিদ্বেষ স্বাভাবিক। কিন্তু কুসুম আমার কাছে কি দোষে দোষী? আমা হইতে আমার প্রিয়তমের স্নেহও সে ছিন্ন করে নাই, আমার আত্মীয়তা অধিকারও তাহা হইতে সে হরণ ক'রে নাই;—সৌভাগ্যক্রমে সে না হয় তাঁহার প্রণয়িনী হইয়াছে, যদি তাহা না হইত—যদি কুসুমকে তিনি না ভালবাসিতেন তাহা হইলেই যে আমি ভালবাসা পাইতাম, এমন আশাও আমার মনে নাই। তবে তাহার উপর ক্রোধ বিদ্বেষ জন্মিবে কেন? বরঞ্চ বিপরীত। দ্বেষের পরিবর্ত্তে এই ঈর্ষ্যার আঘাতে আমার হৃদয়ে একটি গুপ্ত প্রীতিদ্বারা সহসা খুলিয়া গেল।

সত্য কথা বলিতে হইলে ইতিপূর্ব্বেই আমি কুসুমের প্রতি সখ্যভাব অনুভব করি নাই। কিন্তু যখনি মনে হইল, কুসুম আমার প্রিয়তমের প্রিয় হইয়া উঠিল,— তাহার যে সকল গুণরাশি এতদিন আমার অন্ধ-নয়নে অপ্রকাশিত ছিল—পরম প্রীতিভাজন বন্ধুর মত সহসা সেই সবে আমি সাতিশয় আকৃষ্ট হইয়া উঠিলাম এবং এই নবসখ্যতাভাবে আমাকে এতদূর অধীর, এতদূর বিহ্বল করিয়া তুলিল যে, তখনই তাহাকে সখিত্বের ডোরে বাঁধিয়া তাহার সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম। এমন কি, মনের আবেগে বিছানা হইতে উঠিলাম, কিন্তু ডেক্সের কাছাকাছি আসিয়া সহসা মন পরিবর্ত্তিত হইল, মনে হইল, ছি! কুসুম কি ভাবিবে? আর কিই বা লিখিব! আস্তে আস্তে আবার ফিরিয়া গিয়া বিছানায় ঢুকিলাম।

পরদিন সকালে দিদি বলিলেন, "সে আসবে জানিস?" আমার হৃৎপিণ্ড বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কবে?"

"কাল টেনিসে।—মুখে তুই কিছু বলিসনে, কিন্তু দিন দিন যে রকম শুকিয়ে যাচ্ছিস, দেখলে চোখে জল আসে।"

ভারী লজ্জা হইল, ছি—ছি—দিদিও ধরিয়া ফেলিয়াছেন! "হাঁ, শুকিয়ে যাচ্ছি! তোমার যেমন কথা!"

দিদি বলিলেন—"আর এতটা কষ্ট কেন—না সামান্য একটু ভুল বোঝার জন্য!"

আমি সহসা আকাশ হইতে পড়িলাম,—বুঝিলাম, ডাক্তারের কথা বলিতেছেন না।

দিদি বলিলেন—"সে যে তোমাকে ভালবাসে, তাতে আর সন্দেহ নেই। ওনার সঙ্গে দেখা হ'তে নিজেই সে কথা তুলে বলেছে যে, তোর ব্যবহারে তার অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে; যদিও অন্য পার্টিরা তাকে বিয়ের জন্য বিশেষ ধরে পড়েছেন —কিন্তু এখনো সে তাদের কথা দেয়নি; এখনো যদি তোর মত হয়'ত সে সমস্ত sacrifice করতে প্রস্তুত। কা'ল আস্‌বে, দেখিস যেন আবার হেঙ্গামা বাধিয়ে বসিস্ নে। তুই ভালবাসিস্, সেও ভালবাসে, মাঝে থেকে এক ফ্যাকড়া।"

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি এখন নিজের হৃদয় বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছি, তাহাকে ভালবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব, তবে বিবাহ করিব কি করিয়া? আমি বলিলাম, "আমার জন্য তাঁহাকে কোন রকম sacrifice করতে হবে না। দিদি, আবার কেন এ হেঙ্গামা বাধান? আমি দেখা করিতে পারব না!"

দিদি বলিলেন, "তুই এমন কথা ধরতে পারিস ? Sacrifice বলেছে, অমনি অভিমান !"

"অভিমান আবার কোথায় পেলে। ভালবাসাস্থলেই মানাভিমান ! ভালবাসাতেই আত্মবিসর্জ্জন করেও আত্মবিসর্জ্জন নিয়ে সুখ। যেমন ভালবাসা থাকলে তিনিও এটা sacrifice ভাবে দেখতেন না, আর আমারো তা গ্রহণ করতে কুণ্ঠা হতো না।—যাকে ভালবাসিনে, তার উপর মানাভিমানই বা কি—আর তার sacrificeই বা নিতে যাব কেন ?"

দিদি তবুও মনে করিলেন—ইহা আমার অভিমানের কথা। হাসিয়া বলিলেন,—"তোর সঙ্গে বাবু আমি তর্কে পারব না—সে ত কাল আসছেই, এসে তর্কভঞ্জন মানভঞ্জন সবই করবে এখন।"

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "দিদি, তুমি খুবই ভুল বুঝছ। অভিমান ক'রে আমি এরূপ বল্‌ছিনে। তাঁর এ কথায় আমার বরঞ্চ আহ্লাদই হয়েছে—মন থেকে একটা দারুণ ভার নেমে গেছে। আমি যাঁকে ভালবাস্‌তে পার্‌ছিনে, তিনি আমাকে ভালবাস্‌ছেন—আমি তাঁর কষ্টের কারণ—এটা মনে করতে কি খুব সুখ নাকি ?"

দিদি রাগিয়া বলিলেন, "তোর মত আতন্তরী লোক যদি আর দুটি আছে ? সেই যে ধ'রে বসেছিস, সে ভালবাসে না—এ আর কিছুতে ছাড়বিনে।—যা হ'ক, কা'ল ত সে আসছে, দেখা ত' হোক, তার পর যা হয় হবে⋯"

আমি কাতর হইয়া বলিলাম,—"আমি দেখা করতে পারব না দিদি,—ব'লো, আমার অসুখ করেছে।"

"অসুখ করেছে ! উনি এ দিকে তাকে আস্‌তে বলে এসেছেন,—ভাবে গতিতে প্রকাশ করেছেন যে, তোর আর এ বিয়েতে কোন আপত্তি হবে না, আর তুই এখন বলছিস দেখা করবিনে।

আমি কি করব ? দেখা হলেই যে আমাকে আবার সেই কথাই বল্‌তে হবে। আমি যে কিছুতেই এ বিয়েতে রাজি হ'তে পার্‌ছিনে দিদি !"

"আমাদের অপমান, লোক হাসিহাসি এ সবই ভাল, তবু বিয়েতে রাজি হ'তে পার্‌বিনে অথচ তার দোষ কিছুই নেই। এর কোন মানে আছে ?

"আমি তাকে ভালবাসতে পারব না।"

"এই দুদিন আগে এত ভালবাসা, আর ভালবাস্‌তে পারবিনে। সে কি কখনও হয় ! এখন ও রকম মনে হচ্ছে, বিয়ে হলেই ঠিক ভালবাসা হবে।"

আমি নিতান্ত মোরিয়া হইয়া বলিলাম, "দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি দেখা করতে পারব না, আমি তখন বুঝিনি, এখন বুঝছি, তাঁর সঙ্গে বিয়ে হ'লে আমিও সুখী হব না, তিনিও না।"

"তবে তোর যা হচ্ছা করিস, যা ইচ্ছা বলিস। এমন একগুঁয়ে মেয়েও ত আমি কখনো দেখি নি।" বলিয়া দিদি অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে চলিয়া গেলেন।

১৬

জীবনে কত মহাবিপদে পড়িয়াছি, কিন্তু কখনও আমাকে এই সামান্য বিপদের মত এত কাতর, এত অভিভূত করে নাই। যেন ভীষণ অন্ধকারে একাকী দাঁড়াইয়া, দেহে তীক্ষ্ণ শাণিতাস্ত্র বর্ষণ চলিতেছে, আত্মরক্ষার কিছুমাত্র উপায় নাই, হস্ত উঠাইতে, মস্তক তুলিতে শতধার কৃপাণ তাহার তীক্ষ্ণতা আরো ভীষণরূপে অনুভব করাইয়া দিতেছে। আমি যন্ত্রণাজর্জ্জর কাতর প্রাণে সর্ব্বান্তঃকরণে কেবল ডাকিতেছি, মাতঃ পৃথিবী, বিদীর্ণ হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। সে কাতর প্রার্থনা ব্যর্থ হইল না, জগৎমাতার সিংহাসন বিকম্পিত করিয়া তাঁহার করুণা আনয়ন করিল। তখনো আমি সে চৌকিতে সেইরূপ মুহ্যমান ভাবে বসিয়া আছি, চাকর আসিয়া খবর দিল, বাবা আসিয়াছেন। বাবার আসিবার কথা ছিল বটে, তিনি লিখিয়াছেন, আমাকে আসিয়া লইয়া যাইবেন, তবে এত শীঘ্র আসিবেন, তাহা আমরা মনে করি নাই।

দিদির ঘরে প্রবেশ করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম, অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিতে সাহস হইল না, দেখিলাম, অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ক্রোধ-কম্পিত উগ্রস্বরে দিদির সহিত কথা কহিতেছেন ; বুঝিলাম, অবশ্য আমাকে লইয়াই তাঁহাদের বাগ-বিতণ্ডা, কম্পিত কলেবরে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাঁহারা আমার আগমন লক্ষ্য না করিয়াই পূর্ব্বের ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন।

বাবা বলিলেন, "সে শোনাবার মত কথা কি যে বলব ? আমি যে শুনে পাগল হয়ে যাইনি, তা আমারি আশ্চর্য্য মনে হচ্চে। তুমি বলছ, মণির ইচ্ছা ছিল না, তাই বিবাহ ভাঙ্গতে হয়েছে। বাজার-রাষ্ট্র, সে নাকি বলেছে, কন্যার শোভন-শীলতা, নম্রতার অভাব দেখেই তাকে সরে পড়তে হয়েছে ! বেশী আর কি বলব।"

দিদি। মিথ্যা কথা!

বাবা। মিথ্যা কথা, তা কি আমাকে বল্‌তে হবে? মণির মত স্বাভাবিক বিনয়, নম্রতা, লজ্জা কটা মেয়ের আছে?

দিদি। না, তা বল্‌ছিনে। পাত্র কখনই এরূপ বলে নি, মিথ্যা গুজব; এখনো সে বিয়ে করতে রাজি, যদি ওরূপ তার মনের ভাব হবে, তা হ'লে কি—

বাবা। বিয়ে করতে রাজি! অমন পাত্রে আমি মেয়ে দেব!

দিদি। কিন্তু আপনি স্থির একটু ভেবে দেখুন, তাতেই লোকলজ্জা কলঙ্ক সমস্ত দূর হবে।

বাবা। লজ্জা কলঙ্ক যা হবার হয়েছে, তার চেয়ে বেশী আর কি হবে? হ'লেও সবই সহ্য করব, তবু অমন চণ্ডালের হাতে মেয়ে সমর্পণ করব না।

দিদি। কিন্তু আপনি পরের কথা শুনে অন্যায় করছেন। সে কখনই অমন দুর্জ্জন নয়, অমন ক'রে সে বলেনি।

বাবার রাগ তাহাতে উপশমিত হইল না। তিনি তেমনি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন —scoundrel, নিশ্চয়ই বলেছে! মণি যে তাকে বিবাহ করতে নারাজ, সেটা বল্‌তে তার নিজের মানহানি হয়! কিছুতেই আমি তাকে কন্যাদান করব না। মণিকে আজই রাত্রে সঙ্গে নিয়ে যাব। নিজে দেখে শুনে যে পাত্র পছন্দ করব, তাকেই মেয়ে দেব। তোমাদের মত ইংরাজী কোর্টসিপ আর না।"

দিদি অনেক করিয়া তাঁহাকে দুই এক দিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন, বাবা কিছুতেই রাজী হইলেন না, সেই রাত্রেই আমরা ঢাকা-যাত্রা করিলাম, গাড়িতে উঠিয়া আমি যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম, পিতার স্নেহের মধ্যে আপনাকে পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিয়া অনেক দিনের পর অতি অপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু অধিক্ষণ সে সুখভোগ অদৃষ্টে ঘটিল না। কে জানে, সংসারে এ কি দানব-নিয়ম! কাহারও অতিসুখ, তাহাকে এ পর্য্যন্ত সহ্য করিতে দেখিলাম না। ষ্টীমারে বাবা বলিলেন, "ছোটুকে তোমার মনে পড়ে কি?"

"পড়ে বই কি।"

"তাঁর মায়ের ভারী ইচ্ছা, তোমাকে পুত্রবধূ করেন। আমারো অত্যন্ত ইচ্ছা, ইহাকে জামাতা করি, এমন সুপাত্র সচরাচর পাওয়া যায় না; ভগবান যদি বিমুখ না হন, তোমার যদি ভাগ্যবল পুণ্যবল থাকে, তাহ'লে ঢাকায় গিয়ে যত শীঘ্র হয়, এই শুভ বিবাহ সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা আছে।"

যে আশা, যে কল্পনা অনেক দিন ধরিয়া হৃদয়ে নিরবিচ্ছিন্ন সুখকর স্বপ্নরাজ্য নির্ম্মাণ করিত, আজ তাহাই সত্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনায় সহসা বজ্রাঘাতে যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম।

১৭

বাড়ীতে পা দিবামাত্র জ্যেঠাইমার আমার প্রতি স্বাগত সম্ভাষণ—"ওমা, কি হবে গো! মেয়ে যে পেল্লায় বড় হয়ে উঠেছে! আর এখনো আয়বড! লোকে দেখলে বল্‌বে কি! ছিছি ঠাকুরপো, তোমার মুখে অন্নজল রোচে কি ক'রে গা?"

বাবা ব্যস্তসমস্ত পলায়নপর হইয়া বলিলেন—"শীগগিরই হবে—শীগগিরই হবে, সবই এক রকম ঠিক, সে জন্য তোমার কোন ভাবনা নেই।"

সব ভাল করিয়া শুনা গেল কি না গেল, তিনি কোন রকমে কথাগুলো মুখের বাহির করিয়া চলিয়া গেলেন।

জ্যেঠাইমা ইহাতে আরো অসন্তুষ্ট হইয়া আপন মনে গণগণ করিতে লাগিলেন —"না, আমার কোন ভাবনা নেই, তোমারি যত ভাবনা? এই যে পাঁচজন মেয়েছেলে এখনি এখানে আসবে, মণিকে দেখে নানা কথা বলবে, তুমি ত আর শুন্‌তে আসবে না, আমারি লজ্জায় বাক্‌রোধ হবে।"

জ্যেঠাইমার ভয় দেখিলাম, নিতান্ত অকারণ নহে। সত্য সত্যই আমি আসিয়াছি শুনিয়া আমাদের যত কেহ আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবাসী মহিলাগণ পালায় পালায় প্রতিদিন দল বাঁধিয়া আমাকে দেখিতে আসেন; আসিয়া আশ্চর্য্য! প্রতিজনে ঠিক একই রকম ভাষায়, পাখীর শেখা বুলির মত আমার অকাল কৌমার্য্যে, বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া অবশেষে বাবার মূঢ়তার নিন্দাবাদে প্রচুর পরিতৃপ্তি সঙ্গে লইয়া গৃহে ফেরেন। এমন কি, এই সমবেত জল্পনায় জ্যেঠাইমার যথার্থ দুঃখের তীব্রতাও ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল; সারগ্রাহিণী সুন্দরীবর্গের শিক্ষাগুণে মরালের অনুকরণে তিনিও এই অনিবার্য্য দুঃখকর ঘটনার মধ্যে হইতে নিন্দাবাদের সুখটুকু ছাঁকিয়া উপভোগ করতে লাগিলেন। আমারি জীবন কেবল ইহাতে অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। -থাপি ভাবিয়া দেখিলাম, বিবাহের অপেক্ষা,—যাহাকে ভালবাসি না, তাহার পত্নী হওয়া অপেক্ষা এই অশান্তি অসুখও চিরসহনীয় চির-বরণীয়। বিবাহের কথা মনে করিতেই সমস্ত স্নায়ুপ্রণালী এমনি বিপর্য্যস্ত হইয়া ওঠে।

দিন যায়। বাহিরের লোকের তীব্র সমালোচনা, জ্যেঠাইমার বাবাকে ভৎ´সনা, বাবার তাহাকে প্রশান্ত আশ্বাস-প্রদান, এই রকমে প্রতিদিন একই ভাবে কাটে। বিবাহের নূতন কোন কথা বা ছোটুর কোন উল্লেখ আর শুনিতে পাই না, সেই জন্য এই অশান্তি অসুখ স্বত্বেও দিনে দিনে আমি আশ্বস্ত হইতে লাগিলাম, আমার মন হইতে অল্পে অল্পে আশঙ্কার ভাব তিরোহিত হইতে লাগিল; ক্রমশঃ এতদূর স্বচ্ছন্দভাব অনুভব করিতে লাগিলাম যে, আমার মনের নিভৃত চিন্তাগুলি মনোমধ্যে আবার বেশ জমাইয়া গুছাইয়া লইয়া তাহার উপভোগে রত হইলাম। লোকে নিজের দুঃখ ভুলিতে পারিলে পরের দুঃখে সহানুভূতি করিতে অবসর পায়! আমি আত্মস্থ হইয়া জ্যেঠাইমার ও পাড়াপ্রতিবাসীর কঠোর মন্তব্যগুলিকে অন্যভাবে দেখিতে শিখিতেছি; তাঁহাদের তীব্রোক্তিতে তাঁহাদের আজন্মকালের মত বিশ্বাসজাত আকুলতা বুঝিয়া ক্রোধ ও বিরক্তির পরিবর্ত্তে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির ভাবে তাহা সহিয়া লইয়া একটা প্রশান্ত নিরাশার ক্রোড়ে যখন আপনার আশ্রয় প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি, তখন বাবা একদিন আহার কালে বলিলেন,—"ছোটু দু এক দিনের মধ্যেই এখানে আসছেন। তিনি এলেই বিবাহের দিন স্থির হবে।"

জ্যেঠাইমা আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "বর নিজেই আগে আসচে? তুমি যে বলেছিলে, বরের মা আসবে? তা বুঝি এল না! আজকাল এই রকমই হয়েছে, ছেলে নিজে না মেয়ে দেখলে হয় না! দেখুক, কিন্তু আর দেরী না—এ মাসের মধ্যেই বিয়ে দেওয়া চাই।"

বাবা বলিলেন, "আমারো তাই ইচ্ছা।"

১৮

আমাতে আর আমি নাই। মনের মধ্যে প্রলয়ঝটিকা প্রবাহিত। বাবা আহারান্তে বাহিরে গেলেন। আমার আজন্ম-শিক্ষিত ভয়, লজ্জা, সঙ্কোচ এই বিপ্লব-আবেগে তৃণের মত যেন উড়িয়া গেল, আমি উত্তেজিত আলোড়িত মস্তকে গৃহে আসিয়া বাবাকে পত্র লিখিলাম—

"শ্রীচরণেষু

বাবা আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই; ইহা বালিকার খেয়াল মনে করিবেন না। আমি খুব ভাল করিয়া হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিতেছি, বিবাহে

আমার সুখ নাই। ইংলণ্ডে ত এমন অনেকেই অবিবাহিতা থাকেন। থাকিয়া দেশের জন্য কাজ করেন, আমিও দেশের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে চাই। আমি বেশ জানি, তাহাতেই আমার একমাত্র সুখ। বিবাহ দিয়া আমাকে অসুখী করিবেন না।

আপনার স্নেহের

মৃণালিনী।"

বাবা অফিসে যাইবার পূর্ব্বেই চাকরের হাতে চিঠিখানি তাঁহাকে পাঠাইয়া উৎকণ্ঠিত কম্পিত চিত্তে ইহার প্রতিক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছু পরে পদশব্দ হইল, বুঝিলাম, বাবা নিজেই আসিতেছেন—লুপ্ত লজ্জা সহসা ফিরিয়া আসিল, মনে হইল কি করিয়া তাঁহাকে মুখ দেখাইব! তিনি ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি নত মুখে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ বাবা নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "তোমার দেখছি ভারি একটা ভুল সংস্কার জন্মেছে, বিবাহ করলে কি দেশের কাজ করা যায় না! আমাদের দেশের যে রকম অবস্থা, অবিবাহিত স্ত্রীলোকের পক্ষেই বরঞ্চ এসব কাজে বাধা বিঘ্ন অধিক। বিবাহে যে তুমি সুখী হবে, তোমার জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য, সমস্ত উদ্দেশ্য সাধিত হবে, তাতে আমার সন্দেহ মাত্র নেই। স্ত্রীলোকের ঐহিক, পারমার্থিক, সকল প্রকার মঙ্গলের জন্যই বিবাহ শ্রেষ্ঠ, প্রশস্ত পথ। তুমি অনভিজ্ঞ অজ্ঞান বালিকা, তোমার কথায় কাজ ক'রে আমি তোমার অমঙ্গলের কারণ হতে পারিনে। এত দিন যোগ্য পাত্রের অভাবে ইচ্ছা সত্বেও তোমার বিবাহ দিতে পারিনি; এখন ঈশ্বরেচ্ছায় সুপাত্র মিলেছে, তোমারও সৌভাগ্য, আমারো সৌভাগ্য। এই সৌভাগ্য আপনাকে ধন্য মনে করে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করে আনন্দ হৃদয়ে তোমার পতিদেব তাকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত হও।"

বাবা এইরূপ বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন। আমি বুঝিলাম, তাঁহার সঙ্কল্প অটল—আরো বুঝিলাম, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে আমার ক্ষমতা নাই; আমি মর্ম্মে মর্ম্মে দুর্ব্বল বঙ্গনারী, আজ্ঞাবর্ত্তী দুহিতা। জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি—কিন্তু ইহার পরে বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আত্ম-জলাঞ্জলি ভিন্ন আমার উপায়ান্তর নাই।

১৯

দৃষ্টির সম্মুখে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত অথচ কিছুই চোখে পড়িতেছে না, মস্তিষ্ক চিন্তাতরঙ্গে আলোড়িত, অথচ কি ভাবিতেছি, কিছুই জানি না। মন স্থানহিসাবেও অতি দূরে, সময় হিসাবেও অতি দূরে, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব করিতেছি কি, না করিতেছি। মাঝে মাঝে কেবল সচেতন বেদনার অনুভূতি, দেহবন্ধন হইতে পলায়নের জন্য একটা নিস্ফল ব্যাকুলতা, অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখিবার জন্য নিদারুণ প্রয়াস, একহস্তে দৃঢ় লৌহশৃঙ্খল ভাঙ্গিবার জন্য বৃথা চেষ্টায় প্রাণান্ত পরিশ্রান্তি, অক্ষম কষ্ট ও অসহায় ক্রোধ! ছোট্ট, যাহাকে এত ভালবাসিয়াছি, এত বন্ধু মনে করিয়াছি—সেই আমার কষ্টের কারণ! সহসা ভাবিতে প্রাণের মধ্যে দৈববাণী শুনিলাম,—"তাহা কিছুতেই হইতে পারে না, চিরদিন সে তোমার বন্ধু ছিল—চিরদিন বন্ধু থাকিবে, এই বিপদে সেই তোমাকে উদ্ধার করিবে।—" অন্ধকার সমুদ্রে মুহূর্ত্তে যেন দিশা উন্মুক্ত হইয়া গেল ; তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিতে সঙ্কল্প করিলাম। বুঝিলাম, তাহাতেই আমার একমাত্র আশাভরসা। পুরাকালের স্বর্ণপ্রস্তুত উপায়চিন্তানিমগ্ন রসায়নবিদের মত এই আবিষ্কারের আনন্দ আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের পক্ষে অপরিমিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল—কিন্তু কাহাকে ইহার ভাগ দিব ? এখানে আমার সাথী কে ?

একটু পরে একজন চাকর আমার হাতে একখানি কার্ড আনিয়া দিল। কি আশ্চর্য্য! ডাক্তার যে! আনন্দে নহে, বিস্ময়ে আমার হৃৎকম্পন স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। আমি কলের পুতুলের মত চাকরকে বলিলাম—"আসিতে বল।"

সে চলিয়া গেলে তখন মনে হইল, আমার কি এখন তাহার সহিত দেখা করা উচিত! কিন্তু উচিত অনুচিত ভাবিয়া আদেশ-পরিবর্ত্তনের তখন আর অবসর ছিল না। প্রায় তখনি ডাক্তার আসিয়া পড়িলেন। এইখানে বলা আবশ্যক, আমি এতক্ষণ ড্রয়িং-রুমেই ছিলাম। অন্তঃপুরের গোলমাল ছাড়াইয়া দুপুরবেলা প্রায়ই আমি এই বিজন গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করি। বাবা না থাকিলে এখানে বাহিরের লোক কেহই প্রায় আসেন না, কদাচ কেহ আসিলেও আমি আগে খবর পাই।

ডাক্তার আসিয়া প্রথম অভিবাদনের পর বলিলেন,—"আপনাকে ভারি রোগা দেখাচ্ছে—আপনার কি এখনো অসুখ যাচ্ছে ?"

অসাধারণ সহানুভূতির কথা নহে, যে কোন আলাপী আমাকে এখন দেখিতেন —সম্ভবতঃ ইহাই বলিতেন ; তবে একথায় আমি এতদূর বিচলিত হইলাম কেন ?

বহুকষ্টে অশ্রু সংযত করিয়া তাড়াতাড়ি বলিলাম, "আপনি এখানে যে ? কোথা থেকে আসছেন ?"

তিনি বিস্মিতভাবে বলিলেন, "আমি এখানে আসব, তা আপনি জানতেন না ? মিষ্টার মজুমদারকে ত (আমার বাবা) আগেই লিখেছি।"

হাসি পাইল, বাবা যেন সব কথা আমাকে বলিতে যাইবেন ! বলিলাম, কই না, আমি তা শুনি নি। কোনও কেসে এসেছেন বুঝি ?"

তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"না, আপনাদের সঙ্গে দেখা করা ছাড়া আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।"

আশ্চর্য্য হইলাম। আমাদের সহিত দেখা করিতে এতদূর আসিয়াছেন ! বিস্ময়ের আবেগে সহসা বলিয়া ফেলিলাম,—"আশ্চর্য্য বই কি ? কলকাতা থাকতে কবার দেখা করতে এসেছেন, তা এতদূরে—"

তিনি একটু হাসিলেন. হাসিয়া চশমার মধ্য হইতে আমাদিগকে পূর্ণ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"আমার বিশ্বাস ছিল, অনেক কথা খুলে না বলাতেই আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবনের অনেক ভুলের মত দেখছি, এ-ও আমার আর একটা ভুল ! আমি যে কেন আসতুম না, তা কি বোঝেন নি আপনি ?"

"কি ক'রে বুঝব ?"

তিনি আইগ্লাসটা একবার খুলিয়া আবার ভাল করিয়া চোখে আঁটিয়া উন্নত মধুর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বেশী আসতে ইচ্ছা করত বলেই আসি নি।"

"তা হ'লে কি মনে করব, এখন ইচ্ছা নেই বলেই—"

"তা হ'লে তবে একটা ভুল করবেন," তাহার পর একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "একটু যে অবস্থান্তর ঘটেছে, তা অস্বীকার করতে পারিনে। তখন শুনেছিলুম আপনি engaged। এখন সে সঙ্কোচ ঘুচেছে—তাই—তাই।"

ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিলাম। একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সমস্ত দেহে পরিব্যাপ্ত হইল। তাই—তাই—কি ? তিনি একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "তাই আমার জীবন প্রাণসর্ব্বস্ব আপনাকে সমর্পণ করতে এসেছি—এখন আপনি যা করেন।"

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আমার চারিদিকে ঘুরিয়া উঠিল, একটা মধুরতার আবর্ত্তে আমি আবর্ত্তিত হইতে লাগিলাম।—কি করিয়া বলিব, তাহা কি মধুর ! পুরুষের নিকট হইতে—যে পুরুষকে ভালবাসি, তাহার নিকট হইতে প্রথম শোনা সে আমারি ! "পৃথিবীতে যদি স্বর্গ থাকে, তবে ইহাই তাই !" কিন্তু পৃথিবী

সত্যই স্বর্গ নহে, সেইজন্য এত অমিশ্র অসীম সুখ জীবনে কাহারো অধিকক্ষণ থাকে না। মুহূর্ত্ত না যাইতে সুখের অসীমতা দুঃখ আসিয়া সীমাবদ্ধ করে। কিছু পরেই প্রকৃতিস্থ হইলাম, স্বপ্ন ভাঙ্গিল অনতিক্রমণীয় বাধা-বিঘ্ন আবার চক্ষের উপর স্তূপাকৃতি দেখিলাম। বুঝিলাম, এত মধুর আলোক শুধু অন্ধকারের পূর্ব্বসূচনা, তাঁহার আত্মসমর্পণ শুধু চিরবিদায় গ্রহণ করিতে; এ মিলন শুধু চিরবিচ্ছেদ, চিরব্যবধানের জন্য।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি—তুমি—আমার কেমন সমস্ত ভুল হয়ে যাচ্ছে, মাপ করবেন, বিলাত থেকে এসে যেদিন আপনাকে দেখেছি, সেদিন থেকে বুঝেছি, আপনি ছাড়া আমার জীবন নিষ্ফল; সেই থেকে বহুদিনের"—

হঠাৎ বলিলেন—"কিন্তু আপনি না engaged ?"

"আমি engaged ! এ খবর কোথায় পেলেন ?"

"আপনার মা নাকি বলেছিলেন।"

তিনি হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মায়ের কথা যে মেয়েটিকে তাঁর পছন্দ হয়—অবশ্য সেজন্য মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-সরস্বতীর যে আবশ্যক, তা বলতে পারছিনে—তাকে তিনি বৌ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এখন বহুবিবাহ প্রচলিত না থাকায় তাঁর বোধ হয় বিশেষ কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে যাক, আমার কথার কি কোন উত্তর নেই ?"

কি উত্তর দিব ? আমি কি সমস্ত প্রাণে তাঁহারি নহি; তবে কোন্ প্রাণে বলিব, আমি অন্যের হইতে চলিয়াছি। তবুও বলিলাম, কি করিয়া বলিলাম, ঠিক জানি না,—

"আমি engaged ; বাবা অন্যের সঙ্গে বিয়ে স্থির করেছেন।"

একটা শোক-নিস্তব্ধতার আনন্দোচ্ছ্বাস নিমিষে ডুবিয়া গেল। কিছু পরে তিনি বলিলেন, যেন আপনার বিক্ষিপ্ত চিন্তারাশির সহিত একত্রীভূত করিতে করিতে আপন মনেই বলিলেন—"কিন্তু মিষ্টার মজুমদার এরূপ ব্যবহার করবেন, আমাকে,—থাক সে কথা তাঁর সঙ্গে। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনারো কি তাই ইচ্ছা ?"

তখন আমার লজ্জা, সঙ্কোচ জ্ঞান ছিল না। আমি পুরুষের মত সুস্পষ্টভাবে বলিলাম—"না, অন্য কাউকে ভালবাসতে আমার শক্তি নেই ?"

একটা বৈদ্যুতিক-স্ফুরণ তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিলাম, ইহা কি আনন্দের ? কিছু

পরে তিনি বলিলেন, "সে কথা কি আপনার বাবাকে বলেছিলেন ?"

আমি বিস্ময়ে বলিলাম, "সে কথা বাবাকে কি বলব ? এইটুকু বলেছিলুম, আমার বিবাহে ইচ্ছা নেই, তাতে আমি সুখী হব না।"

"তিনি কি বল্লেন ?"

"বল্লেন, আমাকে বিবাহ করতেই হবে।—বুঝলুম, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে আমি অক্ষম, তাঁকে সুখী করাই আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।"

"কিন্তু ভালবাসার কি একটু সামান্য কর্ত্তব্যও নেই ! তুমি—আপনি যাকে ভালবাসেন, যে আপনাকে ভালবাসে, আপনা ব্যতীত যার জীবন-মরণ সমানই—তার প্রতি—কেবল তার প্রতি না—নিজের প্রতিও এতে যে গুরুতর অন্যায় করা হচ্ছে, তার প্রতিকারের চেষ্টাও কি কন্যাধর্ম্মের বিরোধী ? আমার বিশ্বাস, মজুমদার মহাশয় সমস্ত জানলে কখনই আপনাকে অন্যের সহিত বিবাহে বাধ্য করবেন না।"

চুপ করিয়া রহিলাম। যাহা বলিতেছেন, সবই ত ঠিক। নীরব দেখিয়া তিনি অধীরভাবে বলিলেন, "আপনার সঙ্কোচ হয়, আচ্ছা, আমি বলব, আমাকে অনুমতি দিন।"

আমি বলিলাম—"না না, আপনার বলতে হবে না; আমি বলব। কিন্তু বাবাকে না, তাঁকে ব'লে কোন ফল নেই, তিনি তাহার ভাব বুঝবেন না, নিশ্চয়ই sentimental দুর্ব্বলতা ব'লে মনে করবেন। আমি তাকে বলব; যার সঙ্গে বিয়ে হবার কথা, তাকে—ছোটুকেই বলব।—তার উদারতার প্রতি আমার খুব বিশ্বাস আছে। আমি বেশ জানি, তার থেকেই আমি মুক্তি পাব। যদিও আমি তাকে কখনও হৃদয় দিতে পারব না; কিন্তু আমি ছেলেবেলা থেকে তাকে ভালবাসি, বন্ধু মনে করি, তার স্মৃতি চিরদিন আমার মনে সুখ জাগায়। সে যে আমার কষ্টের কারণ হবে, আমি কিছুতেই মনে করতে পারিনে।"

"ছোটু ! ছোটুর সঙ্গেই বিবাহের কথা ? নিশ্চয়ই তার যদি একটুও মনুষ্যত্ব থাকে, অবশ্যই সে সহায় হবে।"

অতিরিক্ত আশানন্দে তিনি নিতান্ত যেন অপ্রকৃতিস্থ হইয়া এইরূপ বলিলেন। আমি বলিলাম—"তাকে চেনেন কি ?"

তিনি সে কথায় উত্তর করিলেন না; বোধ হইল যেন, তাহা শুনিতে পাইলেন না; নিজের ভাবে ভোর হইয়াই বলিলেন—"কেমন যেন সমস্ত মায়ার খেলা মনে হচ্ছে ! আপনি তা হ'লে তাকে বলবেন। আমি এখন যাই। তার সঙ্গে কথা

কয়ে কি ফল হয়, যেন শুনতে পাই। হয় ত নিজেই আসব; যদি আবার কালই আসি, কিছু মনে করবেন না; আপনার বাবার সঙ্গে এখনও দেখা হয় নি।"

বলিয়া কেমন যেন অতি সহসা তিনি চলিয়া গেলেন, আমাকে একটি কথা কহিবার পর্য্যন্ত আর সময় দিলেন না।

২০

মহা আনন্দ! বাবা সম্মত! কিন্তু ডাক্তার আর সে পর্য্যন্ত আসেন নাই, তাঁহাকে এ সুখবরটা কিরূপে জানাই? চন্দ্রময়ী নিশা! আমি উদ্যানে বসিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে রাস্তার দিকে চাহিয়া আছি—মনে হইল যেন তিনি যাইতেছেন। উঠিয়া দ্রুতগতিতে রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। কিন্তু তিনি তখন এতটা দূরে চলিয়া গিয়াছেন যে, আমাকে দেখিতে পাইলেন না; আমি আবার অনুসরণ করিলাম। কিন্তু বৃথা, সেই সুদীর্ঘ রাস্তার মোড়ে তিনি অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। কাতর চিত্তে পথিপার্শ্বের একটি সুপ্রশস্ত ভূমিতে উঠিলাম—সেখান হইতে দেখিব, তিনি কোথায় গেলেন। কিন্তু তখনি একজন বালিকা সাজি হাতে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এ কি প্রভা যে! আমরা ছেলেবেলা কৃষ্ণমোহন বাবুর পাঠশালায় একত্র পড়িয়াছি। সে বলিল,—"তুমি কোথা থেকে? আমি আজ সবে এখানে এসেছি, ফুল তুলে তোমাকে দিতে যাচ্ছিলুম।"

আমি বলিলাম,—"এইরূপ ভাই বিপদ—তাঁকে খবর দিতে যাব, তা পারছিনে।"

সে বলিল—"এস আমাদের বাড়ী।" এমন সময় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া হাজির। প্রভা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জানিস, ডাক্তার কোথায়?"

সে বলিল,—"জানি বই কি। মণি, তুমি আমার এই ঘোড়ায় চড়; আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই।"

ঘোড়ায় চড়িলাম—ঘোড়াটা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একটা পাহাড়ের উচ্চভূমিতে উঠিল, প্রভা ও তাহার ভাই কোথায় পড়িয়া রহিল, তাহার ঠিক নাই। ট্রট, গেলাপ, ক্যান্টার, তাহার পর চারিপায়ে উল্লম্ফন করিয়া পক্ষিরাজের মত উড়িয়া চলিতে লাগিল। আমি প্রাণপণে রাশ ধরিয়া রহিলাম। প্রতিমুহূর্ত্তে মনে হইতে লাগিল, বুঝি পড়ি পড়ি। রাস্তা দিয়া একটা উট চলিয়া যাইতেছিল, বিপদ

দেখিয়া উষ্ট্রবাহক তাহার পিঠ হইতে লাফাইয়া পড়িল—ঘোড়াটাও হঠাৎ থামিল —আমি সেই অবকাশে নামিয়া পড়িলাম। কিন্তু এখানেই বিপদের শেষ নহে। রাত্রিকাল, অপরিচিত বিজন ভূমি, এখানে আমি নিতান্ত একাকী, এখন কি করিয়া গৃহে ফিরি ? হাঁটিয়া রাস্তায় উঠিলাম,—রাস্তাটা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে একটি চোরাগলির মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। চারিদিকে উচ্চভূমি ; মধ্যে একটিমাত্র ছোট্ট গলি, গলির মোড়ে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীরে ঢুকিলাম,—কোমল-মুখশ্রী এক বৃদ্ধা আমাকে দেখিয়া বলিলেন, —"এস মা এস ; যাবে কোথায় ? বস।"

আমি বলিলাম—"আমি পথহারা !"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"বস মা, একটু কফি খাও। সামনে বাগান দেখছ, আমি নিজে হাতে কফিগাছ পুঁতেছি।"

ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল, দীপের কাছে বাটীর উপর নানারকম দ্রব্যসামগ্রী ফেলাছড়া। আমি বলিলাম, "এখানে এ সব জিনিসপত্র প'ড়ে কেন ?"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"সে আস্‌বে ব'লে চ'লে গেছে, এখনো আসে নি—এখনি আসবে।"

আমি বলিলাম, "কে গো ?"

বুড়ী বলিলেন "আমার সোনার চাঁদ বৌ গো।"

বুঝিলাম—তিনি পাগল। তাঁহার বৌ মরিয়াছে ; বধূর অলঙ্কার তৈজসাদি লইয়া তাহার প্রত্যাগমন অপেক্ষায় তিনি বসিয়া আছেন। আমার চোখ দিয়া জল পড়িল। বুড়ী বলিলেন, "মা তুমি কে গো ? আমার বৌ কি ঘরে ফিরে এলে ? ও ছোটু আয় রে ! আহা, সেই যে বাছা আমার মনের দুঃখে বিবাগী হয়ে গেছে—এখনো ঘরে ফেরে নি !" আমার বুক ফাটিয়া কান্না আসিল,— অশ্রুজলে আমি জাগিয়া উঠিলাম।

উঠিয়া ঘড়ি দেখিলাম,—ডাক্তার যাইবার পর আধ ঘণ্টাও অতিবাহিত হয় নাই।—আর আমি পাঁচ মিনিটও ঘুমাইয়াছি কি না সন্দেহ।—মনের মধ্যে কেমনতর একটা নিরাশার গুরুভার লইয়া জানালায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। ছোটুকে ত সব বলিব ভাবিতেছি—বলিলে পরিত্রাণ পাইব এমনো মনে করিতেছি, কিন্তু যদি আমার ভুল হয় ? আমি তাহাকে যেমন ভাল লোক মনে করিতেছি, সে তেমন নাও হইতে পারে। বাস্তবিক আমি তাহাকে কি চিনি।—আর যদি

এমনতরই হয়, ছোটু আমাকে এখনো ভালবাসে? সেইজন্যই আমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে? তাহা হইলে আবার একজনের কিরূপ কষ্টের কারণ হইব! অতিশয় ব্যাকুল অশান্তহৃদয়ে আকাশের দিকে চাহিলাম,—ঈশ্বরের অনুগ্রহলোলুপ হইয়া কাতরচিত্তে অনন্ত নিরীক্ষণ করিলাম।—আকাশে সান্ধ্য মেঘে বর্ণের তরঙ্গবিন্যাস। শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল, লাল, পীত ও হরিৎ নানা আভায় একত্রে স্তরে-স্তরে পুঞ্জীকৃত। সাদায় কালোর ছায়া, লালে নীলের বেষ্টন, ধূসরে গোলাপীর সংমিশ্রণ। দেখিয়া মনে হইল, এই ত সংসারের নিয়ম! দুঃখ ছাড়া কোথায় সুখ; অশ্রুহীন হাসি কোথায়? আমার প্রাণান্ত আকাঙ্ক্ষাতে সাধনাতেই কি তবে ইহার অন্যথা হইবে? আমি কে? সৃষ্টির একটি অণুকণা; বিধাতা আমার জন্য কি তাঁহার নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবেন?

ভাবিতে ভাবিতে কখন্ যে পিয়ানোর কাছে আসিয়া বসিলাম, জানিতেও পারিলাম না। আনমনে বাজাইতে লাগিলাম—

হায় মিলন হোলো!
যখন নিভিল চাঁদ বসন্ত গেলো!
হাতে ক'রে মালাগাছি, সারা বেলা ব'সে আছি,
কখন্ ফুটিবে ফুল—আকাশে আলো।
আসিবে সে বর-বেশে, মালা পরাইব হেসে,
বাজিবে সাহানা তানে বাঁশী রসালো!
সেই মিলন হোলো!
আসিল সাধের নিশা, তবু পূরিল না তৃষা,
কেমন কি ঘুমে আঁখি ভরিয়ে এল!

আর জানিতাম না, এই ক'টি লাইনই বারবার বাজাইতেছি, সহসা পশ্চাৎ হইতে ইহার অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিয়া কে গাহিল—

শুভক্ষণে ফুলহার, পরান হোল না আর
হাতের সুগন্ধি মালা হাতে শুকাল;
নিশিশেষে আঁখি মেলে, বাসি মালা দিনু গলে,
মরমে বেদনা নিয়ে নয়নে জল।
হায় মিলন হোলো!

গীতবাদ্যের সুরকম্পনের সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে কি এক অপূর্ব্ব কম্পন উঠিল। কে গাহিতেছেন, তাঁহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত না করিয়াই আমি

মুগ্ধ আবেশ-বিভোর হইয়া গানের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত বাজাইয়া চলিলাম। তিনি যখন থামিলেন, যখন ফিরিয়া তাঁহাকে দেখিলাম, তখন বর্ত্তমান অতীতে, যৌবন বাল্যে বিলুপ্ত। আমি বিস্ময়ে বিভ্রমে বলিতে যাইতেছি, "তুমি ছোটু—তুমি ছোটু ?" কিন্তু বলা হইল না, প্রাণের কথা ওষ্ঠাধরে আসিয়া মিলাইয়া গেল। তখনি বাহিরে পদশব্দ শুনিলাম, আত্মস্থ হইয়া বুঝিলাম, বাবা আসিতেছেন, সভয়ে সঙ্কোচে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাবা আসিয়া বলিলেন,—"এই যে বিনয়কুমার! মণি, তুমি এঁকে চিনেছ কি ? ইনিই ছোটু!"

এখনো কি স্বপ্ন দেখিতেছি ? নিশ্চয়ই!!!

উপসংহার

তেমনি উজ্জ্বল-মধুর সন্ধ্যায় তেমনি মেঘের স্তর, তেমনি বর্ণবিন্যাস, ছায়া আলোর তেমনি লীলাখেলা, কেবল মনের ভাব আজ অন্য রকম।

আজ আমি দিশাহারা, একাকী নৈরাশ্যপূর্ণ ব্যথিতচিত্তে অকূল আকাশ-সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছি, 'না—সুখ কোথায়? সুখ কেবল দুঃখের অন্ধকারে, হাসি কেবল অশ্রুর তাপে, ফুটিতে না ফুটিতে টুটিয়া ঝরিয়া যায়।' আজ কাননতলে দু'জনের প্রেম মগ্ন দু'জনে, আকাশের বর্ণমিলন-সৌন্দর্য্যে হৃদয়ে অন্য ভাবের সুর বিকম্পিত! আজ মেঘে মেঘে লাল-কালোর মিলন দেখিয়া আমি ভাবিতেছি, 'অশ্রু আছে বলিয়া হাসির এত মাহাত্ম্য, দুঃখ আছে বলিয়াই সুখ এত মধুর!' তিনিও কি ঠিক এইরূপই ভাবিতেছিলেন! আমার নীরব চিন্তা ভঙ্গ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন,— Happiness is not happy enough but must be drugged by the relish of pain and fear.

অতি সুখে দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একটি অনুতাপব্যথা জাগিয়া উঠিল, আমি এত সুখী, আর মিষ্টার ঘোষ? যদি সত্যই তিনি আমাকে ভালবাসিয়া থাকেন—তাঁহার প্রতি কতদূর অন্যায় করিয়াছি? আমার ভাবনা কি ইঁহারো মস্তিষ্ক স্পর্শ করিল! হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"ওঃ, একটা খবর আছে!—কুসুমের সঙ্গে রমানাথের বিবাহ! What a humbug—beg your pardon, I mean what an examplary lover!'

আর বেশী কিছু না বলিতে দিয়াই আমি বলিলাম—"সত্যি নাকি? কবে?"

"আমাদের বিবাহের এক সপ্তাহ আগে।"

গাছের আড়াল হইতে নবোদিত চন্দ্রের জ্যোতি ইঁহার মুখে প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিল। আমি মুগ্ধ নেত্রে সেই রূপের জ্যোতি পান করিতে লাগিলাম।

দুই কলায় মাত্র অসম্পূর্ণ ত্রয়োদশীর নির্ম্মল চন্দ্র নীলাম্বরতলে ভাসিয়া উঠিয়াছে, শেফালিকা-রাশি আমাদের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিয়া সুগন্ধে জ্যোৎস্নালোক বিকম্পিত করিতে করিতে, কাননতলে তারার মত ঝরিয়া পড়িতেছে। শরতের জ্যোৎস্না ঈষৎ ম্লানাভ, তাহার ছায়া, ছায়া-আলোক আমাদের অতি সুখে ম্রিয়মাণ হৃদয়ের মত বিষাদ স্নিগ্ধ, অতি কোমল-মধুর!

থাকিয়া থাকিয়া আমি বলিলাম—"আচ্ছা, আপনি আপনি—কি ক'রে—"

"আবার আপনি ? তবে আমি শুন্‌ব না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা তুমি,—কি ক'রে তুমি আমাকে এতটা দুঃখ দিলে ? যখনি আমার কথা থেকে বুঝলে, তোমার সঙ্গেই বাবা সম্বন্ধ করেছেন, তখন সেটা—"

"বুঝলুম বটে কিন্তু কি ক'রে জানব, যা বুঝছি, তাই ঠিক, ভুলও ত হতে পারে ?"

"তাই আমাকে অমন কষ্টের মধ্যে ফেলে রেখে গেলে—বেশ যা হ'ক।"

"বুঝছ না. আমি ভাবলুম, কেবল তোমার বাবার সঙ্গে একটিবার কথা কয়ে তখনি আসব, তার পর বিনয়কুমার ছোট্ট হয়ে দাঁড়াবে—"

"ভারী একটা কৌতুক-নাটক অভিনয় হবে। সে লোভটা কি আর সামলান যায় ! তা আমার কেন ইতিমধ্যে যতই কষ্ট হ'ক না ! এমনি তোমার ভালবাসা।"

"তা বইকি ! আর তোমার এমনি ভালবাসা, আমাকে দেখে চিন্‌তেই পার নি। আমি তোমাকে প্রথম দিন দেখেই চিনেছিলুম !"

"সেটা কি না খুবই আশ্চর্যের কথা। যখনি বাড়ী এসেছ, তখনি ত পরিচয় জেনেছ। জেনে শুনে আর চিন্‌তে পারবে না ! বরঞ্চ এ অবস্থাতে তুমি যে বরাবর আপনাকে ঢেকে রেখেছিলে—একবার পুরান গল্প করতে ইচ্ছা হয়নি—এইটেই পরমাশ্চার্য্য ! তোমার ভালবাসা এখানেই বোঝা যাচ্ছে।"

"ঠাকরুণ যে engaged ছিলেন ! সেটা ভোলেন কেন ? তার পর যখন দেখলুম, মহাশয় বাল্যবন্ধুকে চিন্‌তেই পারলেন না, তখন ভাবলুম, মানে মানে চুপ ক'রে যাওয়াই ভাল, কি জানি, যদি পুরান পরিচয়ে বন্ধুত্বের দাবীটাই অসহ্য হয়ে ওঠে ! তুমি ত আর পুরান আমাকে ভালবাসনি, তুমি ভালবেসেছ একজন নূতন লোককে !"

"তুমিও ত আর আমাকে ভালবাস নি। তোমার প্রেম পুরাতনের উপর, তুমি ভালবেসেছ তোমার বাল্যসখীকে।

আগে মনে করিতাম, প্রেম বুঝি মতামত, স্বতন্ত্র ভাবে একাকার হইয়া যায়। এখন দেখিতেছি, ছায়ালোকের মত, আকর্ষণ-বিকর্ষণের মত প্রেমে দ্বন্দ্ব কলহ মানাভিমান অবিচ্ছেদ্য। তাহাতেই ইহা চিরনবীন—চিরজীবন্ত।

অন্ততঃ আমাদের জীবনে, প্রেমালাপ অনবরত এইরূপ দ্বন্দ্বময়। আমি বলি, 'তুমি আমাকে ভালবাস নাই, ভালবাসিয়াছ তোমার বাল্যসখীকে!'

তিনি বলেন, 'তুমি আমাকে ভালবাস নাই, ভালবাসিয়াছ নূতন লোক ডাক্তারকে!'

এখন পাঠক মীমাংসা করুন—ঠিক কি? পুরাতনের ছায়া দেখিয়াই হৃদয় নূতনে আকৃষ্ট হইয়াছে, অথবা নূতনে মুগ্ধ হইয়া সহসা পুরাতন লাভ করিয়াছি? কাহাকে ভালবাসিতে এ কাহাকে ভালবাসিয়াছি?

পাকচক্র

প্রহসন

স্নেহাস্পদ

শ্রীযুত অসিতকুমার হালদারকে

বিবাহযৌতুক

হাসিতে রচি দিলাম গছি—
এই, কৌতুক নব ধাঁধা
তোরে—যৌতুক উপহার।
তুমি, যতনে যত খুলিবে তত
পড়িবে পাকে বাঁধা,—
প্রাণে ছুটিবে—হর্ষধার।—

পাকচক্র

প্রথম—দৃশ্য

বরদা বসিয়া পান করিতেছেন।

(বিনোদের প্রবেশ)

বি। বরু পিসি, তুমি একটা উপায় না করলে কিছুতেই চল্‌ছে না—আমি কি চিরদিন ধ'রে এই শরশয্যায় শুয়ে থাক্‌ব নাকি? আমাকে কি ভীষ্ম পেয়েছ?

বরু। আমার কি অসাধ বাবা! তোর মা যে কিছুতেই বোঝে না, কি করি বল না! একটা কাজ যদি করতে পারিস্।

বি। একটা কাজ! লক্ষ কাজ করতে রাজি আছি,—কি বল দেখি?

বরু। ঐ শশী আসছে, এখন থাক, পরে বল্‌ব।

বি। আঃ, পারা যায় না! কেবল শশী আর চাঁদ, চাঁদ আর শশী, তবু সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে বাড়ীটা বেদম অন্ধকার! আচ্ছা, আমি বাইরের ঘরে বস্‌ছি, তুমি কাজ সেরে এস, আমরা দরজা বন্ধ ক'রে পরামর্শ করব—কাউকে—কাউকে ঢুক্‌তে দেব না—কি বল?

(বিনোদের প্রস্থান—শশিমুখীর প্রবেশ ও
পান করিতে উপবেশন)

শ। দাদাবাবু, কি বল্‌ছিলেন? মা গো, অত ক'রে সুপুরি দিয়েছ পিসি!

বরু। শোন কথার শ্রী! সুপুরি দেব না, তবে ঘাস খাব না কি! তুই সুপুরি খেতে পারিস্‌নে ব'লে কি কেউ খাবে না?

শ। তা দাও না—কিন্তু মাসকাবারের আগে সুপুরি ফুর'লে আমার কিন্তু

দায়-দোষ নেই, আমি ব'লে খালাস। তা দাদাবাবু, কি বলছিলেন ?

বরু। হাঁ, তোমারই কি না সব-তাতেই দায়-দোষ পোয়াতে হয়! দাদাবাবু আর কি বলবে, এই হরিবাবু ভদ্রলোক—মেয়ে নিয়ে সাধাসাধি করছে, এমন সুন্দর মেয়ে, ছেলেরও অত মন, তা বৌদিদির যে কেন মন উঠছে না, এইটেই আশ্চর্য্য! ও মা, দারচিনি এলাচ যে সব ফুরিয়ে ফেল্লি!

শ। মা গো! দারচিনি এলাচ না হ'লে কি পান খাওয়া যায়! তা তারা বাবু—আর একটু উঠুক্ না, মা ত হককথাই বলেন, আজকালকার দিনে ছেলে কি দু পাঁচ হাজারে মেলে। আর অমন পাশ করা ছেলে!

বরু। আমাদের পানে একখানার বেশী দুখানা সুপুরি খরচ করবার যো নেই, আর তোমার দালচিনি এলাচ নইলে পান রোচে না—ধন্যি সোহাগিনী যা হ'ক! দেখো, শেষে গিন্নী যেন আমাকে না ফাঁসান!

শ। না, গো না—সে ভয় নেই, বকুনি খেতে হয়, আমিই খাব। তা তারা আর একটু বাড়ুক না।

বরু। সে কথায় আর কাজ নেই, আমরা খাব বকুনি আর তুমি খাবে মেঠাই মণ্ডা! কেন বাড়বে! অমন সুন্দরী শতকে একটা মেলা দায়!

শ। (পান ধুইবার জলপাত্রের দিকে চাহিয়া ভ্রূভঙ্গিসহকারে) দাদাবাবুর যে কি নজর! সুন্দর অমন ঢের ঢের আছে।

(ঘটকীর গান করিতে করিতে প্রবেশ)

কে তোরা জামাই নিবি, ওগো কনের মা-রা—
এনেছি নতুন বর গুণে সেরা, ওগো গুণে সেরা!

বরু। (পান সাজা বন্ধ রাখিয়া) এই যে ঘটক ঠাকরুণ, এস এস—বরের গুণগুলো ভাল ক'রে বল—শোনা যাক। আমাদের ঘরে যদিও মেয়ে নেই।

ঘ। তবে আর এ গান শুনে কি হবে? বানরাণাং কণ্ঠে গজমতিবৎ তরলং দাঁড়াবে বই ত নয়।

বরু। তা আমরা বাঁদরই বটে—মুখ্যু সুখ্যু লোক।

শ। না গো, বাঁদর কেন হ'তে গেলুম—তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি হও। জলে (জলে মুখদর্শন)

বরু। হ্যাঁ, তুই কাষ্ট মাষ্ট কি পড়েছিস্ বটে।

ঘ। আজ্ঞা, তা নয়, তা নয়—ও কেবল উপমা-উপমেয়ঞ্চ।

বরু। ঘটকঠাকরুণ, থেমে যাও। শশী আবার মুখ্যু বল্লে রাগ করে। তুমি বরের গুণ গান কর, আমরা শুনি।

ঘ। কিন্তু রসমঞ্জন ন্যায়টা না জানা থাকলে গানটার রস ভাল বোধ হয় না, বুঝলেন ?

বরু। তা রাসকীর্ত্তন, মানভঞ্জন এ সব পালা জানা আছে বই কি, তুমি গাও।

ঘ। (হাসিয়া) হা হা—রসভঞ্জন ন্যায় আর রাসকীর্ত্তন এক নয়; তবে বল্‌ছেন, গাই।

গান

কে তোরা জামাই নিবি, ওগো কনের মা-রা,
এনেছি নতুন বর গুণে সেরা, ওগো গুণে সেরা।
এ নয় সাধারণ ছেলে,
পাশের রাশ সে বইতে নারাজ,
তাই ফেল বি এ, এল এ ;
গুণের কব কি সীমা, এর নাই জমীজমা,
এ যে স্বনামধন্য পুরুষ গণ্য বিলাত ফেরা।
ওগো কনের মা-রা
কে তোদের মেয়ে এমন কপাল-জোরা !
লাগ্‌বে না টাকাকড়ি সোনা ভরি ওজন করা ;
শুধু উনিশ কি বিশ, যৌতুকটি দিস্
কাগজ ভরা, ওগো কাগজ ভরা,
অমনি পরবে টোপর, আপনি সে বর দেবে ধরা।

ব। ঐ গো গিন্নী আস্‌ছেন।

(সকলের পানের দিকে মনোনিবেশ)

(গৃহিণীর প্রবেশ)

ঘ। ইনিই গিন্নী ?

গৃ। আর গিন্নী ! নামে গো নামে, এ সংসারে খাট্‌তেই আমি গিন্নী, কথার বেলা একটা কিন্তু থাকে না !

ঘ। তাই ত ! অপরস্বা কিং শোচনীয়া—অর্থাৎ এর চেয়ে দুঃখ কি আছে ?

গৃ। ঐ যা বল্লে! এর চেয়ে কেউ দুঃখ সয়নি—সবে না! এই দেখ না, আমার ছেলে,—দুধের ছেলে, এখনও গাল টিপলে দুধ পড়ে—এই বয়সেই দু দুটো পাশ—এমন কেউ কখনও দেখেনি গো শোনেনি। তা—বলে কি না, দু-পাঁচ হাজার দিয়ে নমো ক'রে সারবে। এখানে কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম হ'তে দিচ্ছিনে, দশটি হাজারের একটি পয়সা কম নেব না!

ঘ। তা অন্যায় কথা নয়—অন্যায় কথা নয়, ও কথা বল্‌তে পারেন—মহাজনস্তু যঃ পন্থা স গতা।

ব। ঘটকঠাকরুণ কি পণ্ডিত গা! সেই অবধি কত ছড়াই বল্‌ছেন।

ঘ। হা হা ছড়া! একটু অশ্লীল দোষ ঘটলো যে! শ্লোক—বুঝলেন, ছড়া নয়। আর পণ্ডিত কোথাটাও ভুল—পণ্ডিতের স্ত্রীলিঙ্গ পাণ্ডতানী, যেমন মাতুলানী।

ব। উঃ, কি বিদ্বান্। কথা কইতে ভয় হয়!

ঘ। ভয়ের কোন কারণ নাই, তবে স্ত্রীলিঙ্গে বিদ্বান্ কথাটার প্রয়োগ হয় না। বিদ্বস শব্দে ঈ প্রত্যয় কর্‌লে হয় বিদ্বসী—বুঝিলেন?

গৃ। কি যে বল্‌ছ, কিছুই ত মাথামুণ্ডু বুঝতে পারিনে। বিয়ের কথা কি বল্‌তে এসেছ, তাই বল না ছাই।

ঘ। তা বল্‌ছি। জানেন, মেয়ে আছে চার রকম;—বিদ্বসী, রূপসী ধনাবতী ও গুণাবতী। সচরাচর সকলে ব'লে থাকে বটে, ধনবতী গুণবতী, কিন্তু সেটা ভুল, ধন শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ধনা,—আর গুণ শব্দে গুণা—অতএব ধনাবতী ও গুণাবতী;—এর মধ্যে কোন্ রকম মেয়ে আপনি চান বলুন, আমি তাই এনে দেব।

গান

আমি কি যেমন তেমন ঘটকী ওগিন্নি!
আমার পায়ে পড়ে আট পহরে—ভারে ভারে সিন্নি।
রং-বেরঙের সুগুণ সুরূপ
এক একটি বর আস্ত তুরুপ
আমার হাত ধরা।
আর ক'নে সবি হরেক বিবি—
এমন কেউ কখনো পাননি।

ব। সত্যি, ঘটকঠাকরুণ যে রকম বিদ্বান্—

ঘ। না না—বিদুষী—

ব। ছাই, মনেও থাকে না—বি—বি—বিলাসী।

ঘ। মহাভারত—মহাভারত!

ব। ওটা বুঝি মস্ত ভুল হোল— বি-বি বিদ্যা— হ্যাঁ হ্যাঁ বিদ্যাগজি—এবার ত ঠিক হয়েছে! বিদ্যাগজি ঠাক্‌রুণ--তুমি ঘটকালী না ক'রে পড়াও না কেন?

ঘ। তা, ও সম্বোধনটা করতে পারেন—নিতান্ত অশুদ্ধ হবে না। আমার স্বামীর পদবী হচ্ছে,—বিদ্যাদিগ্‌গজ সংক্ষেপে স্ত্রীলিঙ্গে আমাকে বিদ্যাগজি বলা যেতে পারে।

ব। আঃ বাঁচলুম।—তা দিগ্‌গজি মহাশয়!

ঘ। মহাশয় না, মহাশয়া—

গৃ। দেখ ঠাকুরঝি, বজর বজর ছাড়বে?

ব। আমি বল্‌ছি—তা হ'লে ঘটকালী না ক'রে—মাষ্টারি করলেই ত হয়। আমার মেয়েটকে কিন্তু পড়াইতেই হবে। দিগ্‌গজি ঠাক্‌রুণ, আমার ইচ্ছা, তাকে ভাল ক'রে লেকাপড়াটা শেখাই, নিজে ত মুখ্যু হয়েই রইলুম।

ঘ। এ ইচ্ছা স্বাভাবিনী,—কিন্তু এতে আমার ইচ্ছাও যাতে প্রবলিনী হয় —সেটা করা চাই।

ব। আহা, কেমন মিষ্ট ক'রে কথাটা বল্লে! তা আমার মেয়েকে যদি পড়ান, আমি মাসে পাঁচ টাকা ক'রে দেব।

গৃ। তুই যে দেখছি পাগল হলি—মেয়ের পড়ার জন্য পাঁচ পাঁচ টাকা খরচ করবি?

ঘ। ও কথা বল্‌বেন না, আপনারা হলেন আমাদের মহাজনানিচয়া আদর্শনী দাত্রী—

গৃ। কি বলিস্‌! আমরা ধাত্রী,—বের ক'রে দে মাগীকে—বের ক'রে দে —এমন গাল আমাদের কেউ কখনও দেয়নি।

ঘ। হাঃ হাঃ, গাল নয় মহাজনা—এই আমাদের সহজিনী ভাষায় যাকে বলে দাতা, তাই বল্‌ছি। স্ত্রীলিঙ্গে দাতা কথাটা অশুদ্ধ, দাত্রীই ঠিক!

গৃ। ধাত্রীই ঠিক! মলো মাগী—দূর হ বল্‌ছি!

ঘ। আমি ঠিক বল্‌ছি—বার বার পুনর্ব্বার বল্‌ছি—এ ভাল কথা, গাল নয়, আপনি শিক্ষিতানী নন ব'লে এর মর্ম্ম বুঝেছন না।

শ। তাই ত, মাগী দেখছি বুকে ব'সে দাড়ী ছিঁড়তে চায়।

ঘ। হায় হায়! এ তুলনাটা নিতান্ত ব্যাকরণ অশুদ্ধ হোল! স্ত্রীলিঙ্গে দাড়ী অসম্ভব,—চুল ছেঁড়ার কথা বল্লে সঙ্গত উপমা হয়।

গৃ। ও মা, এ কি বলে গো—ও যে চুল ধ'রে টানে! ও কর্ত্তা—কর্ত্তা গো—শেষে কি এই দশা হোল আমার! পথের লোক এসে চুল ধ'রে টানে।

[উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান।

শশী। থাম মা থাম,—এ কি হোল গো!

(পশ্চাৎ ধাবমান)

বরু। এ কি করলে বল দেখি—বিদ্যাগজি ঠাকরুণ?

ঘ। হা হা, একেই বলে অশিক্ষিতানি পটুস্থানি। বিভূতি দাস স্বয়ং যা বলেছেন—তা কি মিথ্যা হয়!

(নেপথ্যে)—ওগো কি হোল গো আমার!

বরু। চল—আর না—গিন্নী দেখছি ভারী ক্ষাপা হয়েছেন—আর একদিন এসে বিয়ের কথা তুলো।

[প্রস্থান

ঘ। একটু দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান, গানটা একবার শুনে যান!

(ঘটকীর তুড়ি দিয়া গান)

আমি কি যেমন তেমন ঘটকী, ও গিন্নি।
আমার পায়ে পড়ে আট পহরে ভারে ভারে সিন্নি!
রং, বেরঙের স্বগুণ স্বরূপ,
এক একটি বর আস্ত তুরুপ,
আমার হাত ধরা,
আর কনে স'বি, হরেক বিবি
এমন কেউ কথনো পাননি।
চাও য'দি গো গুণের মেয়ে—
তার—না ফুরাবে অন্ন দিয়ে,
আন্‌ব—স্বয়ং দ্রৌপদী
কিংবা পটল পারা চক্ষু চেরা
চাও কি রূপের বহ্নি?
নয় যদি চাও টাকার থলে,
তাহাও বল খুলে খেলে,

ওগো—বিলাত যাবে—তোমার ছেলে,
সবাই কবে ধন্যি।
বেশী কথা কি কব আর,
ভবে করি যাত্রী পার,
আমি কাণ্ডারী,
ছেলে মেয়ে, মা বাপেরা,
পার হ'তে চাও যারা যারা
আঁচল ধ'রে দাঁড়াও তারা,
আমি—নহি ত সামান্যি।

[গাইতে গাইতে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

(গৃহিণীর কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ)

গৃ। উঃ, গেলুম যে, মলুম যে, বড় জ্বালা, ও কর্ত্তা গো—বলি—

(শশিমুখীর দ্রুত প্রবেশ ও করযোড়ে)

শ। হেই মা, ও কথা বলো না গো, আমরা তোমার বালাই নিয়ে নিয়ে মরি, তুমি মর্‌বে কেন, জন্ম জন্ম বেঁচে থাক, পাকা মাথায় সিঁদুর পর, এই—এই—

গৃ। শশিমুখি, তুই কি বলিস! বড় যে জ্বালা: চুল ধ'রে টান্! ওরে—প্রাণের টানের চেয়ে বেশী যে! কর্ত্তা গো—এ সময় তুমি চেয়ে দেখবে না গো!

(ফুঁপাইয়া ক্রন্দন ও শশীরও তথাকরণ)

শ। (গৃহিণীর চোখ মুছাইতে মুছাইতে) আহা! এ কি হোল গো, বুক যে যায়! থাম থাম—তোমার এ চোখের জল কি জল গো? এক এক ফোঁটা জল—যেন পাহাড়-ভাঙ্গা এক একখানা টুক্‌রা, বুকে পড়ে আর হাড়গুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়!

গৃ। (শশীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া) তুই ত ও কথা বল্লি—আমার দুঃখে আর কার কি বল্? বলি ও কর্ত্তা,—মরবার সময় কি একবার দেখা দেবে না,—হায় হায়! কি কপাল ক'রেই জন্মেছিলুম গো!

(আবার উচ্চ ক্রন্দন, শশীর তাহার অনুকরণ।)

(চন্দ্রকান্তের প্রবেশ)

চ। বাইরে লোক এসেছে,—কর্ত্তামহাশয় একটু আস্তে কথা কইতে বলেছেন।

গৃ। কি বল্লে! লোক এসে গাল দেবে—চুল ছিঁড়িবে—আর আমি আস্তে কথা কইব? হুকুম জারি শোন! কে এত মস্ত লোকটা এসেছে শুনি?

চ। হরিবাবু। দাদাবাবুর বিয়ের পাকাকথা কইতে এসেছেন।

গৃ। (সহসা শান্তভাবে) তা কি দেবে ঠিক হোল?

চ। সে কথা এখনো হয়নি,—যা বলেন, জানিয়ে যাব এখন।

গৃ। শুনলি কথার ছিরি! জানিয়ে যাব এখন। আমি যেন হাত পেতে ভিক্ষে চাচ্ছি। যা ত রাশি, তুই একবার দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তাগুলো শুনে আয় দেখি। উনি যে অমনি দুপাঁচ হাজারে সেরে ফেলবেন, সেটা হচ্ছে না। যেন আমার ছেলে—না ওঁর ছেলে! হা রে আমার কপাল!

শ। আহা, আহা, কর কি মা! তার চেয়ে আমাকে ধ'রে মার না। (কপালে হাত বুলাইয়া) ম'রে যাই। কতই লাগলো! ম'রে যাই।

গৃ। তুই ছাড়া আর ত কেউ নেই আমাকে দরদ করতে! তা যা বাছা—একবার কথাগুলো শুনে আয়।

শ। তা যাচ্ছি—সব শুনে আসছি—কিন্তু—কিন্তু হেই মা,—আর ও রকম করো না! তা হ'লে নিশ্চয় আমি—আমি গলায় দড়ি দিব।

[প্রস্থান

গৃ। ভাগ্যিস্ শশীকে পেয়েছিলুম—তাই বেঁচে একটু সুখ আছে। নইলে কি দশাই হোত। সবই একযোট! আমি যেন—চাল ঝাড়তে ভাঙ্গা কুলো।

(কর্ত্তার প্রবেশ)

ক। দেখ গিন্নি—আজ বিকালে হরিবাবুরা আসবেন—একটু যেন—

গৃ। বিকালে—হরিবাবু! এই সকালে—আবার বিকালে! এত ঘন ঘন আসবার মানেটা কি বল দেখি?

ক। (মাথা চুলকাইয়া) মানেটা কি? তা বলছি—আজ বিকালটা হলেই সব এক রকম চুকে যাবে,—বিকালেই পাকা দেখা যাবে।

গৃ। এ দিকে কিছু ঠিক হবার আগেই পাকা দেখা! আমি কিন্তু দশটি হাজারের কম নেব না; এইটি মনে রেখে যা করবার করো।

ক। হবে হবে—অত ক্ষ্যাপ কেন? (কাছে আসিয়া চিবুক ধরিয়া)

আমার ক্ষেপি, আমার পাগলি—চিরদিনই এক রকম।

গি। (নাকিসুরে) যাও, আর অত সোহাগিপনা কর্‌তে হবে না—আমি কিন্তু হাতে দশটি হাজার পাব—তবে বিয়ে হবে।—এই বুঝে যা হয় কোরো।

ক। (স্বগত) মজালে দেখছি! কি ক'রে বাগাই—এ দিকে ভদ্রলোককে আস্‌তেও বলেছি। যা আছে অদৃষ্টে হবে,—দুর্গা ব'লে ত এখন ঝুলে পড়া যাক। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) তা গিন্নি—

গি। বল না—আমি ত কালা হইনি—

ক। (আদর করিয়া) বলি—

গিন্নি আমার সোনামণি গিন্নি আমার ধন,
গিন্নি নইলে কে বুঝবে এ হৃদয়বেদন!

গি। (হাসিয়া ঠেলিয়া দিয়া) যাও,—এমন নাকি কান্না কাঁদতেও পার! আর ভোলাতে হবে না।

ক। তোমার কাছে না কাঁদলে আর কার কাছে কাঁদি বল? হাসি দেখে তবু বুকটা ফুলে উঠলো।

ফুলে ফুলে ঢ'লে ঢ'লে বহে কিবা মৃদুবায়;
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোল বহিয়া যায়;

গিন্নি, হাসিতে হাসিতে যেন মতি ঝরে।—দেখ গিন্নি, পাঁচ হাজার আদায় ক'রে নিয়েছি, বল ত এখনি এনে দিই!

গি। পাঁচ হাজার—শুধু পাঁচ হাজার! কি সর্ব্বনাশ! দেখলে কীর্ত্তি! আমাকে না ব'লে কয়ে পাঁচ হাজার নিয়ে ব'সে আছেন। কিছুতেই আমি রাজি হব না—দেখব দিকি—এ বিয়ে কে দেয়!

ক। (স্বগত) কিছুতেই ত পেরে উঠলুম না—অন্য পথে যেতে হোল দেখছি। (প্রকাশ্যে) তার জন্য ভাবনা কি? আজই সে সব ঠিক হয়ে যাবে—আগে টাকা—তার পর দেখা! বুঝলে গিন্নি, অত নিশ্বাস ফেলো না। তোমার নিশ্বাস যে সাপের বিষের চেয়েও আমাকে জরজর ক'রে ফেলে!

গি। অত হেঁয়ালি গাইতে হবে না,—কাজের কথাটা ভাল ক'রে বুঝে নেও, তারপর বাজে কথা। ১০টি হাজার, নইলে—

ক। বুঝেছি,—বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না, সে সবই ঠিক হবে।—এবার হোল ত? তা বিকালে তারা আসবে—একটু খাবার উদ্যোগ রেখো।

গি। খাবার উদ্যোগ! যেমন দেবে, তেমনি রাখব।

ক। আমি ত আগে থাকতে শ্রীচরণে সবই দিয়ে রেখেছি—যেমনই মাইনেটি পাই, অমনি এনে দিই।

গি। শোন কথার ছিরি! কুড়ি টাকা ক'রে হাত খরচ কে দেয়?

ক। (স্বগত)—পঞ্চাশ টাকা ক'রে মাইনে বেড়েছে, সেটা, যদি একবার প্রকাশ পায়, তা হলেই গেছি। (প্রকাশ্যে) তা গিন্নি, আমার ত খরচও আছে—২০ টাকা আর কত বল?

গি। তোমার খরচটা কি এত শুনি। সবই ত আমিই যোগাচ্ছি। কেবল জামাখানা, কাপড়খানা, তেলটা, সাবানটা, নাপিতটা আসটা—ঐ বই ত নয়! তা আজকাল যে তুমি বেলেল্লা হয়েছ—তা আমি দেখতে পাচ্ছি বটে,—যখন তখন কাপড়ে খোসবাই এর গন্ধ পাই।

ক। বটে—বটে! নিজের মাথার তেলের গন্ধটা দেখছি নাকে লেগে থাকে,—

গি। তাই ত! আর সেদিন যে দর্জ্জী এক কাঁড়ি পাঞ্জাবী দিয়ে গেল,—তাও কি আমার জন্যে নাকি?

ক। তার থেকে—ছেলের জন্য কটা দখল করলে সেটা বল দেখি।

গি। ছেলেকে দুট জামা দিয়েছি—অমনি লেগেছে;—ভ্যাল্লা যা হ'ক! নবাবীপনা দেখে আর বাঁচিনে। সেদিন দেখলুম, নাপতেটা, চুল ছেঁটে চার চারটে পয়সা নিয়ে যাচ্ছে! কখনও জন্মের কালে ত তা শুনি নি, নখ কাট্‌লে এক্ পয়সা, চুলছাঁটায় দু পয়সা—এই ত চিরদিন জানি!

ক। (পেরে উঠব না দেখছি,—সেই হার মান্‌তে হবে, আগে থাক্‌তে সন্ধি করাই ভাল।) তা গিন্নি, আমিই মিষ্টি আনিয়ে দেব এখন, তা হ'লেই ত হোল!

গি। কি আন্‌বে বল দেখি?

ক। যা বল্‌বে। (অঙ্গুলি গুণিয়া) এই নোস্তার মধ্যে কচুরি, নিমকি, সিঙেড়া, ডালপুরি—ভাজাভুজি আর মিষ্টি হোল—রসগোল্লা, পান্তুয়া, সন্দেশ, মেঠাই।

গি। কি বল তুমি? অত কেন? টাকা হাতে পেয়ে তুমি দেখছি বড় বাড় বেড়ে উঠেছ।

ক। তবে কি আন্‌ব তুমিই বল। কচুরি, সিঙেড়া, রসগোল্লা, পান্তুয়া হলেই যদি চ'লে যায়—সে, খুবই ভাল কথা। ঘরে খানকতক লুচি, ভাজি ও

তরকারি আর রাবড়িটা ক'রে দিও।

শশী। (আস্তে আস্তে গিন্নীর পিছন দিকে আসিয়া কানে কানে) মিষ্টান্ন বেশী কিছু আসে, ভালই ত; অনেকদিন ছোট মাসীমার বাড়ী তত্ত্ব যায়নি।

গি। (স্বগত) বেশ বলেছে, ভাগ্যিস শশী ছিল! সত্যিই ত, ওঁর টাকা বাঁচলে আমার ত আর তাতে কোন লাভ নেই।

ক। তা হ'লে অল্প-স্বল্পই আনা যাবে, কি বল?

গি। হঁ্যা, অল্প-স্বল্প আনা যাবে! কি কথাই বল। পাকা দেখতে আসছে, এ সময় লোকে কত ধূমধাম করে খাওয়ায়, আর তুমি দুখানা কচুরি ও দুটি রসগোল্লা দিয়ে সার্বে? কথার ছিরি শোন!

ক। (মাথা চুলকাইয়া) তা ত ঠিক! এ পথও জানি, ও পথও জানি, তবে কি বল্ব, ম'রে আছি।

গি। আমার অকল্যাণ কর্‌ছ! আমি কিন্তু মাথামুড় খুঁড়ে মর্‌ব।

ক। বালাই— বালাই! যেটের বাছা, ষষ্ঠীর দাস, তবে কি আজ্ঞা কর?

গি। (শশীর প্রতি আস্তে আস্তে) কি বলি?

(শশী পিছন হইতে তাঁহাকে পরামর্শ দিতে লাগিল, গিন্নী বলিয়া যাইতে লাগিলেন।)

গি। নোন্তা আনাও,—কচুরি নিমকি, সিঙ্গেড়া, ডালপুরি, রাধাবল্লভি, পাঁপর ঝুরিভাজা, ডালভাজা, পাঁচভাজা—সাতভাজা।

ক। ওঃ বাস্‌ রে!

গি। এর মধ্যেই—বাস্‌! কি কিপ্টেই হয়ে দাঁড়িয়েছে! বাপ রে!

ক। আচ্ছা, বল বল।

গি। মিষ্টি আন্‌বে,—রসগোল্লা, পান্তুয়া, খাজা, গজা, লেডিক্যানিং, লর্ডক্যানিং, কাঁচাগোল্লা, আবারখাব, বরফিসন্দেশ, আমসন্দেশ, অমৃতি—

ক। আর ত পারিনে।

গি। ছেলের বিয়ে—না পার্‌লে চল্‌বে কেন বল। মিহিদানা, বড়দানা, বঁদে —(শশীর প্রতি—আর কি?) ক্ষীর, দই—রাবড়ী—ছানার পায়স—

ক। হয়েছে হয়েছে—ময়রার দোকান শুদ্ধ যে উঠে এল।—

গি। (পুনরায় শশীকে) হয়েছে ত?

শ। তা চল্‌বে।

গি। আচ্ছা, ওতেই হবে।

ক। বাঁচা গেল!

গি। কজন আস্‌বে?

ক। বাইরে দুজন, আর হরিবাবুর পিসতুত বোন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। তিনজনের মত আয়োজন করলেই হবে।

গি। কথা শোন। ঘরের লোকেরা কি মুখে তুলো গুঁজে থাক্‌বে। বাড়ীতে একটা আয়োজন হচ্চে, বাড়ীর ছেলে-মেয়ে চাকর-বাকর সকলকেই ত কিছু কিছু দিতে হবে।

ক। বেশ, বেশ, ময়রার দোকান শুদ্ধ আমি তুলে আন্‌ব এখন, তা হ'লে ত তুমি তুষ্ট হবে? তাতেই আমার প্রাণ ঠাণ্ডা।

[প্রস্থান

গি। ভাগ্যিস্ মনে করিয়ে দিলি—শশি, কেবল সুকুকে না—বোসেদের বাড়ীও পাঠান চলবে—সেদিন আমাকে ওরা তত্ত্ব পাঠিয়েছিল। তা আয়, এখন বাসন-কোসন সব ঠিক্ করতে হবে।

[প্রস্থান

(গৃহিণী চলিয়া গেলেন কি না—শশীর উঁকি মারিয়া দর্শন—তারপর দাঁড়াইয়া গান ও মাঝে মাঝে উঁকি প্রদান।)

গান

মরি কি বাহাদুরি—বলিহারি যাই!
কিবা কর্ত্তা গিন্নী, কিবা,—মুটোতে সবাই;
আমার মুটোতে সবাই।

ছড়াই যেমন সর্ষে পড়া মানুষ বনে গরু ভেড়া,
কলের মত চলে তারা; যে দিকে চালাই।
সাবাস তুমি বুদ্ধিখানি, বাণীর জোরে ধন্য মানি,
রাজা নেই যে একাই রাণী; দুঃখ কেবল তাই!

ইঃ! দুঃখটা কি। বাজাই তুড়ি
কোথায় আছে এমন জুড়ি!
ঘরের কোণে আপন মনে জয় জয় গাই,
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয় গাই।

তৃতীয় দৃশ্য

(গৃহের একদিকে একখানি আসন পাতা ; তাহার নিকট একটি কাঁসার গ্লাস ও দুইখানি মাটীর খুরি সজ্জিত। অন্যদিকে তিনখানা কাঁসার থালা ও মিষ্টান্নের ঝুড়ি ইত্যাদি লইয়া শশী ও বরদা থালায় মিষ্টান্ন সাজাইতে বসিয়াছেন।)

বরু। থালে অত ক'বে ক'রে মিষ্টি দিচ্ছিস, গিন্নী নিশ্চয় আমাকে দূষবে।

শশী। মা গো—পাকা দেখতে আসবে—একটু পাত সাজিয়ে না দিলে চলবে কেন? বাড়ীব যাতে নিন্দে হয়, এমন কাজ আমার দ্বারা হবে না—তা যাই বল।

বরু। তবে চট্‌পট্‌ হাত চালিয়ে—নে ঐ আস্‌ছে রে।

শ। সত্যি নাকি?

(শশীর তাড়াতাড়ি তাহার থালা হইতে কতকগুলো মিষ্টান্ন ঝুড়িতে নিক্ষেপ। গিন্নীর প্রবেশ ও মিষ্টান্নের থালার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া।)

গি। বলি, ও ঠাকুরঝি! করছ কি? এক একটা ক'রে হরেক রকম সন্দেশ—গোটা গোটা পান্তুয়া—রসগোল্লা, আবার মেঠাই,—মানুষ কি খেতে পারে?

বরু। পারুক না পারুক, আজকের দিনে একটু পাত সাজাতে হয়।

গি। তা শশী কি সাজায় নি—দেখ দেখি, ও কেমন দিয়েছে।

ব। আচ্ছা, আমিও কিছু কিছু তুলে নিচ্ছি। তুমি যাও—তাঁকে একলা ফেলে আসাটা ভাল দেখায় না। পাত সাজান হ'লেই আমরা ডাক্‌ব।

গি। তা যেন ডাক্‌বে! কিন্তু আগে যদি একবার না আসতুম, তা হ'লে যে সর্ব্বনাশ হয়েছিল! তাকে এখানে আন্‌লে ত আর মিষ্টি ওঠাতে পারতুম না!

ব। তা যাও যাও—এই দেখ তুলে রাখ্‌ছি—এবার হোল ত এখন গিয়ে তাকে নিয়ে এস।

গি। তা যাচ্চি। দেখ বাছা শশি—বরু ঠাকুরঝি যেন আর বেশী ক'রে মিষ্টি না দেয়।

শ। সে কথা বল্‌তে হবে না; আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, তোমার কোন দ্রব্য অপচয় হবে না; তুমি যাও মা; আমি আছি—একটুও ভাবনা করো না।

গি। তোকে পেয়েই ত আমি নিশ্চিন্ত আছি, শীঘ্র গোছগাছ ক'রে ফেল্—

শ। এই এক্ষুণি আমি সব ঠিক ক'রে ফেলেই তোমাকে খবর পাঠাচ্ছি,—তুমি যাও মা,—ঠাকরুণটি একলা আছেন।

গি। তা যাচ্ছি। পাঁপর কিন্তু আধখানা ক'রে দিস্‌নে—আরও ভেঙ্গে দে, বুঝলি ত?

[প্রস্থান

বরু। আচ্ছা মেয়ে যা হ'ক! তুই সব পারিস্!

শ। এ রকম না হ'লে কি চলে পিসি? যে যাতে বোঝে তাকে সেই রকম ক'রে বোঝাতে হয়। এখন চট্‌পট্ সব ঠিক ক'রে ফেলা যাক্,—কথার বড় সময় নেই। হয়েছে—, এইবার থালা দুখানা আমার হাতে তুলে দাও, আমি বাইরে দিয়ে আসি।

[থালা লইয়া প্রস্থান

(বরদা হাসিতে হাসিতে অন্য থালাখানি সাজাইতে আরম্ভ করিয়া)

"ভ্যাল্লা মেয়ে যা হ'ক। বৌকে এক হাতে কেনে, এক হাতে বেচে! তা যেমন কুকুর—তেমনি মুগুর না হ'লে চলেও না বটে! এমন না হ'লে কি এ বাড়ীতে টিক্‌তে পার্‌ত!"

(গিন্নীর প্রবেশ)

গি। কই গো এখনো হ'ল না?—

বরু। এবার জল দিলেই হয়।

[গ্লাসে জল প্রদান

গি। পাঁপর ভেঙে তুলে রেখেছ ত? কই, তেমনই ত আছে দেখছি, আমি মনে জানতুম—ভাঙবে না,—ভাঙ্গ ভাঙ্গ,—পাঁপর কি কেউ কখনো অত ক'রে দেয়! শশী গেল কোথায়?

বরু। বাইরে থালাগুলো দিতে গেছে। তা পাঁপর ত সেই দিয়ে গেছে——বেশী আর কি? আধখানা বই ত না।

গি। সে দিয়ে গেছে, বল্লেই হোল!—যা হ'ক্, এখন তাজন ভজনের সময় নয়—আরও অদ্দেকটা ভেঙ্গে রাখ।

(আধখানা পাঁপর ভাঙ্গিবামাত্র তাহার নীচে দুই রকম সন্দেশ দেখিয়া)

গি। করেছ কি? রসগোল্লা পান্তুয়া আবার দু দু রকম সন্দেশ? দু দু

রকম মেঠাই? আমি তবে এতক্ষণ ধ'রে কি ব'লে গেলুম? একটা ক'রে তুলে রাখ দেখি; এই যে শশী—শশি, তুই একদণ্ড কোথাও গেলে আমার চলে না। দেখছিস্ ঠাকুরঝি কি কাণ্ড ক'রে বসেছে—আবার বলে কি না শশী করেছে!

শ। (হাসিয়া) সত্যি নাকি? বরু পিসি—তোমরা দেখছি আস্ত মানুষকে ভেড়া বানাতে পার! মা গো ধন্যি! তা বলুক গে মা,—তুমি যাও, তাঁকে আন গে, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।

গি। দেখ—অত রকম মিষ্টি আছে—সব একএকটা ক'রে দেবার কিছু দরকার নেই—ছুট চারটে নিবেদন কমিয়ে দিস্—আর বড় বড় মিষ্টিগুলো ভেঙ্গে দিলেও চলে, বুঝলি ত?

শ। ঠিক বলেছ। মানুষ ত আর সত্যি রাক্ষস নয় যে, অত খাবে। তুমি নিয়ে এস গে!—

[গিন্নির প্রস্থান

বরু। ধন্যি তুমি!

(কনের পিসীঠাকুরাণীকে লইয়া গৃহিণীর প্রবেশ)

সকলে। বসুন বসুন—এই আসনে বসুন।

কনের পিসী। (উপবিষ্ট হইয়া) এ কি! এত সব কেন?

গৃ। (স্বগত) তাই ত; তবুও শশী ঢের দিয়েছে বটে, আমি থাক্‌লে আরও কমিয়ে দিতুম—ছেলে মানুষ, বুঝতে পারে নি!

ব। এত আর কি দিয়েছি? ও রকম বল্লে চল্‌বে না, খান।

পিসী। এ রকম সময় ত খাওয়া অভ্যাস নেই!

বরু। খান খান—ও কথা বল্লে শুন্‌বো না।

গৃ। দেখ ঠাকুরঝি—অত পীড়াপীড়ি ক'রো না! বাস্তবিক অসময়ে খেলে যদি সহ্য না হয়।

বরু। তুমি বৌ থাম।

গি। থাম্‌ব কেন বল দেখি? তোর যেমন কথা! লোকের খেলে অসুখ হবে—তবু তাকে ধরে বেঁধে খাওয়াতে হবে? অম্বলের জ্বালা যে কি রকম, তা আমিই জানি।

পিসী। তা অম্বল-টম্বল আমার হয় না,—তবে এতগুলো—

বরু। এতগুলো আর কি বল! এক একটার বেশী ত কিছুই দিই নি।

গি। তা না হয় ছু'একটা ক'রে তোমরা উঠিয়েই নাও না বাপু—কিছুতেই

যখন খাচ্ছেন না।

বরু। না—খাবেন না কেন? এমন কি বেশী দিয়েছি? না হয় পাতে কিছু প'ড়ে থাক্‌বে।

গি। আচ্ছা, বল্‌ছেন যখন বাপু, তুলেই নাও না, অত তর্কাতর্ক্কি—নাই কর্‌লে। আজকাল মেয়েরা যে কি হ'য়েছে, বড় লোকের সঙ্গে কেবলি তর্ক। দেখছ ত, উনি তোমার মা'র বয়সী? আচ্ছা, আমি তুলে নিচ্চি।—

(সন্দেশ, মেঠাই ও রসগোল্লা তুলিয়া)

এবারে ত হোল—এবার খাও।

পিসী। না, অমৃতিখানা আর আবার-খাবটাও তুলে নেও।—

(গৃহিণীর তথাকরণ)

বরু। (রাগ করিয়া) কি আর রইল?

পিসী। লুচি খানকতক উঠিয়ে নেও, অত পার্‌ব না।

গৃ। আচ্ছা,—তা নিচ্ছি—রাবড়িও দেখছি বেশী দিয়েছে—বেয়ান আমাদের যে রকম নিখাকী—এও না হয় খানিকটা ঢেলে নিচ্ছি। ছানার পায়েসটুকু খেয়ে ফেল।

পিসী। না না, রাবড়ী অতটা আছে, আবার ছানার পায়স কেন?

গৃ। সত্যি! ও মা, ওটাও খাবে না?

(খুরি সরাইয়া লইয়া)

এইবার তবে ব'স—

(নেপথ্য হইতে—ওগো, হরিবাবু তাড়াতাড়ি কর্‌ছেন—ঠাকরুণকে বাইরে পাঠিয়ে দাও।)

গি। এত কি তাড়াতাড়ি বাবু! লোককে খেতে দিবে না ছাই।

পিসী। না, আমি উঠি—বাড়ীতে একটা কাজ আছে, তা ছাড়া আমার আজ মোটেই খিদে নেই; একটু অম্বলের ভাবও দেখছি।

বরু। কক্ষনো অম্বল হয় না বল্লেন—আজ যে হঠাৎ অম্বলও হোল দেখছি।

পিসী। (মৃদু হাসিয়া) সময় বুঝে সব উপদ্রবই যোটে,—সত্যি—বুকটা খুঁচিয়ে উঠেছে।

গৃ। তাই ত! তবে আর কি বল্‌ব।

বরু। উটি হবে না, একটু মিষ্টিমুখ করতেই হবে।

পি। বেয়ান দেখেই প্রাণ মিষ্টি হয়ে গেছে—মুখে দেবার আর দরকার কি ?

গি। তা হ'লে কিন্তু আর একদিন এসে খেতে হবে। ঠাকুরঝি, একটা পান দাও তবে। নিতান্ত অসুখ কর্‌ছে—আর খেতে বলিই বা কি ক'রে ?

বরু। (রাগিয়া) তুমি পান দাও না, আমি পার্‌ব না।

[প্রস্থান

গি। ও ঐ রকম রাগী মানুষ। বিধবা হয়ে পর্য্যন্ত ছোটবেলা থেকেই এখানে আছে—আমি অনেক সহ্য ক'রে চলি।

পি। তা ত দেখতেই পাচ্ছি। তবে ভাই আজ আসি।

গি। হ্যাঁ, চল যাই—পাল্কীতে তুলে দিয়ে আসি। কত সাধ্যসাধনা কর্‌লুম —কিছুতেই ত ধনুর্ভঙ্গপণ খসলো না,—একটু মুখে কিছু দিলে না! এত সাধলে শিবের মাথায় ফুলও পড়তো। বিয়ে যদি হয়, তখন বেয়ায়ের কাছে এ দুঃখ গাইব। যা হোক, কত ত্রুটি হ'ল, কিছু মনে ক'র না।

পি। রামঃ! এমন অমায়িক লোক আমি ত দুটি দেখি নি।

[দুজনের প্রস্থান

শশী। (হাসিতে হাসিতে) আচ্ছা কাণ্ড হোল! বেচারীকে কিছু খেতে দিলে না; আহা, লোকটা খেতে ব'সে খালি হাতে উঠলো গো। মায়া কর্‌ছে! একটা সন্দেশ খেয়ে দুঃখটা নিবৃত্তি করি! (সন্দেশটা শেষ করিয়া) আর একটা নিলে বোধহয় ধরা পড়ব! রসগোল্লা পান্তুয়া লোভনীয় মনে হচ্ছে,—দুএকটা চাকা যাক না। (খাইতে খাইতে)—হি হি—তা বেশ হ'ল—এখন কেউ না এসে পড়ে!

(উঁকি দিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে ও এক একটি মিষ্টান্ন মুখে দিতে দিতে হি হি করিয়া হাস্য। সহসা পশ্চাদ্দিকে চন্দ্রকান্তের প্রবেশ।)

চ। এত হাসি কেন আজ? এত কিসের উল্লাস। মিষ্টির ঝুড়ি সাম্‌নে ক'রে কি কেবল হাসিই ছড়াবে—মিষ্টি কিছু পাব না? [সাম্‌নে আসিয়া] এ কি, গাল যে ভরা ভরা দেখছি—হা হা, তা বেশ করেছ, খাই না খাই, দেখেও প্রাণ ঠাণ্ডা!

শশী। [চটপট্ গিলিয়া ফেলিয়া] দেখলে, দে'লে—এত মিথ্যা বল্‌তে পার। ছি ছি! আর ঠাট্টায় কাজ নেই, কি খাবে বল দেখি?

চ। এত ভয় পাচ্ছ কেন শশিমুখি, তোমার যাতে অনিষ্ট হয়, সে কথা কি

চন্দ্রকান্ত প্রাণ থাক্‌তে প্রকাশ কর্‌তে পারে? খাও খাও, আর একটি সন্দেশ খাও।

শ। এত রঙ্গও জান তুমি! রসগোল্লা খেতে ভালবাস—এই নেও ধর,—চট্‌পট্ খেয়ে স'রে পড়—এখনি কেউ এসে পড়বে।

চ। আগে তুমি সন্দেশটি খাও—আহা, মুখের গ্রাস নষ্ট করছি, বুকটা ফেটে যাচ্ছে।—মাথা খাও, যদি না খাও—

শ। আচ্ছা বাবু খাচ্ছি—তা হ'লে তুমি খাবে ত? এই নাও ধর।

(উভয়ের মিষ্টান্ন ভক্ষণ—বরদার প্রবেশ)

ব। এ কি হচ্ছে, দুজনে যে আচ্ছা ভোজ লাগিয়েছিস্।

শ। আমি না—এই চাঁদা দুষ্টুটা

চ। হা হা—ও কথা বল্লে চল্‌বে না—কার মুখ নড়ছে, দেখাই যাচ্ছে।

বরু। তোমার যা খুসী কর, আমি এ সব অনাচার দেখতে পারিনে।

(এক দিক্ দিয়া প্রস্থান; অন্য দিক্ দিয়া গৃহিণীর প্রবেশ)

গৃ। এই যে চন্দ্রকান্ত, কি খাওয়া হচ্ছে?

চ। কিছু না—এই একটা পান প'ড়ে ছিল, তাই—তাই—

(বলিতে বলিতে দ্রুতগমনে গ্রাস ফেলিয়া মিষ্টান্নের ঝুড়ি উল্টাইয়া পলায়ন)

গৃ। দেখলে—দেখলে—সব ভাঙ্গলে? সব ছড়ালে! এমন লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা লোকও দেখিনি? কর্ত্তা দুধ দিয়ে কালসর্প পুষছেন গো। শশি, মিষ্টিগুলো তুলে থালা সাজাও ত বাবা—দুবাড়ী তত্ত্ব পাঠাই।

(শশী মিষ্টান্ন তুলিতে লাগিল—গৃহিণী গুণিতে লাগিলেন।)

গৃ। এ কি! আর সব কোথা গেল? এত কম যে? চন্দ্রটা বুঝি খেয়ে গেল! তাই বটে, মুখ নড়ছিল! বল্লে কি না পান খাচ্ছি! হাড় মাস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে! আমি কর্ত্তার কাছে চল্লাম—ও যাবে কি আমি যাব! মানুষ আর কত সহ্য কর্‌তে পারে! [প্রস্থান

শশী। হি হি হি হি—কি মজা!

গান

তোম তোম তোম নানা! মজাদার দুনিয়ার খানা!
উঃ—আস্ত মটর বড়ই কঠোর! চাই চানাচুর নকলদানা।

চাই,—এক নয়নে মধুর হাসি এক নয়নে কান্না ?
চাই—আধো পাতে পান্ত বাড়া আধোপাতে রান্না ?
চাই—দু'হাতে ভরা মুটো মুটো—গিল্টি করা রঙ্গিন ঝুটো ?
চাই—আসল খাঁটি—একটা দুটো ?—নানানা।

(মাঝে মাঝে হি হি করিয়া হাসি, মাঝে মাঝে কেহ আসিতেছে কি না, উঁকি দিয়া দেখিতে দেখিতে, হাততালি দিয়া গান।)

পটনিক্ষেপ।

চতুর্থ দৃশ্য

(কর্ত্তা ও চন্দ্রকান্তের প্রবেশ)

কর্ত্তা। দেখ চন্দ্রকান্ত—কি উপায় বল দেখি ? আমি হলুম উন্নতিবিধায়িনী সভার প্রেসিডেন্ট কাগজ-কলমে লিখে প্রতিজ্ঞা করেছি, বিয়েতে টাকা নেবও না, দেবও না ; এখন—

চ। কাজটা ভাল করেন নি।

ক। তা ত এখন বুঝ্‌ছি। তখন ত জান্‌তুম না, বিনোদের বড় দুটি বোন্ শিশুকালে মারা যাবে। যা হ'ক, না বুঝে একটা প্রতিজ্ঞা যখন ক'রেই ফেলেছি,—তখন ছেলেদের বিয়ের বেলা সেটা ভেঙ্গে ১০ হাজার টাকা কি ক'রে চেয়ে বসি বল দেখি ? তাও কি হয় চন্দ্রকান্ত,—তুমিই বল ?

চ। আজ্ঞে, তা আর কি ক'রে হবে ?

কর্ত্তা। তুমি ত বল্লে কি ক'রে হবে—কিন্তু গিন্নি যে বেঁকে বসেছেন, আর সব পারা যায়—গিন্নিকে ত পারার যো নেই। তুমি যদি কোন উপায় করতে পার চন্দ্রকান্ত, তবেই রেহাই পাই।

চ। দাঁড়ান, একটু ভাবতে দিন।

ক। আঃ, ভাব ভাব,—বেশ ক'রে ভাব তুমি ভাবতে ভাবতে শুক্‌নো নদীতেও বান ডাকিতে পার্‌বে—তা আমি বেশ জানি ! দোহাই তোমার, তুমিই আমার আশা, তুমিই আমার ভরসা—আমি তোমাকেই এই ভাবসাগরের কাণ্ডারি ব'লে জানি।

চ। আমি ত একটা খুব সহজ উপায় দেখতে পাচ্ছি।

ক। বল বল, চন্দ্রকান্ত—তোমার দুটি পায়ে পড়ি—বল, বাঁচাও।

চ। আপনি কি যে বলেন! আমি বলি, বিয়েটা ভেঙ্গেই দিন না,—আপনি হলেন বরের বাপ—কন্যা দায় ত আপনার না,—অমন ঢের জুটবে।

ক। হায় হায়! তা যদি পারতেম! কিন্তু বল্‌ব কি দুঃখের কথা—তুমি যেটা ভাবছ সহজ—সেইটেই সবচেয়ে কঠিন।—(কাছে মুখ আনিয়া মৃদুস্বরে) তোমাকে খুলে বল্লে ত আর প্রকাশ হবে না—জান চন্দ্রকান্ত, বেজায় জড়িয়ে পড়েছি, হরি বাবুর কাছে পাঁচ হাজার ধার নিয়েছিলুম—যদি বিয়েটা না দিই, এক্ষণি তা হ'লে সে টাকাটা দিতে হবে।

চ। আর বিয়েটা হ'লে?

ক। তাঁর সব দেনাও শোধ যায়—নগদ ৫ হাজারও ঘরে আসে!—

চ। বটে! তা হ'লে যেমন করেই হোক, বিয়েটা হওয়া চা-ই।

ক। এই যা বল্লে! কিন্তু গিন্নি রাজী না হ'লে ত কিছুই হচ্ছে না।

চ। এটা আর এত মুস্কিল কি? গিন্নি ত ১০ হাজার চাচ্ছেন—তারা ত আসলে তাই দিচ্ছে—সেইটে আর গিন্নিকে বোঝাতে পারবেন না?

ক। তা পারি কই? নগত ত পাঁচ হাজারের বেশী তাঁকে দিতে পার্‌ছি না,—তিনি চান—পুরো দশ।

চ। এতক্ষণে সব বুঝলুম। তা আছে—আছে, একটা উপায় আছে,—শশীকে যদি হাত করতে পারা যায়—তা হ'লে আর ভাবনা নেই।

ক। মন্দ বলনি—ঠিক। সাধে কি বলি, এত কাঁচা বয়স ও এত পাকা মাথা—আর দুটি মেলে না! কিন্তু তাকে হাত করাও ত সহজ না—তবে তোমার অসাধ্য কিছুই নেই—এই যা!

চ। আপনিও একবার চেষ্টা করুন না? শেষে আমি ত আছিই।

ক। আমার চেষ্টা কর্‌তে হবে? মজালে দেখছি! তা কি কর্‌তে হবে বল।

চ। এই পাঁচ রকম মিষ্টি বোলচাল ঝাড়বেন—আর গহনা-গাঁটীর লোভও দেখাবেন।

ক। তুমি ভাবছ সেটা ভারী সহজ—কিন্তু আমার তাকে দেখ্‌লেই ঠোঁটের মিষ্টিগুলো সব টক হয়ে পড়ে। যা হ'ক, যা কর্‌তে হবে, তা শীঘ্রই করা ভাল, একবার তাকে ডেকে আন, দেখি কতদূর কৃতকার্য্য হই।

[চন্দ্র প্রস্থানোদ্যত

ক। আঃ, গিন্নি যেন টের না পায়; যদি দেখ, গিন্নি ঘরে কাজে আছেন,

তবেই আস্তে আস্তে শশীকে ডেকে এন, বুঝলে ?

চ। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান

ক। আঃ, ভাগ্যিস্ চন্দ্রকান্ত ছিল! নইলে কি দশাই হোত! কত পুণ্যির যে ফল! সে আমার সমুদ্রের তরী—ডাঙ্গার গাড়ী—শীতের আগুন—বর্ষার বাড়ী!

(গৃহিণীর প্রবেশ)

গৃ। বলি, তুমি আমাকে চাও, না চন্দ্রকান্তকে ? এইটে স্পষ্ট ক'রে খুলে বল।

ক। (স্বগত) আমার কথা শুনতে পেয়েছেন না কি ? (প্রকাশ্যে) কি হয়েছে—কি হয়েছে—কেন, কেন ?

গৃ। যা হয়েছে, তা আর বলার না—এত খরচপত্র ক'রে মিষ্টান্ন সব আন্‌লে, সেগুলো সব চাঁদাটা দাঁড়িয়ে খেয়ে এঁটো ক'রে একসা ক'রে এসেছে।

ক। এই! (হাসিয়া) সে জন্য আর ভাবনা কি ? আবার আমি তোমাকে মিষ্টি আনিয়ে দিচ্ছি।

গি। বটে! ভারি যে দাতা দেখ্‌ছি! চন্দ্রকান্ত খাবে ব'লে বুঝি ? আমাদের জন্য বল্লে ত এক কাণাকড়ি মিষ্টি আসে না! আমার শশী যদি এ রকমটা কর্‌ত, তা হ'লে কি হোত বল দেখি ?

ক। আমার কিন্তু সন্দেহ জন্মাচ্ছে! শশী নিজে খেয়ে ত চন্দ্রকান্তের নামে দোষ দিচ্চে না ?

গৃ। দেখলে, দেখলে! আমি আর কিছুতেই এ বাড়ীতে থাক্‌ব না, তুমি চন্দ্রকে নিয়ে রাজত্ব কর, আর আমি শশীকে নিয়ে চ'লে যাই।

[প্রস্থানোদ্যত

ক। না গিন্নি, না না,—আমি চন্দ্রকান্তকে এখনি খুব সাজা দিয়ে দিচ্ছি।

(কর্ত্তার হাত ছাড়াইয়া গৃহিণীর পলায়ন চেষ্টা; কর্ত্তা তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া)

ক। আমার সাধের পূর্ণিমার চাঁদ

ছি ছিঃ এত কেন মান।

ম্লান দেখে হৃদয় আমার—ভেঙ্গে শত খান।

গৃ। যাও, আর সোহাগ করতে হবে না।

ক। আমি ঠিক বলছি গিন্নি—তোমার সাক্ষাতে আজ চন্দ্রকান্তের নাক-কান

কাটব—তবে তাকে ছাড়ব। এখন লক্ষ্মিমণি চাঁদবদনি, প্রসন্ন হও—আমার তাপিতপ্রাণে বরফ-জল সিঞ্চন কর।

গি। আর আদরে কাজ নেই—যেদিন থেকে চন্দ্রকান্ত এসেছে—সেদিন থেকে আমার আদর গেছে।

ক। তিন সত্য ক'রে বল্‌ছি—তা না গিন্নি—তুমি আমার চাঁদবদনী জীবনমরণকাঠী, ক্ষেণেক তোমার অদর্শনে মরি লো দম ফাটি।

গি। তা না ত আরো কত! সে সব দিন অনেক দিন চ'লে গেছে, এখন আমার আর কেউ নেই গো!—কেউ নেই!

[উচ্চঃস্বরে ক্রন্দন

ক। আহা আহা, কর কি গিন্নি—বুক যে যায়! গেল গেল,—বিদীর্ণ হয়ে গেল! একবার হাত দিয়ে দেখ!

[হাত ছাড়াইয়া লইয়া গৃহিণীর প্রস্থান

ক। যেয়ো না, যেয়ো না—রাগ ক'রে যেয়ো না। নিশ্চয় বলছি, আমি এখনি চন্দ্রকান্তের গর্দ্দান নিয়ে তোমার হাতে দেব।

[অনুগমন

(কিছু পরে হাত ধরাধরি করিয়া উভয়ের পুনঃপ্রবেশ)

ক। কোথায় যে গেল চন্দ্রকান্ত! বলি ও চন্দ্রকান্ত!

গি। সুর যে ক্রমেই নরমে পড়েছে। আমি বেশ বুঝচি, কোথাকার জল কোথা গড়াবে। তাকে দেখলে আর একটা কথা ফুটবে না।

ক। কি যে বল—পাগল না কি?

গি। আচ্ছা, দেখতেই ত পাব।

ক। এখন তাকে যে দেখতে পেলে হয় (স্বগত) না পেলেই ভাল! (প্রকাশ্যে) বেটার ছেলেকে একবার মজাটা দেখিয়ে দিই। নিশ্চয় জানে কি না, রেগে কেটে দু আধখানা ক'রে ফেল্‌ব,—তাই বেদম কোথায় ডুব মেরেছে!

গি। ঐ যে কোণের বারান্দায় কারা কথা কচ্ছে না?

ক। (উঁকি মারিয়া) এ কি ব্যাপার! শশী ও বিনোদ যে! কি বল্‌ছে শুনি?

(নেপথ্যে) "তুমি যদি রক্ষা কর শশিমুখি, তবেই বাঁচি! তোমার উপরেই আমার একান্ত আশা—একান্ত ভরসা—তোমার হাতেই আমার জীবন-মরণ!

এ কি মা, বাবা যে! (নেপথ্যে শশী) তাই ত আমাদের দেখেন নি ত! এখন পালান যাক্!

ক। শুন্‌লে ত। এর পরেও তুমি শশীকে ধরে রাখবে? এখনি বিদায় কর, এখনি; নইলে আমি ছেলে নিয়ে বিবাগী হব।

গি। (স্বগত) তাই ত! কি ব্যাপার! হঠাৎ যে উল্টো উৎপত্তি হোল!

ক। চুপ ক'রে রইলে যে? অন্য সময় মুখে যে লঙ্কার ফোড়ং ফোটে! এখন একেবারে চুপ। আমি কিন্তু আর চুপ ক'রে থাকতে পারছিনে। হয় শশীকে তাড়াও, নয় আমি এই চল্লুম। জীবন থাকতে ওর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে পারব না।

[প্রস্থানোদ্যত

গি। ও কর্ত্তা, শোন শোন শোন, মাথা খাও, দাঁড়াও।

ক। যতক্ষণ শশী, ততক্ষণ আমি দাঁড়াব? এ শর্ম্মাকে তেমন পাওনি।

গি। ওগো কথা শোন—একটুখানি দাঁড়াও, মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল দিই —রাগটা প'ড়ে যাক্।

[প্রস্থান

(শশীর গান করিতে করিতে প্রবেশ)

গান

প্রাণের উচ্ছ্বাস বাঁধতে নারি
হায় কি করি হোল এ কি!
হাসির তুফান অধরপুটে
আকুল বেগে আপনি ছুটে,
নয়ন-কোণে ব্যঙ্গ লুটে;
অঙ্গে অঙ্গে মাখামাখি!
যতন ক'রে যতই চাপি;
হৃদয় বাপী, ততই যেন উঠে কাঁপি
একুল ওকুল দুকুল ছাপি;
কেমন ক'রে ধ'রে রাখি!

পঞ্চম দৃশ্য

(গৃহিণী পদচারণা করিতে করিতে)

তাই ত! এ কি কাণ্ড দাঁড়াল! আমি কোথা ভাবছি—বেশ চেপে ধরেছি —আমাকেই কি না হঠাৎ পেড়ে ফেল্লে। কি করা যায়। বিধবা—এইটেই হয়েছে মুস্কিল! কিন্তু ছেলে আবার তাকেই পণ করেছে। কি করি! তা আজকাল ঢের হচ্ছে'ও। জজ ম্যাজিষ্টরের ঘরেও ত বিধবা-বিয়ে চলেছে—আর আমাদের দিলেই কি দোষ? আমি ত দোষ দেখিনে, হ'লে ত ভালই। শশিমুখীর মত মেয়ে আর কোথায় পাব,—আর তাকে নইলে আমার ঘরই বা চলে কি ক'রে?

ব। বৌদিদি, আর একগুঁয়েমি করো না। টাকাই তোমার এত বড় হোল? ছেলের সুখটা দেখবে না?

গৃ। (স্বগত)—ঠাকুরঝির'ও দেখছি মত আছে, (প্রকাশ্যে)—ভালই হোল! তা বোন্! তোমরা সকলে যখন বল্‌চ, আমি আর রাজী না হয়ে কি করি বল।

ব। বৌদিদি আমার লক্ষ্মী!

গি। কিন্তু একটা কথা ভাবছি—লোকে কি বল্‌বে?

ব। লোকে ভালই বল্‌বে। দাদা হলেন উন্নতিবিধায়িনীর সভাপতি—তাঁর কাজে কথায় এক হ'লে লোকে ত বাহবাই দেবে!

গি। তা হ'লে তোর মনে হচ্ছে—বিয়েটা হ'লে ভাল?

ব। খুব ভাল। তা আর একবার ক'রে বল্‌তে। আমি এক্ষণি বিনোদকে ব'লে আসি। আহা, কত দিন ধ'রে যে বাছা তোমাকে তার হয়ে বলার জন্য আমাকে সাধছে।

[বরদার প্রস্থান

(কর্ত্তার প্রবেশ)

গি। (স্বগত)—আমার আর যেতে হোল না—আপনিই ঘুরে ফিরে এসে পড়েছেন দেখছি। (প্রকাশ্যে) আহা, এখনো কি মাথাটা ধ'রে আছে? একটু অডিকলন দিয়ে দেব?

(কোলঙ্গার কুঁজা হইতে একটা গ্লাসে জল ঢালন)

ক। না না, আমার একটুও মাথা ধ'রেনি!

(এক গ্লাস জলে এক ফোঁটা অডিকলন ঢালিয়া)

গি। আমি দেই না একটু অডিকলন,—নিশ্চয় মাথা ধরেছে, তুমি বল্‌ছ না,—মুখখান যে বিমর্ষ দেখচি! আমার কাছে কি কিছু লুকোবার যো আছে!

(মাথায় মুখে জলের ছিটা প্রদান)

ক। দোহাই তোমার! আর না,—আমি সেরে উঠেছি—বেশ তাজা মনে হচ্ছে—নিশ্চয় ক'রে বল্‌ছি—আর একটুও বিমর্ষ নেই।

গি। ঠিক বল্‌ছ ত? দেখলে, অডিকলন দিতেই কেমন মাথাটা সেরে গেল,—আর একটু দিয়ে দিই—তাতে ত আর দোষ নেই।

(গ্লাসের জলটা মাথায় ঢালিতে ঢালিতে)

আর গরম মনে হচ্চে না? বেশ আরাম করছে?

ক। কর কি? কর কি? গরম? শীতে কাঁপছি।

গি। সে আবার কি? কুইনিনের শিশিটা আন্‌ব নাকি! ভয় করে যে,—জ্বরটর ত হবে না?

ক। না গো না— রক্ষা কর— আমি বেশ আছি—আস্ত মানুষটাকে তুমি দেখছি গঙ্গাযাত্রা করাবে!

গি। শুন্‌লে কথার ছিরি! ও রকম ক'রে গালাগালি দিও না বলছি। তা হ'লে একাদশী কে কর্‌বে শুনি। তুমি না আমি? গায়ের গহনা মাথার সিঁদুর খস্‌বে কার? তোমার না আমার? ভাল কথা বল্লেও আজকাল দোষ! হায় রে—এত দুঃখও অদৃষ্টে ছিল?

(কপালে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন)

ক। ঘাট হয়েছে—ঘাট হয়েছে—এমন কথা আর বল্‌ব না—থাম থাম।

(চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে)

তুমি আমার তালুক মুলুক তুমি টাকার তোড়া!
তুমি চেলি বারাণসী তুমি শালের জোড়া।

গি। (হাসিয়া হাত ঠেলিয়া) সব, কথা শুন্‌লে লোকে ভাববে, যেন কতই ভালবাস; কিন্তু—

ক। ভালবাসিনে?

কি বল্‌ব গো চাঁদবদনী কত ভালবাসি!
তোমার ঐ একনয়নে মধুর ধারা—
একনয়নে হাসি!

গি। দেখ, তুমি একশবার চাঁদবদনী—চাঁদবদনী ক'র না, চাঁদ নামটা শুন্‌লেও আমার গা জ্বলে যায়।

ক। আচ্ছা, এবার থেকে আমি তোমাকে কৃষ্ণবদনী বল্‌তেও রাজী আছি—তোমারও শশীকে বিদায় করতে হবে!

গি। আমি ভেবে দেখছি, সে কাজটা ঠিক হবে না। ছেলের যখন অত মন পড়েছে—তখন আমাদের নারাজ হওয়াটা কি ভাল? তাতে নিশ্চয় উল্‌টো উৎপত্তি হবে।

ক। কি সর্ব্বনাশ, তুমি ওর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতেও রাজী! তুমি দেখছি সব পার—সব পার!

গৃ। তা কেন দেব না? অমন মেয়ে আর কোথায় পাব বল দেখি? আর তুমি যে সভায় প্রতিজ্ঞা করেছ, বিয়েতে টাকা নেবে না—সে দিকেও এতে পণ বজায় থাকবে,—সভাপতির উপযুক্ত কাজ করা হবে।

ক। কিন্তু ও যে বিধবা?

গি। কেন, আজকাল ত বিধবার বিয়ে শাস্ত্রসম্মত হয়েছে, কত বড় বড় লোকের মেয়ের আবার বিয়ে দিচ্ছে।

ক। ওগো, সে ত নিজের মেয়ের। বিধবা মেয়েকে ত কেউ ঘরে আনুছে না।

গি। তা না হয়, তুমিই আনবে—তুমিই পথ দেখাবে; তাতে তোমার কত নাম হবে বল দেখি? সবাই ধন্যি সভাপতি বলবে।

ক। এটা যে কলিযুগ গো গিন্নি! তুমি একে সত্যযুগ ব'লে বিশ্বাস কর্‌লে ত চল্‌বে না। এখনি ঠেলা খেয়ে জেগে উঠতে হবে।—খবরের কাগজ পড় না—তাই ত হয়েছে গোল!

গি। জানি গো জানি, সব জানি—খবরের কাগজ না পড়েও জানি। এখন আর একঘরের ভয় নেই—ঠেলা খেয়ে না হয় লোক একঘর থেকে আর একঘরে গিয়ে দাঁড়াবে। এখন দুনৌকায় পা দিয়েও বেশ চ'লে যাওয়া যায়, কেবল যদি মনের বলটুকু থাকে।

ক। দেখ—

গি। আমি বেশ দেখছি। তোমরাই আমাদের বেলা চোখ্‌ থাকতেও কাণা, আর প্রাণ থাকতেও মড়া; ১০।১২ বছরের ছোট ছোট মেয়েগুলো যদি

বিয়ের পরদিনই বিধবা হোল, তবু তার আবার বিয়ের নাম মুখে আন্‌লেও জাত যায়—আর আমি যদি আজ মরি, তা হ'লে তুমি—

ক। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) রাম রাম! ও কথা বল্‌তে আছে! নিশ্চয় বল্‌ছি, আমি তা হ'লে সহমরণে যাব!

গি। দেখ, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিও না, বল্‌ছি। এ পোড়া দেশে মেয়ের জন্ম কেন যে ভগবান্ দেন, তা বুঝতে পারিনে। এমনি অদৃষ্ট—একজন যদি তাদের দুঃখে চোখের জল ফেল্লে ত অমনি দশজনে হাঁ হাঁ ক'রে তাকে মার্‌তে ছুটবে!

ক। তোমার দুটি চরণে ধরি—দোহাই তোমার, থামবে?

গি। থামব কেন? দেখে শুনে সর্ব্বশরীর জ্ব'লে গেল! যে জাত মেয়েদের এত দুঃখ দেয়—তার মঙ্গল নেই—নেই—এই আমি তোমাকে ব'লে দিলুম।

ক। আচ্ছা, আমি তোমাকে অনুমতি দিয়ে যাব;—আমি মর্‌লে তুমি আবার বিয়ে কর্‌তে পার, এমনতর উইল ক'রেও যাব,—তা হলেই ত সব দুঃখ ঘুচবে?

গি। দেখ, দুঃখের সময় ঠাট্টায় আরো প্রাণ জ্বলে! তুমি কি ভাব, বিধবাদের বিয়ে চলিত হলেই সব বিধবারা অমনি বিয়ে কর্‌তে যাবে? মেয়েদের পুরুষের মত পাওনি গো—কুমারীরাই বিয়ে কর্‌তে চায় না—তা বিধবা! তবে কেবল একটা পথ খুলে রাখা; মেয়েরা অসহায় জাত—তেমন কষ্টকর অবস্থায় কেউ যদি চায়—ত বিয়ে করাই ভাল। কিন্তু তাদের কষ্টে রেখেই তোমাদের যত ধর্ম্ম, যত পুণ্যি,—হায় হায়! বলিহারি যাই। আর এদিকে সব উন্নতিবিধায়িনী সভাপতি, সম্পাদক,—সহকারী এই সব!

ক। দেখ, অনেকক্ষণ ধ'রে তোমার গাঁজাখুরী বেলেল্লাগিরী কথা শুনেছি—আর পারিনে। তোমার মাথা দেখছি, একেবারে গেছে। যতক্ষণ শশী বাড়ীতে আছে, ততক্ষণ তুমি দেখছি কন্ধ হয়ে থাক্‌বে। ওকে না তাড়িয়ে আমি জলগ্রহণ কর্‌ছি নে।

গি। কি! তোমার দেখছি যত বড় মুখ না তত বড় কথা! আগে তোমার চন্দ্রকে তাড়াও দেখি।

ক। আমার চন্দ্র ত কোন দোষ করে নি। সে ত আর তোমার শশীকে বিয়ে কর্‌তে চায় নি।

গি। ওঃ, তুমি বুঝি তাই চাও? বুঝেছি, তোমার মতলবখানা, আর বল্‌তে হবে না! সেই জন্যই দেখছি যত হেঙ্গাম! কিন্তু প্রাণ থাকৃতে আমি তা হ'তে দিচ্ছিনে। হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া, সে আমার শশীকে বিয়ে করবে।

ক। দেখ, অমন ক'রে গাল দিও না বলছি! জান, সে আমার সম্পর্কীয় লোক—আমার—আমার—আপনার অন্তরঙ্গ আত্মীয়।

গি। হি হি হি—তোমার আপনার—অন্তরঙ্গ—আবার আত্মীয়! বাস্ রে—গেছি যে।

ক। কি হাসিরই ছিরি। আমার আত্মীয় না ত কি? আমার ভগিনীপোতের শালার পোষ্যপুত্র—

গি। আর শশী যে আমার তার চেয়েও আপনার,—আমার বোনের সই-এর পাতান মেয়ে! তোমার সম্পর্ক বড় না আমার?

ক। আচ্ছা বাজি?

গি। কত?

ক। দশ টাকা।

গি। বেশ, দাও, আমার জিৎ—আমি ঠিক বল্‌ছি!

ক। তুমি বল্লেই ত হবে না।

গি। আচ্ছা, সালিসি মান।

ক। কাকে?

(বরদার প্রবেশ)

আচ্ছা বেশ, বরুকেই সালিসি মানা যাক।

গি। আচ্ছা ঠাকুরঝি, তুমিই বল, চন্দ্রকান্ত হোল ওঁর ভগ্নীপোতের শালার পোষ্যপুত্র—আর শশী হোল আমার বোনের শাশুড়ীর সইএর পাতান মেয়ে; কে বেশী আপনার বল দেখি?

ব। তাই ত—আমি ঠিক বল্‌তে পার্‌ছিনে—সমস্যা বটে! টোলের মত নেও।

ক। তবু 'কমন সেন্স'—এই সহজ বুদ্ধিতে কি বলে—তাই বল না ছাই!—

ব। দাদারই যেন বেশী আপনা। ও হোল দুপুরুষে, আর শশী হচ্ছে—তিন পুরুষের তফাৎ।

গি। পক্ষপাতিনী! চন্দ্রের সঙ্গে ভগ্নীপোতের সম্পর্ক ধ'রে সম্পর্ক, আর

শশী সম্পর্কে হচ্চে বোন্ থেকে। চন্দ্রকান্ত কর্ত্তার বোনায়ের শালার পুষ্যি। আর শশী হোল আমার বোনের শ্বাশুড়ীর সইএর পুষ্যি! ভগিনীপোত আপনার না বোন্ আপনার? সব বুঝেছি, বুঝেছি, সবাই মিলে আমাকে ভগবান্ ভূত ক'রে চন্দ্রকান্তের সঙ্গে শশীর বিয়ে দেবেন, এই চেষ্টা। তা আমি প্রাণ ধ'রে কখনই দেব না। ও আমার শশীমুখী রে, সোনারমণি, দধির খনি, প্রাণজুড়ান ধন রে, তোকে আমি প্রাণ থাক্‌তে আর কাউকে দিতে পার্‌ব না।

[ক্রন্দন করিতে করিতে পলায়ন

ব। দাদা, ব্যাপারখানা কি?

ক। কি বল্‌ব, সর্ব্বনাশ উপস্থিত। বিনোদটা দেখি শশীর হাত ধ'রে বল্‌ছে, তুমি আমাকে রক্ষা কর, তুমি আমার জীবন-মরণ, এই সব!

ব। ওঃ, বুঝেছি। তাই ভয় পেয়েছ? ঠাণ্ডা হও। সে আমিই শিখিয়ে দিয়েছিলুম। বল্লুম, শশীকে গিয়ে ধ'রে পড—সে যদি মনে করে, হরিবাবুর মেয়ের সঙ্গে এখনি বিয়ে হয়ে যাবে।

ক। তাই বটে। আঃ বাঁচলুম। মাথা থেকে যেন পাহাড় নামল! সকল মুনিরই তা হ'লে দেখছি একই রকম যুক্তি। চন্দ্রকান্তও আমাকে ঐ পরামর্শ দিয়েছে। আমার কিন্তু ইচ্ছা, শশীটাকে দেশছাড়া করি।

ব। তার হচ্ছে সোজা উপায়

ক। কি কি—বল বল—আঃ, বাঁচাও।

ব। চন্দ্রকান্তের সঙ্গে শশীর বিয়েটা দিয়ে দাও, সব ল্যাঠা চুকে যাবে।

ক। কি সোজা উপায় বল্লে, মরে যাই।—চন্দ্রটা শুদ্ধ তা হ'লে হাতছাড়া হয়ে যাবে। সে আমি কিছুতেই পারছিনে—তার চেয়ে গিন্নী ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চান, তা দিন।

ব। কি যে দাদা বল! চন্দ্রর সঙ্গে বিয়ে হ'লে শশী এমন মুঠোর মধ্যে হবে—যে, তখন তার টু শব্দটিও থাকবে না।

ক। বটে? আমি ত চিরদিন উল্‌টোটাই দেখছি। বিয়ে হ'লে চন্দ্রই ভেড়া বনার বেশী সম্ভাবনা।

ব। তোমার মতন কি না সবাই! তা হ'লে আর সংসার এমন হত না।

ক। দেখি চন্দ্রকে ব'লে। কিন্তু গিন্নি রাজি হবেন না—(মাথা নাড়িতে নাড়িতে) সে আমি বেশ বুঝেছি।

ব। রাজি হবেন না? আচ্ছা দাদা, দেখে নিও।

ক। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) তবে তাই হোক; যা ভাল বোঝ, তাই কর।

[প্রস্থানোদ্যত

ব। দেখ দাদা, একটু শক্ত হয়ো। অত নরম হ'লে সংসার চলে না।

ক। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) নরম? ঘা খেয়ে খেয়ে মনটার আগাগোড়া ঘাঁটা প'ড়ে গেছে। যা হ'ক দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

(উভয়ের প্রস্থান এবং গান গাহিতে গাহিতে কর্ত্তার পুনঃ প্রবেশ)

কোথা তুমি প্রাণেশ্বরি।
ঘোর—বিরহ-তুফান—গরজে কামান—
অভয় কর দান—কর্ণে ধরি।
দোষ করে থাকি রোষ ভুলে যাও,
গজেন্দ্র-চরণে স্থান তবু দাও,—
দীন অভাজনে বারেক ফিরে চাও, অন্তিমে কাতরে স্মরি।
এস—ভ্রূকুটি-লোচনে—প্রাণ চমকিয়া
এস—প্রখর বচনে কান মুখরিয়া
এস—নিম-অধরে—ভীম হাসিয়া দেখি দুনয়ন ভরি!

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

কক্ষ

(গৃহিণী ও বিনোদ)

গৃ। বাবা, আমি বড় খুসী হয়েছি—আমাকে আগে ত খুলে বল্লেই হোত। তোমার যা ইচ্ছে—আমারও তাই ঠিক ইচ্ছে।

বি। আমি ভেবেছিলুম—বুঝি—

গৃ। বাবা, বোঝ না ত, ছেলের সুখেই মা'র সুখ। তা হ'লে বাবা শুভস্য শীঘ্র—আমি বলি, এখুনি নিমন্ত্রণচিঠিগুলো লিখে বিলি ক'রে ফেল, পরশুই দিন ঠিক করা যাক।

বি। পরশু! এত শীঘ্র কি সব যোগাড় হয়ে উঠবে?

গৃ। বেশী লোক ত আর বল্‌ছিনে,—দু'চারজন আত্মীয়-বন্ধু বরযাত্রী এখানে এসে মিষ্টিমুখ করবে—তার পরে কনের বাড়ী যাবে,—এতে আর এমনই কি হেঙ্গাম ?

বি। তবে বাবাকে একবার বল।

গৃ। সে আমি ঠিক সময়েই বলব এখন, সেজন্য তোর ভাবনা নেই। তুই এখন চিঠি কখান লিখে বিলি ক'রে ফ্যাল,—এই তোর কাকার বাড়ী, মামার বাড়ী, রামবাবুদের—আর—

বি। হরিবাবুদেরও ত বলতে হবে ?

গৃ। তা বল না—তাদেরও জানান উচিত বই কি—এতদিন থেকে আশা ক'রে আছে—এখন ঠিকটা বুঝুক।

বি। তা কি রকম চিঠি লিখিব ?

গৃ। এই বিয়েতে যেমন লিখে থাকে—তোমার বাবার নামেই চিঠি হবে।

বি। আচ্ছা, আমি প্রাণধনবাবুর ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রখানা দেখে লিখে ফেলছি। কন্যার বাড়ীর নম্বরটা ?

গৃ। অত নম্বর দেবার দরকার কি বাবা! বরযাত্রী ত সবাই এখানেই প্রথমে আসবে,—এসে তোর সঙ্গেই ত ক'নের বাড়ী যাবে।

বি। তা বটে!—কার মেয়ে সেটা অবশ্য লিখতে হবে ?

গৃ। তাতেই বা দরকার কি ?

বি। কিন্তু চিঠিতে ত তা থাকে দেখতে পাই।

গৃ। আমি বলি, না থাকাই ভাল। অত আড়ম্বর ক'রে লেখাটা ঠিক হবে না—যত কম কথায় চিঠি সার্‌তে পার—

বি। আমিও দেখছি তাই সুবিধা ; কাজটা চটপট হয়ে যাবে। তবে যাই, চিঠিগুলো বিলি ক'রে ফেলি গে, তুমি বাবাকে ব'লে রেখো।

গৃ। দাঁড়া দাঁড়া—আর একটা কথা,—মিষ্টান্ন কিছু ফরমাস দিতে হবে।

বি। কার নামে ?

গৃ। কার নামে আবার ? কর্ত্তার নামে।

বি। একবার তবু জিজ্ঞাসা ক'রে এস,—কি কি চাই।

গৃ। জিজ্ঞাসা আবার করব কি ?—কি কি চাই জানিনে নাকি ? তাঁকে বলতে গেলেই বলবেন—এটা—কম কর—সেটা কম কর,—জান ত বাবা,

তোমার বাবার ধরণ! তার চেয়ে তুই ফরমাস দিয়ে আয়—তখন আর গোল করার উপায় থাকবে না।

বি। বেশ! তুমি যা বল। আমি এখনি গিয়ে সব ঠিকঠাক ক'রে ফেল্‌ছি।

[প্রস্থান

গৃ। বিয়ের খবর পেয়ে হরিবাবু কি রকম ব'সে পড়বে—আমি তাই ভাবছি! হি হি হি, বাছা আমার পাঁচটি হাজারের জন্য এমন বর হারালে! উঃ! আমার এত আহ্লাদ হচ্ছে। হি হি হি, শশী যখন বৌ হ'য়ে উঠবে, তখন আর তাকে কেউ পুষ্যি ব'লে—দাসী ব'লে নাক তুলতে পারবে না! চন্দ্রকান্ত তার কাছে তখন চাকর! হি হি হি! যাই, এখন দাঁড়িয়ে হাস্‌লে চল্‌বে না। শশীকে নিয়ে বোনের বাড়ী যাই—সেখান থেকেই বিয়েটা হোক, সব ঠিকঠাক ক'রে আসি। শশি—শশিমুখি—কোথায় আবার গেল?

[গৃহিণীর প্রস্থান

(শশীর প্রবেশ)

শ। তাই ত! এ কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! (দেয়ালে টাঙ্গান একখানি আয়নায় মুখ দেখিতে দেখিতে) তা এমনি কি আশ্চয্যি! আমি যখন নিজের মুখখানা দেখি, তখন নিজেই মোহিত হয়ে যাই। তবে কথা হচ্ছে, তাতে ত একটা মীমাংসায় উপস্থিত হ'তে হয় না নিজে আমি ত চিরদিন নিজেরই আছি—নিজেরই থাক্‌ব;—এখন কথা হ'চ্ছে, এদের দুজনের মধ্যে কাকে রাখি—কাকে ঠেলি! (কপালে অলকদাম কুঞ্চিত করিতে করিতে) তাই ত, এ যে বিষম সমস্যা! একজন হলেন বড়—একজন ছোট। একজন প্রভু, একজন অনুগত, একজন পুত্র, একজন পুষ্যি। একজনের সঙ্গে বিয়ে হ'লে আমি হব ধনীর ঘরণী, ধনীর গৃহিণী, দাস-দাসী সেবা করবে, জগতের লোকে আদর কর্‌বে, অন্য জনের সঙ্গে বিয়ে হ'লে আজও যা—কালও তাই। এতে আর সমস্যা কি হ'তে পারে? ওগো চাঁদ্‌বদনী, তাকেই তুমি বিয়ে কর—যার স্ত্রী হ'লে জগৎ-সংসার তোমার অনুগ্রহভিখারী হবে। সেই ভাল, সেই ঠিক! উঃ, কি সুখ! কি আহ্লাদ! আমার যেন ধরাখানা সরা জ্ঞান হচ্ছে। কিন্তু তবুও কান্না পাচ্ছে কেন? তা হ'লে চন্দ্রকান্তের দশা কি হবে! সে কি ম'রে যাবে না? সে যে আমাকে বড়

ভালবাসে—আর আমিই কি বাঁচব? কার সঙ্গে পরামর্শ করি? বলি ও চন্দ্রকান্ত, কোথায় গেলে তুমি,—আমি আর সহ্য করতে পারছিনে।

(কৌচে অর্দ্ধশায়িতভাবে উপবিষ্ট হইয়া গান)

মল্লার—রূপক

আমার,—কেন গো আজি হেন উদাস প্রাণ।
কেন—মধুর রাগে হেন বেসুরো তান।
চঞ্চল মন সব হেলা ফেলা—
কিছু না ভাল লাগে হাসি খেলা,
প্রখর তাপ এ কি! প্রভাত বেলা,
শান্ত মেঘে এ কি বজ্র গান।
এই কি ভালবাসা! এরে কি প্রেম কহে?
তবে—কি লাগিয়া চায় সবে—কিসের মোহে!
মলয় মধু বায়ু ইহা ত নহে,
এ যেন ফাগুন আগুন-বাণ!

সপ্তম দৃশ্য

কক্ষ-সম্মুখস্থ বারান্দা

(চন্দ্রকান্তের প্রবেশ)

চ। প্রাণটা যে ষোল আনাই হু হু করছে। আঃ, শশী যে দু'দিন থেকে কোথায় গেল—কিছুই বুঝতে পারছিনে;—এমন কি করতে হয়—প্রেয়সি!

(নেপথ্যে—ও চন্দ্রকান্ত, বলি ও চন্দ্রকান্ত)

আবার এই সময় কর্ত্তাবাবু ডাকাডাকি হাঁকাহাকি করছেন, নিস্তব্ধে যে একটু বিরহ-জ্বালা ভোগ করব—তারও যো নেই!

(কর্ত্তার প্রবেশ)

ক। চন্দ্রকান্ত, এ কি ব্যাপার? এ কি কাণ্ড?

চ। কি হয়েছে?

ক। আমি ত কিছুই তলাতে পারছিনে—তুমি ছাড়া কেউ পারবে না।

(ঝুড়ি মাথায় সন্দেশওয়ালীর প্রবেশ)

ক। এ কি? এ যে এখানে পর্য্যন্ত এসে উপস্থিত! বেরো বল্‌ছি—বেরো! কি করি বল দেখি চন্দ্রকান্ত—এ বেটী বলছে—আমি সন্দেশ ফরমাস দিয়েছি—কিন্তু দিব্যি ক'রে বলছি—আমি এর বিন্দু-বিসর্গ জানিনে।

চ। তাই ত!

স-ওয়ালী। আপনকার বড়লোকের কি রকম এ কথা বাবু! আপনিই ত চিঠি দিয়েছ। অর্জ্জুন ময়রা কি এমনি—আমাকে চিঠি শুদ্ধ পাঠিয়েছে—এই দেখ!

ক। (চিঠি দেখিয়া) তাই ত, আমারি ত নামসই দেখছি! চন্দ্রকান্ত, ভয় পেয়ো না যাদু,—তুমিই কি আমার নামে এ কাজ করেছ? সত্য ক'রে বল—আমি কিছু বলব না।

চ। আমার ঘাড়ে দোষ নিলে যদি দামটা দিতে না হয়—তা হ'লে আমি রাজি আছি। কিন্তু তাতেও যখন আপনি রেহাই পাবেন না, তখন সত্য কথাই বলা ভাল—আমি এর কিছুই জানিনে।

(থাজাওয়ালীর প্রবেশ)

খা-ওয়ালী। এজ্ঞে কি রকম আপনার বাড়ীর লোক সব—খাজা গজা মতিচুর এনে—এত ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করছি—কেউ নিতে আসছে না—কাজেই উপরে উঠে আসতে হোল!

ক। খাজা গজা মতিচুর!

খা-ওয়ালী। এজ্ঞে হাঁ?

ক। কেন?

খা-ওয়ালী। তা কি ক'রে জানব—আপনি ফরমাস পাঠিয়েছ, আপনিই বলতে পার।

ক। আমি ফরমাস পাঠিয়েছি?

খা-ওয়ালী। ও মা! অস্বীকার যান না কি? আজকাল দেখছি ধর্ম্ম নেই। ভাগ্যি ছেলেটা চিঠিখানা সঙ্গে দিয়েছে—এই দেখ!

(চিঠি প্রদান)

ক। দেখ চন্দ্র, তুমি দেখ—যদি কিছু বুঝতে পার। আমার মনে হচ্ছে, আমি স্বপ্ন দেখছি।

চ। ঠিক মনে করুন দেখি—আপনি এ রকম স্বপ্ন আর কোনদিন দেখেছিলেন কি না? কোন বিষয় ইচ্ছা ক'রে—

ক। না বাবা, আমি ত মোটেই মনে করতে পারছিনে।

চ। আচ্ছা, আমি সন্ধান দিচ্ছি।

[চন্দ্রকান্তের প্রস্থান

(রসগোল্লাওয়ালীর প্রবেশ)

র-ওয়ালী। আজ্ঞে, কাঙ্গালীচরণ রসগোল্লা পান্তুয়া পাঠিয়ে দিলে। এক একটা চেখে দেখতে আজ্ঞে হয়।

ক। চেখে দেখব। নিয়ে যা তোর রসগোল্লা পান্তুয়া! আমি দেখছি পাগল হয়ে যাব! ও চন্দ্রকান্ত, তুমি আবার কোথায় গেলে! কিছু কি সন্ধান করতে পারলে?

(কচুরী, নিমকি প্রভৃতি লইয়া আর একজনের প্রবেশ)

ক-ওয়ালী। আজ্ঞে, খাস্তা কচুরী, নিম্‌কি, সিঙ্গেড়া, পাঁপড় এই সব এনেছি, আঃ, একটু বসি।

অন্য সকলে। বেশ বলেছ—আমরাও বসি—সেই অবধি দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে পা ধ'রে গেল!

ক। কৃতার্থ হলুম! তোমরা সকলে মিলে এখানে ব'সে ব'সে খাওয়া দাওয়া কর, আমি চল্লুম।

(সকলে পুনরায় দাঁড়াইয়া উঠিল)

১ম। তা যাবে যাও, সন্দেশের টাকাটা দিয়ে যাও বাবু, জান ত অর্জ্জুন ময়রা!

২য়। আমার টাকাটা আগে মশায়!

৩য়। এজ্ঞে, আমরা বড় গরীব,—দোহাই।

৪র্থ। টাকা না দিলে আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।

ক। কি সর্ব্বনাশ! নিজের বাড়ীতে যে আমাকে বন্দী করলে! সর বল্‌ছি—নইলে—নইলে!

(বাজীওয়ালার প্রবেশ)

ক। এ আবার পুরুষ মানুষ! তুমি কে হে? কি মিষ্টি এনেছ? আর অবিশ্বাস করার যো নেই, আমিই সব ফরমাস দিয়েছি।

বা-ওয়ালা। আজ্ঞে না, আমি কোন মিষ্টি আনি নি।

ক। মিষ্টি আন নি? ভারী যে আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে! শ্যামধন দত্তের কাছ থেকে কোন মিষ্টান্নের ফরমাস পাও নি?

বা-ওয়ালা। আজ্ঞে না, আমি—বা—

ক। ভারী আশ্চর্য্য ত! সবাই ফরামাস পেয়েছে, কেবল তুমি পাও নি? এ হ'তেই পারে না।

বা-ওয়ালা। তা পেয়েছি বই কি।

ক। পেয়েছ—আঃ, বাঁচালে—তাই বল।

স-ওয়ালী। দামটা চুকিয়ে দাও না মশায়!

খা-ওয়ালী। আর কত দেরী কর্‌ব?

ক। আঃ, ভদ্রলোকটার সঙ্গে একটু কথা কইতেও দেবে না?

ক-ওয়ালী। তা কও না—কথা কইতে কইতে কি আমাদের টাকা দিতে পার না বাবু?

র-ওয়ালী। আমাদের কি ঘরকন্না নেই বাবু—চব্বিশ ঘণ্টা আমরা এখানেই কাটাব?

ক। চুপ কর—চুপ কর বল্‌ছি। তা তোমাকে কি ফরমাস দিয়েছি বাবা?

বা-ওয়ালী। আমি বাজীকর! বাজী আন্‌তে ব'লে ভুলে গেছেন দেখছি!

মিষ্টান্নওয়ালীগণ। ওঁর ঐ রকম মেজাজ! সব আন্‌তে বলেন—আর টাকা দেবার বেলা ভুলে যান,—বুঝলে কথাখানা?

ক। আমি বাজি আন্‌তে বলেছিলুম?

স-ওয়ালী! ঐ শোন!

(সকলের হাস্য)

ব-ওয়ালা। নইলে আন্‌বে কেন বলুন?

ক। তা ত ঠিকই। আমি যখন সন্দেশ আন্‌তে বলেছি, রসগোল্লা আন্‌তে বলেছি—কচুরী, নিম্‌কি, খাজা, গজা, সব আন্‌তে বলেছি—তখন নিশ্চয় বাজীও আন্‌তে ব'লে থাক্‌ব!

ব-ওয়ালা। তবে কোথায় পোড়াব মশায়?

ক। কোথায় আর পোড়াবে? আমার মাথায়! বলি ও চন্দ্রকান্ত!

(চন্দ্রকান্তের হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ)

চ। মশায়—বড় বড় গাড়ী জুড়ীতে রাস্তা ভ'রে গেছে—লোকে লোকে গিস্-গিস্ করছে।

ক। কেন কেন? আমি তাদেরও কি ফরমাস দিয়েছি?

চ। সবাই বল্‌ছেন—আপনার নিমন্ত্রণ-চিঠি পেয়ে তাঁরা বরযাত্রী এসেছেন।

মিষ্টান্নওয়ালীগণ। ঐ শোন্—শুন্‌লি?

চ। আপনি কি কোন চিঠিপত্র—

ক। একটু ভাবতে দাও—চিঠিপত্র ত কই কিছুই মনে কর্‌তে পার্‌ছিনে বাবু।

চ। কিন্তু শুন্‌ছি, বিনোদবাবুর সঙ্গে শশীর বিয়ে দেবার জন্যে—

ক। বিনোদের সঙ্গে শশীর বিয়ে! তাই নাকি গিন্নীর মৎলব? কি সর্ব্বনাশ! চন্দ্রকান্ত, তুমি এগুলোকে বিদায় কর—আমি আস্‌ছি।

[প্রস্থান

স-ও। মশাই, কে আপুনি—শালাবাবু বুঝি?

চ। দূর হ পাজিনী—

রস-ও। না না, দেখছ না—উনি বোধহয় ভগ্নীপোত হবেন।

চ। মলো মাগী—বেরো।

খা-ও। না না, দেখছ না—জামাইবাবু বুঝি।

চ। আমি কে, সে খবরে তোদের কি দরকার?

ক-ও। তা যেই হও আপনি—আমাদের সে কথায় কাজ কি—টাকাটা আমাদের চুকিয়ে দিলেই চলে যাই।

চ। তা দিচ্ছি—নীচে চল—উঠনে বস্ গে।

সকলে। তা যাচ্ছি, সে কথা ত এতক্ষণ বল্লেই হোত। এখন দেখ্‌ছি—ইনি বাবুর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

[মিষ্টান্নওয়ালীগণের প্রস্থান

(বাজীওয়ালার সম্মুখে আগমন)

বা। আমিও কি নিচে যাব?

চ। তুমি কে হে?

বা। আমি বাজী এনেছি।

চ। বাজী! তা যাও যাও, নীচেই যাও, আমি এখনি আস্‌ছি।

[বাজীওয়ালার প্রস্থান

চ। শেষকালে আমার বিনোদবাবুর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চল্‌বে নাকি? প্রাণ ধ'রে আমি শশীকে তাকে দিতে পার্‌ব না, এতে যে বাঁচে, যে মরে! বেশ বুদ্ধি যুগিয়েছে। তেমন বেগতিক দেখি, তখন বাজীগুলোকে বোমা ব'লে ধরিয়ে দেব —দেখি, শশীর সঙ্গে বিনোদ ভায়ার বিয়েটা কি ক'রে হয়।

[প্রস্থান

("চন্দ্রকান্ত ও চন্দ্রকান্ত" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে কর্ত্তার ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রবেশ ও পশ্চাতে হরিবাবুর আগমন)

হরি। ভণ্ড, পাজি, আহম্মক, বেয়াদব। ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিকঠাক ক'রে, এখন "মশায়, আমি ত কিছু জানিনে"।

ক। সত্যি বলছি হরিবাবু, তোমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করছি, আমি কিছু জানিনে।

হরি। একেবারে ন্যাকা। কচি খোকা! ভণ্ড তপস্বী! পণ্ডশ্রম! তোর যা ইচ্ছে কর্, আমার দশটি হাজার ফেরত দে, আর নয় ত এই উকীলের চিঠি নে, কালই নালিশ চড়িয়ে দেব।

ক। বল কি হরিবাবু! ও, এতদিনের বন্ধুত্ব—তোমার জন্য গিন্নীর সঙ্গে কত ঝগড়াঝাঁটি, মান অভিমান, চোখের জল নাকের জলের আমদানী,—হায়, হায়, হায়! সে সমস্তই মিথ্যা!

হরি। আমি কথায় ভুলিনে বাপু, হয় আমার টাকাকড়ি বুঝে দাও, নয় ছেলেটিকে দাও।

ক। এই, আর ত কিছু না? হরিবাবু, আমি ঠিক বলছি, আমি তোমা বই আর কাউকে জানিনে, তা গিন্নী যদি গলায়—

হরি। তবে চল, ছেলে নিয়ে এক্ষণি আমার বাড়ী চল।

ক। এক্ষণি—এক্ষণি? তা হ'লেই হ'ল ত? আঃ—আঃ! (চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া) আঃ, একটু দম নিয়ে বাঁচি! সত্যি বল্‌ছি হরিবাবু, আমি তোমা বই আর কাউকে জানিনে। আমি আর কাউকে চিনিনে, জানিনে—ও হরিমোহন বাবু—চিনিনে,—গো মশায়, জানিনে—

(হাতে তাল দিয়া সুর করিয়া গান)

(গিন্নির দ্রুতপদে প্রবেশ)

গৃ। আরাম চৌকিতে ব'সে যে ভারী স্ফূর্ত্তিতে গান হচ্ছে! আর এদিকে পুলিসে যে বাড়ী ঘিরে ফেল্লে। এমন পুরুষ নিয়েও মানুষ ঘর করে। হায় রে, আমার কপাল?

ক। (ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) অ্যাঁ, পুলিস? কেন? আমি কি তাদেরও ফরমাস দিয়ে আনিয়েছি? ও চন্দ্র, চন্দ্র গো? হায় হায়! চন্দ্রটাও ভেগেছে দেখছি! হরিবাবু তুমি একবার যদি দেখ, আমি আর পারিনে, লোকে মেয়ের দায়ে পাগল হয়, আমি ছেলের দায়ে পাগল হয়ে উঠেছি। প্রাণ গেল গো গেল! (পুনরায় উর্দ্ধমুখে চৌকিতে নয়ন মুদ্রিত করিয়া উপবেশন)।

হরি। আচ্ছা, আমি দেখে আসছি, অত অস্থির হয়ো না।

[হরিবাবুর প্রস্থান

(চন্দ্রকান্তের প্রবেশ)

চ। আজ্ঞে, পুলিশ বোমা খুঁজতে এসেছে।

ক। (চমকিয়া উঠিয়া) বৌমা, এখন থেকে কি বৌ এলেও পুলিসকে দেখাতে হবে? এই আইন হয়েছে না কি? কিন্তু এখনো ত বিয়ে হয় নি, শশীকে তবে বৌমা ব'লে দেখিয়ে দাও বাবা।

চ। আজ্ঞে, তা না, বাজীর আওয়াজ শুনেছে কি না, তাই বোমা মনে করেছে, এই মানুষ-মারা বোমা, যার জন্যে আলিপুরে, মেদিনীপুরে—

ক। সর্ব্বনাশ। কি হবে, কি হবে! এবার ধনে প্রাণে মারা গেলুম গো, আর উপায় নেই, গিন্নি, উপায় নেই।

(উঠিয়া গিন্নীর অঞ্চল ধারণ)

গৃ। তাই ত! কোথা যাব! এখনি আমাদের সব ধ'রে নিয়ে যাবে না কি? বাবা চন্দ্রকান্ত, উদ্ধার কর, তুমি রক্ষা কর।

চ। তা আপনি যদি রাজি হন, আমি সব মিটিয়ে—

গৃ। এখনি রাজি, যা বল্‌বে তাতেই রাজি।

চ। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) এই—এই—যদি আমার সঙ্গে শশিমুখীর ও হরিবাবুর মেয়ের সঙ্গে দাদাবাবুর বিয়ে দিতে রাজি হন।

গৃ। তা হ'লেই সব চোকে? এক্ষণি বাবা এক্ষণি।

ক। (অঞ্চল ছাড়িয়া) এক্ষণি চন্দ্রকান্ত এক্ষণি। (বুকে হাত দিয়া) উঃ উঃ!

চ। তা হ'লে আর ভাবনা নেই, আমি এখনি সব ঠিকঠাক ক'রে আস্‌ছি। (স্বগত) কি মজা, এক বাণে সব পাখীগুলো মর্‌লো!

[প্রস্থান

ক। উঃ, বুকে হাত দিয়ে দেখ গিন্নী, আর একটু হ'লে নিশ্চয় ফেটে যেত! চন্দ্রকান্ত, বেঁচে থাক বাবা, তুমি ব্রহ্মহত্যা নিবারণ কর্‌লে?

গৃ। দেখ, বিপদের সময়ও এ রকম নাকে কাঁদ্‌বে?

(বিনোদের প্রবেশ)

বি। বাবা, পুলিসের সব লোকগুলো চ'লে গেল।

ক। এরই মধ্যে? সাবাস্‌ চন্দ্রকান্ত—সাবাস্‌!

বি। বাইরে সব লোক ব'সে আছে, আপনি শীঘ্র আসুন।

ক। যাচ্ছি বাবা, একটু দম নিয়ে যাচ্ছি,—তুমি এগোও।

[বিনোদেব প্রস্থান

দেখলে গিন্নি, ভাগ্যিস্‌ চন্দ্রকান্ত ছিল,—তাই এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া গেল।

গৃ। এমন বেইমানী যদি কোথাও দেখেছি! আমার শশী না থাক্‌লে কার জন্য চন্দ্রকান্ত এ কাজ কর্‌ত!

(হরিবাবুর প্রবেশ)

হরি। এখন ঝগড়াঝাঁটি থাক, বাইরে সব বরযাত্রীরা এসেছে, বর নিয়ে চল যাত্রা করা যাক।

ক। বেশ বেশ, সে কথা খুব ভাল।

গৃ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) তবে বিনোদকে বাড়ীর ভিতর পাঠিয়ে দাও, বর সাজিয়ে বরণ ক'রে পাঠাই।

ক। চন্দ্রকান্ত কোথা? শশী কোথা? তাদের বিয়েটা কেন এখান থেকে আগে সেরে ফেলে আমরা বিনোদকে নিয়ে বরযাত্রী চলি না।

(চন্দ্রকান্তের প্রবেশ)

চ। আজ্ঞে, সেই হলেই ভাল হয়; আমিও পাঁজি দেখে এলুম, আজ এখনি

একটা লগ্ন আছে, আর রাত্রেও আর একটা আছে। বিয়েটার পর আমিও বরযাত্রী হয়ে বেরিয়ে পড়ব।

হরি। বেশ বেশ, তাই হবে। তোমার বুদ্ধিতেই বাবা,বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে, কর্ত্তা-গিন্নীর মতের মিল হয়েছে, আর আমিও কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাব পাব কর্‌ছি। তোমাকে আগে তুষ্ট কর্‌তেই হবে, চল বাবা, চল।

গৃ। কিন্তু দেখ কর্ত্তা, সব যেন হোল, দুটো টোপর ত ফরমাস দেওয়া হয়নি, তার কি উপায় ?

চ। তাতে কিছু ক্ষতি নেই, সে জন্য কিছু মনে কর্‌বেন না, একটা ধুচুনি হলেই চল্‌বে এখন, দরকার বুঝে সেটাও আমি ঠিক ক'রে রেখেছি।

হরি। বেশ করেছ বাবা। তোমার উৎসাহ দেখলে আমারও আর একবার পাক খেতে ইচ্ছা করে।

চ। (মাথা চুলকাইয়া) কি বলেন, আজ্ঞে, আপনাদের অনুগ্রহ, আমি যাই, কি হচ্ছে একবার দেখি।

ক। (গিন্নীর প্রতি বঙ্কিম কটাক্ষ করিয়া) কি বল তুমি হরিবাবু! এক পাক!—সাত পাকের একটি পাক কম নয়, এ হচ্ছে বিষম পাক, পাকচক্র! কি বল গো গিন্নি, হা হা!

গৃ। শুন্‌লে কথার ছিরি। পাক খায় কে ? বর না কনে ?

ক। তুমি যদি একটুখানি বিজ্ঞান জান্‌তে গিন্নি, তা হ'লে আর কোন কথা ব্যাখ্যা ক'রে বল্‌তে হোত না। আসল কথাটা হচ্ছে এই ; গতি জিনিষটা বড়ই ভ্রান্তিজনক , দেখ না, পৃথিবীখানা ঘোরে, মনে হয় সূর্য্যি মামাই পালট খাচ্ছেন। সেই রকম আর কি, তোমরা খাও পাক, আমাদের ঘোরে মাথা।

হরি। না গো না, আমরাই খাই পাক, তোমরা ঘোরাও হাতা।

ক। হাতার বদলে যাঁতা কথাটাই এখানে সুপ্রয়োগ হ'ত।

গৃ। বটে। এবার থেকে তবে হাতার বদলে যাঁতাই ধর্‌ব। ঐ রসানচৌকি বেজেছে, যাই, আর দেরী করা চলে না।

কর্ত্তা ও হরি। চল চল, আমরাও যাই, পাকচক্রটা এবার শেষ ক'রে ফেলা যাক।

[সকলে হাসিতে হাসিতে প্রস্থান

(সন্দেশওয়ালীর গাইতে গাইতে প্রবেশ)

এনেছি মনোহরা রস্করা সন্দেশ !

ছুনিয়া মাঝে মিল্‌বে না এমনটি সরেশ ।

(অন্যান্য মিষ্টান্নওয়ালীদিগের প্রবেশ)

দ্বি । আর নাইক ভয় ওগো কর্ত্তা মহাশয়,

আজ বিয়ের রাত্রি, বরযাত্রী

বাওহা দেবে বেশ !

তৃ । এনেছি রসগোল্লা মতিচুর থাজা !

চ । কচুরি নিমকি পাঁপর-ভাজা !

(মাথায় দুই চারিটি হাঁড়ি স্তরে স্তরে বহন করিয়া ক্ষীরওয়ালীর প্রবেশ)

এনেছি দধিক্ষীর, মাতাজি কি ফিকির ।

সকলে । বাজে বাঁশী হাসি হাসি,

বরণ কর শেষ ।

নৃত্যগীতে পটক্ষেপ ।

সমাপ্ত

বসন্ত-উৎসব

গীতিনাট্য

উপহার

ভাই বিহঙ্গিনি,

সখি লো জনম ধোরে
ভাল যে বেসেছি তোরে,
নে, লো, তার নিদর্শন— এই উপহার,
হৃদয়ের আদরিণি— বিহগি আমার।

পাত্রপাত্রীগণ

কিরণ	··· ···	লীলাবতীর প্রণয়ী
কুমার	··· ···	শোভাময়ীর প্রণয়ী
লীলাবতী ও শোভাময়ী	···	নায়িকাদ্বয়
উদাসিনী	··· ···	মায়াদেবীর মন্দিরের যোগিনী
ইন্দু ও ঊষা	··· ···	শোভাময়ীর সখীদ্বয়
কবিতা, সঙ্গীত, রতি, মদন ও বসন্ত	···	দেবদেবীগণ

বসন্ত-উৎসব

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শোভাময়ীর বাটীর উদ্যান।

(উষা ও ইন্দু সখীদ্বয়ের গাইতে গাইতে প্রবেশ)

মিশ্র—কাওয়ালী।

উভয়ে। আজু কোয়েলা কুহু বোলে,
আয়, তবে, সহচরি, রুণুঝুণু রুণুঝুণু,
বসন্ত জয়ধ্বজা তুলে।
মাধবী লতিকা, মল্লিকা যূথিকা
কম্পত মলয়-হিল্লোলে;
সরসে ঢল ঢল, প্রফুল্ল শতদল,
খেলত লহরী কোলে,
পরিমল আকুল, মত্ত মধুপ-কুল,
বিহরত বিকসিত ফুলে।
আয়, সই, মিলি জুলি, ফুলগুলি তুলি তুলি,
সাজাব সখীরে সবে মিলে॥

(উদ্যানে আসিয়া ফুল তুলিতে তুলিতে)

বেহাগ—কাওয়ালী।

উষা। ধর্‌ লো, ধর্‌ লো ডালা, এই
নে কামিনী ফুল—

ইন্দু। (উষাকে ঈষৎ ঠেলিয়া)

তু সখি আঁচল দিয়ে তাড়া লো ভ্রমরাকুল।

উষা। (কপালে হাত দিয়া আকুলভাবে)

উহু, সখি, মরি জ্বলি—

কপালে দংশেছে অলি—

ইন্দু। (উষার চিবুক ধরিয়া পরিহাসচ্ছলে)

কমল মাধুরী হেরি ভ্রমরারি বুঝি ভুল।

উষা। মিছে সই, ফুল তুলি,

ঝ'রে গেল পাপ্‌ড়িগুলি,

ভাঙ্গা ভাঙ্গা তারা মত

ছেয়েছে গাছেরি মূল।

ইন্দু। তুলি গে নলিনী ওই—

উষা। আমি তো যাব না সই,

মৃণাল কাঁটার ঘায়ে কে বল হবে আকুল ?

ইন্দু। সে ভয়ে পিছায় কেবা

তুলিতে অমন ফুল ?

(শোভাময়ীর প্রবেশ)

(দুই সখী শোভাময়ীকে বেষ্টন করিয়া)

কালাংড়া—কাওয়ালী।

দুই। কোথা ছিলি, স্বজনি লো এ সুখ-দিনে ?

সারা বাগান ঢুঁড়িনু যে আকুল মনে।

বসন্ত উৎসবে কাল বিয়ে তোর, ললনে,

আমোদে সাজিব, আরো সাজাইব যতনে।

বসন্ত-বাহার—খেম্‌টা।

শো। সখি, তোরা হেসে হেসে হলি যে আকুল।

ইন্দু। ফুটলো সই, এতদিনে বিয়ের ফুল।

উভয় সখী। দেখ্‌লো এ দিকে চাহিয়ে সখি,

মধুপে কেমন দিয়ে লো ফাঁকি,

গরীব গোলাপে এনেছি তুলিয়ে
সৌরভে মরি অসম-তুল।
কতই করিয়ে তোমার তরে
কোমল কামিনী তুলিছি ধীরে
নোয়ায়ে যতনে নরম শাখা
তুলেছি কনক চাঁপার ফুল।
মানিনী মালতী, বিলাসী বেলা,
ধর্ লো—মিশায়ে গাঁথ্লো মালা,
আমরা দু'সখী মিলিয়ে আবার
তুলিয়ে আনি গে কুসুমকুল।

(সখীদ্বয়ের রঙ্গভূমির এক প্রান্তে ফুল চয়ন করিতে গমন,
শোভার এক প্রান্তে বসিয়া মালা গাঁথন।)

(অন্য প্রান্তে ফুল তুলিতে তুলিতে)

ঝিঁঝিট—একতালা।

উ। হোথায় একটি গাছের আড়ালে
মালতী ফুটিয়ে রয়েছে ভাই।

ইন্দু। তাই তো, লো সখি, তুই থাক্ হেথা
আমি তবে হোথা ছুটিয়ে যাই।

উ। না, না, ও যে মোর সাধের কুসুম,
কেন দিব সই, তুলিতে তোরে;
এই দেখ্, দেখ্, যাই তোর আগে;
তুই কি পারিবি ধরিতে মোরে?

(উষার অগ্রে মালতী বৃক্ষের নিকট গমন ইন্দুর আস্তে আস্তে
মল্লিকা চয়ন করিতে করিতে গান)

খাম্বাজ—একতালা।

ইন্দু। যা, যা, তুল গে লো তোর সাধের কুসুম
দিব না, লো, তোরে বাধা,
আমি তুলি এই মল্লিকা রাশি
ফুটেছে কেমন আধা।

উ। এই ঢুলু ঢুলু মালতীর ফুলে,
গাঁথিব মোহন মালা ;
মরি কি তাহাতে মধুর মধুর
সাজিবে রূপসী বালা।

কাফি—যৎ।

ইন্দু। এই মল্লিকাটি পরাইব চুলে,
একটি সাজাব কানের মূলে।

উ। গাঁথি মালিকা, বকুল ফুলে
দোলাব সখীর কবরীমূলে।

ইন্দু। গাঁথ্ গে মালা, কানন-বালা,
তোর সে সাধের বকুল ফুলে।
ওই কি আ মরি! ফুটেছে চামেলি!
যাই, আমি যাই, আনিগে তুলে।

(ফুলে অঞ্চল ভরিয়া ইন্দুর ঊষার নিকট আগমন

পিলু—কাওয়ালী।

উ। মানিনু মানিনু হার তোর কাছে, সখি।
আমার মালতী তোলা,
এখনো হোল না বালা,
ফুলে ফুলে আঁচল ভরা তোর যে লো দেখি,
সারা বাগান লুটে নিয়ে তুই এলি নাকি।

দেশ—খেম্‌টা।

ইন্দু। কেমন সখি, আমার সাথে,
পারলিনে তো তুই।
হেথায় তুলিব জাতি,
হরষ-প্রমোদে মাতি,
সখীর কাছে দিয়ে আসি সেফালিকা যুঁই।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—কাওয়ালী ।

উ । দেখ সখি মেলি আঁখি, গোলাপ বয়ান,
এই গোলাপ-বয়ান ।
তোর রাশি রাশি ফুলের হাসি
এর কাছেতে ম্লান ।

ইন্দু । রাখ জারিজুরি, ভাবি বাহাদুরী,
হবে, গরব-সরব অবসান ।
ফুল রতন মণি, নলিনী রাণী
এনেছি খুলিযা হের স্বজনি,
গোলাপ-গরিমা হেথা প্রলাপ সমান
হা হা প্রলাপ সমান ।
(উদ্যানের অন্য প্রান্তে শোভার গান)

বসন্তবাহার কাওয়ালী ।

শোভা । এ কি এ সুখের তরঙ্গ বহিছে ।
এ ভরা পুলকভার, সহিতে পারিনে আর,
প্রেম সুধা-ধারে হৃদি ছুটিছে ।
এ নিখিল চরাচরমাঝে
আনন্দ-রাগিণী নব বাজে
সে আমার আমি তার,
এ উচ্ছ্বাস গীতিধার
দিকে দিকে উলসি ছুটিছে,
সুখের প্লাবনে হিয়া ডুবিছে ।
চাঁদিমা ছড়ায় জ্যোতি হাস
ফলফুল ঢালিছে সুবাস,
পাখী মধুগান গায় ; আবেশে উথলে বায়
কি নব মাধুরী প্রাণে ভরিছে ।
স্বরগ বসন্ত বুঝি ফুটিছে !

(উষার ও শোভার নিকটে আসিয়া হাসিতে হাসিতে)

ঝিঁঝিট—একতালা

দুই সখি। সরমে মরে যাই
বিয়ে হবে কাল, হরষ স্বজনি,
হেসেই আকুল তাই।

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

ইন্দু। দেখ্‌লো শোভা কত শত
এনেছি কুসুম ভাই।
এই ফুলে গাঁথ মালা, এইগুলি বালা,
পল্লবের সাথে, গেঁথে গেঁথে,
বাসর সাজাতে চাই।

লচ্ছাসার—যং।

শো। যাই সখি, আমি যাই,
গাঁথ্‌ লো তোরা মালা,
দেখে আসি আমি,
কেন এখনো এলো না লীলা।
এ সুখের দিনে, লীলার বিহনে,
কেমনে করি বল কুসুমেরি খেলা।

গারা—খেম্‌টা।

দুই। সখি, চল চল যাই মোরা তবে।
তুমি, স্বজনি, মালা গাঁথা রেখে,
আছে লীলা কোথায় এস দেখে,
আমরাও যাই দুটি, বাসর সাজাতে হবে।
আবার এখানে, এই কাননে,
আসিয়ে মিলিব সবে।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

লীলাবতীর কক্ষ।

(গালে হাত দিয়া লীলাবতীর বিষণ্নমনে গান)

বাগশ্রী—আড়াঠেকা।

লীলা। চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশিথে চেয়ে
দুর্ভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় রয়েছে ছেয়ে।
ভয়ানক সুগভীর, বিষাদের এ তিমির,
আশার বিজলী-রেখা উজলে না এই হিয়ে।
হৃদয়ের দেবতারে, পূজিনু জনম ধ'রে
মর্ম্মভেদী যাতনার অশ্রুজল দিয়ে,
দিয়াছি হৃদয়-প্রাণ, সকলি তো বলিদান,
একটু মমতা তবু পাইনু না ফিরিয়ে।

(অঞ্চলে ফুল লইয়া শোভাময়ীর প্রবেশ ও লীলাকে ফুল ও
মালা দ্বারা সাজাইয়া চিবুক ধরিয়া)

বেহাগ—কাওয়ালী।

শোভা। সুখের বসন্তে আজ, সখি লো কেন লো
মুখানি আহা, বিষাদে মলিন হেন,
উৎপল আঁখি দুটি সজল কেন লো কেন ·
দেখ্ লো কুঞ্জে প্রফুল্ল যূথিকা জাতি
মাখি চন্দ্রমা-বিমল-ভাতি রে,
ঢালে অমিয়া পরিমলে, রঙ্গে লো !
পিউ পিউ মধুর তানে ওই,
ডাকে পাপিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে, সই ;
মাতাইয়া দিক্, কুহু কুহু পিক,
কূজিছে, স্বজনি, লো !
আয় রঙ্গে নিকুঞ্জে, স্বজনি, মিলি
গাঁথি মালিকা বিষাদ ভুলিয়ে,

প্রেম-মদে প্রাণ ঢালি ;
সুখ রজনীরে !

ললিত—আড়া।

লীলা। এ হৃদয় ফুল সখি, শুকায়ে পড়েছে ওরে.
কেমনে কুসুম তুলি বল লো প্রমোদভরে ?
বিমল এ জোছনায়, সুমন্দ এ মৃদু বায়,
দলিত কুসুম কলি আর কি উঠিতে পারে !
নাহিক সুরভি হাস, অকালে কীটের বাস,
যতনেও তোল যদি পাপড়িগুলো যাবে ঝ'রে।

কালাংড়া-পরজ—কাওয়ালী।

শোভা। ছি, ও কি কথা বল, স্বজনি !
বসন্ত-উৎসব কালি, প্রমোদে পরাণ ঢালি,
চল, চল, ফুল তুলি সাজি এখনি।
আঁখি কেন ছল ছল, কহ এ কি অমঙ্গল,
কেঁদে কি পোহাবি আজি সুখ-রজনী ?

পিলু—কাওয়ালী।

লীলা। আমোদে কি আছে, সখী, বাসনা এখন ?
আমোদ ফুরায়ে গেছে জন্মের মতন।
দারুণ যাতনানলে হৃদয় পরাণ জ্বলে,
তুই কি বুঝিবি সখি, আমার বেদন ?
বসন্ত-উৎসব হবে, তোরা সখি, সুখী সবে,
মিলিবে লো, ভালবাসা সোহাগ যতন !
আমার মরমতলে, কি যে এ আগুন জ্বলে,
তোরা কি বুঝিবি, সখি, আমার বেদন ?

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—খেম্‌টা।

শোভা। বল, বল, বল সখি এ কি নব ভাব এ কি,
তবে নাকি হারিয়েছ মন, তাই লো খুলে বল দেখি

ভৈরবী—আড়া।

লীলা। তবে বল্‌ব কি লো, কি বেদনা হেথা—
না না তায় কাজ নাই, তুই কি বুঝিবি ভাই,
চিরসুখী জনে কি লো বুঝিবে এ ব্যথা ?

জয়জয়ন্তী—একতালা।

শোভা। দারুণ আঘাত লাগিল মরমে ;
ও কথা স্বজনি বোলো না ;
চিরসুখী হয়ে কি জানিব দুখ ;
কি বুঝিব তব বেদনা ?
জানিতে গো যদি ও মু'খানি তব
হেরিলে বিষাদে ম্লান,
কি যে যাতনায় ভেঙ্গে চূরে যায়
আমার হৃদয় প্রাণ।
তা হ'লে তা হ'লে বলিতে না কভু
আজি ও নিঠুর কথা ;
তা হ'লে নিদয়া, ও কথা বলিতে
তুমিও পাইতে ব্যথা।

মিশ্র—ফেরতা।

লীলা। তোরে হায়! কব না তো স্বজনি
কাহারে কহিব লো ?
আর আমার কে আছে, কাঁদিব আর কার কাছে,
তোর কাছে লুকাইয়ে কেমনে রহিব লো ?
কি জানি সরমে কেন, তবে বেধে যায় হেন,
ফুটিতে পারিনে কেন বলিতে গিয়ে লো ;
মরম-কথা মরমে তাই আছে লুকান লো।

বেহাগ—আড়া।

শোভা। কেন মোরে এত লাজ।
একটি বোঁটায় দুইটি কুসুম
তার কাছে সখি সরম আজ ?

ভৈরবী—আড়া।

লীলা। না না লুকাব না আর
আমি যারে ভালবাসি সে নহে আমার।
সঁপিয়ে এ মন-প্রাণ, পাইনি কো প্রতিদান,
তবু রেখেছিনু প্রাণ আশায় আশায়।
কিন্তু কি বলিব হায়, হৃদয় বিদরে যায়,
সব সাধ সব আশা শেষ এইবার—
(অবসন্ন হইয়া পতন)

(দূরে উষা ও ইন্দুকে আসিতে দেখিয়া ব্যাকুলভাবে)

কালাংড়া—কাওয়ালী।

শোভা। সখি, তোরা আয় আয়।
লীলাবতী যায় যায়।

(সখীগণ ত্রস্তে প্রবেশ করিয়া বীজন করিতে করিতে ও মুখে জল দিতে দিতে)

সখীগণ। সাড়া শব্দ নাই যে লো!

শোভা। কি বিষম দায় হোল বুক ফেটে যায়!

একসখী। ঐ দেখ, দেখ, সখি মেলেছে কমল আঁখি
বহিতেছে মৃদুশ্বাস তায়।

শোভা ও সখীগণ। ঐ যে লো ধীরে ধীরে
চেতনা আসিছে ফিরে
কাঁপিছে অধর যেন মাধুরী মলয়-বায়;
আর নাহি কোন ভয়!

(সামলাইয়া লইয়া কিছুক্ষণ পরে)

ঝংলা-পিলু—কাওয়ালী।

লীলা। মালতী-মালা খুলে নে খুলে নে
বিষম মরম-বিষে মরম ছাইল গো
আর সখি পারিনে—

একসখী। এলায়ে পড়েছে দেহ আঁখি মুদে আসে

লীলা। আর সখি পারিনে—

দেশ-মল্লার—আড়া।

শোভা। কেন গো ফেলিছ সখি দুখ-অশ্রুধার
ও চাঁদমু'খানি কেন বিষাদে আঁধার ?
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে, কি যাতনা পরকাশে !
স্বজনি থাম গো থাম দেখিতে পারিনে আর।
নূতন শোভায় সাজি আশার মুকুলরাজি
আবার তো বিকাশিবে শুকাবে না আর।
নবীন লতিকাচয়ে, কুসুমে পড়িবে ছেয়ে,
যে রবি গিয়েছে ডুবে উদিবে আবার।

বেলোয়ার—আড়া।

লীলা। জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা ;
জীবন ফুরায়ে এল আঁখি-জল ফুরালো না
এমনি অদৃষ্ট ঘোর, জনমেও সখি মোর,
পূরিল না জীবনের একটি কামনা।
এখন সুখের কথা, উপহাসি দেয় ব্যথা—
এই এ মিনতি সখি ও কথা বলো না।.

দেশ- খাম্বাজ ঝাঁপতাল।

শোভা। সখি হেরিতেছি আঁধারে একটি বিজলি
উদাসিনী কাছে গিয়ে এ দুখ বলি।
যোগিনী সদয় হোলে, মায়াদেবী-কৃপাবলে,
মনের মানস সিদ্ধ হইবে সকলি।

পরজ-কালাংড়া—কাওয়ালী।

সকলে। বেশ! বেশ! ভাই, যাই চল সবে মিলি।
মনের মানস সিদ্ধ হবে সকলি !

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

(নদী-কুলে পর্ব্বত-উপত্যকায় উদ্যান)

মায়াদেবীর মন্দির।

(বীরাসনস্থা উদাসিনী স্তবে মগ্না)

স্তব।

উদা। শক্তিরূপা মহামায়া, দেহ মোরে পদছায়া,
কৃপা-নেত্রে চাহ মাতঃ, ভক্তজন প্রতি।
ভীষণ প্রলয় ঝড়ে, কাঁপাক দেবতা-নরে
ও পদে থাকয়ে মতি দেহ এ শকতি।
তোমারি ইচ্ছার বলে, চন্দ্র-সূর্য্য তারা জ্বলে
শত শত গ্রহ চক্রে ঘোরে অনুক্ষণ ;
মহা ঘোর শূন্যময়, আছিল এ লোকত্রয়
তোমারি কটাক্ষে সব হইল সৃজন ;
স্বর্গ মর্ত্ত্য কি পাতাল, তোমারি মায়ার জাল,
তুমি মাতঃ সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারিণী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, ধ্যায় তোমা নিরন্তর,
তত্ত্ব নাহি পায় তবু জগততারিণি !
স্নেহ প্রেম দয়া দিয়ে, রেখেছ ভুবন ছেয়ে,
তুমিই করুণা-রূপে ব্যাপ্ত চরাচর !
তুমি মায়া মহাদেবী, আজন্ম তোমারে সেবি,
জীবন ত্যজিতে পারি দেহ এই বর !

(লীলা ও শোভার গাইতে গাইতে প্রবেশ)

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

উভয়ে। কোথা গো যোগিনি তুমি
উপায় কর গো ত্বরা।
পড়িয়ে যন্ত্রণা-ঘোরে আজিকে এসেছি মোরা।
প্রণয়ের নিরাশায়, হৃদয় দলিত প্রায়,
জুড়াও এ ভগ্ন হৃদি বরষিয়ে শান্তিধারা।
পর-উপকার-ব্রতে উৎসর্গ করেছ প্রাণ,

তুমি মাতঃ দেখা দিয়ে, বাঁচাও গো অসময়ে,
অকূল সাগরে পড়ে হয়েছি মা দিশাহারা।

(উভয়ে মন্দিরের নিকটে আসিয়া উদাসিনীকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া)

শোভা। চুপ চুপ উদাসিনী ধ্যানে নিমগন
দেখো যেন ধ্যানভঙ্গ হয় না এখন।

(ধ্যানভঙ্গে উদাসিনীকে তাহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া উদাসিনীর নিকট তাহাদের আগমন)

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

উদা। সুগভীর নিশি স্তব্ধ দশ-দিশি
কেন গো বালিকা দুজনে,
অসম সাহসে অনাথিনী-বেশে
এসেছ এ ঘোর বিজনে ?

(কিছুক্ষণ আবার নয়ন নিমীলন করিয়া পরে)

যোগবলে জানি অসময়ে কেন
এ বন করেছ আলা,
জানি গো প্রেমের নিরাশ অনলে
কত যে পেয়েছ জ্বালা।
তোমার মতন প্রণয়ের বিষ
আমিও করিয়ে পান,
সংসার ত্যজিয়ে উদাসিনী ব্রতে
সঁপিয়েছি দেহ প্রাণ।
সে দিন হইতে সমদুখী আমি
নিরাশ প্রণয়ী সনে ;
দেবীর প্রসাদে তোমার কল্যাণ
সাধিব পরাণপণে।

খাম্বাজ-দাদ্রা।

উভয়ে। দেবি, নমি চরণে।

খাম্বাজ—আড়া।

উদা। এস সবে মম সাথে প্রণমি দেবীরে ;
এই লগ্নে এই ক্ষণে কাজ সাধি সযতনে ;
সময় চলিয়া গেলে পাইব না ফিরে।

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

উভয়ে। মাতঃ প্রণমি তোমায়।

(সকলের দেবী-মন্দিরে অগ্রসর ; মন্দির ঢাকিয়া উদ্যানের পটক্ষেপ ; কিছু পরে উদাসিনী ও শোভার প্রবেশ)

পরজ—কাওয়ালী।

উদা। লীলায় রাখিনু মন্দির-মাঝ,
থাকুক সেখানে একেলা আজ,
সে দেখিলে সিদ্ধ নাহি হবে তার কাজ।

বিভাস—আড়া।

শোভা। হউক তাহাই মাতঃ, যা ইচ্ছা তোমার।
এখন আদেশ, দেবি, কি কাজ আমার॥

পঞ্চমবাহার—যৎ

উদা। বসন্ত-সমীরে খুলিয়ে পরাণ
ফুটেছে ঐ যে কুসুমগুলি,
তুমি গো কুমারি, এ শুভ নিশীথে
একমনে যাও আন গে তুলি।

শোভা। দেবীর যা আজ্ঞা তাহা করিব সকলি।

সোহিনী-বাহার—একতালা।

উদা। দিবস উত্তাপে যে সব কুসুম
রেখেছিল চাপি বাস,
নিশির পরশে প্রেমের হরষে
চুমিছে চাঁদের হাস।

যে ফুল-রেণুতে রজত-বিমল
অমিয়া ঢালিয়া চাঁদ,
সেই রেণু দিয়ে, এ শুভ লগনে,
গড়িব প্রেমের ফাঁদ।
সুমঙ্গল তারা যে ফুলের পানে
চাহিছে প্রণয় চোখে,
অতুল কি গুণে ভূষিত সে ফুল,
কি জানিবে তাহা লোকে ?
যাও সেই ফুল আঁচল ভরিয়ে
তুলিয়ে আন গে বালা ;
মন্ত্রপূত হয়ে রহিনু বসিয়ে,
গাঁথিব মায়ার মালা।

পিলু—যৎ।

শোভা। চলিনু আজ্ঞায় তব আশিস আমারে,
সফল হইয়ে যেন হেথা আসি ফিরে।

[শোভার প্রস্থান

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

উদা। একটি দলিত হৃদয় আজিকে
পাইবে নূতন প্রাণ,
সফল মানিব উদাসিনী-ব্রত
প্রেমে দিয়ে প্রতিদান।
(কিছু পরে শোভার ফুল লইয়া প্রবেশ)

বসন্ত-ললিত—কাওয়ালী।

শোভা। ধর গো কুসুম এই, যোগিনী,
তব মন্ত্রে কর কার্য্যসিদ্ধি, জননি '

খট্—ঝাঁপতাল।

উদা। এই পাত্রে রাখি ফুল যাও তুমি বালা,
মন্দিরে প্রবেশ যথা রহিয়াছে লীলা ;

তাহারে পাঠায়ে হেথা, ঘুমাও না তুমি সেথা,
ততক্ষণ হেথা বসি গাঁথি আমি মালা।

[শোভার প্রণাম করিয়া প্রস্থান

বাহার—একতালা।

উদা। (মৃগচর্ম্মে বসিয়া মালা গাঁথিতে গাঁথিতে)

এই নলিনীটি অসময়ে যেটি,
ফুটিয়াছে আজ রাতে,
প্রেম মহৌষধ,—দেব পুরন্দরে
ভুলায়েছে শচী যাতে,
এর রেণু লয়ে করিব সিন্দুর,
পরাইব তার ভালে,
রতিদেবী নিজে, আবির্ভাবি এতে,
মোহিবেন ইন্দ্রজালে।
এই সেফালিকা, গাঁথিব মালিকা,
ধরিবে মোহিনী গুণ,
বসন্ত, তুমি গো, এসে বসো এতে
করিতে প্রণয়ী খুন।
মালিকার মাঝে দিনু এ চাঁপাটি
কবিতা সঙ্গীতে সেবি!
সঙ্গীত, কবিতা, দু'টি বোনে এসে
পরশ এ মালা দেবি!
গাঁথিনু ত মালা, হইল সিন্দুর,
মন্ত্রেতে সাধিনু কাজ;
তব ফুলবাণ হোক অধিষ্ঠান
ইহাতে কন্দর্প আজ।

(লীলার প্রবেশ)

ককুভা—ঠুংরী।

উদা। সময়ে এসেছ তুমি, লীলা,
এস এ অজিনে শোও গো বালা,
পরাব তোমারে মন্ত্রপূত মালা। (লীলার শয়ন)

উদা। (মালা ও টিপ পরাইতে পরাইতে)

রামকেলি—আড়া।

ফুরায় ফুরায় রাতি, নিভ নিভ ইন্দুভাতি,
ঘুমাও ঘুমাও বালা, সুখের শয়নে ;
নাহি হেথা হিংসাদ্বেষ, নাহি ভয় দুখলেশ,
উথলিবে হৃদি প্রাণ প্রমোদ-স্বপনে,
দুখের ভাবনা হেথা, আর ত দিবে না ব্যথা,
মন্ত্রবলে দুঃখ-জ্বালা লুকায়েছে বিরলে।
সুখেতে ঘুমাও তবে, রক্ষিবেন দেবী সবে,
জাগিয়ে নূতন প্রাণ পাইবে সরলে।

(লীলাবতী নিদ্রিতা ও উদাসিনী নিষ্ক্রান্তা)

(সহসা দিক্ উজ্জ্বল করিয়া কবিতার গাইতে গাইতে প্রবেশ)

ঝিঁঝিট—একতালা।

ক। কবির অধরে আসিনু ঘুমায়ে
প্রেমের স্বপনে তোর,
সহসা পরাণে কি যেন বাজিল,
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর।
অমনি একটি চাঁদের কিরণে
চড়িয়া এসেছি হেথা,
মন্ত্রপূত মালা দিনু পরশিয়ে, ঘুচুক প্রণয়-ব্যথা।

(মালা স্পর্শন)

(পুনর্ব্বার চারিদিক্ আভাময় করিয়া সঙ্গীতের গাইতে গাইতে প্রবেশ)

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

স। বাণীর বীণাটি লইয়ে
আমোদে হৃদয় ঢালিয়ে,
এ তারে ও তারে ছুটিয়ে,
করিতেছিলাম খেলা ;

এমন সময় অমনি, কেন গো ডাকিলে যোগিনি ?
দেখাও তবে, গো, এখনি,
কোথা সে ব্যথিত বালা ।

রূপের জ্যোছনা ঢালিয়ে,
ওই যে রয়েছে শুইয়ে,
দিইনু সিঁদুর ছুঁইয়ে
সদয় হইবে নাথ ;

ফুলের সুবাস ধরিয়ে,
হেথায় এসেছি উড়িয়ে,
সেই রথে যাই ফিরিয়ে,
খেলিতে বীণার সাথ ।

(অদূরে রতি, মদন ও বসন্তকে দেখিয়া)

ভূপালী—কাওয়ালী ।

কবিতা ও সঙ্গীত । ঐ আসিয়াছেন হেথা
মকর-কেতন,
প্রণয়ের পরিমলে মোহিয়া ভুবন ।
আবেশে অলস-তনু, উরসে কুসুম-ধনু,
সঙ্গে রতি, সুখ-গীতে উথলে নয়ন ।
ফুলে ফুলময় অঙ্গে, বসন্ত বিরাজে সঙ্গে,
ধরণী হইল কিবা পুলক-মগন ।

(চারিদিক্ দ্বিগুণ জ্যোতির্ম্ময় করিয়া রতি ও মদনের সহিত বসন্তের প্রবেশ)

সিন্ধু-ভৈরবী—রূপক ।

রতি ও মদন । সুখের সেই যে বিয়ে
বাসরে মোরা গিয়ে,
প্রেমের লতা দিয়ে
বাঁধিয়ে দোঁহে ।

যুগল হৃদয়ে শুয়ে,
ডুজনে লুকাইয়ে,
ডুবাস্থ দুই হিয়ে
প্রণয়-মোহে।
হেথায় একটি বালা
পাইয়ে প্রেম-জ্বালা,
পরিয়ে মালা বালা
রয়েছে শুয়ে।
এস এই সুলগনে,
আমরা দুইজনে
ও মালা সযতনে,
আসি গে ছুঁয়ে।
(মালা স্পর্শ করিয়া)

(ললিত—ঠুংরি)।

মদন, রতি ও বসন্ত। দেখিব এখন,
কেন এমন,
পারিবে নিজ মন
রাখিতে বশে।
যে পুরুষ আগে
এর বাগে
চাবে, সে অনুরাগে
পড়িবে ফাঁসে।

ভৈঁরো—একতালা।

কবিতা ও সঙ্গীত। পোহায় যামিনী, মলিন চন্দ্রমা,
বহিছে ঊষার বায়;
সুবর্ণ-মণ্ডিত-সুমেরু-শিখরে
বিভাকর-রথ ভায়।
অধীর-চরণ ভানু-তুরঙ্গময়
তেজে ধাইবারে চায়,

অতি সাবধানে অরুণ সারথি
বাগায়ে রেখেছে তায়।
চল, চল, সবে এই বেলা যাই,
না উঠিতে নব ভানু
একটা ক্ষুদ্র কিরণে তাহার,
দহন করিবে তনু।
মোহিনীবাহার—আড়খেম্‌টা।

সকল দেবদেবীগণ।
সুখে তুমি থাক বালা,
মোরা যাই, নিশি যে পোহায়।
যে মালা পোরেছ গলে, তাহারি মায়ায়
ভুলিবে প্রণয়ী তব হেরিলে তোমায়।

[দেবদেবীগণের প্রস্থান

(উদাসিনী ও শোভার প্রবেশ)

বিভাগ—যৎ।

উদা। পোহাইল বিভাবরী, উদিল নব তপন,
ঊষার মোহন রাগে রাঙিল গগন,
তুমি উঠ, উঠ, বালা, জাগ গো এখন।
বহিছে মৃদুল বায়, পাপিয়া প্রভাতী গায়,
ফুলকুল-সৌরভ আকুল বন।
শিশির মুকুতাপাঁতি, চুমিছে রবির ভাতি,
কমলিনী মেলে আঁখি পেয়ে সে চুম্বন।
তুমি মেলো, গো বালা, কমল-নয়ন।
ভৈঁরো—ঝাঁপতাল।

লীলা। (জাগিয়া)
কি দেখিনু একটি লো, সুখের স্বপন—
গিয়েছিনু যেন, সখি, নন্দন-কানন।
সেইখানে দেব-বালা, আনি পারিজাত-মালা
গলায় পরায়ে দিল করিয়ে যতন ;

তাহার মধুর বাসে, আকুলিত চারিপাশে,
কি এক বিচিত্র জ্যোতি ছাইল যেমন !
সেই সে জ্যোতির মাঝে, ভুষনমোহন সাজে,
প্রিয়তম আসি মোরে করিল বরণ।
এখনো হৃদয়ে মম, নিশীথ সঙ্গীত সম,
পূর্ণ তানে বাজে যেই সেই সুস্বপন।

টোড়ি—কাওয়ালী।

উদা। শুভ রাতে স্বপন তোমার,
বুঝিলাম তোমা প্রতি দয়া দেবতার।
পূজার সময় এই, এখন মন্দিরে যাই,
সুখে থাক, এই বাছা আশিস আমার।

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

উভয়ে। দেবি-চরণে প্রণাম।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বসন্ত-উৎসব-ক্ষেত্রের এক প্রান্ত।
রঙ্গভূমির এক দিক্ দিয়া শোভা ও কুমারের হাত
ধরাধরি করিয়া গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

সোহিনীবাহার—কাওয়ালী।
(শোভার প্রতি)

কুমার। স্বজনি, নেহারো বসন্ত সাজে,
ক্যায়সে মাতল হরষে দিক্ !
শোভা ও কুমার। কাননে কাননে ফুলকুল জাগল ;
কুঞ্জে কুঞ্জে কুহরল পিক।
কোমল কুসুমে চুমি চুমি যতনে,
কম্পয়ি সঘনে লতিকা-কায়,

সৌরভ চুরিয়া, প্রমোদে ঢলিয়া,
ক্যায়সে বহয়ত দখিণ-বায়।
মুচকি মুচকি মৃদু, হাস হাস বিধু
ঢলিত মধুময় জ্যোতিক রাশি ;
জ্যোছনা-তরঙ্গে যমুনা রঙ্গে
চলত নাচত হরষে ভাসি।

কুমার। আওলো, স্বজনি, এ সুখ রজনী,
নিকুঞ্জে রাজু পোহায়ব দোঁহে ;
সব দুঃখ জ্বালা, পরাণ বালা,
বিসরব তোঁহার প্রেমক মোহে।

(কিরণের প্রবেশ, কিরণকে লক্ষ্য করিয়া)

লুম-ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

শোভা। এই যে কিরণ, কেন একেলা নিরখি ?
জান কোথা লীলা মোর, হৃদয়ের সখী ?
আশা বড় আছে মনে, আজি তোমা দুই জনে
প্রণয়-বন্ধনে বাঁধি জুড়াইব আঁখি।

কিরণ। (বিরক্তিভাবে)

মিশ্র-বিভাস—একতালা।

এ কি হোল জ্বালা !
এড়াইয়ে সব স্থানে এনু এই নিরজনে,
এখানেও রক্ষা নেই—'লীলা' 'লীলা' 'লীলা' !
কতবার বলেছি, সে ছাড়ুক আমার আশা,
কেন্দ্র-ভ্রষ্ট হবে ধরা, কক্ষ্যচ্যুত গ্রহ তারা,
তবুও সে নাহি পাবে মোর ভালবাসা।
কিন্তু এ কি দায় ঘোর, জ্বালিছে হৃদয় মোর,
আজো সেই এক কথা,—'লীলা' 'লীলা লীলা'।

(লীলার প্রবেশ, তাহার প্রতি কুমার ও কিরণের এক
সময়ে দৃষ্টিপাত)

কুমার। (লীলার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া কিছু পরে
শোভার হস্ত ত্যাগ করিয়া মুগ্ধভাবে)

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া।

আ মরি, লাবণ্যময়ী কে ও স্থির-সৌদামিনী,
পূর্ণিমা-জ্যোছনা দিয়ে মাজ্জিত বদনখানি !

কিরণ। ঢুলু ঢুলু আঁখি দুটি, আবেশে পড়িছে লুটি,
মৃদুমন্দ ঢল ঢল আধো ফুট' কমলিনী।
নেহারি ও রূপ, হায়, আঁখি না ফিরিতে চায়,
যত দেখি তত যেন নব নব মনে গণি।

কুমার। অধরে মধুর হাস—তরুণ অরুণাভাস,
অপ্সরা কি বিদ্যাধরী কে রূপসী নাহি জানি।

শঙ্করা—আড়-খেমটা।

কিরণ। সহসা এ কি এ হইল আমার !
এ কি এ আগুন জ্বলিল হৃদে—
যাকে দেখে আগে ঘৃণায় জ্বলেছি,
মাতিনু তাহারি প্রণয়-মদে !
দেখে দেখে দেখে সাধ যে না মেটে
ইচ্ছা হয় পেতে শতেক আঁখি ;
খুঁজে নাহি পাই ও মুখটি আহা ;
মরমের কোন্ নিভৃতে রাখি।

শোভা। (কুমারকে বিমনা দেখিয়া)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

এ কি, সখা, দেখেও কি দেখিছ না দুঃখিনীরে।
কোথায় মন তোমার, (কোথায় প্রাণ তোমার)
আছে প'ড়ে, খুলে বল বল বল হে।

(বিরক্তভাবে)

মোহিনী-বাহার—কাওয়ালী।

কুমার। যাও যাও, কিছু ভাল নাহি লাগে এ সময়,
সকল সময় আমাদের নয়।

বেহাগ—কাওয়ালী।

শোভা। ছি ছি, সখা, অমন কথা কেমনে কহিলে,
সেই তুমি, সেই আমি, সকলি ভুলিলে ?
(ক্রুদ্ধ হইয়া)
কুমার। হ্যাঁ হ্যাঁ সব মনে পড়ে,
তা বোলে অমন ক'রে
জ্বালিও না কেঁদে কেদে, কি হবে কাঁদিলে ?

ধোরিয়া—আড়া।

(কাঁদ কাঁদ কাতর ভাবে)
শোভা। কি দারুণ বজ্র হানিলে হৃদয় প্রাণে
স্তরে স্তরে মরম যে বিদারিল,
আর যে গো পারিনে।
বিদীর্ণ হ' বসুন্ধরে, নে, মা, এই অভাগীরে,
ডাকি, মা, আকুল মনে।
[গাইতে গাইতে শোভার প্রস্থান

ছায়ানট—আড়া।

কিরণ। (লীলার প্রতি)
কি করিয়ে, প্রিয়তমে, মার্জ্জনা চাহিব আর,
হৃদয় দলিত যে, লো, দোষ ভেবে আপনার।
সরমে সরে না কথা, কত যে দিয়েছি ব্যথা,
কেমনে বল, গো সখি, প্রায়শ্চিত্ত হবে তার।
লহ তুমি এই প্রাণ, দিতেছি তা বলিদান,
সর্ব্বস্ব তোমারি প্রিয়ে, আমাতে নেই আমি আর।
(লীলার কিরণের কর গ্রহণ, কিরণের লীলার স্কন্ধ ধারণ)
কুমার। (কিরণের হস্ত আকর্ষণ করিয়া ক্রুদ্ধভাবে)

সারঙ্গ।

মূঢ়, একি তোর প্রিয়া ?
কুমার। (তৎক্ষণাৎ অবনত-জানু হইয়া লীলাব প্রতি)

সাহানা—যৎ।

প্রাণ সঁপিলাম তোমা, হয়ে প্রেমভিখারী,
রাখ রাখ, মার মার, যা বাসনা তোমারি।

সারঙ্গ—কাওয়ালী।

কিরণ। (পুনরায় লীলার করগ্রহণ পূর্ব্বক কুমারের প্রতি)
কুমার, সহসা তুমি হ'লে কি পাগল!
কুমার। কি! এত বড় স্পর্দ্ধা তোর, বলিস্ পাগল!
জানিস্ এখনি এর দিব প্রতিফল।
কিরণ। প্রতিফল? হাসিবার কথা।
লীলা। (কুমারের উদ্দেশে)

দেশ-মল্লার—আড়া।

সহসা কুমার কেন হইল এমন!
পরেছ বিবাহ-সাজ, হইবে বিবাহ আজ,
ভুলিলে সখীর প্রেম স্বপ্নের মতন?

ছায়ানট—খেম্‌টা।

কুমার। দিও না, দিও না লাজ সে কথা তুলিয়ে,
ও সব পুরাণ কথা যাও, প্রিয়ে ভুলিয়ে।
তুমিই সর্ব্বস্ব ধন, তোমারে সঁপে'ছি মন,
এস, লো হৃদয়ে রাখি যতন করিয়ে।

অহং—খেম্‌টা।

কিরণ। সাবধান এ আস্পর্দ্ধা দেখি যদি ফের,
সমুচিত প্রতিফল দিব আমি এর!
(উভয়ের অসি উন্মোচন)
কুমার। এই অসি মোর হয়ে দেক্ প্রতিদান—
কিরণ। নিশ্চয় আজিকে তোর নাশিব পরাণ।
[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান

বাঁরোয়া—ঠুংরী।

লীলা। এ কি হ'ল, হ'ল, রে!
বিধি হয়ে অনুকূল, কেন হ'ল প্রতিকূল,
যাই পুনঃ দেবী-কাছে প্রাণ গেল গেল রে।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মায়াদেবীর মন্দিরের পার্শ্বস্থ যোগিনীর কুটীর।
(যোগিনী আসীনা)
(শোভার প্রবেশ এবং গাহিতে গাহিতে অবনত-জানু হইয়া)

কাফি—আড়া।

শোভা। দেবি, এসেছি যোগিনী হব।
পাষাণে হৃদি বাঁধিয়ে সংসারে ত্যজিব।
যোগধর্ম্মে দীক্ষা দিয়ে তুমি মা!
রাখ গো, দুখিনী এ জনে,
দলিত এই জীবনে সঁপিনু চরণে তব!

পিলু—যৎ।

উদা। অশুভ এ কথা আজি কেন মুখে শুনি,
বসন্ত-উৎসব দিনে বিয়ে হবে জানি।
পরিবে বিবাহ-মালা, সোহাগে করিবে খেলা,
জন্ম জন্ম থাক সুখে, কি দুখে যোগিনী?

আলাইয়া—আড়া।

শোভা। কি গভীর যাতনায়, হৃদয় জ্বলিয়া যায়,
কথায় প্রকাশ তাহা করিব কেমনে,
বিষাদ যন্ত্রণা ব্যথা, যতই গভীর হেথা
কথাও তেমনি ক্ষুদ্র তার পরিমাণে।

বাসনাও নাহি আর, খুলিতে লুকান দ্বার,
মর্ম্মের নিভৃতে থাক, মরমের কথা,
অশ্রুরুদ্ধ হোক প্রাণ, প্রকাশ সে অপমান,
জানুক হৃদয় শুধু হৃদয়ের ব্যথা।
মরমী মরম-ব্যথা জানুক গোপনে।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—আড়া-ঠেকা।

উদা। কি কথা বলিলে, বালা, কি না জানি পেয়ে জ্বালা,
এ নব-যৌবনে দীক্ষা এই লইবে যোগিনী-ব্রতে ?
হয়েছে বৈরাগ্য-দুখ, ত্যজি পৃথিবীর সুখ,
চাহিছ হৃদয়-লতা অকালে ছিঁড়িতে ?
শিরীষ-কুসুম-কায়, বাকলে ছাইবে হায়,
শিহরে যে অশ্রু, আর না পারি শুনিতে।
মোরে সমদুখী জেনে, খোল, গো হৃদয় প্রাণে,
দেখি কি উপায়, বালা, হয় আমা হ'তে।
(উদাসিনী মনে মনে ধ্যানমগ্ন)

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

শোভা। যে আগুনে আজ জ্বলিছে পরাণ—
কি শুনিবে, দেবি, তাহার কথা ;
কহ চন্দ্র তারা, মাতঃ বসুন্ধরা,
আমার মত কে পেয়েছে ব্যথা !
চিরদিন ধ'রে প্রাণপণ ক'রে
যাঁহারি চরণে সঁপিনু প্রাণ,
সেই আজ নিজে হয়ে নিরদয়
বিঁধেছে হৃদয়ে ঘৃণার বাণ।
আপনার চিতা আপনি সাজায়ে,
আপনি আহুতি প্রদানি তায়
আপনি জ্বলেছি আপনি পুড়েছি,
তবু কেন প্রাণ গেল না হায় !

প্রণয়ের ধনে, হৃদয়ের ধনে,
বল কার যায় ভুলিতে সাধ ;
কিন্তু তবু হায়, ভুলিতে হইবে,
কি করিব দেবি, বিধির বাদ।
যায় যদি এতে যাক্ ভেঙ্গে হৃদি—
হৃদয়ে আমার কাজ কি আর,
ভালবাসা আশা—সাধের পিপাসা
কিছুরি আর না ধারিব ধার।

ভৈরবী—যৎ।

যোগিনী। আর না, থাম, গো, বালা, চাহি না শুনিতে,
বুঝিতেছি কি বেদনে জ্বলে তোর প্রাণ।
যোগবলে সব আমি পারিনু জানিতে,
উপায় করিব তার দিব শান্তি দান।

(শোভার প্রণাম)

[যোগিনীর প্রস্থান

(পদ্মপত্রে অঞ্জন লইয়া যোগিনীর পুনঃ প্রবেশ)
(অঞ্জন পরাইতে পরাইতে)

পরজ ঝাঁপতাল।

যোগিনী। এই যে অঞ্জন শতদল-দলে
দেখিছ, ললনে, জ্বল্ জ্বল্ জ্বলে—
তোমারি নয়নে মাখাব, বালা।
ইহাই পরিয়ে নলিনী-নয়নে,
পশিয়ে ভবানী ভবের সদনে,
অর্দ্ধ অঙ্গ তাঁর করি অধিকার,
ভুলিল কঠোর ব্রতের জ্বালা।
প্রণয়-মিলনে যে আঁখিলহরী—
কপোল বাহিয়া বহে ধীরি ধীরি,

প্রথম চুম্বনে যে তরল শ্বাস
স্বরগীয় ভাবে পূরে হৃদাকাশ—
সেই শ্বাসে তাপি প্রেম-অশ্রু ধার
হয়েছে সৃজিত এ অঞ্জন সার—
তোমারি কারণে এনেছি আজ।
আশিস্ করুণ দেবতা সকলে
সাধিব ইহাতে তোমার কাজ।

(লীলার প্রবেশ)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

লীলা। উদাসিনী রাখ, গো, এ জনে।
কিরণ, কুমারে হোথা মত্ত ঘোর রণে।
উদ্ধারো তুমি, গো, অন্য নাহিক উপায়,
কি হইল কি জানি, মা এতক্ষণে।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

যোগিনী। নির্ভয় হও, গো বালা, কোন ভয় নাহি আর।
তব গলে মায়া-মালা, প্রণয়ে দেখিয়ে, বালা,
শোভা ভুলে তব রূপে মজেছে কুমার!
যে অঞ্জন দিনু চোখে, এখন শোভাকে দেখে,
নিশ্চয় সকল ভুল ঘুচিবে তাহার।

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

দুজনে। (অবনত-জানু হইয়া) মাতঃ প্রণমি তোমায়,

সাহানা—আড়া।

যোগিনী। সুখে থাক, ভাল থাক ভুলে দুঃখ-জ্বালা,
প্রণয়ীর প্রেমে ডুবে থাক দুটি বালা।

[প্রণাম করিয়া শোভা ও লীলার প্রস্থান।

উদাসিনীর কুটীর ঢাকিয়া পটক্ষেপ।

বসন্ত-উৎসব-ক্ষেত্রের এক বিজন প্রান্ত।

(অসি-যুদ্ধ করিতে করিতে কিরণ ও কুমারের প্রবেশ)

অহং—খেম্‌টা।

কিরণ। লও, এই লও, লও প্রতিফল।
কুমার। দেখিব বীরত্ব তোর থাকিলে অটল।
কিরণ। মূঢ়, হ রে সাবধান।
কুমার। এ অমোঘ সন্ধান।
কিরণ। এ আঘাতে অবশ্যই বধিব পরাণ।
কুমার। এই দেখ বক্ষে তোর বিঁধি তলোয়ার।
কিরণ। চুপ, মূঢ় আস্ফালিতে নাহি হবে আর।
কুমার। কি বলিলি তুই ?
কিরণ। এই দেখ তোর রক্তে কলঙ্কিত তুই।

(নেপথ্য হইতে শোভা ও লীলার গাইতে গাইতে ত্রস্তে আসিয়া যোদ্ধাদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ এবং অবনতজানু হইয়া করপুটে শোভার কুমারের দিকে চাহিয়া ও লীলার কিরণের দিকে চাহিয়া গান ও যুদ্ধভঙ্গ)

মাল্লার—যৎ।

দু'সখী। থাম, থাম, থাম হে, রাখ এ মিনতি, সখে।
অস্ত্রের ঘরষণে, ঘন ঘন ঝনঝনে
পলকে পলকে ওই দামিনী চমকে।
নিষ্কোষিত তলোয়ার দেখিতে পারিনে আর
বধিতে বাসনা যদি, বিঁধ অসি এই বুকে।

(মোহভঙ্গে লজ্জিতভাবে সরিয়া কুমারের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

শোভা। (কুমারের উদ্দেশ্যে)
বিরাগভরে অমন ক'রে এখন আর যেয়ো না স'রে,
ভয় নাই আসিনে তো জ্বালাতন করিবারে।
এসেছি দিব না ব্যথা, তুলিব না কোন কথা,
এসেছি দেখিতে শুধু নিতান্ত না থাক্‌তে পেরে।

নব অনুরাগভরে, থাক তুমি সুখ-ঘোরে,
অন্তিম-বিদায় নিয়ে এখনি যাইব ফিরে।
যেথায় আছ, সেথায় থাক, আর কাছে যাব নাকো,
একটি পলক শুধু দেখে নেব প্রাণ ভ'রে।

(শোভার নিকটে আসিয়া)

ইমন-কল্যাণ—আড়া।

কুমার। প্রিয়ে, হৃদয়ের ধন, রাখো চরণে তোমারি,
আমি দোষী অপরাধী ক্ষমার ভিখারী।

শোভা। ও কথা বোল না আর, তুমি পূজ্য দেবতার,
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র আমি অভাগিনী নারী।
তবে প্রেম ভালবাসা, কেমনে করিব আশা,
কেমনে তাহাতে আমি হব অধিকারী।

কুমার। প্রিয়ে, হৃদয়ের ধন, রাখো চরণে তোমারি।

শোভা। না না, সখে, সুখে থাকো, আমি বাধা দিব নাকো,
আমিও যে সুখী হব ও মুখে হরষ হেরি!

গৌর-সারঙ্গ—আড়া

কুমার গিনতি, নিদয়া, আর ও কথা বোলো না,
প্রজ্বলিত হৃদে আর আহুতি ঢেলো না!
বাসনা থাকে, লো যদি বিদীর্ণ করি এ হৃদি,
দেখ, লো, কাহাতে পূর্ণ রয়েছে, ললনা।
কাহাতে শোণিতধারা, বহিছে উন্মত্ত পারা,
কাহাতে মিশিছে হৃদি সুখ-দুঃখ বাসনা।

(গাহিতে গাহিতে অবনতজানু হইয়া কুমারের করযোড়ে শোভার দিকে দৃষ্টি)

পরজ-কালাংড়া—কাওয়ালী।

শোভা। (হস্ত ধরিয়া উঠাইল)
ও মুখে বিষাদ-রেখা দেখিতে না পারি, সখা,
শত শত বজ্র যেন হানে বুকে।

কহিয়ে নিঠুর কথা, কত যে দিয়েছি ব্যথা,
উঠ, উঠ, প্রিয়তম, ক্ষম গো আমাকে।

(লীলা ও কিরণের গাইতে গাইতে অগ্রসর, পরে
চারিজনের সমস্বরে গান)

সাহানা—আড়া।

চারিজন। সহসা হাসিল কেন আজি ঐ কানন,
মাতিয়া বহিল কেন সুখদ পবন ?
ফুটিল মুদিত ফুল, কুহরিল পিককুল,
যে কানন হয়েছিল নীরব শ্মশান—
সেই সে শ্মশান আজি, নূতন শোভায় সাজি,
সহসা মোহিল কেন হৃদয় পরাণ !
যে সুখের চাঁদ আহা কতদিন থেকে,
ভীষণ মেঘের কোলে পড়েছিল ঢেকে—
আজিকে সেই সে শশী, মেঘমুক্ত হাসি হাসি,
ঢালিছে কি মধুময় জ্যোছনা কিরণ।
ঘুচিল সকল মোহ, ফিরিল প্রণয় স্নেহ,
হাসিল চৌদিক্ আজ, হাসিল জীবন !

(হুলুধ্বনি করিতে করিতে সখীগণের প্রবেশ ও নৃত্য
করিতে করিতে গান)

মাঝ—দাদ্‌রা।

সখীগণ। আয় লো, আয় লো, আয় লো,
আয় লো মিলে সব স্বজনি,
বাসরে পোহাব আজি কি সুখের রজনী !
ভাসিয়ে সুখ-তরঙ্গে, মাতিয়ে প্রমোদ-রঙ্গে,
হাসিব সখীর সঙ্গে, দিব সুখে হুলুধ্বনি।

[সকলের নৃত্য করিতে করিতে ও গাইতে গাইতে প্রস্থান।

পটক্ষেপ।

কৌতুক-নাট্য

উপহার

শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবীকে

ধর স্নেহ-উপহার স্নেহময়ি রাণি !
রূপ বা নিরূপ মন্দ
গন্ধ কিবা হীনগন্ধ
সুর বা বেসুর ছন্দ আমার যা বাণী,
সকলি তোমার কাছে আদরের জানি ।

কৌতুক-নাট্য

লজ্জাশীলা

ক্রিয়াকর্ম্মের বাড়ী। ফুলদার সূক্ষ্ম পায়নাপল বস্ত্রপরিহিতা এবং নানালঙ্কারে বিভূষিতা দুই যুবতী সিদ্ধেশ্বরী এবং নিধিমণি অন্তঃপুরে নির্জ্জন বারান্দায় বিশ্রম্ভালাপে রত।

সিধু। এমনো কালামুখী!

নিধু। মাইরি! ছি ছি!

সিধু। ছি ছি না ছি ছি! লাজলজ্জার মাথা একেবারে খেয়েছে!

(কামিনীর প্রবেশ)

কামিনী। কি হয়েছে মেজবৌ! কার কথা বলছিস?

সিধু। কামিনী যে! এতক্ষণে কি আস্‌তে হয়? বোনঝির গায়ে হলুদ, সব কর্‌বি কর্ম্মাবি, না একেবারে বেলা পুইয়ে এলি!

নিধু। ও ভেবেছে বেলায় এসে হলুদের পালাটা এড়াবে, সেটি হচ্ছে না। সোনার রং ফলিয়ে তুলবো লো, ছাড়ব না।

কামিনী। মাইরি ভাই, তোদের পায়ে পড়ি, বিকাল বেলাটা আর হলুদ দিস্‌ নে। নিজেরা ত রং ফুটিয়েছিস, সেই ভাল। চমৎকার বাহার হয়েছে, আমায় মাপ কর।

কি বাহার করেছ রে প্রাণ কিবা হার পরেছ গলে,
দেখে তোমার মুখশশী মুনিজনার মন ভোলে।

সিধু। (সানন্দে নিজ অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে করিতে) কামিনী, তোর কি মিষ্টি গলা ভাই! আমার সারাদিন শুন্‌তে ইচ্ছে করে।

নিধু। বাহারটা তোরই যেন কিছু কম? অমন রঙ্গিন ফিতে কোথায় পেলি বল দেখি?

কামিনী। সে তোর ঠাকুরজামাইকে জিজ্ঞাসা করিস। ছুটিয়ে না লাটিয়ে ব'লে কোন ইংরাজ দোকান আছে, আমার ছাই অত নাম মনে থাকে না, সেখান থেকে এই সব জুটিয়ে-জাটিয়ে আনেন। যা হ'ক, কার কথা তখন বলছিলি,, বল না? লাজ-লজ্জার মাথা কে খেয়েছে?

নিধু। এই বোসেদের শশীর বৌএর কথা হচ্ছিল।

কামিনী। কেন, তার কি—হয়েছে কি?

সিধু। হবে আর কি! যতদূর হবার তা হয়েছে। একেবারে মেম সেজে গাউন প'রে এসেছে। মা গো, আমরা ত সাতজন্মে পারিনে! দেখে অবধি গা কস্‌কস্ করছে, তাই সে ঘর থেকে উঠে এসেছি! (ঘাড় বাঁকাইয়া অধরৌষ্ঠ ভঙ্গী করিয়া ঘৃণা প্রকাশ)।

নিধু। আর বল্লে কি হবে, কলিযুগ দেখছি উল্‌টে গেল!

কামিনী। সত্যি নাকি বাঙ্গালীর মেয়ে হয়ে শেষে বিবি সাজলে! ওমা, কোথায় যাব মা!

সিধু। এমন তেমন বিবি! গায়ে জামা—

কামিনী। গায়ে জামা——তা—

সিধু। শুধু জামা! ভিতরে আবার বিতিকিচ্ছি মোটা ঘাগরা। সাড়ি সে শুধু নাম রক্ষে! দেখে অবধি লজ্জায়-ঘেন্নায় একেবারে ম'রে যাচ্ছি।

কামিনী। এই যে বল্লি গাউন!

সিধু। গাউন না সে গাউনের বাবা! নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে এসেছে, নীলাম্বরী পর, নেট পর, পায়নাপল পর, তা না কি সংটাই সেজেছে, একবার দেখবি চল না।

কামিনী। তা ভাই জামাজোড়া পরেছে—তাতে আর এমন কি দোষ! আমার স্বামী আমার জন্যে একটা ফরমাস দিয়েছেন।

সিধু। সত্যি নাকি! একদিন প'রে আসিস্ দেখব। আমিও ত তাই বলি, সেটা আর এমন কি লজ্জার কথা।

নিধু। তবে যা তোরাও বিবি সাজগে, কুল উজ্জ্বল হয়ে যাক। আহা, কি রূপখানই খুলেছে, কি মানান্‌টাই মানিয়েছে—ম'রে যাই আর কি।

সিধু। তা যদি বলিস, তাকে কিন্তু মন্দ দেখাচ্ছে না ভাই!

নিধু। অমন ভাল দেখানোর কপালে আগুন! আহা, কিবা রূপেরই শ্রী!

সিধু। তা ভাই, রূপটা মন্দ কি? সত্যি কথা বলতে কি, তাকে জামাজোড়ায় সেজেছেও ভাল।

নিধু। (সক্রোধে) কালামুখী ধিক্‌জীবনী, পোড়াকপাল তার রূপে! পোড়াকপাল তার সাজে!

কামিনী। অত রাগ করিস্ কেন ভাই, জামাজোড়া পরলে এক রকম বেশ ত মানায়! এই তুই পরিস, তোকে বড় সরেস দেখতে হয়।

সিধু। (আহ্লাদের হাসি হাসিয়া) তা ভাই, উনিও ঐ কথা বল্‌ছিলেন যে, আমাকে একদিন বিবি সাজায়ে দেখতে ইচ্ছা হয়। তবে কি জানিস, যাদের রং তেমন পরিষ্কার নয়—

কামিনী। তা বই কি? তোমার চেহারায় গাউন কেন, চীনে চোগাও খাটে, তাই ব'লে দেশশুদ্ধ জ্যাকেট পরলে কি সাজে?

সিধু। (উথলিত গর্ব্বে) কামিনী তুই এতদিন আসিস্ নে—তোর জন্যে এমন মন কেমন করত! চল ভাই, ঘরের ভিতর একবার রঙ্গখানা দেখিগে চল।

(তিনজনের মজলিস-গৃহে প্রবেশ)

সিধু। বলি ও শশীর বৌ! কতদিন এমন হলো!

বৌ। (আশ্চর্য্য হইয়া) কি হোল ঠাকুরঝি?

সিধু। ন্যাকা আর কি! যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানেন না!

বৌ। (সভয়ে) তা জানব না কেন? কিন্তু সাদ্দি বল্‌ছি, আমি কিছু বুঝতে পারছি নে।

সিধু। আমরা যে তোকে বড় লাজুক মেয়ে ব'লে জানতুম, তোর মনে এই ছিল!

কামিনী। হায়। হায়! এমন কাজও তুই করলি?

বৌ। কেন, আমি কি করেছি?

কামিনী। সর্ব্বনাশ—লো সর্ব্বনাশ! এতদিন মেয়েমানুষের মন চেনাই দায় ছিল, তুই যে অঙ্গ চেনা পর্যন্ত দায় ক'রে তুল্লি।

নিধু (সিধুর গা টিপিয়া) বেশ বলেছে কামিনী! (সকলের হাস্য)

সিধু। বলি এমন পোষাক কবে ধর্‌লি?

কামিনী। একেবারে যে বিবি লো!

বৌ। (সলজ্জে) কি করব ভাই, তিনি এ রকম কাপড় না পরলে ছাড়েন না যে।

সিধু। তা আরো কত হবে! এর পরে শ্বশুর শ্বাশুড়ির কাছে আর ঘোমটা পর্য্যন্ত উঠবে না।

বৌ। তা কি করবো, আমার শ্বাশুড়ি আমাকে ঘোমটা দিতে দেন না; বলেন, আমার মেয়ে নেই, তুমি আমার মেয়ের মত, কাছে বসো, কথা কও, এই সব।

কামিনী। সত্যি নাকি লো!

নিধু। একেবারে লোক হাসালি, পদার্থ আর রইল না কিছু তোতে!

সিধু। কেন, আমরা কি আর কথা কইনে? সেদিন বাপের বাড়ী যেতে ঠাকরুণ বারণ করেছিলেন, আমি যে একটু স'রে এসেই কত ধুড়ধুড়ি নেড়ে দিলুম—তাই বলে কি ঘোমটা খুলতে গিয়েছিলুম? না, কাছে ব'সে বেহায়ার মত গল্প করতে গিয়েছিলুম? সবাই ত তাই বলে, ও বাড়ীর মেজবৌয়ের লজ্জাটা বড় বেশী—

সকলে। তা সত্যি, তা সত্যি!

বৌ। ছি ঠাকুরঝি; তুমি শ্বাশুড়িকে অমন বল্লে? তাতে তোমার লজ্জা হোল না?

সিধু। কি লজ্জাবতী গা, ঘোমটা খুলে মেম সাজতে লজ্জা হোল না, আর যত লজ্জা ওনার এর বেলা। তোর মত যেদিন নির্ল্লজ্জ বেহায়া হব, সেদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

বৌ। (স্বগত) বটে, জামা পরলেই যত মেম সাজা হয়। আর উনি যে মুখে এক রাশ রুজ পাউডার মেখেছেন, তাতে কোন দোষ হোল না—দাঁড়াও না, জব্দ করছি। (প্রকাশ্যে) ঠাকুরঝি, অত রেগো না গো, লাল গাল আরো লাল হয়ে উঠবে। সত্যি সত্যি তোমার গাল দুটো অতো, লাল দেখাচ্ছে কেন? পিঁপড়ে কামড়েছে নাকি?

সিধু। মরণ, পিঁপড়ে কামড়াবে কেন? আমার গাল দুটো ভাই অমনি লালপানা, তোঁর ঠাকুরজামাই ত সর্ব্বদাই বলেন, গাল নয় ত যেন গোলাপফুল!

কামিনী। আহা, আমাদের যদি ঐ রকম হোত?

সিধু। গাল?

বৌ। না স্বামী?

কামিনী। ওলো, দুই লো দুই—যার গাল লাল, তার স্বামী আপনা হ'তেই বশ, আর যার স্বামী বশ, তার গাল—

সিধু। (সগর্ব্বে)—তা সাধ যায় বই কি ?

বৌ। (সিধুর নিকটে আসিয়া আস্তে আস্তে) তা ভাই, মুখে তোর খড়িপানা ও কি লেগেছে ? মুছিয়ে দেবো।

সিধু। (স্বগত) এই যা মজালে! সব দেখছি ফাঁশ হয়ে যাবে। (তাড়াতাড়ি বৌয়ের কানে কানে) চুপ কর। ও ভাই এক রকম গুঁড়ো, মাখলে স্বামী বশ হয়, কাউকে বলিসনে, আমি তোকে এক কৌট পাঠিয়ে দেব এখন। আর তুই ভাই আমাকে একটা তোর জামার নমুনা পাঠিয়ে দিস্, বুঝলি ? দেখিস্, ভুলিস নে, মাথা খাস ! *

বৈজ্ঞানিক বর

(১২৯২ ভারতী)

(দৃশ্য বাসর-গৃহ, মসনদের উপর কন্যার পার্শ্বে গ্র্যাজুয়েট বর ; নিকটে যুবতীগণ আসীন)

প্রথম যুবতী। (বরের প্রতি) বলি কি গো, অমন ধারা চুপ ক'রে ব'সে রইলে কেন ? সেই অবধি বকাবকি ক'রে মলুম, মুখে যে একটা রা নেই।

দ্বি। রা আর থাকবে কি ক'রে লো ? ফুলির আমাদের চাঁদপানা সোনার মুখ, তাই দেখেই অবাক হয়ে গেছে।

বর। কি বল্লেন, চাঁদপানা সোনার মুখ ? (একটু হাসিয়া) আপনি যে অত্যন্ত রুচিবিরুদ্ধ তুলনা করলেন। চাঁদপানা সোনার মুখ ত কোথাও পড়িনি। (চিন্তিত ভাবে) বায়রণ, স্কট, সেলি, টেনিসন, কই কোথাও Moonface আছে ব'লে ত মনে পড়ছে না। আর সোনার মুখ Why thats absurd ! Golden face সোনার মুখ হয় না—তবে Golden hair সোনার চুল হয় বটে।

---

* উক্ত নক্সাটি ১২৯২ সালের ভারতীতে প্রকাশিত হয়, এই অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গ-মহিলার পরিচ্ছদের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। বাহিরে যাইতে হইলে শাড়ির সহিত একটি সুদর্শন জ্যাকেট এবং অন্তরাবরণ পরিধান এখন আর লজ্জার কথা নহে। কিন্তু তখন যিনি দুঃসাহসী হইয়া উক্তরূপ সুরুচিসঙ্গত শোভন বেশ-ভূষার অঙ্গাবরণে প্রয়াসী হইতেন, তাঁহাকে বিলক্ষণ হাস্যভাজন হইতে হইত।

তৃ। ও মা, কেমন কানা বর গো; মেয়ের অমন সোনাপারা মুখ, তাও সোনা নয়, অমন কাল কুচকুচে চুল, তাও বলে সোনা রঙের! এ কি কথা গা! এত রূপও কি পছন্দ হলো না না নাকি?

প্র। না লো না, বর তা বলছে না, বরের তোদের ইংরাজী পছন্দ, বর সোনামুখ চায় না, সোনাচুল চায়।

চ। ওমা, সত্যি নাকি? হ্যাঁ গা, তবে কি আমাদের বুড়ঝি হারার মাকে এনে তোমার পাশে বসিয়ে দেব নাকি? ফুলির আমাদের কাল চুল ব'লে কি মনে ধরলো না?

বর (একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া) মনে ধরা—পসন্দ হওয়া! যার সঙ্গে এক মিনিট ব'সে কোর্টসিপ করতে পাইনি—তাকে মনে ধরেছে বল্লে মিথ্যা কথা বলা হয়। ইংরাজদের কিন্তু এ সব নিয়ম বড় ভাল।

প্র। কেন, ইংরাজদের কোর্টসিপের বিয়েতেও ত ঝগড়াঝাটি, ছাড়াছাড়ির অভাব দেখিনে।

বর। সে কি জানেন,—সে ভালর মন্দ। যাক্, আপনারা প্রথমে আমাকে যে প্রশ্ন করছিলেন—তার উত্তর দিই। আপনারা জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, আমি চুপ ক'রে আছি কেন? তার উত্তর এই যে পরশু দিন আমার একটা এন্‌গেজমেণ্ট আছে, টাউন হলে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে একটা লেক্‌চার দিতে হবে, আমি সেই বিষয় ভাবছিলুম।

প্র। তা কি লেক্‌চারটা দেবে শুনি—আমাদের কাছে একটা নমুনা দিয়ে যাও।

বর। তা উচিত কথা ছাড়া আর কি বলব? দেখুন দেখি—দশ বছরের বালিকা—আজ তার বিবাহ, কাল সে বিধবা। কাল হ'তে একাদশীর দিনে সে মুখে এক ফোঁটা জলও ঠেকাতে পারবে না, কোন দিন সাধ ক'রে একখানা রংকরা কাপড়ও পরতে পাবে না, আর বড় হয়ে সে যদি কোন সুপুরুষের Loveএ পড়ে গেল—যেটা হওয়া খুবই সম্ভব—তা হ'লে তাদের দুজনের মিলনে পর্য্যন্ত আর কোনই সম্ভাবনা থাকবে না। দেখুন দেখি, এই শেষ ব্যাপারটি কত শোচনীয়! আমার স্ত্রীর আগে যদি আমার মৃত্যু হয়, তা হ'লে আমার উইলে আমি স্পষ্টাক্ষরে এই কথাগুলি লিখে যাব যে, যদি আমার স্ত্রী আবার বিবাহ করেন, তবেই আমার ধনের অধিকারিণী হবেন, তা না হ'লে এক কাণাকড়িও পাবেন না।

প্র। তা যদি বল, তবে তোমার স্ত্রী দোরে দোরে বরঞ্চ ভিক্ষা মেগে বেড়াবে!

তৃ। নে ভাই নে, তোদের পণ্ডিতে পণ্ডিতে এখন ব্যখ্যা রাখ, বর, একটি গান বল ত ভাই!

(কন্যার মাতার প্রবেশ)

মাতা। এস বাছা খাওসে, তোরা এখন ঠাট্টা রাখ।

(বরকে লইয়া আহারের স্থানে গমন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আহারান্তে বর আবার মসনদে উপবিষ্ট।

তৃ। নাও ভাই বর, এবার একটি গান শোনাও।

বর। আমি আপনাদের অজ্ঞতা দেখে অবাক্ হ'য়ে যাচ্ছি। এইমাত্র আহার ক'রে এলুম, এরই মধ্যে গান! স্বাস্থ্যের প্রতি কি আপনাদের একটুকুও দৃষ্টি নেই?

চ। এ বর ত আচ্ছা জ্বালাতন আরম্ভ করলে। মেজদিদি, তোরা সবাই মিলে দুটো ঠাট্টা-তামাসার কথা ক'।

দ্বি। (তৃতীয়ার প্রতি চুপে চুপে) বলি একটা পান-টান সেজে নিয়ে আয়—ঠাট্টাও করতে চাই শিখলিনে।

[তৃতীয়ার প্রস্থান

বর। জীবনটা কি ঠাট্টা-তামাসার যে, সারাদিন ঠাট্টা-তামাসা ক'রে কাটাতে হবে? যত দিন আমাদের দেশে Serious scient ' c spirit—

(তৃতীয়ার পানহস্তে প্রবেশ ও বরের হস্তে পান প্রদান করিয়া)

তৃ। নাও, কথা কইতে কইতে মুখ শুকিয়ে এসেছে, পানটা খেয়ে নাও।

(পান খুলিয়া পানের দিকে বরের একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ)

প্র। (সভয়ে দ্বিতীয়ার প্রতি চুপে চুপে) এই বুঝি ধ'রে ফেল্লে! (প্রকাশ্যে) কি আবার দেখছ, পানটা খেয়ে ফেল না।

বর। (মুখ তুলিয়া) এমন কিছু নয়—এই আগে ব'লেছিলুম, বাঙ্গালীদের যত দিন discovery করবার spirit না হবে, তত দিন কোন মতেই দেশের দুর্দ্দশা যাবে না। আমি যেদিন থেকে science পড়তে আরম্ভ করেছি, সেই দিন থেকেই আমার ঐদিকে লক্ষ্য।

প্র। তা পানের ভিতর আর কি diescovery করবে, ওটা খেয়ে ফেল।

বর। (পান মুখে দিয়া) কিসে কখন কি discovery করা যায়, তার কি ঠিক আছে? তার জন্যই ত যা কিছু হাতে পাই, আমি পরীক্ষা ক'রে দেখি। এই Dr. Kook জলের ভিতর সেদিন কলেরার জার্ম্ম আবিষ্কার করেছেন, আমি যদি দেখিয়ে দিতে পারি, শুক্‌নো জিনিষের মধ্যেও সে জার্ম্ম আছে—তা হ'লে ইণ্ডিয়ার কাছে তৎক্ষণাৎ ইয়োরোপের মাথা হেঁট হয়ে যায়।

প্র। (হাসিয়া) তবে দেখছি—এবার তোমা হ'তেই ভারতটা উদ্ধার হয়ে গেল।

বর। (পান নোস্তা বোধে মুখ বিকৃত করিয়া) এ কি সত্যিই এতে জার্ম্ম-টার্ম্ম কিছু আছে নাকি? এমন ঠেক্‌ছে কেন?

(বরের থু থু করিয়া পান নিক্ষেপ, যুবতীগণের সকলে মিলিয়া হাস্য)

বর। আপনারা একটু চুপ করুন, এ হাসির সময় নয়। গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। এ কি হোল! চারিদিকে যে অন্ধকার—মাথার ভিতর যে বোঁ বোঁ ক'রে উঠলো। ভগবান একি করলে। মৃত্যুর জন্য আজ বিবাহশয্যা বসাইয়াছিলে? প্রেয়সি—তোমার ও চাঁদমুখ—সোনার মুখ আর যে কখনও দেখিতে পাইব না।—জন্মের শোধ যে আজ শেষ দেখা দেখিয়া চলিলাম—প্রাণেশ্বরি, তুমি যে আজ বিধবা হোলে! এই শেষ দিনে একটি অনুরোধ করিয়া যাই, মাথা খাও, আমার এই অন্তিম ভিক্ষাটি স্মরণ রাখিও, প্রেয়সি! ইংরাজদের মত কখনো বিধবা-বিবাহ করিও না, আমি চলিলাম, কিন্তু আমাদের দেশের অমূল্য একাদশীর প্রথাটা তুমি পালন করিবে, এই আশা হৃদয়ে লইয়া চলিলাম।

প্র। (শশব্যস্তে) এ কি, তোমার আবার এ কি হোল?

দ্বি। এ কি নাটক করে যে?

তৃ। ও মা, এমন বেরসিক বরও ত কোথাও দেখি নি—পানে একটু নুণ দিয়েছি, তা এত হেঙ্গাম।

বর। নুণ দিয়েছেন? কখনই না। আমি জানি, এ কলেরা জার্ম্ম, আর আমিই ইহা আবিষ্কার করিয়াছি। আমি এখন মরিলাম বটে কিন্তু আমার নাম চিরকালই পৃথিবীতে জাগিয়া থাকিবে।

দ্বি। এ কি, তোমার মতিচ্ছন্ন ধরলো যে—নুণ নয় ত আবার কি?

বর। (মুখ নাড়িয়া দেখিয়া স্বগত) তাই ত, নুণই ত বটে, আমাকে দেখছি বড়ই মাটী করলে। কিন্তু আমি কি না মাটী হবার ছেলে—রোসো না।

(প্রকাশ্যে) ঠাট্টা ! আপনাদের ইয়ে—এই এক বিন্দুও যদি বিজ্ঞান-জ্ঞান থাকত, তা হ'লে কি এরূপ ঠাট্টা করতে পারতেন ? কি হ'তে যে কখন্ কি হয়, তা যাদের জ্ঞান নেই—

প্র। তা সত্যি কথা, তোমাকে নিয়ে যখন ধান ভান্‌তে আরম্ভ করি—তখন যে এমন শিবের গীত গাইতে হবে, তা কি জানি ?

বর। সেটা আমার দোষ, না আপনাদের ? সেই অবধি Science Philosophy বুঝিয়েও আপনাদের নীতিবিরুদ্ধ ঠাট্টার হাত থেকে নিস্তার পেলুম না। Oh ! Byron how truly thou said,—philosophy and Science I have essay'd but they, availed not ! সমাজের মূল উচ্ছেদ ছাড়া এর প্রতীকার আর কি আছে ?

প্র। তা হ'লে বিধবার একাদশীটা পর্য্যন্ত উঠে যায়, সেটা যেন মনে থাকে।

(সকলের হাস্য)

তৃ। না আমাদের বর রসিক বটে, অনেক বিয়ে দেখিছি—কিন্তু এমন নাটক কেউ করেনি। ও ফুলি, তোর বরের গলায় একগাছা ফুলের মালা দিয়ে দে।

দ্বি। হঁ্যা, এত কান্নাকাটির পর মধুর মিলন হোক্, দুই প্রাণে মিশে এক হয়ে যাক্—আমরা দেখি।

বর। (স্বগত) আমাকে বড় মাটীটাই করেছে—এর শোধ এইবার তুল্‌ব। (প্রকাশ্যে) দেখুন—science তা জানার কত দোষ, তা হ'লে আর আপনি এমন absurd কথাটা বল্‌তে পার্‌তেন না। একজন living being কি আর একজন living being এর সঙ্গে মিশে যেতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে ও কথাটা matter এর molecules সম্বন্ধেই খাটে ; কেননা, cohesion matter এর একটা property, একজন ইংরাজ মেয়ে হ'লে কখনো এরূপ বল্‌তেন না—what a pity !

প্র। কেন, ইংরাজ মেয়ে ছাড়া অনেক ইংরাজ পুরুষেও ত কবিতার এরূপ কথার ছড়াছড়ি ক'রে গেছেন।

বর। সে আলাদা কথা। কিন্তু ও কথাও আর বেশী দিন চল্‌ছে না। রেনা স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—অল্পদিনের মধ্যে বিজ্ঞান ছাড়া কবিতা-টবিতা কিছু থাক্‌বে না।

প্র। তখন না হয় বল্‌ব না ?

বর। উঁহু এখনও বলতে পারেন না। ওতে অলঙ্কারশাস্ত্রের দোষ পড়ে।

একটা গ্রহের যখন Centrifugal force কমে যায়, তখন সূর্য্য Centripetal force দ্বারা তাকে টেনে নিয়ে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে—কিন্তু মানুষ ত আর একটা গ্রহ নয় ?

দ্বি। কোথাকার হতভম্বা বর,—এ সব আবার কি বকে ?

তৃ। একবার সোজা না ক'রে দিলে চল্লো না দেখ্ছি—

প্র। আমরা জানি—হাতের জোরে পিঠের জোর কমিয়ে ফেল্‌তে পারলেই মানুষ-গরুদের নাকে দড়ি দিয়ে নিজের দিকে টেনে আনা যায়—পরীক্ষা দেখবে ?—

(বরের পৃষ্ঠের চারিদিক্ হইতে মুষ্টি পতন)

বর। একি ভয়ানক। দোহাই আপনাদের—এ সব ছেড়ে আপনারা একটু লেখাপড়া চর্চ্চা করুন, যদি বিজ্ঞানও না পড়েন—দর্শনগুলো,—গুলো না হ'ক, অন্ততঃ কান্টের দর্শনখানা জানা থাকলে এ সব Nasty ব্যাপার হ'তে কেবল আমি না—সমাজ পরিত্রাণ পায় !

প্র। বটে, তা কানটেপার দড়ন আমরা বেশ জানি,—বিদ্যাটা দেখিয়ে দেব ?

বর। (কানমলা খাইয়া) By Jove ! রক্ষা করুন—জানলে কোন হতভাগ্য বিয়ে কর্‌তে আসে। দোহাই তোমাদের, যা হবার হয়েছে—এমন কর্ম্ম আর কখনো কর্‌ব না।

দ্বি। বল কর্‌বে না—

বর। কক্ষনো না, জন্মে না, নেহাৎ গণ্ডমূর্খ না হ'লে সে বিয়ে কর্‌তে আসে—রাম রাম !

প্র। বা বই কি, কিন্তু হ্যাদে গণ্ডমূর্খ বিয়েটা একবার করলে যে আর ফেরে না।

বর। গণ্ডমূর্খ ! শেষে এ-ও অদৃষ্টে ছিল !

চতুর্থ। না না, গণ্ডমূর্খ না—পণ্ডিতমূর্খ। ও ফুলি, তোর পণ্ডিতমূর্খ বরকে একবার ফুলের মালাটা পরিয়ে দে, তোর বুদ্ধির একটু ভাগ পাক্।

(ক'নের হাতে মালা দিয়া তাহার হাত ধরিয়া বরের গলে মালা প্রদান)

বর। (ক্রুদ্ধভাবে) মশায়রা মাপ করবেন, বিয়েটা ক'রে জীবনের মধ্যে একটি মূর্খামি ক'রে ফেলেছি, তাই ব'লে আর বেশী করতে পারছিনে।

(মালা খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ)

দ্বি। কেন, মালাতে আবার কি দোষ হ'ল ? ওতে আবার সাপ বিছে আছে নাকি ?

বর। কি আশ্চর্য্য ! বিজ্ঞানের এই সামান্য সত্যটাও কি আপনাদের বোঝাতে হবে ? ফুল থেকে Carbolic acid বলে রাত্রে একরকম গ্যাস বার হয়—সে সাপ-বিছে হ'তেও ভয়ানক। রাতে ফুল ঘরে রাখাই উচিত নয়।

দ্বি। সে আবার কি জিনিষ ?

বর। By Heavens ! সে একরকম মন্দ বাতাস।

তৃ। মন্দ বাতাস কি ? ভূত নাকি ?

বর। তা ভূত বল্‌তে পারেন—বাতাস পঞ্চভূতের এক ভূত।

প্র। তা তোমাকে দেখছি, আগে থাকতে পঞ্চভূতে পেয়ে বসেছে—এক ভূতে আর কিছু করতে পারবে না—মালাটা এখন প'রে ফেল।

বর। সে কথা আর বলতে ! এখন ভূতগুলো ছাড়াতে না পারলেও তো প্রাণ বাঁচে না। আগে জানা ছিল, অন্ধকারেই ভূতের প্রাদুর্ভাব, কিন্তু এখন দেখছি, আলোতেই ভূতের দৌরাত্ম্য বেশী। আলোটা নিভিয়ে দিলেই এ ভূত ছেড়ে যাবে।

(উঠিয়া দীপ নির্ব্বাণ)

প্র। আমাদের ভূত বল্লে ? ভারী ত অসভ্য ! যুবতীগণ। (গোল করিয়া) যা হোক, এতক্ষণে একটা কীর্ত্তি করেছে—পাশ দিয়েছে বটে।

[হাসিতে হাসিতে সকলের পলায়ন

———

লোহার সিন্ধুক

(ভারতী ১২৯২)

প্রথমা। তারপর ?

দ্বি। নেহাৎ শুন্‌বি ? সে কিন্তু অনেক ক'রে বারণ করে দিয়েছে।

প্র। তা বারণ করলেই বা, আমার কাছে বলবি বই ত নয়, আমি ত আর কাউকে বলতে যাচ্ছিনে।

দ্বি। তা জানি বলেই ত তোকে বলছি—নইলে কি বলতুম, তা ভাই দেখিস যেন প্রকাশ না হয়।

প্র। মরণ—তুই ক্ষেপেছিস—আমার কাছে—

দ্বি। তবে শোন, এই সেদিন—কিন্তু তাকে কড়ারটা দিলুম দেখিস—

প্র। এমন ক্ষেপাও ত কোথায় দেখি নি, আমাকে কথা বলতে ডরাস্। এই সেদিন দিনুর মা আমাকে যে বল্লে, তার স্বামী মদ খেয়ে ঘরে এসেছিল—সে কথা কি আমি তোদের কাউকে বলেছি? আমার মত লোহার সিন্ধুক কাউকে পাবি নে।

দ্বি। তা সত্যি—তবে শোন—

———

ষষ্ঠীর বাছা

নবীন ও নবীনের কাকা।

কাকা। আজকাল তোমার কেমন পড়াশুনা হচ্ছে নবীন?

নবীন। খুবই ভাল।

কাকা। তোমার মতে ত বরাবরই খুবই ভাল, সে কথা কে জিজ্ঞাসা করছে?

নবীন। তবে কি জিজ্ঞাসা করছেন?

কাকা। মাষ্টার তোমায় কি বলেন? তিনি কি সন্তুষ্ট?

নবীন। আজ্ঞে খুবই।

কাকা। সবই খুবই! superlative ছাড়া দেখছি তোমার কথা নেই।

নবীন। আজ্ঞে ঠিক উল্টো, superlative হ'লে হোত খুব তম, আমি positive-এর একটুও এদিক-ওদিক করি নি।

কাকা। বটে, একেবারে গোল্লায় গেছে। কাকার সঙ্গেও ইয়ারকি! খুবতম একবার পেতে ইচ্ছে হয়েছে বুঝি?

(নবীনের মাতার প্রবেশ)

মা। কি হয়েছে ঠাকুরপো? মার-মূর্ত্তি যে?

কাকা। কি আর হবে, তোমারি কারখানা—ছেলেটাকে একেবারে গোল্লায় দিয়েছ?

মা। তোমার ঐ এক কথা! কেন গা, ওর আমার পড়াশুনায় যেমন মন—তোমাদের তেমন হ'লে বাঁচতুম। রাতদিন বই হাতে করেই বাছা আছে।

কাকা। আর কারো নজরে তো তা পড়ে না।

মা। হ্যাদ্ দেখো ঠাকুরপো—নজর-নজর করো না—তা হ'লে কালই আমি বাপের বাড়ী চ'লে যাব। আমি কি একলা ওর পড়াশুনার কথা বলি—কেন, মাষ্টার কি বলেছে শোন নি কি? হ্যাঁ, বাবা, বল্তো রে আর একবার, তোর কাকাকে একবার শুনিয়ে দে ত রে।

নবীন। তা উনি শোনেন কই?

মা। না. শুনবে না! বল বাবা তুই, বল দেখি, কেমন শুনবে না দেখি?

কাকা। আমি ত সেই কথাই জিজ্ঞাসা কর্ছিলুম?

মা। বেশ কর্ছিলে—ভাল করছিলে—তা করবে না কেন? বল্ বাবা আমার, বল্ তুই।

নবীন। আমি ত আগেই বল্তে গিয়েছিলুম।

মা। তা ত বেশ করছিলে—আবার বল্ মাণিক আমার।

নবীন। সেদিন আমি স্কুলে একটা রচনা লিখেছিলুম—

মা। শোন ঠাকুরপো, বাবা আমার একটা ল—ল—লচনা—

নবীন। অ্যাঃ, থাম না একটু—

মা। না বাবা, হ্যাঁ হ্যাঁ, থামছি—বাবা—তারপর বল্ বল্ ধন তুই!

কাকা। তুমি দেখছি বলতেও দেবে না।

মা। সে কি কথা? কেন দেব না? বল যাদু, মাষ্টার লচনা দেখে—

কাকা। কি বল্লে, ব'লে যাও।

মা। হ্যাঁ বাবা, ব'লে যাও।

নবীন। তুমি একটু না থামলে আমি বল্ব না!

মা। বল্বি বই কি, বাবা আমার বল্, বাবা রে, আমি আর কিছু বলব না।

নবীন। বল্লেন—সব ছেলেরা যদি তোমার মত হোত।

মা। শুন্লে ঠাকুরপো, যদি আমার বাবার মত হোত।—

কাকা। আঃ, ওকে বল্তে দাও না!

মা। বল্ বাবা বল্, তা হ'লে কি হোত সোনা ধন?

কাকা। (রাগিয়া) হবে আর কি, তা হ'লে মাষ্টারের অন্ন জুটত না।

নবীন। ঠিক কথা কাকা। মাষ্টারও তাই বলছিলেন। বলছিলেন—সব ছেলেরা যদি তোমার মত হোত, তা হলে কাল স্কুল উঠিয়ে দিতুম।

মা। শোন ঠাকুরপো শোন,—চাঁদের আমার—

কাকা। বটে!

নবীন। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার মত যদি সবাই শেখে—তা হ'লে শেখাবার জন্য নূতন কিছু ত আর থাকে না।

মা। তবু যে তোর কাকার মন ওঠে না—বাবা! বাছা রে আমার, ষাটের বাছা—তুই কি আমার বাঁচবি রে!

———

চাক্ষুষ প্রমাণ

বারান্দায় দণ্ডায়মান শ্যামবাবু, মাষ্টার প্রাণকালীবাবুকে রাজপথ দিয়া যাইতে দেখিয়া।

শ্যাম। আরে এই যে মাষ্টারবাবু! এত সকালে এত চোটপাট যাওয়া হচ্ছে কোথা?

মাষ্টার। (উপরে চাহিয়া) এই যে শ্যামবাবু! আর ম'শায়, আমাদের সকাল বিকাল কি? চারটি অন্নের জন্য আমাদের কি না করতে হয়!

শ্যাম। সে সব হবে এখন, দেখাই যদি হ'ল, একবার এই দিক্ দিয়ে হয়ে যান।

মাষ্টার। না মশায়, সময় বিন্দুমাত্র নেই। আপনাদের কি, আপনারা পায়ের উপর পা রেখে দিব্যি আরামে ব'সে থাকেন, সময়ের মূল্য ত আপনারা জানেন না।—তা যাচ্ছি—এক্ষণি কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে।

শ্যাম। এক মিনিটের মধ্যেই যাবেন এখন!

(প্রাণকালীর গৃহে প্রবেশ, দু'জনে উপবেশন)

মাষ্টার। দেখবেন মশায়, শীঘ্র ছেড়ে দেবেন, বোঝেনই ত, পরের চাকরী, এক ঘণ্টা দেরী হ'লে সর্বনাশ! একবার একজন বন্ধুর অনুরোধে প'ড়ে এক হপ্তা—শুধু একটি হপ্তা মশায় কামাই হয়েছিল—তা সে যে লাঞ্ছনা—কি বলব!

শ্যাম। উঃ! তাই ত, ওরা সব পাষণ্ড মশায়, ওরা সব পারে! বুঝেছি আপনাকে গলায়—

মাষ্টার (তাড়াতাড়ি) না না, তা নয়, এই—

শ্যাম। তা যেন নাই হ'ল—মাইনেটা যে কেটে নিয়েছিল, তার ত সন্দেহ

নেই, গরীবের প্রতি কি অত্যাচার—তা নিক গে—কিছু মনে করবেন না—আমি—

মাষ্টার। আপনি ত আমাদের মা-বাপ আছেনই কিন্তু মাইনে কাটাও নয়। মাণিকের মা স্পষ্ট ব'লে পাঠালেন যে, অমন করলে এবার কর্ত্তাকে ব'লে দেবেন, আর মাণিক বল্লে—ওরূপ হ'লে সে স্বতন্ত্র মাষ্টারের বন্দোবস্ত করবে।

শ্যাম। হাঃ হাঃ, মাষ্টার মশায়, আপনি বলেই ও রকম হয়েছিল! আমি হ'লে—

মাষ্টার। কি করতেন?

শ্যাম। কি করতুম! বড় মানুষের ছেলেকে যে রকম ক'রে পড়াতে হয়, তাই করতুম।

মাষ্টার। সে কি, কোন রকম ফন্দী আছে না কি? আমাকে শিখিয়ে দিন দেখি।

শ্যাম। সে অতি সহজ ফন্দী। পড়াতে গিয়ে একেবারেই পড়াতে হয়, তা হ'লেই সব চুকে যায়, বিনা আয়াসে মাইনেটি আদায় হয়, আর ঘাড় ভেঙ্গে দুপাত্র টানাও যায়।

মাষ্টার। তবে বলব মশায়? সে উদ্যোগটাও হয়ে এসেছে।

শ্যাম। সত্যি নাকি?

মাষ্টার। সত্যি না ত কি, যে টেরী বাঁকিয়ে চুল আঁচড়াতে শিখেছে, শীঘ্রই তার গোল্লায় যাবার লক্ষণ।

শ্যাম। বটে! টেরি বাঁকাতে ধরেছে! তবেই হয়েছে! আমাদের হরি এমন ভাল ছেলে ছিল, যেদিন দেখলাম চুল ফিরিয়েছে, সেব কি মশায়, তার পরদিন থেকে সে স্কুল ছেড়ে দিল!

মাষ্টার। এরও সে উদ্যোগ হয়ে এসেছে; কিন্তু বড় মানুষের কথা বলতে ভয় করে, যদি প্রকাশ—

শ্যাম। পাগল না কি! ও সব ভাবতে হবে না, বলুন দেখি ব্যাপারটা কি?

মাষ্টার। (চুপে চুপে আরম্ভ করিয়া প্রকাশ্যে) মাণিক বল্‌ছিল, তার বাপকে ব'লে একদিন ষ্টার থিয়েটারে যাবে, চৈতন্যলীলা তার ভারী দেখতে ইচ্ছে হয়েছে।

শ্যাম। ষ্টার থিয়েটার! হাঃ হাঃ, আমি ত বলেছিলাম?

মাষ্টার। কিন্তু একটা কথা,—তার বাপ যে যেতে টাকা দেবে, তা আমার মনে হয় না। তিনি তেমন পাত্রই নন।

শ্যাম। তা বাপে না টাকা দিলে কি আর অন্য উপায় নেই? আমি ছেলেবেলা যখন টাকা চেয়ে না পেতুম, তখন মা ঘুমালে আস্তে আস্তে চাবিটি নিতুম। তা তার যখন যেতে ইচ্ছে হয়েছে, সে অবশ্যই চুরী করেছে।

মাষ্টার। (আশ্চর্য্যভাবে) সত্যি নাকি? তাই বটে। একদিন আমি পড়াতে গেছি, দেখি, সে তার বাপের ডেস্কের কাছে বসে আছে; আমাকে দেখে সে নিজের ডেস্কের কাছে এল।

শ্যাম। দেখলেন। সে নিশ্চয়ই ডেস্ক ভাঙ্গছিল, আপনাকে দেখে সে স'রে পড়লো, সন্দেহমাত্র নেই?

মাষ্টার। বলেন কি সন্দেহমাত্র নেই?

শ্যাম। যেমন নিঃসন্দেহ আমি আছি।

মাষ্টার। কি ভয়ানক! (হাঁ করিয়া একদৃষ্টে শ্যামের মুখ নিরীক্ষণ)

শ্যাম। হায় হায়, ছোকরাটা একেবারেই ব'য়ে গেল।

মাষ্টার। একেবারেই ব'য়ে গেল!

(বামাচরণ বাবুর প্রবেশ)

বামা। কি হয়েছে? দুজনে অমন ক'রে বসে আছ কেন?

শ্যামা। বলব কি মশায়, তাজ্জব লেগে গেছে—বরাবর ত শোনাই যেত, মাণিক বড় ভাল ছেলে, সে নাকি পড়াশুনা ছেড়ে মায়ের বাক্স ভেঙ্গে টাকা চুরী ক'রে থিয়েটারে থিয়েটারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বামা। (অবাক হইয়া) আমার বিশ্বাস হয় না—তাকে আমরা বড় ভালছেলে ব'লে যে জানি, তার নামে এ পর্য্যন্ত মন্দ কথাও ত কখনো শুনি নি!

শ্যাম। আপনার কিসে বিশ্বাস হয়! এই মাষ্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা করুন, ইনি তার নাড়ী নক্ষত্র সব জানেন। ইনি বলছেন, ইনি স্বচক্ষে তাকে তার বাপের ডেস্ক ভেঙ্গে চুরী কর্‌তে দেখেছেন, আর—

(মাষ্টারের চোখে হাত দিয়া ক্রন্দন।)

বামা। কি ভয়ানক—কি ভয়ানক—পৃথিবীতে কাকেও বিশ্বাস নেই!

[প্রস্থান

মাষ্টার। দুপুর বেজে গেল, আজ আর পড়াতে যাওয়া হ'ল না দেখছি, এখানেই আহারের কথাটা বলে দিন।

শ্যাম। তবে রাতটাও থেকে যান, সন্ধ্যার পর দুজনে ষ্টার থিয়েটার যাওয়া যাবে এখন।

সেই দিনেই মাণিকের নিন্দায় সহর গুল্‌জার হইয়া পড়িল।

———

সৌন্দর্য্যানুরাগ

পত্নী পুকুর-ধারে সোপানে একখানি বই হাতে আসীন,
স্বামীর আগমন ও নিকটে উপবেশন।

স্বামী। কি পড়া হচ্ছে? রসময়ের অসময়ে আবির্ভাব হ'ল নাকি?

স্ত্রী। না, না,—এস এস,—একলা প'ড়ে মন উঠছে না—একবার শোন দেখি, এবার আর বল্‌তে হবে না যে, ইংরাজীতে অমন ঢের আছে।

স্বামী। যে মত্ত দেখছি, ভয় হচ্ছে যে! একেবারে দেখো মনটা হারিয়ে ফেলো না। আমার যেন শেষে হা হা ক'রে বেড়াতে না হয়।

স্ত্রী। (হাসিয়া) মন হারানই বটে—আহা—আহা, কি চমৎকার বর্ণনা, সত্যই মোহিত না হয়ে থাকা যায় না—

সুকোমল চরণ-কমল দুটি
ছোঁয়া কি না ছোঁয়া মাটী
আচল ধরায় পড়ে লুটি।
করে পদ্মফুল
করে দুল দুল
অলসিত আঁখি সম আধো আধো ফুটি।

কি চমৎকার—বল দেখি?

স্বামী। তাই ত! (বইখানি হাতে লইয়া) স্বপ্নপ্রয়াণ? নামটি ভাল। তা পড়ব এখন, এখন থাক। আমার কি ভয় জান—সৌন্দর্য্যরসে মিছরির মত আমাকে এত শীঘ্র গলিয়ে ফেলে যে, ও সব পড়তে বড় ভয় করে। বিশেষ এখন তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইতে এলুম—তা হ'লে আর তা হবে না। কিন্তু তুমি ভাই, ঐ বর্ণনার সৌন্দর্য্যটুকু really কতটা appreciate করেছ—

স্ত্রী। আবার ইংরাজী—বাঙ্গালা বেরোয় না বুঝি?

স্বামী। কতটা তুমি উপলব্ধি করেছ, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

স্ত্রীলোকের Aesthetic faculty দূর হ—সৌন্দর্যরসজ্ঞান আদপে যে নেই, এটা একরকম সিদ্ধান্তই হয়ে গেছে।

স্ত্রী। বটে! কে সে বল দেখি বিদ্যাবাগীশ—যিনি এরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন?

স্বামী। (স্বগত) তুমি ত আর প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী বি, এ, নও কিংবা দিগম্বর গড়গড়ি এম, এ, বি এলও নও—যে, তোমার কাছে মুখ বুজে ব'সে থাকতে হবে একটা যার তার নাম করলে ত আর ভুল ধরবার যো নেই—কি সুবিধা! (প্রকাশ্যে) কার সিদ্ধান্ত শুন্‌তে চাও? লোকটা কে জান, আর কেউ না—স্বয়ং স্পেনসার!

স্ত্রী। পেনসর কেন, স্বয়ং আমর প্রাণেশ্বর বল্লেও ও কথা মানিনে। মিন্সের রকম দেখ না! ও কথা বল্লে কি ক'রে তার পেটে কি দু-কড়ার বিদ্যে নেই?

স্বামী। বটে প্রাণেশ্বরগুলো বুঝি মানুষের মধ্যেই নয়?

স্ত্রী। (হাসিয়া) আমার প্রাণেশ্বর ছাড়া।

স্বামী। স্পেনসার লোকটা কে জান? একজন সভাপণ্ডিত। তার কথা অগ্রাহ্য করার যো কি!

স্ত্রী। সত্যি নাকি? কখানা ইংরাজী বই পড়েছে?

স্বামী। হা হা— সে যে ইংরাজ!

স্ত্রী। ইংরাজ হলেই বা, সে কি তোমার মত অতগুলো বই পড়েছে, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি?

স্বামী। তা, আমার মত অতগুলো পড়েছে কি না, জানি না—তবে তিনিও একজন মস্ত বিদ্বান্, এই কথা বলতে পারি।

স্ত্রী। কক্ষনো না! তবে সে ও কথা বল্‌বে কেন? তবে বুঝি সেটা এ কালের নারদ অবতার? স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে কেবল ঝগড়া বাধাবার ফন্দী!

স্বামী। (হাসিয়া) তিনি একলা না—কাণ্ট, কমটি প্রভৃতি আজকালকার বড় বড় লোকদের সকলেরই ঐ মত। কিন্তু তুমি ত সে সব কথা অত বুঝবে না—আমি তোমাকে আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাই।

স্ত্রী। (গর্বে উৎফুল্ল হইয়া স্বগত) কি বিদ্বান্ স্বামীই আমি পেয়েছিলুম—সরস্বতী যেন কণ্ঠাগ্রে।

স্বামী। দেখ, ঐ ওখানে গোলাপ ফুলটি ফুটে আছে, কত সুন্দর—

স্ত্রী। তা ত দেখছিই, সে কি আর আমাদের চেয়ে তোমরা বেশী দেখবে ? শোন—

কি চক্ষে দেখে যে ফুল বিরহিণী !
ফুরায় না দেখা আর !
পড়ে যেন দুঃখের কাহিনী !
পড়া শিখিয়াছে ফুলধনু কাছে
ফুলেই তেঁই সে এত মরমগ্রাহিণী।
পুষ্প নারী-হৃদয়ের দরপণ,
অবলা লালিত্য যেন করিয়াছে ছবি অরপণ।
তা'র দলে দলে, তেঁই গীতচ্ছলে
মনোজ্বালা করে বালা ফুলে আরোপণ।

কবি এ কথা বলেছেন।

স্বামী। আহা, কথাটাই ছাই শেষ করতে দাও। মেয়েরা যে ফুল, আমি অস্বীকার করছি কি ? কিন্তু ফুল নিজের সৌন্দর্য্য জগৎ মুগ্ধ করে ব'লে কি নিজেও সে সৌন্দর্য্য অনুভব করে ? তেমনি তোমরা সৌন্দর্য্যভাব প্রস্ফুটিত কর ব'লেই সৌন্দর্য্যরসে মজ না।

স্ত্রী। কি কথাই বল্লে—ম'রে যাই আর কি ! ফুলের সঙ্গে আমরা সমান্ হলুম। কেন, আমরা ফুলের মত জড় নাকি ? মেয়ে ব'লে আমাদের কি মনটন কিছু নাই ! তা বলবে বই কি ! হা অদৃষ্ট ! (মুখভার)

স্বামী। (শশব্যস্তে) তাই কি আমি বলছি ?

স্ত্রী। তবে কি বলছ ?

স্বামী। আমি বলছি, মেয়েদের পুরুষদের মত অতটা সৌন্দর্য্যজ্ঞান নাই।

স্ত্রী। কথা একটা বল্লেই হোল না, কিসে বুঝিয়ে দাও ?

স্বামী। রুচির উৎকর্ষ সাধিত না হ'লে যথার্থ সৌন্দর্যজ্ঞান কখনই স্ফূর্ত্তি পেতে পাবে না। তোমাদের রুচির অভাব তোমাদের বেশেই প্রকাশ পায়, অসভ্য মেয়েদেরও এরূপ নির্লজ্জবেশ নয়। বিশেষ যখন তোমরা নিমন্ত্রণে যাও—দশজনের মাঝে ভদ্র রকম বেশের যেখানে নিতান্তই আবশ্যক, সেখানেই তোমাদের চূড়ান্ত কুরুচি প্রকাশ পায়।

স্ত্রী। প্রভু, সে কার দোষ ? আমাদের, না আপনাদের ? আপনারা আমাদের যেমন রাখেন, তেমনি থাকি, যে পথে নিয়ে যান, সেই পথে যাই।

আপনারা আমাদের' এই বেশ ভালবাসেন, তাই আমরা পরি, যদি দেশশুদ্ধ পুরুষের এ বেশ নিন্দনীয় মনে হয়, ত একদিনেই এর জন্য ব্যবস্থা হয়ে যায়।

স্বামী। কেন, আমি ত অনেকবার এরূপ কাপড় পরার নিন্দা করেছি।

স্ত্রী। ও মা, কবে গো? সেদিন বোসেদের বাড়ীর বৌয়ের নতুন ফ্যাসানের কাপড় করার কথা শুনে কি বল্লে, সব কি ভুলে গেছ?

স্বামী। দূর কর ছাই—তোমরা এমন কথাটাকে বাঁকিয়ে ফেলতে জান! নতুন কিছু হ'লেই লোকে অমন দু একটা কথা কয়। তাতে ত আর তোমাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান আছে ব'লে প্রমাণ হচ্ছে না। ভারতচন্দ্র, বিদ্যাপতি প্রভৃতি আমাদের কবিদের বর্ণনায় দেখ, আর আসলেও দেখ,—বাঁকাহাসি, আড়চাহনি, তেড়িফেরান, সৌখীনতা ভাবেই আমাদের দেশের মেয়েরা পাগল। যথার্থ মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব পুরুষের একটা পুরুষত্ব ভাব এ আমাদের বাঙ্গালী মেয়েরা কজন Appreciate করে—দূর কর ছাই, এ সবে কজন মেয়ে মুগ্ধ হয় বল দেখি? এইখানেই ত প্রকৃত রুচির অভাব।

স্ত্রী। তা দেশের পুরুষরা যদি সব মেয়েই হয়, তার জন্য আমরা কি করব?

স্বামী। তা কেন? তোমরা যদি বাস্তবিক পুরুষের পৌরুষিকগুণ ভালবাসতে তা হ'লে কি পুরুষেরা মেয়ে হ'তে পারে? তা হ'লে দেশের স্বতন্ত্র শ্রী হয়ে পড়ত। এই সেদিন আমি এক রকম নতুন রকম কাপড় ও পাগঁড়ি তৈরী করলুম,—তা দেখেই তুমি নাক তুলতে আরম্ভ করলে। তোমার সেই বাহারে ধুতি চাদরটি না হ'লে মনঃপুত হয় না!

(ভ্রাতৃবধূর প্রবেশ)

স্ত্রী। (হাসিয়া) ও বউ মজা শুনসে? তুই যদি ভাই সেই ধুম্ব পাগড়িটা—আর মালকুচা সাটের কাপড় পরাটা দেখতিস্—ত হাসি রাখতে পারতিস না। তা যখন যুদ্ধে যাবে, সে রকম কাপড় পরো—এখন ঘরে ব'সে আর ওতে কি হবে?

স্বামী। তা তুমি যেতে দিলে ত?

স্ত্রী। তা দেব না কেন? এই যে সেদিন হারার মাকে হারা মদ খেয়ে মারতে লাগলো—আমি জানালা দিয়ে দেখে ছাড়িয়ে দিবার জন্য তোমাকে কত ডাকলুম—তা তুমি ত গেলে না!

স্বামী। (স্বগত) বেশ স্ত্রী যা হোক! মাতালের হাতে গিয়ে তখন প্রাণটা

থুইয়ে আসি। (প্রকাশ্যে) সে তখন আমার মাথা ধরেছিল, কি করি বল?

স্ত্রী। মাথা আবার কখন ধরলে। তুমি ত বল্লে, কে আবার যায়।

স্বামী। আমি না গিয়ে থাকি—সেও তোমার দোষ। তুমি যদি যশোবন্তের স্ত্রীর মত আমাকে উত্তেজিত করতে, তা হ'লে কি আমি না গিয়ে থাকতে পারতুম?

স্ত্রী। সে আবার কোন্ কেতাবে আছে?

স্বামী। টডের রাজস্থানে।

স্ত্রী। ইংরাজী না বাঙ্গালা?

স্বামী। ইংরাজি।

স্ত্রী। সেটা কার দোষ? তুমি আমাকে ইংরাজী পড়ালে না কেন? তা হ'লে ত সে বক্তৃতাটি মুখস্থ ক'রে রাখতুম!

স্বামী। (স্বগত) তা হ'লেই হয়েছিল আর কি! এখানে এসে বিদ্যে ফলিয়ে যে সুখটুকু আছে, তাও থাকত না। (প্রকাশ্যে) তা আমি ত তোমাকে ইংরাজী শেখার জন্য ঢের বলেছিলুম—তোমার সঙ্গে একসঙ্গে মিল স্পেনসর প'ড়ে যদি দুজনে সকল রকম ভাবের আদান-প্রদান করতে পারতুম—তা হ'লে কি সুখই হোত।

ভ্রাতৃজায়া। বলি, ব্যাপারখানা কি, আমি ত তোদের ঝগড়ার মানে মোদ্দা কিছু পাচ্ছি নে।

স্ত্রী। উনি বলছেন কি জান—মেয়েদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান নেই।

ভ্রাতৃজায়া। সে কি কথা! কার কেমন রূপ, কে কেমন দেখতে—কে সুন্দর—কে কুরূপ, তা আমরা বুঝতে পারি নে? আমরা কি কাণা নাকি?

স্বামী। ঠিক কাণা নয়—একচোখো। তোমরা কুরূপই দেখতে পাও, সুরূপ কারো কখনো দেখ না। এই মনে কর—আমরা একটা সুন্দরী—এই সৌন্দর্য্য দেখলে যতটা আনন্দলাভ করি—তা কি তোমরা কর? তোমাদের মুখে কাউকে ত প্রায় সুন্দর বলতেই শোনা যায় না!

স্ত্রী। ও মা, কি হবে? কেন জগৎ বাবু?

স্বামী। (রাগিয়া) জগৎ বাবু! সে কথা কে বলছে? আমি বলছি—যথার্থ সৌন্দর্য্য তোমাদের চোখে লাগে না—লাগে কেবল তার খুঁৎটা। সৌন্দর্য্য দেখে তোমরা আনন্দ উপভোগ কর না—ঈর্ষ্যা উপভোগ কর।

স্ত্রী। কেন, কাকেই বা আমি ঈর্ষ্যা-নয়নে দেখলুম আর কারই বা খুঁৎ

ধরতে গেছি ?

স্বামী। কেন ললিতা—অমন সুন্দরী, আর তুমি—

স্ত্রী। যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবার কথা হয়েছিল !

ভ্রাতৃজায়া। ও পোড়া কপাল, সে আবার সুন্দরী ? তার পায়ের আঙ্গুলের নখগুলো যেন শালপাতা পানা চটালচটাল। হাতের কুনুইটা ঢিবলে বার হয়ে আছে। তার পর আবার মেয়েমানুষের অত বড় কপাল, ট্যাঁকাল নাক। শ্রী যে কোন্‌খানটায় তা ত বুঝতে পারি নে। চুলটা ছাই যদি পেটে পেড়ে কপালটা ঢাকে, তবু না হয় চলে—তা না, আবার ঐ চাঁদপারা কপালে আলবার্ট ফ্যাসানো চুল বাঁধা—ম'রে যাই আর কি ! মেয়েমানুষ ছোটখাট কপালটি হবে, খাঁদাপারা নাকটি হবে ; হ্যাঁ, তবে চোখ দুটি ডাগর ডাগর দেখায় ভাল। কেন, তার চেয়ে আমাদের ঠাকুরঝি কি কম সুন্দরী ?

স্বামী। (মনে মনে) হ্যাঁ, ঠিক ঐরূপ খ্যাঁদাপারা শ্রীটিই বটে।

স্ত্রী। তা ভাই, আমি যেন নেই সুন্দরী হলেম—তাই ব'লে কি আর কেউ সুন্দর নেই—ঐ একজনই কি বিশ্বে সুন্দর জন্মেছে ? অমন পটলচেরা চোখ আমি ঢের দেখিছি !

স্বামী। কোথায় বল দেখি ?

স্ত্রী। কেন, আমার ভগিনীপতির চোখ দুটি কি চমৎকার। দেখেছে ত বৌ ?

স্বামী। (রাগিয়া) জগৎ বাবু !—সেই বানরটা আবার !

স্ত্রী। আর আমার মেজ ভগিনীপতি ত আরো সুশ্রী দেখতে। যেমন রং—তেমনি চেহারা !

স্বামী। সে হনুমানটার নাম শুনলে গা জ্বলে।

স্ত্রী। আর সেজও যেন কার্ত্তিক !

স্বামী। (ক্রোধভরে উঠিয়া) আমি চল্লুম, বুঝেছি, সবাই সুন্দর—আমি কেবল কুশ্রী, আমার মুখ আর তোমার দেখে কাজ নেই।

স্ত্রী। কেন গো—এত রাগ কি ? সুন্দরকে সুন্দর বলেছি বই ত নয় !

স্বামী। তাই জন্ম জন্ম বল, আমি চল্লুম।

(পুষ্করিণী-সোপানে দ্রুতবেগে অবতরণ)

ভ্রাতৃজায়া। এ কি ! হাসতে হাসতে সমস্তটাই শেষে হাহাকার যে !

স্ত্রী। [কাঁদিয়া] কর কি, কর কি—সব ঠাট্টা। আমি অমন কথা বলব না।

স্বামী। না, আমি আর তোমার সুখের বাধা হব না। তুমি চিরদিন সাধ মিটিয়ে ভগিনীপতিদের চন্দ্রানন দেখো।

স্ত্রী। সব ঠাট্টা গো, আমি আর অমন কথা কখনো বলব না।

স্বামী। কেন বলবে না? জন্ম জন্ম বল। তোমার ভগিনীপতিদের রূপে মুগ্ধ হয়ে থাক—আমি জলে ডুবে মরি।

ভ্রাতৃজায়া। বলি ঠাকুরজামাই, কর কি? মর, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু সিঁড়িতে প'ড়ে গেলে অমন চাঁদপানা মুখে চিরকালই কলঙ্ক ধ'রে থাকবে যে?

স্বামী। (জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া) সে কথা বড় মিথ্যা নয়, তবে দেখছি, এখান থেকেই আবার ফিরতে হোল।

গানের সভা

গৃহকর্তা গোপাল বাবু, পুরাতনানুরাগী নব্য গ্রাজুয়েট হরিদাস এম, এ; জ্ঞানদাস বি, এ; বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, তদ্বন্ধু ভজহরি প্রভৃতি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসীন।

ভটচায। যাই বল, যাই কও, সেকালের মত গাইয়ে আজকাল নেই।

গোপাল। না মশায়, এ মস্ত গাইয়ে, একবার এর গানটা শুনে তবে ও কথা বল্‌বেন।

ভজহরি। বলি কার পালাটা হবে?

গোপাল। কারো পালা-টালা নয় মহাশয়, এ হোল ওস্তাদ মানুষ, কালোয়াতি খেয়াল, ধ্রুপদ, তার চেয়ে ত টপ্পাই ভাল।

জ্ঞান। টপ্পাটাই হোল কি না more modern invention.

হরি। modern invention বলেই কি ভাল বলতে হবে নাকি? বল দেখি আমাদের আগে যা ছিল, তার চেয়ে এখন ভাল কি হয়েছে?

জ্ঞান। তা নাই হোল—তবে তুমি যে বল্লে টপ্পা ভাল?

হরি। আমি ভাল বল্লুম because ভাল because আমার ভাল লাগে, because খেয়াল ধ্রুপদ are nothing but barrious meaningless gronts.

গোপাল। আরে, তোমরা যে ঝগড়া করতে বসলে!

হরি। মশায়, ঝগড়া কি, এ ত ঠিক কথা, বলুন দেখি, আগে যা ছিল, তার চেয়ে এখন ভাল কি হয়েছে?

জ্ঞান। তা ত অস্বীকার করছিনে।

হরি। তা করছ না? বস্, তবে সব চুকে গেল—then let us friends again—shake hands and say—আমাদের আগে যা ছিল, তার চেয়ে ভাল কিছু হয় নি।

ভটচায। বেঁচে থাক বাবা, তোমার মত বুঝদার ছেলে আমি একটি আর দেখি নি! বড় ঠিক কথা—সেদিনের মত আর কি এখন কিছু আছে? সেই যে রামযাত্রা—রামলক্ষ্মণ ছোট দুটি ভাই, বুকে চন্দনের চিত্র-বিচিত্র, নাকে নোলক, মাথায় চূড়া, হাতে ধনুর্ব্বাণ, নৃত্য করতে করতে হুহুঙ্কারকারী, সোলার মুণ্ডধারী রাক্ষসপতি দশাননকে—

ভজ। আ-হাহা! আর সেই কৃষ্ণযাত্রা! ধড়া-চূড়াধারী বালক কৃষ্ণ, রাঙ্গা লাঠির বাঁশী হাতে, অলকা-তিলকায় সেজে রাধার প্রেমে গদ্‌গদ হয়ে সরু গলায় সরু সুরে অধিকারী বিন্দে দূতীকে বিনয় ক'রে বলছেন—

রাধা রাধা বলে—
মানের দায়ে প্রাণ ত্যজিব যমুনাজলে।

হরি। উঃ, কি চমৎকার গান!

রাধা রাধা ব'লে—
মানের দায়ে প্রাণ ত্যজিব যমুনাজলে।

এমন সহজ ভাবের সহজ গান এখন আর কোন কবির মুখ হ'তে বার হয় না। ইংরাজী অনুকরণে প'ড়ে কবি ত আর আমাদের নেই।

আহা! রাধা রাধা ব'লে,—
মানের দায়ে প্রাণ ত্যজিব যমুনাজলে।

জ্ঞান। এখন হ'লে একজন বলতেন—

মান ক'রে থাকা আর কি সাজে,
বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চল চল কুঞ্জমাঝে।

সেক্‌স্‌পিয়র বলেছেন—Othello the Occupation is gone—আমরাও বলতে পারি, Poetry the time is gone!—অর্থাৎ কবিতা, তোমার কাল আর নেই।

ভটচায। পয়ারের কথা বলছ বুঝি! তা যদি বল্লে ত শোন। বর্দ্ধমানের

রাজা সেকালে জাত্যংশে পতিত তাঁর এক হুমড়ো-চুমড়ো বন্ধুকে জাতে ওঠাবার অনুরোধ ক'রে নদের রাজাকে একখানা পত্র দেন। তার উত্তরে নদের রাজা দুই ছত্র পয়ার লিখে পাঠান—

আমি—নহি তব অবাধ্য
এ—বহুজনরব বহুজনসাধ্য।

অস্যার্থ—আমি তোমার অবাধ্য নই, আমার ইচ্ছা, আমি তাঁকে জাতে উঠাই,—কিন্তু যে কথা বহুজনে জানে, তা বহুজনের ইচ্ছাতেই লোপ করা যেতে পারে। একা আমার সাধ্য কি তাঁকে জেতে তুলি। দেখেচ ত বাবা! দুই ছত্রের মধ্যে কি কারখানা।

ভজহরি। আজকাল এমন পয়ার আর হ'তে হয় না।

গোপাল। মশায়গণ, আজ দেখছি আপনাদিগকে কষ্ট ভোগ করবার জন্যই নিমন্ত্রণ করেছি। গায়ক মশায় আপনাদের মনের মত উচ্চাঙ্গের কবিতায় গান গাইতে পারবেন কি না, আমার বড়ই সন্দেহ হচ্চে।

হরি। রাধা রাধা ব'লে—পরাণ ত্যজিব আমি যমুনার জলে! কি সুন্দর! আর কিছু নয়, একটা গান শোনাবার জন্য কি করা না যেতে পারে?

(গায়কের প্রবেশ)

গোপাল। এই যে গায়ক মশায়! আপনার জন্য সবাই অপেক্ষা করছি, আপনাকে আজ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করতে হচ্চে।

গায়ক। কেন মশায়, দলে এসে পড়েছি না কি?

ভটচায। (হাসিয়া)—তা বলতে পারেন—বলতে পারেন। মশায়ের একটি রামযাত্রার—

ভজহরি। একটি কৃষ্ণযাত্রার—

জ্ঞান। মশায়, আমরা আপনাকে একটি উচ্চাঙ্গের টপ্পা গাইতে বলছি।

হরি। রাধা রাধা ব'লে—জীবন ত্যজিব আমি যমুনাজলে; মশায় জানেন কি?

গায়ক (অবাক্ হইয়া) গোপাল বাবু, আপনি ত জানেন, ধ্রুপদ খেয়াল নিয়েই আমার কারবার।

গোপাল। কি করবেন মশায়, এদের মনের মত গানই আগে হোক্।

গায়ক। (স্বগত] কি বিপদ্—এ দেখ্ছি ভেড়ার দলে এসে পড়া গেছে —তবে ভেড়াই সাজা যাক্। একটা হাসির গান শেখা গেছলো, সেইটে গাই!

গান।

ছক্র গাড়ী চক্র নাড়ী, বক্র পাড়ি মারছে।
বঙ্ককানু ফুংকি বেণু যন্ত্র তন্ত্র সারছে।

হরিদাস। (চোখ বুজিয়া) ওহো ওহো—

ভটচায। (মৃদুস্বরে) হরিদাস বাবু, কি হোল, ভাল বুঝ্‌তে পারছিনে।

হরি। বুঝতে পারছেন না! গানের অর্থ বড় চমৎকার! আমাদের দেহরূপ এই যে ছক্রগাড়ী—এই গাড়ী যখন প্রবৃত্তিরূপ চক্রনাড়ীর বক্র পাড়ি মারে, তখন কানু অর্থাৎ পরমাত্মরূপী কৃষ্ণ আমাদের আত্মার মধ্যে সুবুদ্ধির বাঁশী বাজাইয়া আমাদের বিকৃত মদরূপ যন্ত্র মেরামৎ করেন। বুঝলেন মশায়?

গোপাল। (স্বগত) Ah! philosophy with a vengeance! এরা দেখছি ridiculausকেও sublime করে তুলতে পারে।

হরিদাস। (গদগদ হইয়া) কি ভাষা!

জ্ঞান। কি ভাব!

ভজহরি। ওহো ওহো!

ভটচায। আহা আহা! (চারিজনের দশা-প্রাপ্তি)

ব্যাঘ্র-সভা

সভাপতি ব্যাঘ্র। সভ্যগণ, আমরা সুসভ্য ব্যাঘ্র জাতি, পশুদিগের মধ্যে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। এই উন্নতির কারণ--

প্রথম সভ্য। আমাদের খরধার দন্তনখ, আমাদের দাঁতের জোরের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্য? দেশকে দেশ আমরা এই দাঁত-নখের প্রভাবে উচ্ছন্ন দিই।

সভাপতি। (জিভ কাটিয়া) উহুঁ, অমন কথা বলিবেন না। মনের জোরই আমাদের প্রধান জোর। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বাক্য, স্বাধীন বাণিজ্য, ইহাই আমাদের উন্নতির কারণ। আমরা যেখানে যাই, এই স্বাধীনতা বিস্তৃত করি, বিশ্বজনীন উন্নতির ভিত্তি প্রোথিত করি।

দ্বিতীয় সভ্য। উত্তম, উত্তম, আমরা উন্নত উদার ব্যাঘ্র জাতি। আমাদের যেরূপ সুবিধা; সেইরূপ বাক্য, সুতরাং আমাদের স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বাক্য—

তৃতীয়। স্বাধীন বাণিজ্য। গরু-ছাগল আমাদিগকে অনবরত রক্ত যোগায়,

সেজন্য তাহাদিগকে আমাদের কিছুই দিতে হয় না।

(সহসা একজন শৃগাল সভ্যকে দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া) কি হে, তুমি কি বলিতে চাও?

শৃগাল। আমি শুধু একটি স্বাধীন বাক্য বলিতে চাই—

দ্বি স। বেটা, তুমি স্বাধীন বাক্য বলিবে? তোমাকে এই উন্নত ব্যাঘ্রজাতির সহিত একাসনে বসিতে দিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট, আবার স্বাধীন বাক্য! ধর বেটাকে।

(সকলের আক্রমণ, শৃগালের পলায়ন।)

(ব্যাঘ্র-দূতের প্রবেশ।)

দূত। মশায়রা গো—মশায়রা গো, আর স্বাধীনতা না, এদিকে গোথানার গরুটা যায়।

সভাপতি। বড় গরুটা যায়! তার পা দুটা যে খেয়ে রাখা গেছে, যাবে কি ক'রে?

দূত। সে যাবে না মশাই, তাকে নিয়ে যাবে।

সভা। কে, নেবে কে?

দূত। কে আবার? ভালুক ভায়া! তাঁর ডাক এতক্ষণ আপনারা কেউ জানেন নি।

সভা। ভালুক ভায়া! গোথানার নেকড়ে খানসামা কি করছে? ভালুকের কান পাকড়ে ধরুক না?

দূত। সে ত মশাই পাকড়াতেই গেছে।

সভা। তবে খবর?

দূত। খবরের মশায় অভাব। নেকড়ের খবর ত এখনো পাওয়া যাচ্ছে না।

প্র-স। সত্যি নাকি?

সভা। তাই ত, নেমকের চাকর, বিড়ালটা বল, কুকুরটা বল, যখন তখন আমাদের যোগাচ্ছে, তার দেখা নেই?

দ্বি-স। তার জন্যেই ত এমন পেট ফুলিয়ে ব'সে আছি, আর তার দেখা নেই?

তৃতীয়। গেল গেল, সব গেল, গরু গেল, নেকড়ে গেল, হায় হায় সব গেল!

(সকলের উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন)

সভাপতি। (ব্যগ্রভাবে) আরে, কেঁদ না—সভ্যগণ, আমি এখনি খোঁজ নিতে পাঠাচ্ছি।

গোঁখানা

(একজন ব্যাঘ্রের প্রবেশ)

ব্যাঘ্র। বলি নেকড়ে ভায়া, হেথায় আছ হে? (নেকড়েকে দেখিয়া) এই যে নেকড়েজি, খবরটা কি বল দেখি? পাকড়ালে?

নেকড়ে। প্রভু, এতক্ষণ তা কি বাকি থাকে, সে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।

ব্যাঘ্র। (আহ্লাদে) বেশ হয়েছে—ভালুক ভায়া কেমন জব্দ। কিন্তু কোথায় রেখেছ বল দেখি?

নেকড়ে। ভালুক ভায়া! তাকে কেন পাকড়াব?

ব্যাঘ্র। তবে কাকে?

নেকড়ে। যাকে পারব, তাকে। ভালুক পাকড়ান কি সহজ নাকি? ভালুক ত ভালুক—মশায়, কাবুলি বিড়ালটাকে ধরতে গিয়ে দেখুন না গায়ে এখনো আঁচড়ানো দাগ।

ব্যাঘ্র। তবে কাকে পাকড়ালে নেকড়ে সাহেব?

নেকড়ে। দুটা ফড়িং।

ব্যাঘ্র। ফড়িং! কই?

নেকড়ে। একটাকে ঐ বর্ম্মার কোণে মেরে রেখে এসেছি। আর একটাকে এই পাহাড়ে মারতে চলেছি।

ব্যাঘ্র তাহার বুদ্ধিবিক্রমে মুগ্ধ হইয়া নতজানু হইলেন।

সূক্ষ্মার্থ

আকবরের প্রমোদ-সভায়, তানসেন সুরদাস রচিত গান গাহিলেন—

"যশোদা বার বার ইহ ভাষে, হৈ কোই ব্রজমে হিতু হমারো চলত গোপালহি রাখৈ।"

সম্রাট বলিলেন—"বা, কি তারিফ! কিন্তু ইহার অর্থ কি ওস্তাদজী?"

তানসেন। যশোদা ঘড়ি ঘড়ি ইহাই বলিতেছেন, ব্রজধামে আমার এমন কেহ মিত্র আছেন, যিনি আমার চলন্ত গোপালকে ধরিয়া রাখিবেন ?

আকবর বলিলেন, "যেমন গান, তেমনি অর্থ, বহুত আচ্ছা ওস্তাদজি।" রাজার প্রশংসায় প্রসন্ন হইয়া তানসেন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর মন্ত্রী বীরবল সেইখানে আসিয়া উপনীত হইলেন। সম্রাট তাঁহাকে বলিলেন,—"মন্ত্রীবর, যশোদা বার বার ইহ ভাষৈ, হৈ কোই ব্রজমে হিতু হমারৌ চলত গোপাল হি রাখৈ—এই গানটি গাহিয়া তানসেন মন উদাস করিয়া দিয়া গিয়াছেন।"

বীরবল হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি গানে উদাস হইয়াছেন, গানের অর্থে আমার উদাসীন হইতে ইচ্ছা হইতেছে। বার অর্থাৎ পৌর (পাড়া)—যশোদা পাড়ায় পাড়ায় গিয়া ইহাই বলিতেছেন, ব্রজধামে আমার এমন কেহ মিত্র আছেন, যিনি গোপালকে আটকাইয়া রাখিবেন ? আহা!"

(টোডরমল্লের প্রবেশ)

টোডরমল্ল। মন্ত্রিমহাশয়, অর্থটা আমার সঙ্গত মনে হইতেছে না। বার অর্থে জল ও দ্বার, জলের দ্বার কি ? না ঘাট, সুতরাং গানটির অর্থ দাঁড়াইতেছে—যশোদা ঘাটে ঘাটে গিয়া ইহাই বলিতেছেন যে, ব্রজে আমার এমন কোন মিত্র আছেন, যিনি গোপালকে যাইতে না দিবেন ?

কবি ফৈজি এতক্ষণ নিস্তব্ধে তাঁহাদের কথা শুনিতেছিলেন, তিনি বলিলেন,—"মহাশয়গণ, আপনারা চিরকাল মন্ত্রণা প্রদান করুন, কিন্তু দোহাই আপনাদের, আপনারা আর কবিতার অর্থ করিবেন না।" জাঁহাপানা, বার অর্থে জল এবং দ্বার সত্য, কিন্তু এখানে ইহা নদীর জলও নহে, জলের ঘাটও নহে! এখানে জল অর্থে অশ্রুজল এবং দ্বার অর্থে অশ্রুজলের দ্বার অর্থাৎ আঁখি, সুতরাং গানটির অর্থ এই—যশোদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতেছেন, ব্রজে আমার এমন কেহ মিত্র আছেন, যিনি গোপালকে ধরিয়া রাখিবেন ?

(নবাব খান খানানের প্রবেশ)

আকবর। নবাব সাহা, বিষম সমস্যা! তানসেন গান গাহিয়া গেলেন, "যশোদা বার বার ইহ ভাষৈ হৈ কোই ব্রজমে হিতু হমারৌ চলত গোপালহি রাখৈ'—ইহার অর্থ লইয়া বড় গোল বাধিয়াছে, আপনাকে অর্থ ভাঙ্গিতে হইতেছে।

বীরবল। একবার আমার কথাটা আগে শুনুন, পাড়ায় পাড়ায় গিয়া—

টোডরমল্ল। তাহা হইতেই পারে না—যশোদা ঘাটে ঘাটে গিয়া—

কবি ফৈজি। ইহারা কি বলে মশায়! যশোদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া—

আকবর। কিন্তু তানসেন যিনি গানটি গাহিয়াছেন,—তিনি বলেন,—'ঘড়ি ঘড়ি যশোদা ইহাই বলিতেছেন যে, ব্রজে আমার এমন কেহ মিত্র আছে যে, গোপালকে ধরিয়া রাখে?' এখন আপনি মীমাংসা করুন, ইহার কোন্‌টি ঠিক?

নবাব। জাঁহাপনা, এ কোনটাই এই বিষ্ণুপদের ব্যাখ্যা নয়, সকলেই আপন আপন মনের অনুভাব বলিয়াছেন মাত্র।

বাদশাহ। সে কিরূপ?

নবাব। ঐ যে কলাবন্ত তানসেন, যিনি ঘড়ি ঘড়ি নোম তোম করেন, তাঁহার মনে ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, যশোদা ঘড়ি ঘড়ি বলিতেছেন। আর বীরবল জাতিতে ব্রাহ্মণ, পাড়ার পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, ইঁহার মনে হইয়াছে, যশোদা পাড়ায় পাড়ায় ফিরিয়া কহিতেছেন। আর টোডারমল্ল, তুমি মুৎসদ্দি—তুমি ঘাটে ঘাটে নৌকা বাহ আর মাশুল আদায় কর, তোমার মনে ঘাটের কথাই আসিয়াছে। আর ফৈজি কবি—ইনি জগৎশুদ্ধ লোককে কাঁদিতেই দেখেন।

বাদশাহ। ইহা ত ঠিক কথা! তবে তুমি বল নবাব সাহা, ইহার অর্থ কি?

নবাব। বার অর্থে কেশ। যশোদার প্রতি কেশ ইহাই বলিতেছে, 'ব্রজধামে আমার এমন কে মিত্র আছে—যে গোপালকে ধরিয়া রাখে?"

বলিয়া নবাব সাহা আপনার শ্মশ্রুতে সতৃষ্ণ কটাক্ষপাত করিলেন!

আকবার বলিলেন—বাহবা! বাহবা!

তত্ত্বজ্ঞানী

প্লাটার্ক ও তাহার শিষ্য।

প্লাটার্ক। অহঙ্কারের বিসর্জ্জনই সত্যজ্ঞান লাভের উপায়। সর্ব্বদাই মনে এই ভাব জাগ্রত রাখিতে হইবে। অহং বলিয়া বিশ্বসংসারে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নাই তুমি আমি সকলি সেই এক পরমাত্মাময়।

শিষ্য। কিন্তু কি করিয়া অহংকার পরিত্যাগ করিব প্রভু? আমি যখনি মনে করি, এ বিশ্বসংসারে আমার আমিত্ব কিছুই নাই, তখনি জগৎসংসার হইতে

আপনার পার্থক্য অনুভব করিতে থাকি।

গুরু। বৎস, জিতেন্দ্রিয় হও, মনঃসংযম অভ্যাস কর, তাহা হইলেই এই দ্বৈতভাবাপন্ন সৃষ্ট জগতের মধ্যে স্রষ্টা ও সৃষ্টের একত্ব অনুভব করিবে।

শিষ্য। সর্ব্বক্ষণই ত ভাবি মনঃসংযম করি, কিন্তু কি করিয়া করিব বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

গুরু। মনঃসংযম অর্থাৎ প্রবৃত্তি-দমন। মানবগণ স্ব স্ব প্রবৃত্তি-জয়ী হইলেই সত্যের আলোক দেখিতে পায়।

শিষ্য। ভগবন্, যে মন্ত্র দ্বারা মনুষ্য প্রবৃত্তি দমন করিতে পারে, আপনি তাহাই আমাকে প্রদান করুন!

গুরু। ইহার অন্য কোন মন্ত্র নাই, নিজের ইচ্ছা, একাগ্রতাই প্রবৃত্তিদমনের একমাত্র মন্ত্র, একমাত্র উপায়। অল্পে অল্পে অগ্রসর হও, প্রথমে ক্রোধ দমন কর। অহঙ্কার হইতেই ক্রোধের আবির্ভাব। যদি আমি জানি, সংসারে তুমি আমি নাই—তাহা হইলে কেই বা ক্রোধ করে, ক্রোধের পাত্রই বা কে? ক্রোধ অহংকারকে জাগাইয়া রাখে সুতরাং ক্রোধ মহাঅনর্থের মূল। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে অজ্ঞানতার উদয়। অতএব সর্ব্বাগ্রে ক্রোধ দমনীয়।

শিষ্য। আপনার উপদেশে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু তথাপি ক্রোধের উদ্রেক তিরোহিত করিতে পারিতেছি না।

গুরু। অজ্ঞান! অজ্ঞান!

শিষ্য। প্রভু, যখন দুষ্ট দাস আপনার নিন্দাবাদ করিতেছিল, আমি কিছুতেই ক্রোধ সংবরণ করিতে পারি নাই। এ অজ্ঞানতা—

গুরু। আবার সে গালি পাড়িতেছিল?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ।

(দাসের প্রবেশ)

গুরু। বৎস, দাস সর্ব্বদাই শাসনীয়। উহাকে বেত্রাঘাত কর।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

দাস। (সক্রোধে) আমি কি দোষ করিয়াছি? বিনাদোষে আমাকে মারিতেছেন?

(পুনশ্চ বেত্রাহত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুর প্রতি) ভণ্ড তপস্বি, এই তোমার জিতেন্দ্রিয়তা? এই তোমার তত্ত্বজ্ঞান? অন্যকে ক্রোধ দমন করিতে উপদেশ দাও, সংযমী হইতে বল, আর নিজে অন্যের উপর এইরূপ ব্যবহার

করিয়া ক্রোধহীনতার দৃষ্টান্ত দেখাও!

প্লাটার্ক। (স্থির গম্ভীরভাবে) হতভাগ্য পাষণ্ড! কি দেখিয়া তুই মনে করিলি, আমি রাগিয়াছি? আমার মুখ, আমার স্বর, আমার বর্ণ, আমার বাক্য কিছুতে কি ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে? আমার চক্ষু বিস্ফারিত হয় নাই, মুখ রক্ত বর্ণ কিংবা স্বর ভয়ঙ্কর হয় নাই. আমি আস্ফালন করিতেছি না, কিংবা দাপাদাপি মাতামাতি করিয়াও বেড়াইতেছি না, আমার মুখে ফেন নির্গত হইতেছে না এবং এমন কোন কথা কহি নাই, যে জন্য আমাকে পরে অনুতাপ করিতে হইবে। রে মূঢ়. জানিয়া রাখ, এই সকলই ক্রোধের লক্ষণ।

(শিষ্যকে বেত্রাঘাত বন্ধ করিতে দেখিয়া)

বৎস, ইহাতে আমাতে যতক্ষণ এই বিষয় লইয়া বিচার চলিতেছে, তুমি তোমার কাজ করিতে থাক, থামিবার আবশ্যক নাই।

নিজস্ব সম্পত্তি

(সস্ত্রীক নবীন বাবু ও তাঁহার ভগিনীপতি রাখাল বাবুর কথোপকথন স্থলে নবীন বাবুর শ্যালী-পতি নভেল-লেখক ব্রজ বাবুর প্রবেশ)

রাখাল। চুপ চুপ, ঐ যে ব্রজ বাবুই আসছেন।

স্ত্রী। এই যে জামাই বাবু! নাম করতে যে এসে উপস্থিত, অনেক দিন বাঁচবে!

নবীন। দাদাঠাকুর. আস্তে আজ্ঞে হোক। এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছিল!

ব্রজ। (বসিয়া) তা বইখানা কি পড়া হয়েছিল?

নবীন। আরে, তার কথাই ত হচ্ছিল, চমৎকার!

রাখাল। এর কাছে বঙ্কিমবাবুও দাঁড়াতে পারেন কি না সন্দেহস্থল।

ব্রজ। দেখ রাখাল, তোমাদের সমালোচনাশক্তির প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা; এ পর্য্যন্ত এমন সমালোচক কিন্তু আর দেখলুম না।

স্ত্রী। ঠিক বলেছ! তা জামাই বাবু, তুমি যে বলেছিলে, বইখানা অভিনয় করতে দেবে, তার কি হোল?

ব্রজ। শেষে বুঝলুম, অভিনয় করতে না দেওয়াই ভাল। না জেনে কোন

লোকের নামে কিন্তু বল্‌তে চাইনে, তবে এইটে বলতে পারি—ঈর্ষ্যাটা মানুষের মনে স্বভাবতঃই প্রবল।

নবীন। তা সত্যি বলেছ।

ব্রজ। তা ছাড়া যারা নিজে লেখে, তাদের হাতে বই দেওয়া আমার বড় ভাল মনে হয় না।

নবীন। সেও একটা কথা বটে, চুরি করতে পারে।

ব্রজ। আমিও তাই ভাবছি, কার হাতে দেব, কে আত্মসাৎ করবে!

রাখাল। (আস্তে আস্তে) তাতে তোমার ত ক্ষতি দেখছিনে, ক্ষতি ত অন্য পক্ষেরই।

ব্রজ। কি বলছ?

স্ত্রী। উনি বলছেন, তোমার যে লেখা চুরি করবে, ক্ষতি তারই।

ব্রজ। ক্ষতি তারই! কথাটা ঠিক—

স্ত্রী। বুঝলে না? এ লেখায় Originality এত অধিক যে, চুরি ক'রে কেউ হজম কর্‌তে পার্‌বে না। জান ত Originality গুলি ঠিক লোহার কলাই—তাতে দন্তস্ফুট করা যে সে লোকের কর্ম্ম নয়, সে কেবল তোমরাই পার।

ব্রজ। (আহ্লাদে) বাস্তবিক বইখানা তোমাদের কোথায় কি রকম লাগলো, সেটা শুন্‌লে বুঝতে পারি—

রাখাল। সমস্তই ভাল লেগেছে।

ব্রজ। তবু কোথাও কিছু বদল করার আবশ্যক দেখলে কি? তুমি কি বল হে নবীন?

নবীন। কোথাও না, কোথাও না, আগাগোড়াই ভাল।

ব্রজ। কিছু সঙ্কোচ করো না। উপযুক্ত লোকে যখন আমার লেখার ঠিক দোষটি দেখিয়ে দেখিয়ে দেয়, তাতে আমি যেমন সন্তুষ্ট, এমন কিছুতেই না। বন্ধুরা যদি দোষ সংশোধন না করেন, তা হ'লে বন্ধুত্বই কি বল?

রাখাল। এতটা যখন বলছ—তা হ'লে আমার একটি কথা বলার আছে।

ব্রজ। কি বল!

রাখাল। আগাগোড়া বইখানি বেশ হয়েছে—

ব্রজ। বেশ হয়েছে?

রাখাল। হ্যাঁ, বেশ হয়েছে—কেবল একটু—

ব্রজ। কেবল একটু কি?

রাখাল। একটু যেন ঘটনার অভাব!

ব্রজ। ঘটনার অভাব! আশ্চর্য্য কল্লে যে!

রাখাল। হঁ্যা ঘটনা বড়ই কম হয়েছে।

ব্রজ। আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য! তুমি যদিও একজন সমজদার লোক এবং তোমার সমজদারিত্বের উপর আমার অটল বিশ্বাস, কিন্তু তবুও এ কথাটায় আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছিনে। আমার মতে বরং ঘটনাটা একটু বেশীই হয়েছে। নবীন কি বল হে?

নবীন। হাঁ, আমারও মতে ঘটনাটা যথেষ্ট আছে—আর প্রথম দিকের পরিচ্ছেদগুলি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু শেষাশেষি কৌতূহলটা যেন একেবারেই কমে আসে।

ব্রজ। কমে আসে? আমি কিন্তু অন্য যাকে প'ড়ে শুনিয়েছি, সকলেই ত বল্লেন কৌতূহল বাড়ে।

নবীন। আচ্ছা, গিন্নীকে জিজ্ঞাসা কর—উনি ত তোমার খুব একজন admerer.

স্ত্রী। ওর যেমন কথা, তুমি শুন জামাইবাবু! আমি সমস্ত বইখানির কোথাও একটু খুঁৎ পাইনি।

ব্রজ। তাই বল! মেয়েরা যেমন ঠিকটি বোঝে, পুরুষেরা অমন কখন বুঝতে পারে না।

স্ত্রী। আমার কেবল মনে হয়—একটু বেশী বড় হয়েছে!

ব্রজ। আকারে বড় হয়েছে, না বল্‌ছ ঘটনার আধিক্য বেশী হয়েছে?

স্ত্রী। এই অভিনয় করার পক্ষে আকারেই একটু বড় হয়েছে।

ব্রজ। শ্যালী ঠাক্‌রুণ, তোমার কথার উপর আমার কথা নেই, তবে এটা কি না হিসাবের কথা, আমি বেশ বল্‌ছি, অভিনয় কর্‌তে গেলে পাঁচ ঘণ্টার বেশী কখনই লাগবে না, তা হ'লে বইখানা ত আর বড় হ'তে পারে না।

নবীন। সে কথা তবে যাক। খবরের কাগজওয়ালারা কি বলছে?

ব্রজ। খবরের কাগজ! তাদের মতন মিথ্যাবাদী হিংসুক, নিন্দুক, বদমাইস, ধর্ম্মবুদ্ধিহীন—যাক্, আমি যদিও তাদের কাগজ পড়িনে।

নবীন। সেটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তারা যে রকম কঠোর গালাগালি দেয়, তাকে তোমার মত কোমল-হৃদয় লোকের বিশেষ কষ্ট পাবার সম্ভাবনা।

রাখাল। কিন্তু লেখক হ'তে গেলে সে নিন্দা শুনাটাও দরকার।

ব্রজ। তা যদি বল, তা হ'লে যার বন্ধু আছে, তার খবরের কাগজ পড়ার কিছুমাত্র আবশ্যক নেই। আর নবীন, তুমি যে ভায়া মনে কর, খবরের কাগজের নিন্দেতে আমি চোটে যাই, তেমন পাত্র আমাকে পাওনি। জঘন্য খবরের কাগজের প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই ভাল।

রাখাল। তা ঠিক। সেদিন ঐ কাগজটা তোমাকে কি গালটাই দিয়েছে।

ব্রজ। কি রকম?

নবীন। হ্যাঁ সত্যি, সে কি যাচ্ছে-তাই-রকম গালাগালি।

ব্রজ। (কষ্টে সৃষ্টে হাসিয়া) বেশ বেশ, বড় নাকি ব'য়ে গেল।

নবীন। বাস্তবিক—তাদের ঝালঝাড়া দেখলে হাসিই পায়!

ব্রজ। তবু কি বলেছে শুনি।

নবীন। রাখাল, তোমার মনে আছে হে?

রাখাল। দেখছি ভারী উৎসুক।

ব্রজ। উৎসুক! না, একটুও না। তবে কি না বলেছে জানাই যাক না।

নবীন। কি রাখাল মনে আছে? (চুপে চুপে) যা হয় কিছু ব'লে যাও।

রাখাল। হাঁ কতক কতক মনে আছে বৈ কি।

ব্রজ। বল না, শোনাই যাক।

রাখাল। বলেছে, তোমার কল্পনায় নূতনত্ব বা নিজত্ব কিছুই নেই। সমস্ত চুরী।

ব্রজ। সত্যি নাকি! এর চেয়ে absurd আর কি হ'তে পারে? (জোর করিয়া হাস্য) হাঃ হাঃ!

রাখাল। ঠাট্টা-তামাসাগুলি সব নিখত্তিতে ওজন করা—

ব্রজ। ভারী মজা! হাঃ হাঃ!

রাখাল। তুমি যে চুরী করেছ, তাও ভাল রকম ক'রে করতে পার নি, যত যেখানকার বিশ্রী বই আছে, তাই থেকে চুরী ক'রে চুরীটাও চুরীর অধম ক'রে তুলেছ।

ব্রজ। মিথ্যাবাদী! কেউটে। বোকাস্য বোকা!

রাখাল। ভাল লেখকের লেখাও যেখানে চুরী করেছ—তাও তোমার ভাষার আবর্জ্জনার মধ্যে পড়ে একেবারেই কলঙ্কিত হয়ে গেছে।

ব্রজ। নেকো-বাগীশ! গর্দ্দভ গণ্ড! ভূতুড়ে!

রাখাল। দু'এক জায়গায় যেখানে দৈবাৎ ভাষা ভাল হয়েছে, সেখানে বিকৃত

কল্পনা, কুরুচি এমন ফুটে উঠেছে যে, ভাষার সৌন্দর্য্য সেখানে বাঁদরের গলায় মুক্তাহারের মত হয়েছে।

ব্রজ। গিরগিটি! গোসাপ! বইখানা তার গলায় দেখছি, গলগণ্ড হয়ে উঠছে। বিস্ফোটক!

রাখাল। আর আমার সব মনে নেই, এক বিষয়ে কিন্তু তোমার খুবই প্রশংসা করেছে।

নবীন। হ্যাঁ, মুক্তকণ্ঠে।

ব্রজ। শুনি, শুনি?

রাখাল। বলেছে, গালাগালিগুলো যা দিয়েছে, তাতে কিন্তু আর সকলেই হার মেনেছে, সেইগুলি তোমার যথার্থ নিজস্ব সম্পত্তি।

নবীন। বাহবা! বাহবা! তা হ'লে আর কি চাও ব্রজ?

বিরহ-বেদনা

নববিবাহিত মতি বিষন্নভাবে উপবিষ্ট, ভগিনীপতি বন্ধুবর মাধবের প্রবেশ)

মা। কি হে মতি, এমন ক'রে গালে হাত দিয়ে ব'সে কি ভাবা হচ্ছে? উঠতে আজ্ঞা হোক; আমাদের ওখানে একটা মজলিস আছে, তোমাকে নিতে এসেছি।

মতি। আমার শরীরটা বড় ভাল নেই, যেতে পারব না।

মা। কেন, কি হয়েছে বল দেখি? কপালে (কপালের উষ্ণতা অনুভব করিয়া) কই, গরম মনে হচ্ছে না তো।

মতি। (পুনশ্চ দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বক্ষে হস্ত প্রদান করিয়া) ওখানে না, এইখানে মাধব, গেলুম, গেলুম ভাই, আর পারিনে, এইখানে—কি যন্ত্রণা!

মা। (সভয়ে) হার্ট ডিজিজ নাকি? এতদিন বলনি? লুকিয়ে রেখেছ, ডাক্তার ডাকাও, ডাক্তার ডাকাও।

মতি। হার্ট ডিজিজ বটে, কিন্তু ভয় পেয়ো না, তুমি কি আর এটা বুঝতে পারছ না? তুমিও ত বে করেছ।

মা। করেছি বৈ কি?

মতি। তা তো আমি জানি, তবুও এ জ্বালা যে কেন বুঝতে পারছ না,, সেইটে শুধু বুঝে উঠতে পারছিনে। উঃ, কি সুন্দর বাতাস! মাধব, প্রিয়সখা

প্রাণবয়স্য, প্রাণ যে জ্বলে গেল।

(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ)

মা। কিন্তু আমার তো ভাই আরাম বোধ হচ্ছে।

মতি। আরাম বোধ হচ্ছে? কক্ষণো না, তা হতেই পারে না! মন্দা তো এখানে নেই, প্রিয়াসঙ্গ ছাড়া হয়ে কি ক'রে তুমি এ দক্ষিণে বাতাস উপভোগ করবে—এ আমি কল্পনাই করতে পারিনে,—নিশ্চই ঠাট্টা করছ।

মা। সত্যি ক'রে বলছি, মাথার দিব্যি, ঠাট্টা নয়, বাতাসটা বড্ডই ভাল লাগছে।

মতি। সত্যি ক'রে বলছ? হা হতভাগ্যে মন্দাকিনি! তোর অদৃষ্টে এই ছিল! হা পিতঃ! হা মাতঃ! এমন অপ্রেমিক অরসিক হৃদয়হীনের হাতে কি ক'রে তোমাদের স্নেহের কন্যা সমর্পণ করেছিলে?

মা। থাম হে, বাতাসটা গরম গরম ঠেকছে বটে—বুজতে পারছি, ক্রমশঃই অসহ্য হ'য়ে উঠবে।

মতি। কিন্তু হে অপ্রেমিক, আমার বিরহজ্বালাটা কিরূপ অসহ্য, তা কি তুমি বুঝতে পারবে?

মা। না ভাই, সেটি ঠিক পারব বলে মনে হচ্ছে না। সেই দশ বছরের মেয়ের প্রেমে এত হাবুডুবু, এত ফোঁশফোঁশানি, এত হাঁসফাশানি—আমার বোঝার অসাধ্য!

মতি। রে নিষ্ঠুর, রে নির্মম, তা তুমি কি ক'রে বুঝবে? তা নাই বুঝলে, সে দুঃখ আমি সইতে পারি; কিন্তু হায়! আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন হৃদয়ের হৃদয়, আহা! না জানি, আমার জন্য সে কতই কাতর। একটু গরম হ'লে, একটু বৃষ্টি হ'লে একটু মৃদু বাতাস বইলে, একটু জোর বাতাস উঠলে আমার বিরহে তার প্রাণ বোধহয় আমারি মতন আকুল হয়ে উঠে। হায়, কে ব'লে দেবে—

মা। সেটুকু আমি বলে দিচ্ছি। অত ভাববার কারণ নেই,—এইমাত্র—

মতি। এইমাত্র? ভাই, বল বল, এইমাত্র কি? সে তো ভাল আছে? সুখে আছে সখা? সে সুখে আছে জানলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি! তার কথা শোনার জন্য যে আমি হা-প্রত্যাশ ক'রে আছি। সে চাঁদ, আমি যে চাতক—

মা। বল চকোর।

মতি। হাঁ, তা জানি, সে চাঁদ, আমি যে চকোর—সে জল, আমি যে মীন—একটি গান রচনা করেছি, শুনবে—

হায়! এমনো দিনে—
কোথায় প্রেয়সী ওলো হৃদয়হীনে,
তোমার বিরহানলে, হৃদি প্রাণ গেল জ্বলে,
মীন যেন সরোবরে—সলিল বিনে।

মা। তাই তো! এটা খবরের কাগজে বের করতেই হচ্ছে।

মতি। তা ভাই তোমরা যা হয় করো, কিন্তু আগে প্রাণপ্রিয়ার কাছে নিয়ে গিয়ে আমার দুঃখ তাকে দেখাও, আমার হৃদয় সুশীতল কর। কি বলছিলে মাধব, তার কথা কি বলছিলে?

মা। আমি বলছিলুম—সে ভাল আছে, সুখেও আছে, তার জন্য কোন ভাবনা নেই। আমি যখন গাড়ী করে এখানে আসছি, দেখলুম, তাদের বাগানে সে ছুটাছুটি ক'রে খেলে বেড়াচ্ছে।

মতি। কি বল মাধব? সত্যি সত্যি? সে ছুটাছুটি ক'রে খেলে বেড়াচ্ছে? আমি সেখানে নেই, আমা-হারা হয়েও হেসে খেলে আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছে? সত্যিই কি মিতু আমাকে এ কথা বিশ্বাস করতে চাও? আমার শালী যে লিখেছেন, নলিনী আমার বিরহে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছে! হায়! রমণী ভুজঙ্গিনী প্রায়।

(হরি বাবুর প্রবেশ)

মা। এই যে তোমার ভায়রাভাই হরি বাবু এসেছেন—ওঁকে জিজ্ঞাসা কর না, উনি বল্লে তো বিশ্বাস হবে? হরি বাবু, নলিনী কেমন আছে?

হরি। আমাদের নোলু?

মতি। (স্বগত) আমাদের নোলু—? উঃ, এতখানি আস্পর্দ্ধা?

মা। হ্যাঁ, তার কথাই বলছি, মতি বাবু শুনেছেন, সে অসুস্থ—তাই বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন।

মা। হাঃ হাঃ, অসুস্থ? এইমাত্র আমরা সকলে বাগানে খেলা করছিলাম। তার সঙ্গে ছুটে ছুটে আমার পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে—আমার পকেট থেকে চাবি চুরী ক'রে আর দেয় না।

মতি। (স্বগত) পকেট থেকে চাবি চুরী!—পরপুরুষের অঙ্গস্পর্শ। নলিনি, এই তোমার ভালবাসা, এই তোমার প্রেম! হায়, বিশ্বাসঘাতকতা!

মা। তারপর চাবিটা তো পেয়েছেন? একজনের হৃদয়ে সে এমন চাবি দিয়েছে—যে, আমি এত চেষ্টা ক'রেও খুলতে পারছিনে, আবার আপনার শুদ্ধ মনের চাবি হারাবে না তো?

মতি। (সক্রোধে) মাধব, ও ঠাট্টা করো না—জান—

হরি। মতি বাবু, আপনার ভয় হচ্ছে নাকি? তা ভয় নেই। জানেন, আজ দুটি গালে দুটি চড় মেরে তার কাছ থেকে চাবিটা কেড়ে নিয়েছি, মন-চাবি যদি চুরী করে তো, সেই রকম ক'রে না হয় কেড়ে নেওয়া যাবে।

মতি। (দ্বিগুণ ক্রোধে) হরিবাবু, জানেন সে পরস্ত্রী? সে আমার স্ত্রী! তার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে জানেন কতদূর অভদ্রতা করছেন! এর জন্য আমার কাছে মাপ চাওয়া উচিত।

মা। মতি তুমি কি সত্যই ক্ষেপেছ?

মতি। আমি ক্ষেপেছি? তোমার ধমনীতে একটুও আর্য্য-শোণিত নেই তাই তুমি ও কথা বলছ! হরি বাবু দাঁড়ান—দাঁড়ান—যদি ভরসা থাকে দাঁড়ান, যুদ্ধ চাই, আমি যুদ্ধ চাই!

(হস্ত আস্ফালন করত দণ্ডায়মান)

(হরি বাবু হাসিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে পুনরায় চৌকিতে বসাইয়া)

"মাধব বাবু, একটু জল আনুন, দেখি!"

মতি। (চৌকিতে মাথা হেলাইয়া) আঃ, কি ভয়ানক! কি অত্যাচার! কি অপমান! প্রাণ থাকতে এ অপমান আমি ভুলব না! প্রিয়ে! তোমার মনে এই ছিল! রমণী, তুমি সত্যই ভুজঙ্গিনী।

(ক্রন্দন)

সূক্ষ্ম ডাক্তারী

(অন্তঃপুরের বারান্দা—যাদবচন্দ্রের প্রবেশ)

যাদব। তোর হাতে কি রে মানি? বড় এলাচ বুঝি? ফেলে দে—ফেলে দে, এমন অসুখ করবে।

(মানির দ্রুতবেগে পলায়ন)

যাদব। (পশ্চাদ্ধাবিত হইতে হইতে পথে খোকাকে দেখিয়া) তোর গাল ট্যাবলা যে? কি খাচ্ছিস?

খোকা। মিশলি।

যাদব। (কোলে লইয়া) ছিঃ মিছরি খায় না, ফেলে দে, হাতে আরো রয়েছে যে,—দেখি—?

খোকা। কাকাবাবু, খাবি? (এক টুকরা যাদবের মুখে এবং বাকী সমস্তটা নিজের মুখে পুরিয়া) তুই খা, আমি খাই?

যাদব। আচ্ছা খা, কিন্তু আর যেন খাসনে, বুঝলি? ঝি, খোকাকে নে। এই যে শশি, কচুরি খাচ্ছিস? কে দিলে? ফ্যাল বলছি—ফ্যাল, ফ্যাল, সদ্য এতে ওলাউঠা হবে, ডাক্তার 'কনেমারা' স্পষ্ট লিখেছে।

(শশীর হাত হইতে কচুরি কাড়িয়া নিক্ষেপ)

[শশীর কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান

(মেজ বোয়ের ঘর, যাদবের প্রবেশ)

যাদব। শুয়ে যে? আহারের ব্যবস্থা কেমন চলছে বল দেখি?

বৌ। তুমি ভাই যেমন বলেছ।

যাদব। বেশ বেশ, এবার দেখবে, দু'দিনে কেমন হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যপূর্ণ হ'য়ে উঠবে।secretটা কি জান? যে খাদ্য সহজে জীর্ণ করতে পারবে, তাই খাবে, হজমেই আমাদের শরীর। যদি বিশ্বাস না কর তো বরঞ্চ তোমাকে ডাক্তার কর্পেন্টারের ফিজিয়লজিখানা খুলে দেখিয়ে দিই।

বৌ। তার দরকার নেই, তুমি যা বলছ, আমি ঠিক তেম্নি করছি।

যাদব। ইনোস ফ্রুটসল্ট-টা খাচ্ছ তো? ওতে হজমের একটু help করে—

বৌ। হাঁ।

যাদব। আয়রণ, ওটা একটু জোরাল—

বৌ। খাচ্ছি বৈ কি?

যাদব। তবে বল বেশ আছ, তোমার আর Complain করার কিছুই নেই?

বৌ। হ্যাঁ—তা তা মন্দ নেই, গা-মাথাটা কেমন ঘুরছে।

যাদব। সে আবার কি? তা হ'লে নিশ্চয়ই আহারের কোন অনিয়ম হ'য়ে থাকবে। ও একটা অজীর্ণের লক্ষণ কি না। বোধ করি লুচি খেয়েছ? আমি তো বলেছি, লুচিটা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিষ।

বৌ। না ঠাকুরপো, তুমি বলা পর্য্যন্ত লুচি আদতে খাই নি।

যাদব। পাঠার মাংসটা বুঝি ছাড়তে পার নি? তোমার তো দেখতুম, লুচি আর মাংস নইলে চলে না।

বৌ। না, মাংসও ছেড়েছি।

যাদব। মাংস একটু খেলে হানি আছে, তা নয়, তবে তোমরা যে ঘি-মসলা দিয়ে রাঁধ—তা ছাড়া দুধটাও তোমাদের সে সঙ্গে তো বাদ পড়ে না,—মাংস আবার দুধ বড় খারাপ—বড় খারাপ !

বৌ। দুধও ছেড়েছি।

যাদব। তা ভালই—কম খেলেই শরীর ভাল থাকে। তবে গা-ঘোরাটা কেন হ'ল ? ফল খাও বুঝি ? ফলটা বড় বেহজমি—তা জান ?

বৌ। না, ফল খাই নি।

যাদব। তবে আর তো কোন কারণ দেখছিনে, ওঃ! ফসফোডাইনটা খাও নি বুঝি ?

(দাসীর বরফ-জল লইয়া প্রবেশ)

যাদব। কি সর্ব্বনাশ! বরফ-জল! তাই বল! আমি ভেবে মরছি—কেন ওরকম হ'ল! কি ভয়ানক, নিয়ে যা, এ শরীরে বরফ-জল খেলে এখনি ইন্‌টেসটাইনের overturn হবে।

দাসী। বৌঠাকরুণ ক'দিন থেকে কিছু খাচ্ছে না—অরুচি করেছে, না খেয়ে খেয়ে ঘুরনি রোগে ধরেছে; একটু ঠাণ্ডা জল খেয়ে শরীরটা ঠাণ্ডা হবে, তাই নিয়ে এনু, খেতে দাও দাদাবাবু!

যাদব। খেতে দেব বৈ কি ? আমি নিজে হাতে বিষ দিই, এই ওনার ইচ্ছা! বরফ-জল খেয়েই তো গা ঘুরছে। নিয়ে যা বলছি।

বৌ। না ঠাকুরপো, আমি আগে খাই নি, এই খেতে যাচ্ছিলুম।

যাদব। অজীর্ণ তো আর অমনি হয়নি, অবিশ্যিই তা হ'লে আর কিছু কুপথ্যি করেছ।

দাসী। না গো না, বৌঠাকরুণ সকাল থেকে এ পর্য্যন্ত দু'টি ভাত ছাড়া আর কিছু মুখে দেয় নি।

যাদব। ভাত! শুধু ভাত! দাঁড়া দেখি, তাতে কি প্রপার্টি আছে, ওঃ! বুঝেছি গা তো ঘুরবেই, ওতে আলকহল আছে কিনা। বোধ হচ্ছে, পরিমাণে কিছু বেশী হ'য়ে পড়েছে, একটু বুঝে সুঝে খেও।

(বড় বৌয়ের প্রবেশ)

বড়বৌ। ও মেজবৌ, ক'দিন থেকে তোর মুখে কিছু রুচছে না, এই টাটকা নিমকি ভেজে নিয়ে এলুম, দেখ দেখি দুখানা, কেমন লাগে।

যাদব। কি সর্ব্বনাশ! নিমকি! তবেই হয়েছে।

বড়বৌ। তুমিও খাও না একখানা, দেখ না, কেমন হয়েছে!

যাদব। না না, ও সব খেতে নেই, অসুক করে।

বড়বৌ। ডাক্তারীর জ্বালায় তো আর বাঁচিনে বাবু, তবে তোমার খেয়ে কাজ নেই, মেজবৌ ধর্—একখানা খা।

যাদব। আচ্ছা কই দেখি? বেশী না কিন্তু একখানা। মন্দ হয় নি আর একখানা দেখি, না আর দু'খানা দাও।

বড়বৌ। এই থালা শুদ্ধ রইল, তোমার যখানা ইচ্ছা খাও না বাবু!

(একে একে সমস্ত নিঃশেষ করিয়া)

যাদব। স্ত্রীবুদ্ধিঃপ্রলয়ঙ্করী, তোমাদের হাতে প'ড়ে দেখছি আমি শুদ্ধ মারা গেলুম। যাই, একগ্লাস পাইরেটিক স্যালাইন খাই গে।

———

সঙ্গীত-শতক

সঙ্গীত-শতক

কালাংড়া—আড়খেম্‌টা

চল লো কাননে যাইব দুজনে,
জুড়াতে হৃদয় জ্বালা !
স্বজনি লো, আজি, ফুলে ফুলে সাজি,
কাটাব সারাটি বেলা !
তরুমূলে মূলে, ফুল তুলে তুলে,
কহিব মরম-কথা ;
গাহিব লো গান, খুলিয়ে পরাণ,
ভুলিয়ে সকল ব্যথা !
তুলিয়ে বকুলে, পরাইব চুলে
বেলায় করিব দুল ;
উড়ায়ে ভ্রমরে, বোঁটা ধ'রে ধ'রে,
তুলিব গোলাপ ফুল ।
কিসের বেদনা, কিসের যাতনা,
কিসের হৃদয়জ্বালা !
দেখিব আজিকে হৃদয়-আঁধার
ঘোচাতে পারি কি, বালা !

মল্লার—কাওয়ালী

সখি লো ! ঝিম ঝিম ঘন বরিষে !
গুরু গুরু গর্জ্জনে গর্জ্জে নবীন ঘন,
দলকে দামিনী বিকাশে ।
বিরহিনয়ান-পারা, ঢালিছে শ্রাবণ-ধারা,
কি জ্বলে মরমে জ্বালা—নিভাই কেমনে সে ?

———

দেশ মল্লার—আড়া

আকাশের ঐ মেঘ এখনি ত' ছুটিবে ।
আবার জ্যোছনা-ভাতি এখনি ত ফুটিবে !
কিন্তু গো, স্বজনি, আর হৃদয়ের এ আঁধার
এ জনমে অভাগীর কভু না ঘুচিবে !
জীবন-বরষা যদি বহায় শোণিত-নদী—
তবু এই আঁখি-ধারা জন্মে না মুছিবে ।

———

কেদারা—আড়া

আজ ওরে বজ্র ! তোরে কভু না ছাড়িব—
আটকি হৃদয়ে তোরে এ হৃদয় দহিব ।
হৃদয়ে কি কাজ আর, পুড়ে হোক ছারখার ;
হৃদয়-সর্ব্বস্ব ছেড়ে হৃদয়ে কেন রাখিব !
এ প্রাণ জীবন হৃদি, তাহারি না হোল যদি,
আমারি বা হবে কিসে ! পর তোরে তেয়াগিব ।

———

ভৈরবী—একতালা

কত দূরে থেকে অধীর হয়ে
ছুটে এল ম[illegible]য়-বায়—
কেন গো গোলাপ-কলি মুখটি তুলি
তার পানে না ফিরে চায় ?

আসছে বায়ু সাড়া পেয়ে
বোঁটায় সে যে পড়লো নুয়ে,
হাসিটি ফুটতে গিয়ে
কেন হোল অশ্রুময় ?
মলয় তার কাছে এসে
আদর ক'রে হেসে হেসে,—
উঠলো না সে—সে পরশে—
কেন ঝরে ঝরে প'ড়ে যায় ?
আকুল প্রাণে তারে বালা
ডেকেছে সারা বেলা ;—
এল বায়ু সাঁজের বেলা,
সে অভিমানে ম'রে যায় !
ছিল বালা ফোটার আশে,
ফুটতে ফুটতে ফুটলো না সে—
মলয়-বায়ু আকুল প্রাণে
করে শুধু হায় হায় !

———

ভৈরবী—রূপক

চেয়ে আছি, কবে হইবে সে দিন,
সুখ দুখ সব ফেলিয়ে থুয়ে—
মরণের শান্ত শীতল কোলেতে
বিরাম লভিব আরামে শুয়ে !
ভাঙ্গিবে না কভু যে গভীর ঘুম,
ফেলিতে কেবল যাতনা শ্বাস,
পারিবে না কভু ভাঙ্গিতে যে মোহ,
ধরার বিকট পিশাচী হাস।
দেখিতে দেখিতে পলকে পলকে
একটি একটি একটি করি—
ছেলেবেলাকার সুখের স্বপন—
সকলি ত' হায় পড়িল ঝরি।

এ জীবন-ফুল পড়িল শুকায়ে,
ফুটিতে ফুটিতে ফুটিল না ;—
যত কিছু আশা ছিল এ মরমে—
একটিও তার মিটিল না।
শিথিল হয়েছে দেহের বাঁধুনি,
ভুলেছে বহিতে শোণিত-ধার ;
ফুরায়ে এসেছে নয়নের জল,
এক ফোঁটা নাহি ফেলিতে আর !
নিভিল না তবু সে পুরাণ স্মৃতি !
কত দিন আর এমন করি—
পুষিয়া রাখিব এ চিতা-অনল—
মরমের এই শ্মশান ভরি।
সে সুখের দিন আসিবে রে কবে,
যে দিন অভাগা জনম-দুখী—
মরমের শান্ত শীতল কোলেতে
মাথাটি রাখিয়ে হইবে সুখী।

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া

ভুলে যাও দুখিনীরে ভুলে যাও ওহে নাথ !
নহিলে হবে না সুখী একটি পলকপাত।
এমনি অভাগী বালা, বিপদ যাতনা জ্বালা—
যেখানে যেখানে আমি তারা ফিরে সাথ সাথ !
ভুলিবারে কহিতে গো কি বেদনা লাগে প্রাণে
কেবলি যাতনা-জীর্ণ মরমী সে ব্যথা জানে !
হোক তবু তাও সবে, তুমি, নাথ, সুখে রবে, —
ভুলে যাও ভুলে যাও, তাই যাচি দিনরাত।

মেঘমল্লার—আড়া

ঘোষে বজ্র কড় মড়, কাঁপে পৃথ্বী থর থর,
প্রলয় বিপ্লবে কাঁদে সর্ব্ব-চরাচর ;
উন্মত্ত পবন ছোটে, তটিনী গরজি ওঠে,
তরঙ্গ ছুটিছে যেন সচল ভূধর !
পাগলিনি ! শোন ওরে তোরে এই বুকে ধ'রে—
বাহিরে ঝড় জ্বালা পশে না অন্তর ;
তরী যায় যাক্ ডুবে, কি ভয় ? আমরা উভে—
সুখের শয়নে রব নদীর ভিতর !

———

ভীমপলাশী—আড়া

উথলিত অশ্রুবারি, এ পোড়া নয়নে হেরি,
ভাবিও না আমারে যে ভুলে গেছ কাঁদি তাই।
তুমি আছ শান্তি-সুখে কাঁদিব আমি কি দুখে ?
কে আমি করিব আশা, আরো হৃদে পেতে ঠাঁই ?
ভাল যে বাস না মোরে, ভুলেছ যে একেবারে,
ভালই করেছ সখে, আর কি ভাবনা তবে ?
ভাবি দুখিনীর কথা, আর ত পাবে না ব্যথা,
তুমি ত নিশ্চিন্ত হ'লে, হোক যা আমার হবে।
পাছে সমদুখী জনে, আমি ব্যথা দিই মনে,
আমা দুখে পাছে তব মুখখানি মলিন হয়—
এই সে আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা দূরে গেল,
আর ত বাস না ভাল, হয়েছ পাষাণময় ॥
তবে আর কিসে ডরি, যাহা ইচ্ছা তাহা করি,
নাহি ত মমতা ডোর কে আর রাখিবে বাঁধি !
নিশ্চিন্তে মরণ-বুকে, ঘুমাতে যেতেছি সুখে,
সুখ-অশ্রু পড়ে তাই, ভেবো না দুখেতে কাঁদি।

———

গৌর-সারং—যৎ

আকাশের পটে মধুর মূরতি
আবার আজকে দেখি রে কেন ?
কেন রে আবার নয়নে উদিলি
প্রভাতী চাঁদের জ্যোছনা হেন ?
জান না কি, প্রিয়ে ও মূরতি দেখি
কঠোর পাষাণও গলিয়ে যায় ?
জান না কি, প্রিয়ে, ও মূরতি দেখি
শবের তনুও জীবন পায় ?
জান না কি, প্রিয়ে, ও মূরতি দেখি
এ হৃদি-কবাট আপনি খসে ?
গলে গলে যায় মরম আমার
মধুর কি এক নেশার বশে ?
তবে কেন তুই দেখা দিলি, সই,
হাসিলি কেন ও করুণ হাসি,
বিষাদের ঐ ম্লান চাহনিতে
কেন বরষিলি পীযূষরাশি ?
দেখা যদি দিলি বিস্মৃতি টুটিলি,
সুদূর অম্বরে কেন লো তবে ?
তোর লাগি এই পেতেছি হৃদয়,
আয় হৃদে হৃদে মিশাই এবে !

———

বেহাগ—আড়া

চলিলে প্রবাসে তবে, হৃদয়ের ধন,
শূন্য করি অভাগীর হৃদি প্রাণ-মন !
যাও তবে যাও, সখা, হয় ত এ শেষ দেখা,
এ বিদায় হল বুঝি জন্মের মতন !
লভিয়ে সৌভাগ্য-কান্তি পাবে যথা সুখ শান্তি—
যাও তবে, প্রিয়তম, সুদূর সেখানে—

আজিকে হৃদয় খুলে, উপহার অশ্রুজলে,
দুখিনী বিদায় সরবস্ব ধনে।
অভাগিনী অনাথিনী, রহিল যে একাকিনী,
মনে রেখো এইটুকু ধরি গো চরণে।
প্রণয়-কুসুমে গাঁথা, বিগত সুখের কথা,
আনন্দ উল্লাস মাঝে কোরো তবু মনে।
না না, নাথ, সুখে থেকো
মনে রেখো নাই রেখো।
তোমারি স্মরণে যেন রাখিনু জীবন—
তোমারি তোমারি ধ্যানে রব অনুক্ষণ।

———

বেলোয়ার—আড়া

যাতনার এই দুখময় সুখ
তুই কি বুঝিবি সজনি?
কি বুঝিবি তুই কি যে এত সুখ
কাঁদিয়ে দিবস রজনী!
অমনি অমূল্য যাতনার এই জীবন
আমার ঠাঁই লো,—
চির হাসিময় সুখের জীবন বিনিময়ে
নাহি চাই লো,—
হাসিবার কথা নয় এ ত' সখি,
হেসো না এ কথা শুনিয়ে,
হেসো না হেসো না দিও নাক ব্যথা,
আর লো ভুলিতে বলিয়ে।
আজীবন ধ'রে জ্বলিব পুড়িব
সারাটি দিবস রজনী,—
তবুও তবুও হৃদয়ের ধনে
ভুলিব না কভু, সজনী!

পিলু—যৎ

ফোটা ফুলগুলি আনিয়াছি তুলি,
আঁখি দুটি মিলি হের গো হের !
এইটি নলিনি, কাহাকে বলিনি,
চুপি চুপি আমি এনেছি ধর !
গোলাপটি ওই মোর হৃদি সই !
সে যে তোমা বই হবে না কারো—
হৃদিধনে ভুলে তুলেছি বকুলে,
সেউতির ফুলে পর গো পর !
দেখিয়ে এ অশ্রুরাশি, হেসো না ঘৃণার হাসি,
মাথা খাও দুখিনীর—হেসো না ও হাসি।
যদি মুহূর্ত্তেরি তরে ভালবেসে থাক মোরে,
তাহারি তাহারি দিব্য হেসো না ও হাসি।
তুমিই ত' সাক্ষী সখে, তুমি ত, দেখেছ চোখে—
কত যে ঝটিকা-ঝঞ্ঝা সহেছি কি করে ;
কিন্তু ও ঘৃণার হাসি, জ্বলন্ত গরলরাশি,
ছুটিছে অসহ্য বেগে মরম ভিতরে !
আমারে ভুলিয়ে গিয়ে, আছ যে নিশ্চিন্ত হ'য়ে,
তাহাও ত' সহিতেছে এ হৃদি-পাষাণ ;
কিন্তু অবিশ্বাস তব, হায়, কি করিয়ে স'ব
ভাবিতে পারিনে আর বিদরে পরাণ !
পাতিয়ে দিতেছি হৃদি, বাসনা থাকে গো যদি
মার মার ছুরি তাহে, দেখ কত সয় !
কর ইচ্ছা যা তোমার, কিন্তু গো বলো না আর
ছলনার অশ্রু এ যে সরমের নয় !

———

মিশ্রমল্লার—কাওয়ালি

আজু কোয়েলে, কুহু বলে !
আয় তবে সহচরি, রুণুঝুণু রুণুঝুণু,
বসন্ত-জয়ধ্বজা তুলে।

মাধবী লতিকা, মল্লিকা যুথিকা,
কম্পত মলয়-হিল্লোলে ;
সরসে ঢল ঢল প্রফুল্ল শতদল
খেলত লহরীকোলে ;
পরিমল আকুল মত্ত মধুপ-কুল
বিহরত বিকশত ফুলে।
আয়, সই, মিলি জুলি ফুলগুলি তুলি তুলি
সাজাব সখীরে সবে মিলে !

বসন্তবাহার—কাওয়ালী

একি এ সুখে তরঙ্গ বহিছে !
এ ভরা পুলকভার, সহিতে পারিনে আর,
প্রেমসুধাধারে হৃদি টুটিছে।
এ নিখিল চরাচর মাঝে,
আনন্দ রাগিণী নব বাজে,
সে আমার আমি তার—এ উচ্ছ্বাস গীতধার
দিকে দিকে উলসি ছুটিছে ;
সুখের প্লাবনে হিয়া ডুবিছে।
চাঁদিমা ছড়ায় জ্যোতি হায়,
ফুলকুল ঢালিছে সুবাস,
পাখী মধুগান গায়, আবেশে উথলে বায়,
কি নব মাধুরী প্রাণে ভরিছে।
স্বরগ বসন্ত বুঝি ধরাতলে ফুটিছে !

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

চন্দ্রশূন্য তারাশূন্য মেঘান্ধ নিশীথ চেয়ে
দুরভেদ্য অন্ধকারে হৃদয় রয়েছে ছে'য়ে !
ভয়ানক সুগভীর বিষাদের এ তিমির,
আশারো বিজলী-রেখা উজলে না এই হিয়ে।

হৃদয়ের দেবতারে পূজিনু জনম ধ'রে
মর্ম্মভেদী যাতনার অশ্রুজল দিয়ে ;—
দিয়াছি হৃদয় প্রাণ সকলি তো বলিদান,
একটু মমতা তবু পাইনু না ফিরিয়ে !

———

বেহাগ—কাওয়ালি

সুখের বসন্তে আজ, সখি লো, কেন লো
মু'খানি, আহা, বিষাদে মলিন হেন ?
উৎপল আঁখি দুটি সজল কেন, লো, কেন ?
দেখ্ লো কুঞ্জে প্রফুল্ল যুথিকা যাতি
মাখি চন্দ্রমাবিমল ভাতি রে,
ঢালে অমিয়া পরিমলে রঙ্গে লো ।
পিউ পিউ মধুর তানে ওই,
ডাকে পাপিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে সই !
মাতাইয়ে দিক্ কুহু কুহু পিক্
কুজিছে, সজনি লো !
আয় রঙ্গে নিকুঞ্জে, সজনি মিলি
গাঁথি মালিকা বিষাদ ভুলিয়ে,
প্রেম-মদে প্রাণ ঢালি,
মধু রজনী রে !

———

ললিত—আড়া

এ হৃদয়-ফুল, সখি, শুকায়ে পড়েছে ওরে !
কেমনে কুসুম তুলি বল' লো প্রমোদভরে ?
বিমল এ জ্যোছনায়, সুমন্দ এ মৃদু বায়,
দলিত কুসুমকলি আর কি উঠিতে পারে ।
নাহিক সুরভি হাস, [illegible]লে কীটের বাস
যতনেও তোল যদি পাপড়িগুলি যাবে ঝ'রে

———

পিলু—কাওয়ালী

আমোদে কি আছে, সখি, বাসনা এখন!
আমোদ ফুরায়ে গেছে জন্মের মতন।
দারুণ যাতনানলে হৃদয় পরাণ জ্বলে,
তুই কি বুঝিবি, সখি, আমার বেদন!
বসন্ত উৎসব হবে, তোরা সখি, সুখী সবে,
মিলিবে লো ভালবাসা, সোহাগ যতন!
আমার মরম-তলে কি যে এ আগুন জ্বলে,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে হতেছে দাহন,—
তোরা কি বুঝিবি, সখি, আমার বেদন!

———

দেশমল্লার—আড়া

কেন গো ফেলিছ সখি, দুখ অশ্রুধার,
ও চাঁদমু'খানি কেন বিষাদে আঁধার?
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে কি যাতনা পরকাশে!
সজনি, থাম গো থাম দেখিতে পারিনে আর
নূতন শোভায় সাজি আশায় মকুলরাজি
আবার তো বিকশিবে, শুকাবে না আর
নবীন লতিকাচয়ে কুসুমে পড়িবে ছেয়ে,
যে রবি গিয়েছে ডুবে উদিবে আবার।

———

বেলোয়ার—আড়া

জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা!
জীবন ফুরায়ে এল আঁখিজল ফুরালো না।
এমনি অদৃষ্ট ঘোর, জনমেও, সখি, মোর
পুরিল না জীবনের একটি কামনা।
এমনি সুখের কথা উপহাসি দেয় ব্যথা,—
এই এ মিনতি, সখি, ও কথা তুলো না!

———

সোহিনীবাহার—কাওয়ালি

সজনি, নেহারো বসন্ত সাজে,
ক্যায়সে মাতল হরষে দিক।
কাননে কাননে ফুলকুল জাগল,
কুঞ্জে কুঞ্জে কুহরল পিক!
কোমল কুসুমে চুমি চুমি যতনে,
কম্পয়ি সঘনে লতিকাকায়;
সৌরভ চুরিয়া, প্রমোদে ঢলিয়া,
ক্যায়সে বহয়ত দক্ষিণা বায়।
মুচকি মুচকি মৃদু হাস হাস বিধু
ঢালত মধুময় জ্যোতিকরাশি,
জ্যোছনা-তরঙ্গে যমুনা রঙ্গে
উথলত নাচত হরষে ভাসি।
আওলো, সজনি, এ সুখ রজনী
নিকুঞ্জে আজু পোহায়ব দোঁহে;
সব দুখ জ্বালা পরাণ, বালা,
বিসঁরব তোঁহার প্রেমক মোহে।

———

সিন্ধু-ভৈরবী—আড়া

আমরি লাবণ্যময়ী কে ও স্থির-সৌদামিনী,
পূর্ণিমা-জোছনা দিয়ে মার্জ্জিত বদনখানি!
ঢুলু ঢুলু আঁখিদুটি আবেশে পড়িছে লুটি,
মৃদুমন্দ ঢলঢল আধোফুট, কমলিনী।
নেহারি ও রূপ, হায়, আঁখি না ফিরিতে চায়,
যত দেখি তত যেন নব নব মনে গণি।
অধরে মধুর হাস—তরুণ অরুণাভাস,
অপ্সরা কি বিদ্যাধরী, কে রূপসী নাহি জানি!

———

বিভাস—যৎ

পোহাইল বিভাবরী, উদিল নব তপন,
উষার মোহন রাগে রাঙিল গগন,
তুমি উঠ, উঠ, বালা জাগ গো এখন!
বহিছে মৃদুল বায়, পাপিয়া প্রভাতি গায়,
ফুলকুলসৌরভে আকুল ভুবন।
শিশিরমুকুতা-পাতি চুমিছে রবির ভাতি,
কমলিনী মেলে আঁখি পেয়ে সে চুম্বন,
তুমিও মেলো, গো বালা, কমল নয়ন!

———

আলাইয়া—আড়া

কি গভীর বেদনায় হৃদয় জ্বলিয়া যায়
কথায় প্রকাশ তাহা করিব কেমনে!
বিষাদ যন্ত্রণা ব্যথা যতই গভীর হেথা,
কথাও তেমনি ক্ষুদ্র তার পরিমাণে।
বাসনাও নাহি আর খুলিতে লুকানো দ্বার,
মর্ম্মের নিভৃতে থাক মর্ম্মের কাহিনী,—
অশ্রুরুদ্ধ হোক্ প্রাণ,—প্রকাশ সে অপমান,
আপন তরঙ্গবলে ফাটুক আপনি।

———

আলাইয়া—আড়া

বিরাগভরে অমন ক'রে এখন আর যেও না স'রে!
ভয় নাই আসিনি তো জ্বালাতন করিবারে।
এসেছি দিব না ব্যথা, তুলিব না কোন কথা,
এসেছি দেখিতে শুধু নিতান্ত না থাক্‌তে পেরে।
নব অনুরাগ ভ'রে থাক, তুমি সুখ-ঘোরে,
অন্তিম-বিদায় নিয়ে এখনি যাইব ফিরে।
যেথায় আছ সেথায় থাক, আর কাছে যাব নাকো,
একটি পলক শুধু দেখে নেব প্রাণ ভ'রে।

———

সাহানা—আড়া

সহসা হাসিল কেন আজি এ কানন।
মাতিয়া বহিল কেন সুখদ পবন!
ফুটিল মুদিত ফুল, কুহরিল পিককুল,
যে কানন হয়েছিল নীরব শ্মশান—
সেই সে শ্মশান আজি নূতন শোভায় সাজি
সহসা মোহিল কেন হৃদয় পরাণ!
যে সুখের চাঁদ, আহা, কতদিন থেকে
ভীষণ মেঘের কোলে পড়েছিল ঢেকে,—
আজিকে সেই সে শশী মেঘমুক্ত হাসি হাসি
ঢালিছে কি মধুময় জোছনা কিরণ!
ঘুচিল সকল মোহ, ফিরিল প্রণয় স্নেহ,
হাসিল চৌদিকে আজ, হাসিল জীবন!

———

ভূপাল—কাওয়ালি

হের গো উদয় ঐ মকর-কেতন!
প্রণয়ের পরিমলে মোহিয়া ভুবন!
আবেশে অলস তনু, উরসে কুসুমধনু,
সঙ্গে রতি, সুখ-গীতে উথলে-নয়ন!
ফুলে ফুলময় অঙ্গে, বসন্ত বিরাজে সঙ্গে,
ধরণী হইল কিবা পুলক-মগন!

———

মাঝ—দাদ্‌রা

আয় লো, আয় লো, আয় লো, আয় লো,
মিলে সবে, সজনী!
বাসরে পোহাব আজি কি সুখের রজনী!
ভাসিয়ে সুখ-তরঙ্গে, মাতিয়ে প্রমোদ রঙ্গে,
হাসিব সখীর সঙ্গে, দিব সুখে হুলুধ্বনি!

———

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা

কেন, সখি, আসিতে না চায় !
যদি বা আসে সে হেথা,
কেন, সখি, থাকিতে না চায় ?
যাই যাই করি করি—
কেন বুকে বিঁধে ছুরি নিঠুর কথায় !
সখি, কেমন করিয়া প্রাণ ধরি,
তার যদি এতই অসাধ –
থাকিতেই বলি বা কি করি ;
মুখ সখি, ফুটে না যে তায় !
মনের তরঙ্গ যত মনেতে মিশায় ।
সখি, হাসিয়া যাইতে তারে বলি,
মনে মনে যাতনায় জ্বলি,
ভয় মনে, সে যাতনা জানিতে বা পায়,
পাছে আঁখি উথলায় !
সখি, বড় অভিমান ক'রে যাইতে যে বলি তারে
বোঝে না সে পলাইয়ে যায়,
সে যে কেবলি কাঁদায় !

———

শ্রাবণ বেলাওল—আড়া

সখি, সে কেমনে চলে যায় !
আমরা ত দেখিলে তাহায়, শুধু দেখিলে তাহায়,
শুধু মুখ পানে চেয়ে প্রাণ উঠে উথলিয়ে,
শতবার হৃদিমাঝে বিদ্যুতের লহরী খেলায়,
সদা ভয়ে ভয়ে সারা, বুঝি পড়িলাম ধরা,
হৃদয়ের ভাব বুঝি নয়নে প্রকাশ পায় !
সে ত বুঝিতে না পারে, শুধু যাই যাই করে,
মনে মন না বুঝিলে কে বুঝাবে কায় !

আমি বড় ভালবাসি সে মুখের হাসি,
মলিন দেখিলে মুখ বুক ফেটে যায় ;
তবু সাধ যায়, সখি, একবার দেখি
সে প্রাণে বেজেছে ব্যথা না দেখে আমায় !
দেখিতে পাই না ব'লে হৃদয়ে বেদনা জ্বলে,
সখি, এ হেঁয়ালি বল কে বুঝায় ।

———

মিশ্রঝিঁঝিট—একতালা

ছি ছি, কেমন জামাই ! লাজে মরে যাই ;
ঢুলুঢুলু আঁখ, মুখে নাহি বাক্,
শিরে জটাজুট অঙ্গে মাখা ছাই !
আমাদের উমা সোনার প্রতিমা !
মরি ! ম্লান অঙ্গে যেন মণির মহিমা !
ধিক তোরে রাণি ! হইয়ে জননী
হলি এমন পাষাণী কেমনে, শুধাই ।
কবি বলে, ধনি, বলিছ না ভালো,
কাল না থাকিলে শোভিত কি আলো !
নীরদে দামিনী, কমলে মধুপ,
রূপের জগতে কুহক অরূপ ;—
তাই ত দেখিতে পাই !

———

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—যৎ

আয় লো, বালা, গাঁথব মালা
চামেলির ফুলে
উড়িয়ে অলি বেলের কলি
পরব লো চুলে ।

ঐ ফুটেছে গোলাপরাণী
চলো গিয়ে তুলে আনি ;
রচি রূপের হাসি, প্রেমের ফাঁসী,
দেখি কেমনে খোলে !

———

বারোঁয়া ঝিঁঝিট—ঠুংরি

সাগর-ছেঁচা মাণিক আমার !
ঘর করেছ আলো !
তুমি নইলে রতনমণি,
তিনটি ভুবন কালো !
হৃদয়মাঝে ঐ মুরতি
সদাই আছে জাগি,
সদাই উথলে উঠছে হিয়া,
প্রিয়া, তোরি লাগি।
আমি খুঁজে নাহি পাই—
হৃদয়ের কোন্‌খানেতে রেখে—
তোরে হৃদয় জুড়াই !
যে দিয়ে মোর মানস-পূজার
আকাঙ্ক্ষা মিটাই ?
এ সংসারে তোমার যোগ্য
কোন্ বস্তু ভালো !

———

দেশ—কাওয়ালী

আমার সাধের পূর্ণিমার চাঁদ
ফুটলো বুঝি আকাশে ঐ।
জ্যোৎস্না হাসি ঢালছে রাশি,
প্রাণে ফাঁসী দিলে যে সই !

সবাই হাস্‌ছে ও রূপ দেখে,
সবাই পাগল ও রূপ মেখে,
হাস্‌ব ব'লে এসে শেষে—
আমিই কেঁদে সারা হই।

———

কীর্ত্তনী সুর

সই লো মোর গঙ্গাজল!
সাত রাজার ধন মাণিক আমার,
কোথায় আছিস বল!
সরষে ফুল হেরছি চোখে তর্সে রেখে ছল।
তুমি ধনি চাঁদ্ বদনী জীবন মরণ কাটি,
ক্ষণেক তোমায় অদর্শনে মরি লো দম ফাটি।
তুমি আমার তালুক মুলুক,তুমি টাকার তোড়া,
তুমি চেলি বারাণসী তুমি শালের জোড়া।
ও লো আমার সাধের খোঁকা, কহি চুপে চুপে,
সদাই ভয় জাগে মনে
তোমায় কে নেয় কখন লুপে।
তুমি আমার পায়সান্ন, মিষ্টি, মেঠাই, ছানা;
শীতের তুমি দোলাইখানি, গরমির চিনিপানা!
বর্ষাকালের ভরসা তুমি তালপত্রের ছাতি,
তোমায় পেলে হৃদয় ফর্সা,
ও লো সকল ভাতির ভাতি!
তুমি বেদ আগম পুরাণ তুমি তর্ক যুক্তি,
তুমি আমার ভজন পূজন, সাত পুরুষের মুক্তি?
তুমি আমার যাগযজ্ঞি সকল পুণ্যির ফল,
সকল কর্ম্মের সিদ্ধি, ও লো, দাও চরণে স্থল!
স্বর্গসুধা সঞ্চারিত তোমার প্রেমে প্রিয়ে,
পাপতাপের দমন তুমি মুড়ো খ্যাংরা নিয়ে।
হেসে হেসে কাছে এসে, ও লো সকল দুঃখ ঘুচো!
অধীন তোমার দাসানুদাস শ্রীচরণের ছুঁচো!

উত্তর

কীর্ত্তনী সুর

ও প্রাণ মোর গঙ্গাজল !
খুসীর খুসী মহাখুসী সপত্নী কোন্দল !
তুমি আমার ঘরকন্না উনকুটি চৌষট্টি,
ধান ভানাতে ঢেঁকি তুমি, মাছ বানাতে বঁটি !
বেড়ির মুখে হাঁড়ি তুমি, তুমি খোন্তা হাতা,
মশলাপেশার শীলনোড়া, কলাই পেষার জাঁতা।
হাতিশালের হাতী তুমি, ঘোড়াশালের ঘোড়া,
তিন ভুবনে কোথায় মেলে
তোমার একটি জোড়া।
গোশালাতে তুমি আমার বাঁধা কামধেনু,
আর, মন মজাতে তুমি, প্রভু, বংশীধারীর বেণু !
ভাঁড়ারঘরের ভরাভর্ত্তি, শয়নঘরের বাতি,
ভাগ্যিবলে কভু মেলে পদাম্বুজের লাথি।
বিপদকালে তুমি আমার মহাবীর হনু !
দেখা দিয়ে বাঁচাও হিয়ে অদর্শনে মনু !
ও প্রাণ মোর গঙ্গাজল !
ঈরিষা তিরিষা বারণ, আর বারণ প্রেমানল !
কাঁচা চুলে দড়ি তুমি, পাকা ধানে মই,
শীতলাভাজায় তুমি আমার মুড়ি-মুড়কি খই !
ব্যান্নেতে লবণ তুমি, মাছের মুড়ো ঝোলে,
মোচারঘন্টে বড়ি তুমি, কাঁচা আম শোলে।
ভাপা দই তুমি সাফা, দুধের ক্ষীর চাঁচি,
তোমা নইলে কেমন ক'রে বল প্রাণে বাঁচি।
চৌপাকুলে সলপ তুমি, অরুচির রুচি !
তোমায় পেলে নিমিষেতে নয়নের জল মুছি।
তুমি আমার—
পান্তাভাতে বেগুনপোড়া ফ্যানসাভাতে ঘি,
কেমন ক'রে বলব, বঁধু, তুমি আমার কি !

তুমি আমার জরি-জরাও, তুমি পাকা কোটা,
সকল শুদ্ধির শুদ্ধি তুমি গোবর জলের ফোঁটা।
শীতের তুমি ওড়ন পাড়ন,গ্রীষ্মের জলের জালা,
বসন্তে বাহার তুমি, বর্ষাকালে নালা!
এক মুখেতে করব তোমার গুণগান কত,
অভিমানে সোহাগ তুমি, বেশ-বিন্যাস যত!
তুমি অঙ্গে অঙ্গরাগ, পানে দোক্তা চুন,
তোমায়, এক দণ্ড নাহি পেলে একেবারে খুন!
যৌবন-জোয়ার জলে তুমি রূপের ঢেউ,
যতন কল্লেই রতন মেলে (আমা বই)
তোমায় পায় না কেউ!
তুমি আমার—
সোনার রংয়ে জোড়া ভুরু, কাল জুলপি চুল,
খাসা নাকে ঢাসা নথ তাহে নলকদুল!
বাউটি তাবিজ রতনচক্র তুমি সুগোল হাতে,
সীতি ঝুমকো কণ্ঠহার ধুকধুকিটি তাতে!
মলের তুমি রুণুঝুণু চন্দ্রহারের থামি,
আমারূপী বোচকাবাহি, তোমায় নমি, স্বামি!

কীর্ত্তনী সুর

আমি কি করি বল, সহচরি?
আমার প্রাণে উঠছে গানের তুফান, আমি
গাহিতে নারি!
আমার মনের বাসনা—যে রূপে নাইক তুলনা,
যেরূপে পাগল হৃদি মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন
মনের সাধে দিন রাতে সে রূপের স্তুতি গান করি
গাহিব কি, বিন্দে সখি, পোড়া বাঁশরী অরি।
আমি চাই বাঁশীর তানে তাহার প্রাণে করুণা জাগাই
রাই গো। শরণ দাও বলে,
সে চরণের তলে পরাণ বিকাই

বাঁশী আমারে ছলে, বাজাতে গেলে,
আর কিছু না বলে,
শুধু রাধা-নামে সাধা-স্বরে ডাকে কিশোরী।
আমি উপায় কি করি।

———

সোহিনীবাহার—আড়া

সুচারু চাঁদিমা মাখি উদয়তি ঋতুপতি!
নেহারিয়ে চমকে নয়ান;
মন্দ মলয়বায় কম্পে অবলাকায়,
অন্তরে ডারল বাণ!
মুকুলিত রসালে, পলবিত তমালে,
কোকিল কুহুকুহু কুজতি রঙ্গে;
কাঁহা আজু বিহরতি? আওরে প্রাণের বঁধু!
খেলিব হোলি তয়া সঙ্গে।

———

মিশ্রবিভাস—কাওয়ালি

যাও যাও যাও হে, কাছে এসো না।—
নিতান্ত আসিবে যদি কাছে বসো না।
ভোর ত হয়েছে নিশা, এখন কেন গো আসা?
যার তরে ভালবাসা, যাও—যাও সেথা হে,—
হেথা এসো না।
কেন ঘোমটা খোলা, কথা কহিতে বলা,
সখা হে, মিছে এ সাধা।
আমি কে তব? শুধু সুখের বাধা।
যেথায় মন এসেছ রেখে, যাও হে সেথা সখে।
অমন শূন্যমনে মনভোলান হাসি হেসো না।
এত জ্বালাতে মরি দহে সেও প্রাণে সহে,
বঁধু হে পায়ে ধরি অমন হাসিতে নেশো না।

বেহাগ—আড়খেমটা

সখি রে, ক্যায়সে বাজাওয়ে কান।
ও নহিরে গীততান, মুঝ অনুমান।
বাঁশরীক হিয়া ভরি নিঠুর কানাইয়া মরি,
অনুক্ষণ স্মৃতিখণ হানয়িছে বাণ।
টুটয়িল মরম, আকুলিল মরম,
চুর চুর অন্তর প্রাণ।
ও ক্যায়সে নিরদয় কান।

ভৈরবী একতালা

কোথায় গেল কালরূপ! কেঁদে সারা নন্দভূপ!
যশোদার কোল অন্ধকার।
দাঁড়ায়ে যমুনাজলে গোপনারী ভাসে জলে
বাজে না যে কদমতলে
রাধা রাধা বাঁশরীটি আর।
তোমা বিনে, প্রাণের বাঁকা,
সাধের গোকুল শূন্য ফাঁকা!
তোমার শ্রীদাম সুদাম সবাই একা!
মন বাঁধে না কার!
ওহে, ব্রজবাসির হৃদয়শশি! ব্রজপুরে ত্বরায় পশি—
ঘুচাও হে তার মনের মসী
কালো রূপের আলোতে আবার!

বারেঁায়াখাম্বাজ—একতালা

মধু বসন্ত সখি রে!
যৌবন আকুল, ফুল্ল কুসুমকুল,
উলসিত ঢলঢল শশিকর মাখি রে।
সমীরণ চঞ্চল, যমুনা কলকল,
কুহরত কুহুকুহু নিকুঞ্জে পাখী রে!

সুহাসিত যামিনী, সকচিত কামিনী,
কম্পিত হিয়া পর ঝরঝর আঁখি রে!
কাঁহা বৃন্দাবন হরি, কাঁহা মধু বাঁশরী,
বাজিল না আজু, মরি, রাধা রাধা ডাকি রে!

———

মেঘমল্লার—একতালা

এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী,
সে শুধু গো যদি আসিত!
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা,
যদি সে শুধু গো ভালবাসিত!
এ মধু বসন্ত, এত শোভা হাসি,
এ নবযৌবন, এত রূপরাশি,
সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি,
সে শুধু গো যদি চাহিত!
মিথ্যা তুমি বিধি! মিথ্যা তব সৃষ্টি,
বৃথা এ সৌন্দর্য্য নাহি যদি দৃষ্টি
যদি হলাহলে-ভরা প্রেম সুধা মিষ্টি,
কেন তবে প্রাণ তৃষিত!

———

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি

দিনের আলো নিভে এল, তবু প্রাণের আলো
চোখে জাগে,
নাইক হেথায় দিবা রাতি সদাই জ্বলছে ভাতি
অনুরাগে।
মেঘের কোলে জ্বলজ্বল তারাগুটি
উঠলো ফুটে;
ফুলের গন্ধ লুটে নিয়ে মলয় বাতাস
বেড়ায় ছুটে!

ওগো—প্রেমের বাতাস আরো উদাস,
বাঁদন ছাঁদন নাহি মানে,
উধাও কেবল ভাসিয়ে নে যায়,
তাহার কূল সে অকূল পানে!

———

মিশ্রমুলতান—আড়া

হায় রে, হোল না ত মালা গাঁথা।
সারা বেলা ফুল তুলে
গাঁথব ব'লে এনু কূলে,
কে জানে গো কেমন ভুলে,
ভাবতে ভাবতে কাহার কথা।
আঁচল খ'সে ফুলরাশি
স্রোতের জলে গেল ভাসি,
মুছে আঁখি চমকে দেখি,
কোলে পড়ে খালি সুতা।
ঐ যে বেজেছে বাঁশী,
তরীখানি আসিছে ভাসি।
এখনি সে হাসি হাসি
চাহিবে মালা, কি করিব ছুতা?
তার পিয়ার গলে দেবে বলে
চেয়েছিল মালাগাছি—
আপনি যাচি।
বলেছিল আর, হবে সুখের বাঁধন তার,
পরিলে বালা—
আমার হাতের এ মালা।
হায়! কে আমি তাহার!
ও গো পুরাতে নারিনু তার সাধ,
সাধিল রে বাদ পোড়া নয়নের ধার,—
জানে না সে তা।

সে যে মালা চেয়ে নাহি পাবে,
নিরাশ প্রাণে ফিরে যাবে,
চিরদিন মোর প্রাণে জাগিবে ব্যথা!
হায় রে পুরাতে নারিনু তার সাধ,
এ জীবনই বৃথা।

মিশ্রকানাড়া—কাওয়ালি

ওহে পরাণ-প্রিয়।
তারে দিও গো দিও—
তব মধুর দৃষ্টি, মোহন হাসি,
বচন অমিয়।
তব সোহাগ যতন রাশ,
তব প্রণয়-পরশ মদির সরস,
পুলক-পাশ,—
যাহা কিছু আছে ভাল তব,
পুরাতনে যাহা নহে পুরাতন,
চির নব—
দিয়াছ যা মোরে নাই বা দিয়াছ
সঁপিও সব।
শুধু দিও না সখা,
কঠোর বচন, ব্যথা অযতন—
গরল মাখা।
তাহা আমারি ব'লে শুধু
মনে রাখিও!

মিশ্রভৈঁরো—কাওয়ালি

নিভে গগন-সীমান্ত হায় রে ঐ তারাশশী!
তবু যদি বা আসে সে তাই এখনো আছি বসি
ফুটিল ফুল বনে, উঠিল উষা হাসি,
হাতের কুসুমমালা হইল ম্লান বাসি!

বুঝি আন পথে সারানিশি ঘুরেছে,
এমনি কাতর প্রাণে বুঝি ফিরেছে!
ঐ ঢালে রবিছটা, রাখাল সঙ্গীত গায়;
অভাগিনী বিরহিণী কেন তবু কেঁদে চায়

———

আসাবরি—আড়া

মনের উচ্ছ্বাসে, হরব উল্লাসে,
ভাসি কে ও যায় স্রোতের টানে!
সহাস আননে, প্রমোদ তুফানে।
ঢালি দিয়ে সুখে হৃদয় প্রাণে!
যাও, সখা যাও, বাসনা মিটাও,
আমি কেন ফিরে ডাকিব কূলে?
সাধাসাধি মিছে, চেয়োনাক পিছে,
আপনে থাক গো আপনা ভুলে!
দেখিতে দেখিতে, ভাসিতে, ভাসিতে,
কতদূর সখা গিয়াছ চ'লে!
ডাকিলে এবার কে শুনিবে আর,
কে চিনিবে মোরে আমিই ব'লে।
যাও সখা, তবে যাতে সুখী হবে,
ভাসিয়ে হরষ স্রোতের টানে!
আমি কেন আর ডাকি বারবার,
ব্যথিব তোমার হৃদয় প্রাণে।

———

পরজ—আড়া

হাস একবার, সখি, সে মোহন হাসি.
ভস্মময় হৃদে যাহা ঢালে সুধারাশি।
বিষাদ-তিমিরে সই, একটি আলোক ঐ।
আঁধার সংসারে উহা ধ্রুবতারা মম।

সঙ্কট কণ্টকগণে ও হাসির পরশনে
শোভে হৃদে সুখময় কুসুমের সম।
অনন্ত বিপদে, প্রিয়ে, ডরায় না এই হিয়ে,
যা লাগি লভেছি তোমা অমূল্য রতন।
তোমার কোমল বুকে, বাজিল অভাগা দুঃখে,
তাই ত সদয়া বালা! দিলে নিজ মন।
বার শত শত ঘেরিল তরঙ্গ যত,
যতই নিবিড় ঘন বিষাদের রাতি;
ততই দ্বিগুণ, প্রিয়া, উজলিল দুই হিয়া,
ততই বিমলতর প্রণয়ের ভাতি।
যত দিন মোর লাগি সোহাগে উঠিবে জাগি,
সখি লো! অধরে তোর মধুময় হাসি—
তত দিন, প্রিয়ে শোন, আমার হৃদয়-মন
সুখ বলি মানিব লো বিপদের রাশি।

গৌড়মল্লার—একতালা

তারকা হারাতে পারে ভাতি
দিবসের অবসানে নাহি পারে আসিতেও রাতি;
কিন্তু সখি, এ হৃদয়মাঝে,
তোমাতরে যে প্রেম বিরাজে—
রবে তাহা চিরজ্যোতির্ম্ময়,
পরিপূর্ণ অমর অক্ষয়;
জন্ম জন্মান্তরে তাহা জীবনের সাথী।

সিন্ধুড়া—আড়া

যাতনা-সমুদ্রমাঝে ডুবায়ে হৃদয়-প্রাণে,
অভাগিনী অনাথিনী চলেছে স্রোতের টানে।
প্রত্যেক তরঙ্গ-যায়, হৃদয় বিচূর্ণ-প্রায়,
এখনো অসাড় তবু হোল না বেদনে।

দলিল আহত হিয়ে, তবু এ হৃদয় দিয়ে,
মমতা-শোণিত-তপ্ত বহিছে গোপনে।
এ হেন যন্ত্রণাভ'রে, রুধিতে তা নাহি পারে,
বৈরাগ্য বিরাগভরা ধরা দিতে এইখানে।

পিলুবারোঁয়া—কাওয়ালি

এ হৃদয় বুঝিল না কেহ!
অনাদরে উপেক্ষায়, সেই ফিরাইল হায়,
যাঁহারে সঁপিতে গেনু এত প্রেম এত স্নেহ।
এ মহা পাষাণভার, বহিতে পারিনে আর,
কোথায়, মরণ, তুমি চরণে শরণ দেহ।
মৃত্যু না জীবন তুমি, শূন্য না আশ্রয়ভূমি?
তাপিততারণ ওহে! নিরাশ্রয় দাও গেহ।
তুমিও না দিলে ঠাঁই, তোমারো সাড়া না পাই,
না পেনু দুখিনী ব'লে তোমারো করুণা-লেহ।

বেহাগ—আড়া

চোখের আড়াল হ'লে সবে ভুলে যায়,
পড়িয়ে যে থাকে শুধু কেঁদে কেঁদে চায়।
শুধু পথপানে চাহে, স্মৃতির কাহিনী গাহে,
আকুল আকাঙ্ক্ষামাঝে বিশ্বাস জাগায়।
ব্যথাভরা ভালবাসা, বিরহে অসীম তৃষা,
তাই সে ভুলিতে ভোলে একা এ ধরায়।

গৌড়—ঠুংরি

এমনে কেমনে রব না দেখি তাহায় রে
গণিয়ে নিমেষ পল দিন না ফুরায় রে।
শবদে চমকি উঠি, দুরু দুরু হিয়া
প্রাণ যারে চায় কেন বিধি না মিলায় রে!

ভান—আড়া

এ হেন পাষাণ যদি, কেন ভালবেসেছিলে,
আশা দিয়ে ভুলাইয়ে কেন বা ভুলে রহিলে।
তোমারি বিরহ সহি, দিবস-রজনী দহি,
যাতনা দিতে কি শুধু প্রেমাগুন জ্বালাইলে?
প্রেমের শপথ সেই মনে পড়ে বার বার,
আবেশে আবেগময় সতৃষ্ণ আঁখির ধার;
প্রাণের আহ্বানগীতি, আদর নূতন নিতি—
কেমনে দুদিনে, সখা, সকলি সে ফুরাইলে।

———

মিশ্র—একতালা

এমনি ক'রে—
তারো কি কাঁদে প্রাণ আমারো তরে।
সেথা—জোছনা রজনী ম্লান কি স্বজনি,
এমনি তাহারো নয়ন-লোরে।
ঐ দুটি তারা, আপনাতে হারা,
শুনিছে তারো কি বিরহগান?
মালাগাছি গলে, তেমনি কি দোলে,
শুকান তবু কি তেমনি মান?
বুকে ধরে চেপে, উঠে সে কি কেঁপে,
শিহরে কভু বা অধরে রাখি?
ওগো এমনি পিয়াসা, এত ভালবাসা,
এমন স্মৃতিতে বিহ্বল সে কি?
প্রাণ কেঁদে কয়, নয় তা তো নয়,
সবি বিসরণ সে মায়াপুরে।
সেথা পুরাতন ব'লে, কিছু নাহি ছলে,
শুধু বাজে বাঁশী নিতি নূতন সুরে।

———

বেহাগড়া—আড়া

এ হৃদি নেভাতে চাহে ও মরম-ব্যথা
এ প্রীতি মুছাতে চাহে ও নয়নপাতা।
প্রাণ চায় প্রাণ দিতে, ও আননে ফুটাইতে
সরস হরষ হাসি, নব প্রফুল্লতা।
জ্বলন্ত এ অশ্রুধার, কিছুই নহে গো আর,
বাহিরে প্রকাশ শুধু সেই আকুলতা।

———

ভৈরবী—আড়া

জনমের মত, সখা, বিদায় দেহ গো মোরে।
এই দেখা শেষ দেখা আর দেখা হবে কি ফিরে?
ও মোহন মুখশশী, ঐ মধুময় হাসি,
জন্মশোধ শেষবার দেখেনি হৃদয় ভোরে।
অঙ্কিত যে ও মূরতি হৃদয়ের শিরে শিরে,
জীবন মুছিবে তবু ও ছবি মুছিবে কি রে!
নয়নে দেখি না দেখি, তবুও দূরেতে থাকি,
যতনে পূজিব ছবি অভাগীর আঁখিনীরে।
তাতেই ভুলিয়া রব, তাতেই প্রাণ সঁপিব,
স্মরণের সুখে সুখী রহিব অন্তরে।

———

আলাইয়া—আড়া

শুকাইতে রেখে একা ফেলিয়ে চলিলে সখা!
যাও যাও দূরদেশে, সুখে থেকে। এই চাই।
যখন আসিবে ফিরে, শুনিও হরষভরে
জ্বালাতন করিবারে অভাগিনী বেঁচে নাই।
যে সুখ আমোদ আশে, মু'খানি হরষে ভাসে,
পূর্ণ হোক, সখা তব আশ-অভিলাষ সেই।
জন্ম জন্ম সুখে ভাসি, হাসিও অনন্ত হাসি,
এছাড়া আর অন্য সাধ অন্য কিছু ভিক্ষা নাই।

———

ভৈরবী—আড়া

কেমনে বিদায় দেব অভাগী-সর্ব্বস্বধনে !
ভাবিতে এ কথা যে গো এখনি শিহরি প্রাণে
যে মুখটি নিরখিয়ে—অনন্ত যাতনা সয়ে,
তবুও অতুল সুখে ভাসি মনে মনে ;
কেমনে ছাড়িয়ে রব সে প্রাণের প্রাণে !

না না, নাথ, যাও তুমি দূর দেশান্তরে,
যেখানে পাবে না ব্যথা দুখিনীর তরে ।

যা আছে অদৃষ্টে হবে, তুমি ত' গো সুখে রবে,
সুখী আমি মনে মনে রব তাহাতেই !

শুধু গো তোমার কাছে, একটি প্রার্থনা আছে,
বিদায়ের কালে শুধু ভিক্ষা মাগি এই—
যে দিন শুনিবে কানে, তোমারি তোমারি ধ্যানে
জীবন ত্যজেছে এই অভাগিনী বালা,
এড়ায়ে গিয়াছে চলি সুখ-দুঃখ জ্বালা ;
একবিন্দু অশ্রুধার, তখন গো উপহার,
দিও তব অভাগিনী মৃতের স্মরণে !

———

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালি

সেই ত' কুসুম ফোটে, সেই ত' মধুপ ছোটে,
সেই ফুল চুমি চুমি মৃদু ব'হে যায় ;
ধরি কলকলতানে, খুলিয়া তরল প্রাণে,
তটিনী সেই ত ঐ ধীরে বহে যায় ;
সেই রবি যায় আসে, চাঁদিয়া হরষে ভাসে,
সন্ধ্যার সুনীল নভে তারাদল ল'য়ে ;
অমৃতে ভাসায়ে দিক, কুহরে পাপিয়া পিক,
আনন্দ পুলকমাঝে বিশ্ব যায় বয়ে !

তবুও হৃদয়ে, সেই, সে দিনের মত কই,
প্রতিধ্বনি জাগে না ত' প্রকৃতিশোভায় !
কই সে উল্লাস কোথা, আরো বাড়ে মনোব্যথা,
সে সুখের দিন, সখি, ফেরে না ত' তায় ।

জিলফ—আড়া

চোখের আড়াল হ'লে সবে ভুলে যায়—
পড়িয়ে যে থাকে শুধু কেঁদে কেঁদে চায় !
শুধু পথ পানে চাহে, স্মৃতির কাহিনী গাহে,
আকুল আকাঙ্ক্ষা মাঝে বিশ্বাস জাগায় ।
ব্যথাভরা ভালবাসা, বিরহে অসীম তৃষা,
তাই সে ভুলিতে ভোলে একা এ ধরায় !

ছায়ানট—আড়া

কে তুমি, স্বপনময়ী কল্পনাকুমারি !
ধরিব ধরিব করি ছুঁইতে না পারি !
ও ছবি হৃদয়মাঝে, আলো করি সদা রাজে
দেখিতে না পাই কেন নয়ন প্রসারি ;
অন্তরে আলোক ভায়, নয়নে প্রকাশে তায়,
একটি আঁধার ঘোর ছায়া মাত্র তারি !

মারু—আড়া

প্রেমের অমৃত-বিষে হৃদয় ত রয়েছে ভরিয়ে !
তবে কেন পিয়াস [illegible]টে না !
সই, মেটে কি করিয়ে !
কি মদিরা মাখান সে মুখে !

সারাদিন রাখি চোখে চোখে,
সারাদিন পিয়া হিয়াভরি
তবু কেন পিয়াস মেটে না !
তবু কেন অতৃপ্ত এ জ্বলন্ত বাসনা ?
সুধাপানে মত্ত হিয়া, সুখোচ্ছ্বাসে উঠে উথলিয়া,
কাঁদিয়া আবার চাই বিষে,—
বড় সাধ সে হৃদয় এ হৃদয়ে মিশে।
বড সাধ হিয়ায় হিয়ায়, একেবারে মিলাইয়া যায়,
বল, সখি, হয় কি করিয়ে !

টোরী—আড়া

সুখের স্বপনে ছিনু কে ভাঙ্গালে ঘুমঘোর !
সে মধু মূরতি আহা কোথা মিশাইল তোর।
কোথায় পালালি, বালা, ফুরাল সুখের খেলা,
ভাঙ্গিল সাধের স্বপ্ন, ভাঙ্গিল হৃদয় মোর !
ফিরে পুন স্বপ্নঘোরে, মোহের ছলনে,
ও রূপ দেখিতে পেলে কি চাহি, লগনে !
তা ত হইবে না আর। যে স্বপন একবার
ফুরাযেছে, তারে হৃদে পাব আর কেমনে।
আবার পাব কি ফিরে, কল্পনার সে সখি রে !
মধুর ভাবের খেলা ফুরালো নিমেষে।
স্মৃতি সুখবিন্দু আর নিরাশার অশ্রুধার,
রহিল সম্বলমাত্র স্বপনের শেষে !

ভৈরবী—আড়া

এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন !
এখনো হেরিলে তারে কেন রে উথলে মন !
উপেক্ষা ভ্রূকুটিরাশি, হেরি সে ঘৃণার হাসি,
তবুও ভুলিতে তারে নারিনু কেন এখনো।

চোখের দেখা দেখতে গেলে, তাও দেখা নাহি মেলে,
বিরক্তি তাচ্ছিল্যভরে সে করে যে পলায়ন।
তাই থাকি দূরে দূরে, ভাসি মর্ম্মভেদী নীরে,
মুহূর্ত্তেও দেখা পেলে স্বর্গ হাতে পাই যেন,
জ্বলে প্রাণ যাতনায় জ্বলুক কি ক্ষতি তায়,
সে আমার সুখে থাক নাহি সাধ অন্য কোন।

———

ভূপালী—কাওয়ালি

আর না আর না, সখি, ও কথা বলো না আর,
অভাগিনী এ দুখিনী ফিরিবে না কূলে সে—
ভেসেছে আঁধার সাগরে নিরাশা করিয়া সার।
হাসে না হৃদি সুখে, কাঁদে নাক কোন দুঃখে.
যা লো সখি, ফিরে যা, মিছে ডাকা বার বার!

———

জয়জয়ন্তী—কাওয়ালি

নিঠুর নয়নে কেন চাহ বার বার,—
কেন গো এখনো, সখা, সেই তীব্র তিরস্কার!
এত যে নয়নজল, ভিজায়ে চরণতল,
ঢালিনু—হোল না তবু করুণা সঞ্চার?
তব প্রেম-ভিখারিণী, নহে ত' গো এ দুখিনী,
অভাগী ভিখারী শুধু একটু দয়ার!
ভাল যদি নাই বাস, তবুও একটু হাস,
আদর করিয়া কথা কহ একবার!
অধিক করি না আশা, চাহি না ত' ভালবাসা,
একটু দয়ার ভিক্ষা—তাও অহঙ্কার!

———

সরফর্দ্দা—আড়া

জ্বলিল কেন এ হৃদে দুরন্ত অনল।
কেন এ নয়নে আজি উথলিত অশ্রুজল।
ভেবেছিনু অশ্রুধার, কভু না বহিবে আর,
হৃদয় হয়েছে ভস্ম, শুষ্ক এ মরমতল।
কঠিন বজ্রের সম, বেঁধেছিনু হৃদি মম,
সহস্র আঘাতে তাহা ছিল অটল।
জানিনে তবে রে কেন, পাষাণ সে হৃদি হেন—
কোমল পরশে এত হইল বিহ্বল।

সিন্ধুভৈরবী—কাওয়ালি

মরমের সাধ, সখি, মরমে লুকায়ে রাখি,
দূরে থেকে শুনে থাকি সে কেমন আছে লো।
বিজনে বেদনা সই, ভয়ে ভয়ে কথা কই,
আমার কথার আঁচ লাগে তারে পাছে লো
বাহিরে চাপিয়ে ব্যথা, ঢাকিয়ে হৃদয় কথা,
দূরে থাকি যেন আমি কেহ কারো নই লো।
লুকাইয়া একা একা, কখনো পাইলে দেখা—
দেখেও দেখি না যেন পরভাবে রই লো।

কেদারা—যৎ

চলিনু জন্মের মত আসিব না আর,
এ শুষ্ক মলিন মুখে জ্বালাইতে বার বার।
নব অনুরাগভরে, থাক হে সুখের ঘোরে,
চলিনু আঁধারময় নিস্তব্ধ বিজনে,
খুলিব হৃদয়জ্বালা তরুলতা সনে,
নিঠুর নরের পারা, নহে ত পাষাণ তারা,
ব্যথিতের তরে বাজে তাহাদেরো মনে।

তবে আমি যাই যাই, সুখে থাক ভয় নাই,
মনে করো, যদি কভু পড়ে মনে ভুলে,—
অকালে এ প্রাণকলি, নিঠুর চরণে দলি,
জনমের সুখশান্তি নেশেছ সমূলে।

———

সিন্ধুকাফি—আড়া

কেহ শুনিল না, হায়, এ পূর্ণ প্রাণের কথা।
চিররুদ্ধ রয়ে গেল তরঙ্গিত আকুলতা।
স্বজন সমাজ হেন, বিজন শ্মশান যেন,
চন্দ্র-সূর্য্য-তারা আছে নাহি তাহে উজ্জ্বলতা।
এ কি রে ভীষণ ঠাঁই! সব আছে কেহ নাই—
সম্মুখে অপার সিন্ধু নেভে না তৃষ্ণার ব্যথা।

———

মল্লার—ঝাঁপতাল

এত বুঝাইনু কেন বোঝে না এ মন?
কি লাগি যাতনা প্রাণে সে সুখ যখন।
এ দুঃখের অশ্রুধার, তার প্রতি তিরস্কার,
জাগায় সে হাসি মুখে বিষাদ-বেদন।
এই কি নিঃস্বার্থ প্রেম? এই কি গো ভালবাসা?
এখনো গোপনে যদি আপন সুখে লালসা;
পুড়ে ইহা হোক খাক, প্রাণ ইথে যাবে যাক,
যার প্রাণ সে নিলে না, মোর কিবা প্রয়োজন।

———

সাহানা—যৎ

প্রাণ সঁপিলাম তোমায় হয়ে প্রেমভিখারী,
রাখ রাখ মার মার যা বাসনা তোমারি।
যদি দেহ আপনারে, পূজি জীবনোপচারে,
স্থাপিয়ে হৃদিমন্দিরে চিরদিন সেবাধারী।
যদি ক'রে দাও দূর, মন-প্রাণ চুরচুর,
মরিব তোমারি দ্বারে তোমারি নাম উচ্চারি।
প্রসন্ন বা হও বাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
তোমারি নিষ্কাম মুক্তি, তোমাতে কামনাচারী।

———

বেহাগ—যৎ

সারাদিন পড়ে মনে।
লাজভরা প্রেমরাগে চেয়েছিল সে কেমনে।
রবির কিরণ আগে, সে আলো কিরণ জাগে,
সন্ধ্যা না আসিতে সন্ধ্যা সে দিঠীর স্মৃতিঘনে
হাসি কাঁদি সারাদিন, সে নয়নে চিরলীন,
স্বপ্নখানি যেন তার, মরি বাঁচি তাহে ক্ষণে!

———

মিশ্রপিলু—যৎ

লুকাইবি যদি পুনঃ কেন দেখা দিলি বালা,
কেন এ শীতল স্পর্শ শুধু বাড়াইতে জ্বালা।
স্বর্গের অমৃত তানে, মোহিলি কেন এ প্রাণে,
নিমিষের তরে শুধু যদি এ স্বপন লীলা।
আঁধারে ছিলাম ভাল, কেন এ ক্ষণিক আলো
প্রাণে শুধু ধাঁধা হানে এরূপ চপলা-খেলা,
কানে সেই গীতরেশ, প্রাণে সেই মধু বেশ;
গলে সেই ফুলহার তবু সে শুকান মালা।

———

আসোয়ারি—কাওয়ালি

আহা কেন ঐ মুখখানি আজি
বিষাদ-বরণে রয়েছে ম্লান?
কি দুখ বেজেছে কোমল পরাণে
সুধায় সখি, এ আকুল প্রাণ!
বিষন্ন হেরিলে ভেঙ্গে যায় বুক,
হৃদয়ের শিরা ছিঁড়িয়ে যায়,
কি যে মর্ম্মভেদী সে দারুণ জ্বালা,
মরমী শুধু তা জানে যে হায়।

শতচাঁদমাজা ঐ মুখখানি কেন
আজি আহা বিষাদময়,
চির হাসিমাথা নয়নযুগলে
কেন আজি অশ্রু-সলিল বয়।
প্রফুল্ল হেরিতে ও মুখকমল
মুছিতে বিন্দু সলিল-বারি,
কি করিতে বল করিব এখনি,
কি না তার তরে সহিতে পারি।
জীবন পরাণ যা আছে আমার
হাসিয়া সঁপিব চরণে আনি,
যদি একবার নিমিষেরো তরে
উজলে তাহাতে ও মুখখানি।

———

মিশ্রমল্লার—আড়া

উদয় মধুর মধু, কোথায় প্রাণের বঁধু,
অভিমানী যামিনী-কামিনী।
তাই ঘন গরজন, রিম্‌ঝিম্‌ বরষণ,
চমকিত চকিত দামিনী।
সারাক্ষণ যার লাগি, আশায় রয়েছি জাগি,
আসে নি যে, তাই উন্মাদিনী।
নয়নেতে অশ্রুজল, তাই ঝরে অবিরল,
ঘন বহে আকুল নিঃশ্বাস।
পরাণে লেগেছে দুঃখ, দেখিবেনা চাঁদ মুখ,
তনু ঢাকা জলদের বাস।
তরুণী রজনী বালা, হৃদয়ে বিরহজ্বালা,
খুলিয়াছে হাসিখুসি সাজ—
মধুর বসন্তে তাই, চাঁদিনী সুষমা নাই,
বরষা বাদল ঘন আজ।

———

দেশমল্লার—একতালা

এমন বারি ঝরে, এমন থরে থরে,
আকাশ ঘন ঘোরে ছেয়েছে,
এমন বরষায়, সে মোর আজি, হায়,
কোথায় কোন্ দূরে রয়েছে।
নির্ঝর সচকিত মিলন জাগরিত,
চমকি উথলিত পুলকে,—
চাতক তৃষা ভরি, আমরা পান করি
ভ্রমিছে ঘুরি ঘুরি দ্যুলোকে।
বনানী নুয়ে নুয়ে, এ ওরে ছুঁযে ছুঁযে,
গাইছে প্রাণ খুলে প্রেমগান,
ফুলের রূপ রাশি, উঠিছে হাসি হাসি,
শুভ্র হিমনীরে করি স্নান
এ হেন বরষায়, কাহার ভরসায়
দিবস যাপি?
কাহার প্রেমাগুনে, সযতনে,
হৃদয় তাপি?
কাহার আঁখিতারা, মাতোয়ারা,
করে এ প্রাণ মোর?
কাহার সুধাচুমে, একঘুমে
জীবন করি ভোর?
কাহার প্রাণে গিয়া, লুকাইয়া,
জুড়াই ব্যথা?
এমন ঘনঘটা, বারিচ্ছটা,
হায়, সবি বৃথা।

———

শ্রাবণমল্লার—কাওয়ালি

সখি, নব শ্রাবণ মাস;
জলদ ঘনঘটা, দিবসে সাঁঝছটা,
ঝুপ ঝুপ ঝরিছে আকাশ।

ঝিমিকি ঝম ঝম, নিনাদ মনোরম,
মুহুর্মুহু দামিনী আভাস ;
পবন বহে মাতি, তুহিন-কণা ভাতি,
দিকে দিকে রজত-উচ্ছাস।
উছলে সরোবর, পত্র মরমর,
কম্পে থরথর পান্থ নিরাশ ;
যুবতী যুবজনা, পরম প্রীতমনা,
দুহুঁ দোঁহে বাঁধে ভুজপাশ।
বিরহে যাপি যামী, ঘুমায়ে ছিনু আমি,
স্বপনেতে মিলন-উল্লাস ;
সহসা বজ্রপাত, কড়াক্কড় নাদ,
কাঁপি উঠি, হৃদয় তরাস।
নয়ন মেলি চাই, কোথায় কেহ নাই,
উথলিত আকুল নিঃশ্বাস ;
আমার বঁধুয়া পরবাস !

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা

ওগো, একবার চেয়ে শুধু নয়নকোণে—
কি সুধা ঢালিয়া গেল হৃদয় মনে।
সে মদিরা মোহে আমি, মগন দিবস যামি,
চির প্রেমে—মধু স্বপনে।
কি কুহক জানে, সখি, মনোমোহনে।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী

সখি, মোর বিরহ ভালো
মিলনেতে পুরে সাধ,আছে তাহে অবসাদ,
কে জানে উচ্ছাসে স্রোত বহে কি মিলালো।
সখি, মোর বিরহ ভালো।
তীব্র সুখময় স্মৃতি, তৃষাভরা ব্যথা অতি,
চির সচেতন প্রীতি—চির দীপ্ত আলো।
সখি, মোর বিরহ ভালো।

মিশ্রকানাড়া—একতালা

ঐ বুঝি দেবী সে আমার।
হৃদয় যাহারে চায়?
যাহার আসন ধরে হৃদি'পরে,
অনুক্ষণ এ জীবন, আহ্বান-সঙ্গীত গায়?
বুঝি ফুলের গন্ধ, তারার হাসি—
যাদের আমি ভালবাসি—
তারা গো প্রেমে আমার সদয় হয়ে
চেতনরূপে জনম ল'য়ে আজিকে নয়নে ভায়!
দেবি, তুমি নয়নের কান্তি।
হৃদয়ের শান্তি,
দুখ তাপ ভ্রান্তি—
তব কটাক্ষে মিলায়।
আত্মার নির্ব্বাণ মুক্তি তুমি এ ধরায়।

———

দেশসিন্ধু—কাওয়ালী

সে প্রেম সে ভালবাসা গেছে সব ঘুচে,
এ ছবি হৃদয় হ'তে ফেলিয়াছি মুছে।
তবু, সখা, রাখ এই নিদর্শনটুকু;
মনে যদি পড়ে কভু পুরাণ সে সুখ—
ক্ষতি নাই তাহে কিছু, নাহি তাহে ব্যথা;
পুরাতন স্মৃতি শুধু, নাহি আকুলতা।

———

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

বিদায় প্রাণেশ!

চিরদিন কাঁদিয়াছি আজ অশ্রু শেষ।
দুখের মিলন গেছে চিরকাল, চিরদিন,—
চেয়ে শুধু মুখ পানে এ নয়ন জ্যোতিহীন;
হৃদয় আকুল অতি বহিয়ে নিরাশা ব্যথা
আজিকে বিদায়, সখা, আজ এই শেষ কথা।

———

প্রভাত-সঙ্গীত

প্রভাত

অরুণ মুকুট শিরে, অধরে উষার হাসি,
পদতলে প্রস্ফুটিত শত শত ফুলরাশি।
শুভ্র পরিমল বায়ে উথলিত তনুখানি,
ধরায় চরণ দান করেন প্রভাত-রাণী।
আনন্দের কোলাহলে চারিদিক নিমগন,
পাখী গায় আগমনী হাসে বন উপবন।
কম্পিত সরসী-হিয়া মৃদু ঝুরু ঝুরু বায়,
কমল কোমল আঁখি সুধীরে খুলিয়া চায়!
উপকূলে থরে থরে বায়ুভরে দুলি দুলি,
হরষে সরসে মুখ দেখিতেছে তরুগুলি!
শ্যাম শস্য দুর্ব্বাদল ভক্তিভরে নুয়ে নুয়ে,
প্রণমে তাঁহারে সুখে, ধরাতল ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
শুভ্র অভ্র জ্যোতির্ম্ময় অরুণ কিরণ মাখা,
গাহিয়া উড়িছে পাখী বিছায়ে পেলব পাখা :
এসেছে তুলিতে ফুল বালিকা সাজিটি হাতে!
ভুলে গেছে ফুল তোলা চেয়ে আছে নভঃপাতে!
বালিকা দেখিছে চেয়ে, ফুল তোলা গেছে ভুলে,
প্রতিধ্বনি গাহিতেছে সপ্তমে লহরী তুলে!
কোমল অমৃত সুরে বিভু নামে উঠে তান,
প্রভাত আনন্দে মগ্ন সে গীত করিয়ে পান!

খুকুরাণী

আমার খুকুরাণি, সোনামণি
আয় ত কোলে ভাই।
বুকে থুয়ে মুখখানি তোর
সদাই দেখিতে চাই।

অমন মধুর হাসি মধুর মুখে
কোথায় আছে কার,
চাঁদ মামা ঢেলে গেছে
সুধা যত তার।

অমন নরম-নরম, বাধো বাধো
আধো কথাগুনি,
কোথা থেকে শিখে এলি
বোন্‌টি বল শুনি।

তোরে দেখলে পরে, হরষভরে
হৃদয় ভেসে যায়,
রাখি তোরে বুকে ক'রে
আয় রে খুকু আয়।

আমি কি চাহি

আমি কি চাহি ?
সে আমার, আমি তার, আমার কি নাহি !
আনন্দ-সাগর, তার খেলে পদতলে ;
কোটি চন্দ্র তারা শিরোপরি জ্বলে ;
বিশ্ব-ভুবনের রূপরত্ন মণি,
তাহাতে বিরাজে, সে মোর তরণী,
আমি তাহারে বাহি, আর কি চাহি !
সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি।

দূরে থেকে দেখে ভাবে লোকে সবে,
দীনহীন নেয়ে আমি এই ভবে।
তরী বাহি আর হাসি মনে মনে,
তাহারা এ সুখ বুঝিবে কেমনে।
জগতে সবাই দুঃখের প্রবাসী,
আমি শুধু সুখে দিবানিশি ভাসি;
কালাকাল হেথা নাহি; আমি কি চাহি!
সে আমার আমি তার, আমার কি নাহি!
আমার মতন ধনী কেহ নাই,
অনন্ত উল্লাস বাঁধা মোর ঠাঁই;
রূপের তরণী প্রেমেতে চালাই,
আনন্দ-সঙ্গীত গাহি! আর কি চাহি।
আমি তার, সে আমার, আমার, কি নাহি!

জানি না ত

জানি না ত ভালবাসি কি না, শুধু এই জানি,
একটি অব্যক্তভাবে রুদ্ধ যত বাণী।
একটি পরশে দেখি অনন্ত স্বপন,
একটি পরাণে দেখি বিশ্ব নিমগন।
স্বর্গের সৌন্দর্য্য আলো বিকাশে নয়ানে,
ঈশ্বরের প্রেমরূপ একটি বয়ানে।
আত্মায় আত্মায় হেরি মহিমা তাহার,
মঙ্গল সুন্দর সত্য আনন্দ অপার।
দেহের সীমাতে এ যে অনন্তের বাসা,
জন্ম-জন্মান্তের পুণ্য ভবিষ্যের আশা।
এই যদি ভালবাসা ভালবাসি তবে;
অনাদরে আদরে এ চিরদিন রবে!

কোথায় কোথায় ?

কোথায় কোথায় ?
সবিতার জ্যোতির্ম্ময় রূপে ?
চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ কিরণে ?
নক্ষত্রের কনক-বিভায় ?
বিজুলির চমক-বরণে ?
পর্ব্বতের অভ্রভেদী দৃশ্যে ?
সমুদ্রের মহান্ শোভায় ?
বনানীর গম্ভীব সৌন্দর্য্যে ?
মেঘেব বা বিচিত্র খেলায় ?
কোথায় কোথায় ?
নির্ঝরের ঝর ঝর তানে ?
তটিনীর মৃদুল কল্লোলে ?
বিহগের সুললিত গানে ?
বসন্তেব সুমন্দ হিল্লোলে ?
গভীর নিশীথে উথলিত
বাঁশরীর মধুময় তানে ?
প্রস্ফুটিত গন্ধে ঢল ঢল
সুকোমল কুসুম-বয়ানে ?
কোথা কোন্‌খানে—
সৌন্দর্য্যের সে পূর্ণ মহিমা,
সৃষ্টির সে মুক্ত শোভা রাজে ?
ঐ দেখ একখানি মুখে,
দুইটি ও নয়নের মাঝে !
বিশ্বের সৌন্দর্য্য যাহে ভাতে,
আনন্দের বহে পারাবার,
চরাচর ডুবে যায় যাহে,
জীবন মরণ একাকার।

———

বিরহ কারে কয় ?

বিরহ কারে কয় ?
আমি ত দিবানিশি, তোমাতে আছি মিশি,
জগৎ সদা হেরি তুমি ময় ?
বিরহ কারে কয় ?

প্রভাতে রবি উঠে, কাননে ফুল ফোটে,
পাখীরা গাহে গান, বাতাস ধীরে বয় ;
তাহে—তোমারি পরশন, তোমারি দরশন,
তোমারি মধুভাব উথলয় !

দুপুরে খর জ্যোতি, তাপের তেজ অতি,
তাহে আর এক ভাতি তোমারি ;
কাহারো কটুভাষে, যখন মরি ত্রাসে,
আঁখে, অমনি রোষানল নেহারি।

আকাশে ঘন-ঘটা ঢাকিয়া রবি-ছটা,
যখন বারি-ধারা বরষে ;
আমার অভিমান, তোমার প্রেমগান,
আকুল সাধাসাধি যেন সে।

আবার মেঘ ছুটে, আলোক-হাসি ফুটে,
প্রশান্ত চারিদিক অতিশয় ;
ফুরায় ধীরে বেলা ; মেঘের রঙ্গ খেলা,
তোমার প্রেমলীলা-প্রকাশয় !

সন্ধ্যায় চাঁদ উঠে, জ্যোৎস্নায় ফুল ফোটে,
পাপিয়া গাহে গান, তারকা হেসে চায়,
আবেশে ঢল ঢল, মধুর সুকোমল,
অলস দিশা-হারা চাহনি তব ভায় !
রজনী সুগভীর, নিদ্রায় ধীর স্থির,
স্বপন তোমারি যে বিরচয়,
বিরহ হেথা যত, মিলনে অনুরত,
গাঁথিছে মিলে মিলে প্রেমের সুবিস্ময়।

কে বলে তুমি দূরে ? আমার হৃদয়পুরে,
তোমায় করিয়াছি স্থাপনা !
আমি ত দিবানিশি, তোমাতে আছি মিশি,
আপনা হ'তে তুমি আপনা !

হোক কালের মরণ

বহু কামনার ফলে বহু সাধনার বলে,
বহু দিন পরে আজ আঁখিতে মিলেছে আঁখি ;
একটি মুহূর্ত্ত মাঝে, কালাকাল ডুবিয়াছে ;
মুক্ত সত্য এ মুহূর্ত কেমনে ধরিয়া রাখি !
আঁধার গিয়েছে ছুটে, বাঁধন গিয়েছে টুটে,
আকাঙ্ক্ষার বাসনার গেছে হাহাকার !
আনন্দ-প্লাবনে হিয়া, উঠিতেছে উথলিয়া,
তুমি আমি আমি তুমি সবি একাকার !
নয়নে অরূপ-দীপ্তি, মরমে চরম তৃপ্তি,
অকূল সুখেতে তবু অশান্ত আকুল ! —
বুঝি এ মুহূর্ত্ত হায় ! এখনি চলিয়ে যায়,
এ সত্য এখনি বুঝি হয়ে যায় ভুল !
ভিক্ষা কিছু নাহি আর পেয়েছি যা চাহিবার ;
পরিপূর্ণ হৃদি মন তবুও ভিখারী !
এ মুহূর্ত্ত চিরতরে রহুক অনন্ত ভরে,
বিন্দুতে হউক পূর্ণ জলধির বারি !
বহু কামনার ফলে, বহু সাধনার বলে,
বহুদিন পরে যদি আজি দরশন ।
ফেলিও না আঁখি-পাতা, দূর হোক আকুলতা,
মুহূর্ত্ত অমর হোক—কালের মরণ ।

মায়াবিনী

(তরুর গান)

নিতান্ত তরল ছোট একটি সে মেঘমালা !
সে এমন মায়াবিনী এত জানে প্রেম-খেলা !
বুঝি না তাহার ভাব, জানি না সে চায় কিবা !
থেকে থেকে আচম্বিতে মলিন হাসির বিভা '
সোনার বরণা এই গিরিশিরে দেয় উঁকি।
সহসা কি অভিমানে অশ্রুভারে পড়ে ঝুঁকি !
সমীরণ চাহে বুঝি ? তাও ত বুঝিতে নারি !
সে যদি নিকটে আসে পলায় যে তাড়াতাড়ি !
স'রে যায় উড়ে যায় দুর নভে যায় ভাসি,
বিষণ্ণ অনিলে হেরি ঢলি পড়ে হাসি হাসি !
এ কি রঙ্গ কি তামাসা কিছু বুঝিতে নারি,
ভাল কি বাসে না তারে ? এমনি বা বাসে নারী ?
না তারেই বাসে ভাল, সেই ভাল আমি দেখি,
শুধু দিত যদি অশ্রুবিন্দু—মরিতাম হৃদে রাখি !
মনে মনে এই কথা কাতরে কহিনু আমি,
দেখিনু বিষণ্ণমুখী ধীরে আসিতেছে নামি।
শুনিল কি ? জানি না ত ! যেতে যেতে গেল চেয়ে'
ফুলে ফুলে উলসিনু সে যাদু কটাক্ষ পেয়ে !
জীবনের পাতে পাতে শীতলতা গেল মেখে,
লভিনু যৌবন চির, আমি সেই দিন থেকে।

তুমি জ্যোতির্ম্ময় রবি

প্রতিদিন উষাকালে তুমি জ্যোতির্ম্ময় রবি।
কারে দিতে উপহার হৃদয়ের প্রেম-ছবি,—
কালাকাল তুচ্ছ করি, যুগযুগান্তর ধরি,
গাহিছ প্রাণ-গীতি, তরুণ অরুণ কবি।

হেথায় কে বোঝে তব প্রাণের গভীর স্নেহ ?
হৃদয়ের অসীম রূপ ধরিতে কি জানে কেহ ?
ফুটাইতে পূর্ণ হাসি আনন্দের জ্যোতি ঢালো ;
সহিতে কে পারে হেথা অত প্রেম অত আলো ?
হাসিতে সুখের হাসি "তাপ স্তাপ" উঠে গান ;
প্রেমের বাসনা যত বিলাপেতে অবসান !
হেথায় আকাঙ্ক্ষা শুধু তৃপ্তি কেহ নাহি চায় ;
চাবে প্রেম ততক্ষণ, যতক্ষণ নাহি পায়।
রূপ হেথা শুধু কথা, চাহে না স্বরূপ রূপ ;
সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু, তারা খুঁজে মরে কূপ !
হেথায় চাহে না ভাব, শুধু তারা চাহে কথা ;
চাহে না হেথায় সুখ, পেতে তারা চাহে ব্যথা !
সত্যের আদর নাই শুধু হেথা চাহে মায়া,
কে হেথায় আলোক চাহে ? তারা শুধু চাহে ছায়া।
এই কি বিশ্বের ধারা সসীমে অসীম লয় ?
তবে কেন অশ্রুজল এ অশ্রু মোছার নয় !

আমার ঘুম ভেঙ্গেছে

আমার ঘুম ভেঙ্গেছে, ওগো ভুল ভেঙ্গেছে
শীতের প্রভাতে আজি বসন্তের পাখী
আঁধার বকুল-শাখে উঠিয়াছে ডাকি ;
কাননের প্রাণ টুটে,
কুয়াসা পড়িছে ছুটে,
আশার উষার রাগে মুখানি রেঙ্গেছে,
আমার ঘুম ভেঙ্গেছে,
এ নহে সে মধুমাস, ভুল ভেঙ্গেছে !
যেতে যেতে বল, পাখি, কোন্ ফুলময় দেশে ?
সুদূর প্রবাসে এই একাকী পড়েছ এসে !

দিশাহারা সাথীহারা,
ডাকিছে আকুল পারা,
সে গানের প্রতিধ্বনি হৃদয়ে জেগেছে,
আমার ঘুম ভেঙ্গেছে,
ওগো ভুল ভেঙ্গেছে।

না, পাখি, গেয়ো না আর অমন আকুল তানে!
দেখ দেখি কে চাহিয়ে তোমার মুখের পানে;
কেন গো উতলা তুমি?
এ হেন প্রবাসভূমি,
তোমারি কানন এ যে, তব আশে বেঁচে প্রাণে।

সে দিনের কথা, হায়! মনে কি পড়ে না তোরে?
গাহিতিস্ শাখে বসি সুখের-স্বপন ঘোরে!
থরে থরে ফুল ফুটে,
চরণে পড়িত লুটে,
হায় রে সে ফুল বটে বহুদিন গেছে ঝ'রে।

তবু ত এ বন সেই যদিও কুসুমহীন,
সবি কাছে গেছে তার শুধু বসন্তেরি দিন।
তাই আজ, পাখি হা রে'
চিনিতে নারিস তারে?
তোরি তরে যে হয়েছে এমন মলিন দীন।

যে দিন হইতে তুই গিয়াছিস্ দেশান্তরে,
সেই দিন হ'তে তার ফুলগুলি গেছে ঝ'রে।
সেই দিন হ'তে তার,
হৃদি মন অন্ধকার,
সেই দিন হ'তে তার হাসিচ্ছটা গেছে ম'রে!

আজ তুই চাহিস্নে, আজ তারে চিনিলিনে,
প্রবাসীর মত এসে আকুল যাবার তরে!

সরলা কাননবালা
কেমনে সহিবে জ্বালা,
সব দুঃখ ভুলে গেছে সে যে রে নেহারি তোরে

বসন্তের নব আশা তাহার শীতের প্রাণে,
জাগিয়া উঠিছে যে রে তোর কুহু কুহু তানে ;
হয়ে সে বসন্ত হয়ে,
সে আনন্দ ম্লান করে,
কেমন চলিয়া যাবি কে নিঠুর তোর হেনে ?
ভাল বেসেছিস্ তুই এক দিন যারে,
এবে ফুলহীন হ'লে
কেমনে যাইবি চ'লে
ভাসাইবি নিরাশায় কেমনে তাহারে !
পাখীটি রে,—
এলি যদি পথ ভুলে, গা রে গা হৃদয় খুলে,
মরমের সাধখানি পূরুক তাহার।
কাননের ফুল্ল হাসি,
করিস্ নে যেন বাসি,
ফুটেছে শীতের প্রাণে বসন্ত-বাহার
ঘুম ভেঙ্গেছে আমার, ভুল ভেঙ্গেছে আমার !

কলিকালে কালো রূপ

সখি, ওলো !
চুপে চুপে বলি শোন,
পাইয়াছি দরশন,
কলিকালে কালো রূপে আলো-করা শ্যাম
নাই বটে পীত ধড়া,
বাঁশী গোপী-মনোচরা ;
শিরে শুধু শোভে পগ্‌গ কটিতটে চাম !

মরি তাহে কি বাহার !
উপমা কি দিব তার,
প্রকৃতির কোন দৃশ্যে সে আনন্দ নাই !
মূরতি দেখিলে দূরে
অমনি হৃদয় পুরে,
কি আবেগে উথলিত কেমনে বুঝাই ?
অধীর চঞ্চল মন,
আসে হেথা কতক্ষণ,
পিয়াসিত উপহার পাব কতক্ষণে ?
হেরি বটে অনিমিখে,
দ্রুত ধায় এই দিকে,
গজেন্দ্রগামিনী তবু আমার নয়নে !
স্বজনি, বল গো বল
আমার এ কেমন হোল !
এক দিন না হেরিলে শান্তি নাহি মনে।
হৃদয় কেমন করে,
নয়নে সলিল ঝরে,
কি মোহ দিয়া সে ফিরে—বলিব কেমনে !
সময়ের খেয়ে মাথা,
বলি আর এক কথা,
বলিস্ নে মাথা খাস্ যেন লো কাহারে.
একা আমি নই ; বোন্,
আরো হেন কত জন,
তার পথ পানে চেয়ে হা হা ক'রে মরে !
কি শুধাস্ ওগো সখি ?
নাম ধাম বলিব কি ?
কিছু আর নাহি জানে অবোধ এ রাধা !
প্রিয় হস্তাক্ষর দেখি
মজিয়াছে শুধু আঁখি !
পেয়াদা সে, এই জানি, ডাকের পেয়াদা !

———

আশীর্ব্বাদ

বাছা

যতনে সোহাগে হৃদিমাঝে
সুখে ত রেখেছ চিরদিন
দুঃখ সে যে নিরাশ্রয় অতি,
আতুর মলিন দীন-হীন!
কেহ তারে চাহে না যে, বাছা,
দিও তারে একটুকু স্থান;
উজল সুখের মাঝে মাঝে
হেরি যেন মলিন বয়ান।
হাসি ত, রয়েছে সারাদিন,
যেন বাছা তার সাথে সাথে—
মিলন-সুখের অশ্রুজল
নেহারিও নয়নের পাতে।
মধু তোর প্রফুল্ল মুখানি!
সুমধুর আরো অশ্রুজল;
খর সুখ স্নিগ্ধ অতি ভায়
অশ্রু-ধোওয়া বিষাদ-কোমল।
সুখ সে যে শুধু সুখটুকু,
তাহা ছাড়া নহে কিছু আর;
দুঃখ বটে দুখের পরশ,
তবু সে রতন-মণি-সার।
সে গরল পান করি উঠে
পরাণ সুধায় যায় ভ'রে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জেগে ওঠে
ক্ষুদ্র এই নয়নের পরে।
সুখ শুধু মানুষের ধন,
দুঃখ করে দেব নিরমাণ;
তবু ত চাহে না কেহ তারে,
দিও বাছা, একটুকু স্থান!

(২)

বাছা,

ও ঠোঁটের পুণ্য হাসি যেন চির ফুটে,
ও মুখের সরলতা যেন নাহি টুটে ;
ও প্রাণের পবিত্রতা শুভ্র নিরমল,
করে যেন ব্যথিতের হৃদয় উজল ।
অশ্রু-জল বহে যদি বহে যেন তবে,
সান্ত্বনা দিবার তরে দীন-হীন সবে ।
প্রাণের বাসনা এই শুধু কথা নয়,
মঙ্গল আশিস্ ইহা শুভ আলোময় ।
ভুলে যদি যেতে চাও ভুলো কথাগুলি,
ভোল যদি কে বলেছে তাও যেয়ো ভুলি ;
এ আলোক শুধু যেন আঁখি-পথে থাকে,
পাপ তাপ হ'তে তোমা দূরে দূরে রাখে !

বাছা,

শুধু এই হাসি-খুসি, শুধু ধুলা-খেলা,
কাটি দিবে জীবনের সুদীর্ঘ এ বেলা ?
শুধু এই হাহাকার, শুধু অশ্রু ব্যথা,
হৃদয়ের আঁখি-পাতে রহিবে কি গাঁথা ?
কিছুই কি নাহি আর প্রাণ যাহা যাচে ?
থাকুক তাহাই তব পরাণের কাছে ।

———

মধ্যাহ্ন-সঙ্গীত

মধ্যাহ্ন

নিস্তব্ধ নিঝুম দিক, শ্রান্তিভরে অনিমিখ,
বসন্তের দ্বিপ্রহর বেলা,
রবির অনল-কর, শীতলিতে কলেবর,
সরোবরে করিতেছে খেলা।
বায়ু বহে শন শন, বিকম্পিত উপবন,
ঘুঘু ডাকে সকরুণ ডাক ;
মাঝে মাঝে থেকে থেকে, কোথা হ'তে ওঠে ডেকে,
কঠোর গম্ভীরস্বরে কাক।
নীল নীলিমার গায়, শাদা মেঘ ভেসে যায়,
চিল উড়ে পাতার সমান ;
চাতক সে ক্ষুদ্র পাখী, সকরুণ কণ্ঠে ডাকি,
মেঘে চায় ডুবাইতে প্রাণ।
মুকুলিত আম্রশাখে, পল্লবিত তরু থাকে,
কুহু কুহু কোকিল কুহরে ;
হিল্লোলিত সরো-কায়া, ঘুমায় গাছের ছায়া,
গাভী নামি জলপান করে।
এলোচুলে মেয়েগুলি, কলস কোমরে তুলি,
স্নান করি গৃহে ফিরে যায়।
একটি রাখাল ছেলে, দূর মাঠে গরু ফেলে,
কুঞ্জবনে বাঁশরী বাজায় !

————

সুন্দরী

তুমি গো সুন্দরি, প্রাতে জীবনের তব
আছিলে একটি কলি গোলাপের নব!
প্রণয়ী সূর্য্যের করে,
সে মুকুল সারা ডরে,
খুলিতে কুমারী-হৃদি সাহস না পায়,
অধীর কোমল লাজে,
সবুজ পাতার মাঝে,
রাঙ্গা মুখখানি যথা লুকাইতে চায়।
অথবা মরতে বুঝি নাহি সে তুলনা,
স্বরগ উষাটি তুমি আছিলে ললনা!
প্রভাত পরশে যথা,
প্রতি ফুল পাতা লতা,
হাসিয়া জাগিয়া উঠে ঝাড়ি অশ্রুজল,
তোমার রূপের জ্যোতি,
বিমল প্রশান্ত অতি,
তপ্ত মরু স্পর্শ পেয়ে স্নিগ্ধ সুশীতল।
সে দিন গিয়াছে, তবু দ্রুতগামী কাল
হরিতে পারেনি তব সুধারূপ-জাল।
অতুল অফুট সেই সৌন্দর্য্য লাজের,
সহিতে নারিতে যাহা আঁখি অপরের?
কাল শুধু পূর্ণতম মোহিনী প্রভায়
ফুটায়ে তুলেছে তাহা যৌবন-শোভায়!
ফুটন্ত কুসুম যথা পাতার মাঝারে
আকুল আবেশে ভরা সৌরভের ভারে!
দিবাকর দ্বিপ্রহরে যথা পূর্ণ শোভা ধরে,
তেমনি কোমল তব আধ-ফুট রূপ নব,
বিকসিত অপরূপ প্রদীপ্ত আকারে।

———

বঙ্গের বিধবা

কে তুমি ধরায়, সতি,
পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী,
শুভ্র সুবিমল যেন প্রভাতের ফুল ?
নাহি সাজসজ্জা কোন,
মণি রত্ন আভরণ.
আপন রূপেতে তবু আপনি অতুল ।
সংসার কঠোর ঘোর,
ভেঙ্গেছে আশ্রয় তোর,
ছিন্ন বৃন্তে বিকসিত সৌন্দর্য্য-তরুণা,
ম্লান ধরাতলে বাস,
অধরে অটুট হাস,
হৃদয়ে লুকান অশ্রু, নয়নে করুণা ।
আপনার নাই কেহ,
বিশ্ব তাই নিজ গেহ,
পরকে আনন্দদানে তোমার মহিমা,
যে যায় দলিত ক'রে
তব বাস তারো তরে
বঙ্গের বিধবা তুমি স্বর্গের গরিমা !

স্রোত

স্রোত হাসে খেলে, মধুর বহে যায় ;
আপনা ভাবে ভোর কারে না ফিরে চায় ।
কে দেখে মুগ্ধ আঁখে, কে কাঁদে ব'সে তীরে ?
কে তারে ভালবেসে পরাণ সঁপে নীরে !
সে কি তা দেখে চেয়ে জানিতে সে কি পায় !
সে শুধু হেসে খেলে আপনি বহে যায় !
সে-জানে সংসারে সে শুধু নিজে আছে,
সাধের ঢেউগুলি রয়েছে হিয়া কাছে ।

উছলে যৌবন সমীরে দিবানিশি,
ঢালিছে সুখচ্ছটা তারকা রবি শশী।
প্রমোদে উথলিত স্বপনে ঢল ঢল,
সে কি গো দেখে চেয়ে দুঃখের আঁখি-জল!
কে তার পায়ে ঝাঁপে কে মরে উপেখায়,
জানিতে পারে সে কি শুধু ভাসিয়ে নিয়ে যায়!
পাষাণ উপকূলে আছাড়ি ফেলে শেষে,
সে বায় সে যায় শুধু, স্রোত সে বহে হেসে!

তরু ও লতার বিলাপ

লতা বলে—

তুমি তরু, ক্ষুদ্র আমি লতা,
ভালবাসি নাহিক ক্ষমতা।
যত বাসি আরো বাসিবার
হৃদে উঠে বাসনা অপার,
কিছুই ত পূরে না তাহার
থাকি যায় শুধু আকুলতা!

তরু বলে—

প্রেয়সী আমার!
ভালবেসে নাশিছ জীবন।
পূরে না তবুও আকুলতা,
না জানি সে বাসনা কেমন।
সোহাগের বন্ধনের ফেরে
তনু অবসন্ন জরজর,
বিহ্বল প্রেমের সুধা-ঘোরে
জ্ঞানহীন আছি মর মর।
এক দিন ছিনু বটে তরু,
এখন যে কাঠ মাত্র সার;
ক্ষুদ্রলতা আজি সে বিশাল,
পদতলে প'ড়ে আছি তার!

কোমলতা ভেঙ্গেছে পাষাণ,
লতাতেই পড়িয়াছি ঢাকি,
পূরিল না বাসনা এখনো,
মরিতে যে আছি শুধু বাকি!

কেউ চাহে না আপন পানে

কি রকম-এ দাপী তোমার?
সদাই চাই ক্ষমা ক্ষমা,
একবার হিসাব খুলে দেখ দেখি
কতটা রেখেছ জমা!
বাকি কিছু রাখ না ত'
পেলে পরের খুটিনাটি!
তখন, পদদাপে আঁৎকে উঠে
ঘরের মধ্যে পাষাণ মাটী।
তারা বুঝি গরিব দুঃখী,
কর্ম্মের ফল তাদের বেলা!
নবাবের আর কে দেয় জবাব,
আপনি কর লীলা-খেলা।
সবাই পাপী সবাই তাপী,
অপরাধী বিশ্বজোড়া;
তুমিই কেবল মাঝখানেতে
দাঁড়িয়ে আছ ফুলের তোড়া!
তোমার দোষ কি দোষের বাচ্য?
বক্ষ ফাটে রাগে ভারি;
অযতনে রতন মলিন,
দোষটা সে ত জগতেরি!
এ কি হায় রে ধরার ধারা!
কেউ চাহে না আপন পানে,
সবাই কেবল ভ্রূ বাঁকায়ে
পরের প্রতি দৃষ্টি হানে!

সিন্ধুর বিলাপ

নাহি দিবা নাহি সিন্ধু, যাম,
অবিশ্রান্ত কেন অবিরাম
গাহিতেছ বিষাদের গান ?
বিঁধাইয়া পরাণে পরাণে
শ্রোতাদের পশে যে গো কানে
একই ঐ বিলাপের তান !
কি বাসনা বল মনে মনে
জাগিতেছে গোপনে গোপনে ?
কিবা সে এমন উচ্চ আশা
পূরাইতে হয়েছে পিপাসা ?
যার তরে শ্রান্তি-বিন্দু নাই,
ঝটিকার বিপ্লব সদাই,
বেগে তোড়ে করে আলোড়ন
তোমার মহান্ হৃদি মন ?
কিসের অভাব সিন্ধু তব ?
পৃথিবীর ধন রত্ন যত—
সকলি ত উরসে তোমার।
কটাক্ষেতে চরাচরগ্রাসী,
কত রাজ্য সাম্রাজ্য বিনাশি
আপনি করিছ অধিকার !
জলধি গো তোমার প্রতাপে
চারিদিক ভয়ে সদা কাঁপে,
নাহি সীমা তব ক্ষমতার।
অনন্ত ক্ষমতাশালী তুমি
ইচ্ছায় লভিতে পার ভব,
কেন তবে কাঁদ দিবানিশি,
কি আশা সে পোরে নাই তব ?
ঐ উচ্চ পাহাড়ের গায়
উছলিয়া রজত-কণায়,

ঝরণার ক্ষুদ্র এক রাণী
হাসি হাসি খেলিয়া বেড়ায়।
ভাল কি বাসিয়া তবে ওরে
হারায়েছ সুমহান্ মন ?
ক্ষুদ্র এক হৃদয়ের কাছে
সকলি দিয়েছ বিসর্জ্জন ?
তোমার মহিমা-গৌরব,
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সীমাহীন,
একটি বালার পদতলে
সকলি কি হয়েছে বিলীন ?
একটি সে অণুতম হৃদি,
তুমি কত উচ্চ সুমহান্,
তুমি সে চরণে আজীবন
অশ্রুর তরঙ্গ করি দান,
তবুও সে হৃদয় দেবীর
পাওনি কি, পাওনি কি মন ?
তাই কি গো দিন-রাত ধ'রে
সদা হেন বিষাদ-ক্রন্দন ?
কিংবা গো বিফল হয়ে প্রেমে
নাহি কোন পেয়ে প্রতিদান,
আপন গৌরবে তোমার
দারুণ বেজেছে অপমান ?
তাই বুঝি হৃদয়ের সনে
মত্ত আছ সদা ঘোর রণে,
বশেতে আনিতে চাও বুঝি
বিদ্রোহী সে অবাধ্য পরাণ ?
তাহাও ত নহে গো, জলধি,
কে না বল ভালবাসে তোরে ?
দেখিলে ও সৌন্দর্য্য গভীর
কার হৃদি প্রণয়ে না পোরে ?

অবিশ্রান্ত দিন রাত ধ'রে
বড় ব্যগ্র বিয়াকুলমনা,
সঁপিতে ত ঐ পদে প্রাণ
চলিয়াছে ছুটিয়া ঝরণা।

অতুল ও রূপের তোমার
কি আছে যে ক্ষমতা মোহন,
দেখিলে একটিবার যে গো
অমনি মোহিত ত্রিভুবন।

যে মুহূর্ত্তে প্রাণ নিয়ে যায়
জলধি করিতে থাক খেলা,
তখনো যে মুগ্ধ আঁখে তোরে
নেহারে সে মরিবারো বেলা!
কিছুরি অভাব নাহি তব,
ইচ্ছাতেই পূরে যে কামনা;
তবে কেন কাঁদ দিন-রাত
শুধাই গো তোমারে, বল না?
কত হতভাগ্য নর-নারী

হৃদে পুষি দারুণ হুতাশ,
কাটাইছে দিবস-যামিনী
নাহি তার বাহিরে প্রকাশ;
প্রলয়-ঝটিকা ধরি মনে
নাহি ফেলে একটি নিশ্বাস,
আঁধার মরম অতি ঘোর
অধরেতে হাসির বিকাশ।

তব সম কত অশ্রুসিন্ধু,
লুকায়ে রয়েছে ধরি বুকে;
এক ফোঁটা জল তার তবু
উথলে না নয়নে সে দুখে।
জলধি গো—

দুঃখ নেই জ্বালা নেই ভবে
কেন কাঁদ সারা দিন ধ'রে ?
কিছুরি অভাব নাহি তব,
কেন কাঁদ কাঁদিবারি তরে ?

———

কি দোষ তোমার

(অর্জ্জুনের প্রতি জলকুমারী উলূপী)

কি দোষ তোমার !
দোষ যদি কারো থাকে দোষ বিধাতার !
দেবতা কজন হেথা ফুল শত শত !
যদি কোন পুণ্যফলে কোন সুপ্রভাতে
ঊষার আলোক শুভ্র শুভ্রতর করি—
কোন সৌম্য দেবমূর্ত্তি প্রকাশে নয়নে,
থাকিতে পারে কি তারা ? থাকিবে কেমনে !
মুক্ত করি দিয়া রুদ্ধ চির-জীবনের
আবেগিত তরঙ্গিত ক্ষুব্ধ আলোড়িত
মানস-পূজার তপ্ত আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বাস,—
নিমেষেতে শত ফুল পায়ে এসে পড়ে ;
তুমি কি করিবে, দেব, কি দোষ তোমার !
চরণ সরায়ে নিয়ে তুলিতে একটি
প্রফুল্ল পাপড়ি শত মুহূর্ত্তে দলিত
ভালবেসে লও যারে হৃদয়ে তুলিয়া
সরমে মরম ঢাকি সভয়ে সঙ্কোচে—
সেও চাহে খসিবারে শতধা হইয়া,
প্রতিক্ষণে অনুভবি হীনতা আপন।
এইরূপ ভাগ্য নিয়ে জনমেছে যারা,
তুমি কি করিবে দেব করুণা করিয়া !
চরণ সামগ্রী তারা হৃদয়ের নহে,
চরণে লভিতে চাহে দুর্লভ মরণ।

সহস্র সোহাগময় আদর যতন
বাঁধিয়া রাখিতে নারে হৃদয়ের পরে।
এই যদি, এই হবে, এই হোক তবে,
বিফল জীবন চেষ্টা করো না ওদের,
দাও মৃত্যু, দাও পুণ্য, যাও দলে যাও,
মরিয়া যাদের সুখ মরুক তাহারা।
তুমি কি করিবে দেব, কি দোষ তোমার!

———

থাক' ভোর

(গোবিন্দলালের প্রতি ভ্রমর)

তুমি রূপসী বালা নিয়ে, বিলাসে থাক ভোর,
তোমার তরে মোর ঝরুক আঁখি-লোর।
তুমি তাহার কানে ঢাল মধুর প্রেম-ভাষ!
হেথা বিরহে আমি ফেলি আকুল দুখ-শ্বাস।
তুমি বিহ্বলে থাক ভুলে, শোন হে মধু গান,
তোমায় স্মরি আমি হুতাশে ধরি প্রাণ।
তুমি দিবস যামী স্বপনে থাক লীন,
জীবন যাপি আমি গণিয়ে পল দিন!
ডেকো না কাছে শুধু একটু দূরে থাকি
ছুঁয়ো না, সখা, শুধু উহাই রাখ বাকী
আমি ত সেই আমি তেমনি আছি তব,
শুধু সে প্রেমাদর স্বামি গো, নাহি স'ব।
পরিপূর্ণ বিশ্বাসের করেছ অপমান,
তোমার সেই আমি, শুধু দেহের ব্যবধান!
এ হৃদি ভাঙ্গাচোরা, তবুও তোমা রত,
শুধু সে মিলনের হয়েছে দিন গত।
সুখেতে শুধু নাহি, দুঃখেতে সেই আমি,
জীবনে নহি আর, মরণে অনুগামী!

———

"চুপ চুপ"

(কচের প্রতি দেবযানী)

বজ্র হ'তে রুদ্র স্বরে হইল ধ্বনিত—
"চুপ চুপ", স্তম্ভিত মুখের বাণী !
হৃদয়ের কথা হায় ! কহিবারে গিয়া
তরাসে কম্পিত দেহ নীরব রসনা ;
দেবতার অভিশাপ, প্রভুর আদেশ ।
তাই হোক্, কিন্তু দেব অন্তর-নিভৃতে
গিরি-গর্ভে জ্বালামুখীসম উদ্গিরিয়া
প্রচণ্ড অনল, চলিছে যে আলোড়ন
তরঙ্গিয়া ইথরের অণু পরমাণু—
তার কি করিলে ? নীরব সে মহাভাষা
শুনিছ না তুমি ? কি করিব, নিবারিতে
নাহিক ক্ষমতা, সদাই সশঙ্ক-চিত
তব আজ্ঞা লঙ্ঘি পাছে, ইচ্ছা আটকিয়া
বধি তারে, পারি না তা, অনন্ত প্রবাহে
উথলিছে শতোচ্ছ্বাসে ভীষণ তরঙ্গে ।—
প্রভু হে, নীরব যদি করিলে রসনা,
এক ভিক্ষা মাগি, নাথ, পূর্ণ কর তাহা—
দাও বর, অভিশাপ দাও, আজ্ঞা দাও,
এ হৃদয় রসনাও স্তব্ধ হয়ে যাক,
প্রকাণ্ড ভাষার রাজ্য নিস্তব্ধ হউক,
সৃষ্টির পূর্ব্বের শান্তি ব্যাপুক ধরণী ।

বলি শোন খুলে

হেদে বিন্দে, বলি শোন খুলে
ননদী বলেছে আর আসিতে দেবে না কুলে ।
গৃহেতে রাখিবে বন্ধ,
নয়ন করিবে অন্ধ,

কালোরূপ-নিধি আর দেখিতে পাব না মূলে।
হৃদি হ'তে প্রেমলতা শুকায়ে ফেলিবে তুলে!
স্বজনি লো, মিছে কহিছি না,
কাঁদিব কি— কথা শুনে হাসিয়ে বাঁচি না!
বিশ্বে যা আনন্দ পুণ্য,
যাহা বিনা সব শূন্য,
যে নারী সে প্রেমমর্ম্ম না জানে, সে অতি দীনা!

আহা মরি কি বুদ্ধি ধারালো!
দেহই বাঁধিল যেন, কেমনে বাঁধিবে মন, হ্যাঁ লো,
হৃদয়ে হৃদয়ে আঁকা,
যে মধু মূরতি বাঁকা,
প্রাণের পরাণে পূর্ণ যে অরূপ রূপ কালো;
আহা মরি বড় ফন্দী!
শরীর করিয়ে বন্দী।
হরিবে সে জীবন-জীবন্ত প্রেম আলো।

ভাল সই ভাল খুব ভালো!
জানে না কি এই দীনা রাধা,
ভুবন-ঈপ্সিত রূপ শ্যামেরি হৃদয় আধা?

মুদিলেও এ নয়ান,
জ্বলে আঁখে সে বয়ান,
সে মূর্ত্তি দর্শনে তবে কেমনে কে দিবে বাধা?

হিংসুকে সখি রে হায়!
এ প্রেম ঘুচাতে চায়;
দু মুটো বালুকা দিয়ে এ বুঝি সমুদ্র বাঁধা!
কাঁদিব কি হাসি তাই, বিষাদ বিস্ময় বাঁধা।

— —

অপরাহ্ণে

এ কি অপরূপ ঘটা!
পূরবে চাঁদের আলো পশ্চিমে অরুণচ্ছটা;
রঙের তুফান ওঠে,
পদ্মা, কুলু কুলু ছোটে,
বিকালে উষার লালে রঞ্জিত বটের জটা।
দূর-দূরান্তর পুরে,
কোকিল পাপিয়া ঝুরে,
এ ভাঙ্গন ধরা, হায়, বিজন তটিনী-তীরে—
পশে কি না পশে কানে,
স্বপনের মত প্রাণে,
জাগায়ে অতৃপ্তি ব্যথা শূন্যে তা মিলায় ফিরে
হেথা শুধু সাথে থাকি
ডাকে কে অচেনা পাখী
ঘড়ির কাঁটার তানে মুহুর্মুহু টুক্ টুক্;
বাবলার ফুল আর,
শূন্যে ঢালে উপহার,
কি জানি তাহার প্রাণে ইথে কতখানি সুখ।
আচম্বিতে দুরদাড়
খসে খসে পড়ে পড়ে,
নিস্তব্ধ প্রান্তরে তার জেগে ওঠে প্রতিধ্বনি
অর্দ্ধমূল মাটীহীন,
জটাজুট জলে লীন,
বৃদ্ধ বট প্রতিক্ষণে কাঁপে আয়ু ক্ষীণ গণি
ফেলে শ্বাস মাঝে মাঝে,
যেন কি বেদনা বাজে,
যেন মনে ওঠে জেগে পুরাণ স্মৃতির ভার;
কত লুপ্ত ইতিহাস
তার হৃদে স্বপ্রকাশ,
কত সুখ দুঃখ খেলা অভিনীত তলে তার।

আজি হায় কেহ ভুলে
আসে না এ তরুমূলে ?
সঁপিয়ে গিয়াছে এরে একেলা মৃত্যুর কাছে।
পরিত্যক্ত তরুবর,
ক্ষীণ ভগ্ন কলেবর,
পুরাণ সে স্মৃতি ধরি বুঝি বা বাঁচিয়ে আছে ?

* * * *

নিখিল রবির জ্যোতি,
চন্দ্রমা উজ্জ্বল অতি,
স্তম্ভিত নয়নকোণে, দুই ফোঁটা অশ্রুধার ;
সহসা বিস্ময় ত্রাসে,
চমকি চাহিনু পাশে,
আকুল নিশ্বাস যেন পশিল শ্রবণে কার !
এ কি রে কাহার ছবি ?
এলোকেশী কে মানবী ?
বিষণ্ণ গম্ভীর মূর্ত্তি ছল ছল দুনয়ান।
প্রাণের স্বপন যত
বুঝি এইখানে হত,
তরু কি গাহিতেছিল ইহারি বিলাপ গান !
স্পন্দহীন অনিমেষ,
দেখিতেছি সেই দেশ,
সহসা চাহিল নারী এইদিক্ পানে ফিরে ;
দেখিয়া অচেনা আঁখি
ক্ষণেক চমকি থাকি
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি চলি গেল উঠি ধীরে !
কি যেন কি মনে ক'রে,
ডাকিনু কাতর স্বরে,
কে তুমি সলিল ? তব কি যন্ত্রণা দুঃখ ?

গেল চ'লে শুনিল না,
একবার চাহিল না,
বুঝি ভুল করিয়াছি লাজেতে কাঁপিল বুক ;
পাখীটি মাথার পরে শুধু করে টুক্ টুক্ !

———

কেমনে ভুলি

সে ভুলেছে, আমি কেমনে ভুলি !
নূতন বসন্তে নূতন হাওয়া,
মধুর নয়নে মধুর চাওয়া,
ফুল তুলে চুলে পরাইয়ে দেওয়া,
থাকিয়া থাকিয়া পাপিয়া বুলি,—
হায় ! সে ভুলেছে ব'লে কেমনে ভুলি !
গাছের তলায় খেলার ভাণ,
প্রাণের মাঝারে প্রেমের টান,
কথায় কথায় মান অভিমান,
ভালবাসে কি না এই আকুলি,—
হায় ! সে ভুলেছে তাই কেমনে ভুলি !
ধীরে ধীরে বলা মনের কথা,
নয়নের নীরে প্রেম-আকুলতা,
পুরাতন ছলে নূতন ব্যথা—
আবেগে দেখান হৃদয় খুলি,—
হায় ! সে ভুলেছে ব'লে কেমনে ভুলি !
স্বপনেতে যেন আত্ম-বিনিময়,
সুখের সাগরে মগন হৃদয়,
মুহূর্ত্তের মাঝে অনন্ত বিলয়,
স্বর্গে পরিণত মরত-ধূলি !
ওগো ! সে কি ভোলা যায় কেমনে ভুলি !

———

অলি ও ফুল

অলি।—সখি, সকালে ফুটেছিলে, বিকালে মর মর,
হায়! সে নব রূপরাশি মলিন ঝর ঝর;
নাহি সে মধু হাসি, নাহি সে পরিমল,
হেরিয়ে মুখ পানে নয়নে আসে জল।

ফুল।—কিসের দুঃখ, সখা! না হয় গেছে রূপ,
না হয় লুটিব ভূমে শুষ্ক দলস্তূপ!
আমার ছিল যাহা, সুগন্ধ রূপবিভা,
সব ত দিয়ে গেছি, ঝরিব ক্ষতি কিবা!

অলি।—ক্ষতি কি জানি না ত হৃদয় কাঁদি কহে—
অমন রূপরাশি কেন না চির রহে।
ফুটিতে না ফুটিতে অমনি ম্লান মুখ,
তিয়াস সার শুধু, সুখ সে কতটুক্?

ফুল।—'সুখ সে কতটুক্!' তা নহে ভুল তোর,
দুখ যা দিয়ে যাই, সুখই সব মোর।
ফুটিয়ে থাকিতাম যদি গো চিরস্থির,
দিতে কি উপহার করুণ আঁখি-নীর?
আদর করিতে কি এমন প্রাণভরে?
যদি এ রূপ নব থাকিত চিরতরে?
বাসনা তৃষা ইথে তোদের জাগে প্রাণে,
মোরা ফুটিয়ে ঝরে যাই, সুখের মাঝখানে।

অলি।—তা যদি সেই ভাল! আমরা কেঁদে মরি,
তোমরা চিরদিন আদরে যার ঝরি!

———

নীরব বীণা

আমি নীরব বীণা, অতি দীনা,
ভাঙ্গা হৃদয়খানি,
আমার ছেঁড়া তার, নাহি আর মধুর বাণী!
প্রাণের কথা যত, আগে গেয়েছি ত সকলি,
মনে নাই যার, এখন তারে আর কি বলি?
গাঁন গাহে যারা, গাক তারা;
জানাক্ ব্যথা।
আমার নাহি ভাষা, নাহি আশা,
শুধু আকুলতা।
সবাই বোঝে হেথা, বলা কথা,
কে বোঝে নীরব প্রাণে?
কেহ কি বুঝিবে না—একো জনা?
কে জানে!

———

নহে অবিশ্বাস

সখা গো, এ নহে অবিশ্বাস;
অপূর্ণ মনের ইহা অতৃপ্ত উচ্ছ্বাস।
তাই অশ্রু অভিমান,
তাই এ বেদনা গান,
তাই এই বুক-ফাটা দুরন্ত নিশ্বাস।
সখা গো, এ নহে অবিশ্বাস!
তব পুণ্য প্রেমে যদি করিব সংশয়,
কোথায় নির্ভর কোথা এ নিখিলময়?
ঈশ্বরের অনুরূপ সত্য সুমহান্
তোমার ও সুনীরব আত্ম-প্রেম দান।
তৃপ্ত আছ ভালবেসে,
যা পাইছ লও হেসে,
আকাঙ্ক্ষা, অভাব কিবা নাহি কোন জ্ঞান!

আত্মা মোর অনুভবে ও প্রেম-মহিমা,
জ্ঞানেতে বুঝিতে পারি নাহি তার সীমা ;
তবুও যে মাঝে মাঝে এই হা-হুতাশ,
হৃদয় বাহিরে চাহে হৃদয় প্রকাশ।

মনে রেখো অসম্পূর্ণ মানব-প্রকৃতি,
অপূর্ণ প্রেমেতে তার এইরূপ রীতি !
তাই সাধ দেখিবার
অভাবের অশ্রুধার,
একই কথা শুধাইতে তাই চায় নিতি।

তোমার প্রাণেতে ইথে যদি লাগে ব্যথা,
আর, সখা, তুলিব না হৃদয়ের কথা ;
আর শুধাব না, সখা, ভালবাস কি না,
আজ হ'তে আঁখি মোর হবে অশ্রুহীনা।

কি কথা কহিব তবে কি গাহিব গান ?
প্রেমেরি বাসনা পূর্ণ হায় যে এ প্রাণ !
হোক সে বাসনা রুদ্ধ,
চলুক মরণ-যুদ্ধ
নীরব অশ্রুতে হোক সে তাপ নির্ব্বাণ !

আমার সে ফুল দুটি

সারাদিন পথ চেয়ে থাকি !
ধীরে ধীরে রবি উঠে, অন্ধকার পড়ে টুটে,
ফুলগুলি মেলে হাসি আঁখি,
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি !
আমার সে ফুল দুটি কখন উঠিবে ফুটি,
উষার বরণ রাঙ্গা মাখি ?
সারাদিন এই আশে থাকি !

হোল বেলা চ'লে গেল,
ধীরে অই সন্ধ্যা এল,
আলোক আঁধারে বাঁধি বিবাহ-বাঁধনে ;

আধেক আঁধার ভাসে,
আধেক আলোক হাসে,
সব একময় শেষে মিশিয়া দু প্রাণে !

সবে প্রভাতের বেলা,
ফুটেছে যে ফুলবালা,
নবীনবরণমাখা কিশলয় সাজে,
তাদের ফুরালো খেলা,
সমাপন করি পালা,
সমাপন করি পালা,
ঝরে ঝরে পড়ে সবে দু'দণ্ডেরি মাঝে !

নাই সে মোহিনী সাজ, প্রফুল্ল বয়ান
বেশ-ভূষা সব বাসি,
নাট্যশালা হ'তে সবে করিছে প্রয়াণ ;
আর এক পথ দিয়ে,
নূতন সৌন্দর্য নিয়ে,
ফুটি তারার ফুল ঝলসি নয়ান !

এক আসে এক যায়,
না ফুরাতে হায় হায়,
সে 'হায়ে' নূতন হাসি অমনি ফেলে রে ঢাকি !

যে যায় সে শুধু যায়, যেমন তেমনি হায়,
জগতের সব বুঝি ফাঁকি !
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি !

আসে রাত সন্ধ্যা যায়, প্রাণ করে হায় হায়,
কোথায় সে হৃদয়ের আঁখি ?

আমাতে যে আমি হারা, কখন আসিবে তারা,
আকুল নয়নে চেয়ে দেখি ;
কিছু তারা বলে না ত',
বাতাসটুকুর মত
কি জানি কখন্ আসে, শুধু চেয়ে থাকি !
আসে তারা অতি ধীরে.
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় ফিরে,
শত ফুল সে পরশে হৃদয়ে ফুটিতে চায় ;
না খুলিতে দলগুলি,
না চাহিতে মুখ তুলি,
হাসিমাখা সে সমীর পলকে মিশায়ে যায় !
ফুটো ফুটো দলগুলি,
বিষাদের তান তুলি,
একে একে পড়ে নুয়ে মরমে মরম ঢাকি,
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি ।
ধীরে ধীরে রবি উঠে, অন্ধকার যায় টুটে,
ফুলগুলি মেলে হাসি আঁখি ;
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি !
আমার সে ফুল দুটি, কখন্ উঠিবে ফুটি,
উষার বরণ রাঙ্গা মাখি,
সারাদিন পথ চেয়ে থাকি !

———

এই ত দেখিনু

এই তো দেখিনু একটি বোঁটায়
দুইটি কুসুম প্রণয়ভরে
আপনার মনে হাসিছে খেলিছে
মিশায়ে হৃদয় হৃদয় 'পরে ;

একটি শোণিত-লহরী উচ্ছ্বাস
বহিছে দুইটি হৃদয় দিয়া,
একটি নিশ্বাস বায়ুতে কাঁপিয়া
উঠিছে পড়িছে দুইটি হিয়া।
কোথায় সে ভাব সে প্রেমের লীলা!
কেহ যেন আর কারে না জানে;
আজন্ম কালের প্রেমের বন্ধন
মুহূর্ত্তে এমনি বিলীন প্রাণে!
হা রে দুষ্ট বায়ু! তুই মাঝে এসে
কেন ফিরাইলি দুইটি মুখ?
সে মুহূর্ত্তে আর আসিবে না ফিরে,
ঝ'রে যাবে দল, ভাঙ্গিবে বুক।

———

সন্ধ্যা-সঙ্গীত

সন্ধ্যা

সুনীরব সন্ধ্যাকালে পূরব গগনভালে,
জ্বল-জ্বল তারা দুটি চাহে হেসে হেসে ;
বায়ু বহে মৃদু-মন্দ, মধুর চাঁপার গন্ধ,
পাতায় বিতান হ'তে আসে ভেসে ভেসে।

নিভৃত নিকুঞ্জ-বাটী, ব'সে আছি একেলাটি,
নয়নে আঁধার জাগে স্নিগ্ধ অভিরাম,
নভঃপটে ছায়া ছায়া, স্পন্দহীন তরুকায়া,
ধেয়ায় একাগ্রচিত্তে কি রহস্য নাম।

বকুল-শাখাটি নুয়ে, দুলে দুলে মাথা ছুঁয়ে,
দু একটি ফেলে কোলে ফুল টুপ টাপ ;
প্রশান্ত সরসীতলে, ঘনাইছে ছায়াদলে,
গভীর প্রাণেতে তার কি যেন বিলাপ।

মালতীর লতা গাছে ফুলে ফুলে ভরিয়াছে,
আঁধারে স্বপের আলো চমকে নয়ান ;
সুদূরে মন্দিরমাঝে, পূরবী রাগিণী বাজে,
তুলিয়া প্রাণের প্রাণে অনন্তের তান !

শিশু হরি

গিয়েছে বেলা ব'য়ে, এসেছে সন্ধ্যা হয়ে,
শ্রীহরি মা মা করি ছুটিয়ে আসে ;
দেখে মা নাহি ঘরে, খুঁজিয়া গৃহে ফিরে,
আকুল আঁখি-নীরে পরাণ ভাসে।

মেঘেতে ভাসে চাঁদ, জ্যোৎস্নার নাহি বাঁধ,
তারকা ফুটে ওঠে, গগনময় ;
এই ত চাঁদা মামা, কোথায় মা গো আমা,
কে দিবে টিপ ভালে এই সময় ?

আকাশে আঁখি তুলে, শ্রীহরি ফুলে ফুলে,
কেবলি কাঁদে আর কাতরে ডাকে।
মা আসি হেনকালে, মু'খানি চুমি বলে,
ভেবে যে সারা হই দেবীর পাকে।

কাঁদিয়ে গলা ধরি, হাসিয়ে বলে হরি,
মা গো মা সারাদিন কোথায় ছিলি ?
এনেছি দেখ ফুল, পরিয়ে দেব দুল,
যাব না কোথা আর তোরে মা ফেলি।

বাল্যসখী

এই ত সুরম্য নন্দন-কাননে
কত যে করেছি খেলা,
দেখিতে দেখিতে জানিনে কেমনে,
কাটিয়া গিয়াছে বেলা।

তরু মূলে মূলে ফুল তুলে তুলে
কহেছি লুকানো কথা,
সুখেতে হেসেছি, কেঁদেছিও সুখে,
দু'জনে পেয়েছি ব্যথা।

উড়াইয়া অলি, তুলি বেল-কলি,
তুলিয়ে কত কি ফুল,
কুসুমের সাজে সাজাইতে তোরে
গেঁথেছি মালিকা দুল।

আহা লো কতই হরষিত হৃদে
কতই আমোদে মেতে,
লতিকার বিয়ে দিয়েছি যতনে
অশোক তমাল সাথে।

সরসীর কূলে ব'সে দু'জনায়,
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা,
পাপড়ি ভাসায়ে দেখিতাম সুখে
কেমন করিত খেলা।

মলয়-সমীর ফুল ছুঁয়ে তোর
দোলাত কানের দুল,
মৃদুল মৃদুল ও মুখ চুমিয়া
দুলিত অলক-চুল!

মরি কি মধুর সাজিতে তখন
কমল-বদনখানি!
উজলিয়া রূপে কুসুম-কানন
শোভিতিস্ বনরাণী!

আবার যখন সাঁজের গগনে
পরিয়া তারকামালা,
দেখা দিত বিধু ছড়াইত মধু
জোছনায় করি আলা।

মনে আছে, সখি, চাঁদিমা হইতে
ও মুখ লাগিত ভালো;
বলিতাম, মরি এ রূপের কাছে
জোছনাও যেন কালো!

ও কেমন কথা, বলিয়া সোহাগে
হাসিতে সরম হাসি,
অমনি লাজের রকতিম মুখে
চুমিতাম রাশি রাশি।

কোকিল পাপিয়া পিউ পিউ কুহু
কুজিয়া মোহিত প্রাণ,
সেই মধু-সুরে মিলাইয়া বীণা
দু'জনে গেয়েছি গান।

আপনা ধ্বনিতে মোহিত হইয়া
আপনা হয়েছি হারা ;
ভুলেছি জগতে আছে আর কেহ
আমরা দুইটি ছাড়া।

হৃদয় দুইটি একটি সুরেতে
বাঁধা গো আছিল হেন,
ছুঁইলে একটি হৃদয়ের তার
দুইটি বাজিত যেন।

সারাদিন গেছে বনেতে কাটিয়া
দুজনে বনের বালা,
জানিতাম না তো তখন আমরা
কেমন বিষাদ-জ্বালা।

সে সুখের দিন কোথায় এখন,
স্বজনি গো, বল দেখি ?
হৃদয়ের ধন তুই বা কোথায়
আমি বা কোথায়, সখি !

একটি বোঁটায় দুইটি কুসুম
আছিল কেমন ফুটি,
কে ছিঁড়িল, আহা ! একটি গো তার
দুইটি হৃদয়ে টুটি।

সকলি ত হায়, তেমনি রয়েছে !
তেমনি ফুটিছে ফুল,
এ ফুল ও ফুলে মধু খেয়ে খেয়ে
ছোটে ত মধুপ-কুল ;

সেই ত বহিছে তেমনি করিয়া
সমীরণ মৃদু মৃদু,
সেই ত তারকা উজলে বিমান,
অমৃত ঢালিছে বিধু,

পাপিয়া কোকিল গাহিছে সেই ত
কেন নাহি মোহে প্রাণ,
কেন আর, সখি, নাহি মন ওঠে
গাহিতে লো কোন গান ?

সেই ত হোথায় বীণা আছে প'ড়ে
ছুঁইতে পারিনে আর,
কত দিন হ'তে কি বলিব, সখি,
নীরব আছে ও তার !

দুই দিনে, বালা, সকলি ফুরালো,
ঘুচিল কি ছেলেবেলা !
ফুরাইল সুখ, ফুরাইল দুখ,
ফুরালো সাধের খেলা !

স্মরিও আমায়

(মূর হইতে অনুবাদ)

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায়,
লভিবে সুযশ-কীর্ত্তি-গৌরব যেথায়।

কিন্তু গো একটি কথা,
কহিতেও লাগে ব্যথা,
উঠিবে যশের যবে সমুচ্চ সীমায়,
তখন স্মরিও নাথ ! স্মরিও আমায়,

সুখ্যাতি অমৃত রবে,
উৎফুল্ল হইবে যবে,
তখন স্মরিও নাথ স্মরিও আমায়।

কত যে মমতা-মাখা,
আলিঙ্গন পাবে সখা,
পাবে প্রিয় বান্ধবের প্রণয় যতন,
এ হ'তে গভীরতর,
কতই উল্লাসকর,
কতই আমোদে দিন করিবে যাপন।
কিন্তু গো অভাগী আজি এই ভিক্ষা চায়,
যখন বান্ধব সাথ,
আমোদে মাতিবে নাথ,
তখন অভাগী ব'লে স্মরিও আমায়।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে চারু সন্ধ্যাকালে
তোমা সনে মনস্তৃপ্তি,
সন্ধ্যা-তারা দিব্য দীপ্তি,
নেহারিবে সমুদিত আকাশের ভালে ;—
মনে কি পড়িবে নাথ,
এক দিন আমা সাথ,
বন ভ্রমি ফিরে যবে আসিতে ভবনে—
ওই সেই সন্ধ্যা তারা,
দু'জনে দেখেছি মোরা,
আরো যেন জ্বল-জ্বল জ্বলিত গগনে ?

নিদাঘের শেষাশেষি,
মলিনা গোলাপরাশি,
নিরখিয়া কত সুখী হইতে অন্তরে,
দেখি কি স্মরিবে তায়,
যেই অভাগিনী হায় !
গাঁথিত যতনে তার, মালা তোমা তরে।
যে হস্ত-গ্রথিত ব'লে তোমার নয়নে,
হ'ত তা সৌন্দর্য্য-মাখা,
শিখিলে তুমি গো সখা,

গোলাপে বাসিতে ভাল যাহারি কারণে—
তখন সে দুঃখিনীকে করো নাথ মনে।
বিষণ্ণ হেমন্তে যবে,
বৃক্ষের পল্লব সবে
শুকায়ে পড়িবে খ'সে খ'সে চারিধারে,
তখন স্মরিও নাথ স্মরিও আমারে।

নিদারুণ শীতকালে,
সুখদ আগুন জ্বেলে,
নিশীথে বসিবে যবে অনলের ধারে,
তখন স্মরিও নাথ স্মরিও আমারে।
সেই সে কল্পনাময়ী সুখের নিশায়,—

বিমল সঙ্গীত তান.
তোমার হৃদয় প্রাণ
নীরবে সুধীরে ধীরে যদি গো জাগায়—
আলোড়ি হৃদিতল,
একবিন্দু অশ্রুজল,
যদি আঁখি হ'তে পড়ে সে তান শুনিলে,

তখন করিও মনে,
একদিন তোমা সনে,
যে যে গান গাহিয়াছি হৃদি প্রাণ খুলে
তখন স্মরিও হায় অভাগিনী ব'লে।

———

সন্ধ্যার স্মৃতি

প্রতিদিন দূর হ'তে তোমা পানে চাই,
আঁখির কিরণ ছুটি;
আঁখিপরে পড়ে লুটি,
গভীর হরষ মাঝে মগ্ন হয়ে যাই

আমি সন্ধ্যা পৃথিবীর অতি দীন-হীন,
নাহি গুণ, রূপ-রাশি,
ভুলিয়ে যদি বা হাসি,
বিষাদ অশ্রুর জলে তাহাও মলিন!

তুমি বালা সন্ধ্যা-তারা স্বরগের আলো!
এত কথা এত হাসি,
এত ভালবাসাবাসি,
ক্ষুদ্র আমা পরে কেন এত মায়া ঢালো?

পাতা না ফেলিতে চায় অবাক্ নয়ন,
পলকে যদি কি জানি
হারাই ও হাসিখানি,
এই ভয় হিয়া-মাঝে জাগে অনুক্ষণ!

ও হাসি অমৃতময় স্বরগের ভাষা,
ও হাসির জ্যোতি ছুটে,
অসীম শূন্যেতে লুটে
পূরাইছে জগতের সৌন্দর্য্য-পিপাসা।

সুরের লহরী আধো সেই ভাষা গায়,
শিখে আধো আধো খানি,
মলয়-বায়ু সে বাণী,
শিখাইছে বনে বনে কুসুম লতায়।

প্রেমের যৌবন স্বপ্ন সে হাসির ছায়া,
শিশুর অফুট বাণী,
সেথাকার স্মৃতিখানি,
সেথাকার মধুময় শেষ মোহমায়া।

সে ভাষা বুঝিতে গিয়ে হৃদয় আকুল,
যতই বুঝিতে যাই,
কিনারা নাহিক পাই,
ভাবের তরঙ্গ মাঝে হয়ে যায় ভুল।

আপনার ভাষা যেন গিয়াছি ভুলিয়া,
মনে পড়ে পড়ে এই—
ধরি ধরি আর নেই,
প্রাণের অন্তর প্রাণ ওঠে আকুলিয়া !

পড়ে না পড়ে না তবু পড়ে যেন মনে
যেন দূরে অতি দূরে,
কোন এক সুরপুরে,
এক সাথে আছিলাম মোরা দুই জনে।

সেথায় বসন্ত চির-স্বপনে আকুল,
সেথাকার স্নেহ প্রীতি,
কেবল নহে গো স্মৃতি,
ঝরিতে ফোটে না যেন সেথাকার ফুল।

সেথায় কাহার যেন আনন্দের তরে,—
সখীগণে মিলি মিশি, সাজিয়াছি দিবানিশি,
কুসুমের পরিমল সযতনে ধরে,
সেথায় কুসুম নাহি ঝরে।

যেন কত ফুলবাস চয়ন করেছি,
তুলিয়ে শান্তির বাস,
মিলায়ে আশার হাস,
গাঁথিয়ে মালার রাশ গলায় পরেছি।

যেন গীত-স্বরে সুরে রচেছি শয়ন,
হাসির সুবাস তুলে,
মুকুট করেছি চুলে,
বসন রচেছি করি সুষমা চয়ন।

ভুলে ভুলে যেন যাই, যেন প্রাণে প্রাণে,
না হইতে মালা গাঁথা,
না হইতে হাসি কথা,
স্বপন বালক দুষ্ট তার মাঝখানে—

চুপি চুপি লুকোলুকি উপবনে আসি,
ফু দিয়ে উড়াত ফুল,
টেনে খুলে দিত চুল,
ছিঁড়ে দিয়ে বাস মালা সারা হোত হাসি।

ধরিতে যেতাম মোরা যদি তারে রাগে,
দূর থেকে হেসে, হেসে,
ছুটে ছুটে পালাত সে
কনক মেঘের দ্বার খুলি আগে ভাগে।

সহসা প্রমোদ হাসি হোত অবসান,
একটি নূতন লোক,
সেথাকার দুঃখ শোক,
মনে পড়ে আঁখি-পথে হোত ভাসমান!

কত শত জন সেথা দুঃখ-শোকাতুর,
করিতেছে হাহাকার,
উথলিত অশ্রুধার,
তখনি সুখের সাধ হয়ে যেত দূর।

আকুল নিশ্বাস ফেলি বলিতাম মনে,
উহাদের দুঃখ লয়ে,
এ সুখের বিনিময়ে,
জনম দাও গো দেব, উহাদের সনে।

বুঝি গো এসেছি হেথা ল'য়ে সে বাসনা,
কই তা পূরিল কোথা,
একটি হৃদয়-ব্যথা,
একটিও অশ্রু ফোঁটা মোছান হোল না।

করুণ-নয়নে বুঝি তাই চেয়ে আছ ?
হৃদি বড় দুরবল,
তাহাতে সঁপিছ বল ?
হৃদয়ের অবসাদ বুঝি মুছিতেছে ?

এখন সে সখিত্বের এই বুঝি শেষ ?
কে আমরা কোন্ পুরে,
চাওয়াচায়ি দূরে দূরে,
পুরাতন সে স্মৃতির এইটুকু রেশ ?

এটুকুও যায় যদি ভয়ে ভয়ে থাকি,
আকুল নয়ন তুলে,
একদিন যদি ভুলে,
দেখিতে না পাই তোর ও কিরণ আঁখি ?

সারা দিবসের পরে বিশ্রাম কোথায় ?
নিরাশায় শ্রান্ত অতি,
সে হৃদে কে দিবে জ্যোতিঃ ?
ফুটাইবে নিরমল ঊষা কে সন্ধ্যায় ?

যদি, সখি, বুঝি সখি, আসিবে সে দিন,
ঊষাময়ী নিজ দেশে,
যাবি তুই ভেসে ভেসে,
উদিবে জীবন-সন্ধ্যা সন্ধ্যাতারা-হীন ;
কে জানে বুঝি বা, সখি, আসিবে সে দিন

———

মাঘ-মেলা

পবিত্র মাঘের মেলা,
গঙ্গাতীরে সন্ধ্যাবেলা,
মা'র কি অপূর্ব্ব দৃশ্য রূপের তুফান !
পা-দুখানি খোলা খোলা,
হাতে প্রদীপের মালা,
ঈষৎ ঘোমটা টানা উজল বয়ান ;

বঙ্গবালা পু[illegible]বতী,
পূজিবারে ভাগীরথী,
নামিছে বন্যার ধারে সোপান-লহরী ;

ভক্তের চরণ-স্পর্শে,
জাহ্নবী কাঁপিয়া হর্ষে,
কল্লোলি আশিস্ দান করে প্রাণ ভরি।
পুলক-প্রফুল্ল প্রাণ,
শতকণ্ঠে মা মা তান,
স্তবস্তুতি হুলুধ্বনি আনন্দ-কল্লোল;
দিগন্ত ধ্বনিয়া ছোটে,
স্বর্গে উথলিয়া উঠে,
অচেতন জাগে পেয়ে চেতনা-হিল্লোল।

উপকূলে সারে সার,
শোভিছে দীপের হার,
তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসে উৎসর্গ দেউটি;
মহোৎসবে হুলস্থূল,
রাতে যেন দিন ভুল,
জলে স্থলে আলোকের ফুল ফোটাফুটি।
বুঝি বা স্বর্গের তারা,
মন্ত্রাহ্বানে আত্মহারা,
ধরায় ফুটেছে আসি দেবী-পদতলে;
সমাপি এ পুণ্যকর্ম্ম
লভিবে নূতন জন্ম,
বিসর্জ্জি জীবন আজ জাহ্নবীর জলে।

* *

সুবিজন নিরালয় ঠাঁই,
প্রমোদ-উৎসব হেথা নাই,
স্নান করে বিধবা একাকী,
সঙ্গে মেয়ে বালিকা বড়াই।

অষ্টমবর্ষীয়া শিশু বালা,
উমা যেন, স্বর্ণলতা নাম
মিষ্ট মিষ্ট আধো আধো কথা,
নাহি কিন্তু কথার বিরাম।

উপকূলে বসিয়া একাকী,
জ্বালাইছে পূজার প্রদীপ,
এই জ্বলে এই নিভে যায়,
দু'একটি করে টিপ টিপ।
করযোড়ে জপিছে জননী,
'দয়া কর দয়াময়ী গঙ্গে!'
সহসা নীরব হয়ে শোনে,
বালিকা কি কহিতেছে রঙ্গে।

দীপ জ্বালি সারি দিয়া কূলে,
নমি গঙ্গা মাগিছে সে বর,
'সীতার মত হব সতী,
রামের মত পাব পতি,
ভুলে গেনু এই যা তা পর!'
মাতা কহে 'কর, বাছা, ব্রত,
লক্ষ্মণ দেবর হয় যেন,
কৌশল্যা শাশুড়ী হোক্ তোর,
শ্বশুর সে দশরথ হেন;
ধৈর্য্য পাও পৃথিবী সমান,
কাজকর্ম্মে অটল সুদক্ষী,
গঙ্গা তাঁর শীতলতা দিন
স্বামিগৃহে হয়ে থাক লক্ষ্মী।

মেয়ে কহে কাঁদিয়া তখন,
'না, মা, আমি করিব না ব্রত;
শ্যামা গেছে শ্বশুরের ঘরে,
আসে না সে করে তিন সত্য।
তোরে ছেড়ে যাব না মা, কোথা,
জানিস্ মা আমি পেমি পিসি!'
মা কহে, 'থাম রে সর্ব্বনাশি,
ও কি কথা কোস্ কোন্ দিশি,

বিধবা সে তাই ঘরে আছে,
বাছা কি করিলি অকল্যাণ !
মা গঙ্গা, শিশু বোধহীন,
ও কথা দিও না মনে স্থান।'

ও পারে চমকে চিতানল,
মা কাঁদি তাহার পানে চায়,
বালা হাসি বলে, 'দ্যাখ, মা গো,
কেমন প্রদীপ ভেসে যায়।'

যেন আমার দুঃখে

যেন আমার দুঃখে—
আমারো চেয়ে কার বাজিছে বুকে !

কে যেন অতি করুণ-নয়নে,
আছে মুখের পানে চাহিয়া,
হৃদয়ের শত অতৃপ্তি বেদনা
সেই আঁখির অমৃতে নাশিয়া।
যেন অতি বিয়াকুল আসিতে নিকটে,
এই নয়নের জল মুছিতে ;
দিগন্ত প্রসাদ বাধা ব্যবধান,
মহাবলে চায় ভাঙ্গিতে।
ব্যথিত নিষ্ফল নিরাশ কাতর,
বিষণ্ন পরাণ টুটিয়া,
আরো উজল উচ্ছ্বাসে সে করুণ প্রেম
শতধারে উঠে ফুটিয়া।
বল কে তুমি গো, দেব, কোন্ জনমের
পুণ্য-স্মৃতি, মূর্ত্তি ধরিয়া—
আঁধার প্রাণের হরিছ তিমির,

হৃদি কি সুখ আনন্দে ভরিয়া !
থাক্ মাঝে থাক্ শত ব্যবধান,
থাকি তোমারি দূর ভবনে,
যদি ঢাল চিরদিন ঐ প্রেমজ্যোতিঃ,
ভরি কোন্ জ্বালা কোন্ বেদনে !

সেই তিরস্কার

এমনি একটি সন্ধ্যা মধুর-উজ্জ্বল,
পশ্চিমে সোনার মেঘে বহেছিল ঢল।
পূর্ব্বাকাশে প্রকাশিত সুতরুণ শশী,
ছায়াখানি বিকম্পিত সরোবরে খসি।
একাকী বসিয়া ঘাটে ছিনু অপেক্ষায়,
এমন মধুর সন্ধ্যা, কোথা-সে কোথায় !
নয়নে বিরহ-অশ্রু, অভাব পরাণে,
আবেগে আগ্রহে হৃদি পূর্ণ অভিমানে।
সহসা সম্মুখে কার হেরিনু মূরতি ?
কার হাসি-সুধা পিয়ে, কার হাসি হয়ে নিয়ে,
সহসা অপূর্ণ চন্দ্রে পরিপূর্ণ জ্যোতিঃ ?
অকূল আনন্দমাঝে অবসিত প্রাণ,
বুঝিনু) মৃত্যু ত দুঃখের নহে সুখের নির্ব্বাণ।
হায় রে ভাঙ্গিল কেন সেই মৃত্যু-সুখ,
আবার আসিল কেন অভিমান-দুখ !
উচ্ছ্বাস-কাতর প্রাণে হাতখানি ধ'রে
বলিনু 'বাস না বুঝি ভাল আর মোরে' ?
শুনিতে উথলে সাধ সে পুরাণ বাণী,
'বাসি না-তোমারে ভাল, হৃদয়ের রাণি' ?
বার বার শুনিয়াছি এ সোহাগ ভাষা,
তবু নহে মিটিবার জ্বলন্ত পিপাসা !

একই জিজ্ঞাসা তাই, অতৃপ্ত ইচ্ছার,—
"বুঝেছি আমারে ভালবাস না ত আর।"
বুঝিল না ভাব মোর বুঝিল না ভাষা,
বলিল, 'সন্দেহ এ কি ঘোর মর্ম্মনাশা'।
নয়নে দেখিনু তীব্র তিরস্কার দৃষ্টি,
মুহূর্ত্তে হেরিনু শূন্য অনন্ত এ সৃষ্টি,
প্রথম হেরিনু সেই সে নয়নে রোষ,
স্বার্থভরা আকুলতা তোরি যত দোষ!

* *

সে দিনও এমনি রাত্রি মেঘস্তর কালো
ঢেকে ঢেকে যেতেছিল চন্দ্রমার আলো;
রজনী সুখেতে ম্লান সে জ্যোৎস্না-পরশে,
বিরহের ভয় যেন মিলন-হরষে;
জ্বল জ্বল সন্ধ্যা-তারা নামে ধীরে ধীরে,
বিজনে দাঁড়ায়ে মোরা সরোবর-তীরে:
হৃদয় বেদনা-ভরা, আনত লোচন,
পরাণে কত কি কথা, না সরে বচন;
সে দিন কি আছে আর কি কহিব কথা?
কি ব্যথা জানাতে গিয়ে শুধু দিব ব্যথা!
সম্বরি নয়নজল বলিলাম শেষে,
'বিদায় দাও গো তবে যাই দূর দেশে।'
পাষাণ সে একটিও কথা কহিল না,
একবার বলিল না যেয়ো না যেয়ো না।
শুধু নয়নেতে সেই তিরস্কার দৃষ্টি,
মুহূর্ত্তে হেরিনু শূন্য অনন্ত এ সৃষ্টি!
সেই দৃষ্টি আনিয়াছি প্রবাস-সম্বল,
দুর্ব্বল হৃদয়ে মোর একমাত্র বল।
প্রশান্তি বহিয়ে আনি ঝড় জ্বালা ক্ষান্ত,
ঈশ্বরের রুদ্র বজ্রে পাপী তাপী শান্ত।

সেই তিরস্কার দৃষ্টি অন্য কিছু নয়,
তাহাতে প্রকাশ দেখি তাহারি প্রণয় !
সেই ঘর স্মৃতি দিয়ে দগ্ধ হবে যত,
হবে স্বার্থপূর্ণ প্রেম সুবিমল তত।
ভুল করেছিনু তাহা নহে তিরস্কার,
বুঝেছি এখন তাহা ভালবাসা তার !

বিরহ

অধরে মোহন হাসি নয়নে অমৃত ভাসে,
বিরহ জাগাতে শুধু মিলন পরাণে আসে।
সুখের প্রভাতে আশে বিরহ চমকি চায়,
হৃদয়ে আশার আলো নয়নে আঁধার ভায় !
কই রে মিলন কোথা সে কি হেথা আছে আর
রাখিয়া গিয়াছে শুধু গরল পরশ তার !
তাপটুকু রেখে গেছে, প্রভাতের আলো নিয়ে,
হাসি যত নিয়ে গেছে অশ্রুজল রেখে দিয়ে ;
সন্ধ্যা ক'রে দিয়ে গেছে সন্ধ্যার হারিয়ে তারা,
আঁধার পড়িয়ে আছে, সুষমা হইয়ে হারা !
ফুলটি সে নিয়ে গেছে ফেলে গেছে কাঁটা টি,
বিরহ কাঁদিয়ে সারা নয়নে মেলিয়ে উঠি।

প্রজাপতির মৃত্যুগান

১

ছিল না ত কোন কাজ কিছু
জীবনটা শুধু হেলাফেলা,
নিরানন্দ হাসি খেলা নিয়ে,
কাটিত সুদীর্ঘ সারাবেলা।

এক দিন সন্ধ্যা অতি ধীর,
বহিয়াছে প্রফুল্ল সমীর,
ক্লান্তিভরা প্রমোদের ভারে
অবসন্ন স্তিমিত শরীর।

লক্ষ্যহীন ছুটোছুটি করি
সারাদিন গিয়াছে কাটিয়া,
চলিতে না সরে পদ আর
ভূমিতলে পড়িনু লুটিয়া।

চারিদিকে চাহিনু বারেক
কেহ যদি তোলে স্নেহভরে,
জ্বল জ্বল হাসিল কৌতুকে
তারকাটি মাথার উপরে।

মুদে এল ধীর দু'নয়ন
বুঝিলাম পালা হোল সায়,
শ্রান্তিময় ধরণীর পাশে
শান্তিময় অন্তিম বিদায়।

পড়িল না অশ্রু এক ফোঁটা,
অধরে ফুটিল হাসি-রেখা,
নিমেষের এই এ জীবন,
কে আমার আমি শুধু একা।

২

জীবনে আরম্ভ হোল কাজ,
আজ আমার নূতন জীবন।
সমুখে এ কাহার মূরতি,
শ্রান্ত আঁখি খুলিনু যখন?

কলিকাটি নতমুখী একা,
তুষার-আবৃত হিম-দেহ।

না ফুটিতে অবসন্ন ক্ষীণ
কেহ নাই করিবারে স্নেহ !

ঘুচে গেল শ্রান্তি অবসাদ,
দাঁড়াইনু তার পাশে আসি,
সযতনে আগ্রহে উদ্যমে
ঘুচাইনু সে তুষাররাশি !

আনন্দ-পুলক অভিনব
শিরে শিরে হোল বহমান,
মিছে হাসি খেলাধূলা সব
সেই দিন হ'তে অবসান।

৩

আজ আমার কাজ সমাপন,
চিরতরে জীবনের ছুটী,
মলিন কলিকা সে আমার
মধুরূপে উঠিয়াছে ফুটি।

সযতনে পাথনায় ঢাকি
গণিয়াছি মুহূর্ত্ত পলক,
প্রাণ-ভরা সে স্নেহ আদর
ধন্য বিধি আজিকে সার্থক !

আজ আর নহে সে একাকী,
আজি সে ত নহে দীনহীন,
অলি কহে মধুর বচন,
বায়ু গাহে প্রেম সারাদিন।

প্রাণ ভোরে দান করে রবি
সুবিমল আলোক কিরণ,
দেখে চেয়ে কবি মহাকবি
রূপ-মুগ্ধ বিস্মিত নয়ন।

বিকাশিত সুবাস সুহাস,
বিকাশিত রূপের মহিমা,
বিকাশিত সে নবযৌবন,
আজি নাহি আনন্দের সীমা !

উল্লাসে অধীর সে আমার
আনন্দ রাখিতে নারে ঢাকি,
পূর্ণতম আমারো জীবন
কাজ আর নাহি কিছু বাকী।

শূন্য ছিল জীবন সে দিন,
পূর্ণ এবে জীবনের ঘের,
সুখভরা ধরণীর পাশে,
অন্তিম বিদায় মাগি ফের।

ধন্য ধন্য চারিদিক স্তুতি,
প্রশংসা ধরে না কারো মুখে,
প্রসারিত রাজহস্ত অই
আদরে তুলিয়া নিতে বুকে।

একা ছিনু সে দিন এখানে
আজ আমি দোঁহে মিলি মহা,
তাই বুঝি অশ্রু নাহি মানে,
এ হর্ষ নাহি যায় সহা !

বিদায় গো বিদায় ধ্বনি
সে আমার উঠিয়াছে ফুটি ;
এ প্রাণে আর কি প্রয়োজন,
দিয়াছে সে জীবনের ছুটী।

মরণ-সোহাগ

ও কি আর ফুল আছে? ও যে শুধু ঝরা দল;
কেন আর সমীরণ উহারে ছুঁইবি বল্?
মধুর সোহাগে তোর ও ত আর গাহিবে না,
নয়নে ঢালিয়া সুধা ও ত আর চাহিবে না;
সুখের পরশে শুধু শুকাইবে দলগুলি,
সমীব ফিরিয়া যা রে মরণ-সোহাগ-ভুলি!

দুটি তারা

অতি ক্ষীণ ক্ষীণতর পাপিয়ার স্বর,
কোথা কোন্ দূর হ'তে আসিছে ভাসিয়া,
তরল বারিদপুঞ্জ মেঘের বরণ,
নীলিম শৈলের শিরে জমিছে আসিয়া।

রবির বিদায় দৃষ্টি স্বর্ণ জ্যোতির্ম্ময়,
চমকিছে শুভ্রনভ দিবসের শেষে,
দুইটি হারান তারা সহসা মিলিয়া,
চাহিছে দোঁহার পানে বিষণ্ণ আবেশে।

সন্ধ্যার ঊষার খেলা সব যেন মোহ,
স্বপনেতে জাগরণ গিয়াছে মিশিয়া,
স্মৃতি উথলিছে চির বিস্মরণ মাঝে,
প্রীতির কাহিনী জাগে অপ্রীতি নাশিয়া।

মরমে মরম-কথা প্রথম প্রকাশ,
সবে ফোটা হৃদয়ের প্রথম আকুলি—
তরঙ্গ তুলিছে বেগে নিরাশার প্রাণে,
আদরের স্মৃতি মাঝে অ 'দর ভুলি।

সুখ বা যন্ত্রণা ইহা? শূন্য, মায়ামোহ?
দু দণ্ডের মরীচিকা অবসান ভাতি?

এখনি সরিয়া যাবে যে যাহার দূরে—
কে কাহার আঁখিতারা কে কাহার সাথী ?

তা নহে তা নহে, ইহা নহে অভিশাপ,
দেবতার আশীর্ব্বাদ মঙ্গলসূচন ;
জীবন আরম্ভ পুন নূতন করিয়া,
পরিপূর্ণ প্রেমে তাই বিশ্বাস মিলন।

এই উষাময়ী সন্ধ্যা হইবে বিলীন
নূতন মধুর দৃশ্য শুধু আনিবারে,
নূতন পুলক-ভরা জোছনা রজনী
অবসান হবে নব প্রভাতমাঝারে।

আসে যদি সুগভীর রজনী আঁধার,
ঝটিকার ভয়াবহ তরঙ্গ লইয়া,
এ দুটি তারকা হৃদি আলিঙ্গিয়া দোঁহে,
উজ্জল হইবে আরো অধিক করিয়া।

দুজনের অপূর্ণতা পূর্ণ করি দিয়া,
চির-প্রেম চির-কান্তি চির-শান্তি ধরি,
প্রণমি অনন্ত পদে বেড়াবে ভাসিয়া,
জীবনের কক্ষপথ আলোকিত করি।

———

নিশীথ-সঙ্গীত

জীবন-অভিনয়

এই ত জীবন-অভিনয় !

কেহ কাঁদে কেহ হাসে, দাঁড়াইয়ে পাশে পাশে,

তবুও কাহারো কেহ নয়।

এই ত জীবন-অভিনয় !

বিশ্ব ঘোর থম্‌থমে, বৃষ্টি পড়ে ঝমঝমে,

নিশীথিনী বিরহে চমকে।

থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণ, নীরদের গরজন ;

বায়ু বহে দমকে দমকে।

গাছপালা জেগে উঠে, এ উহার গায় লুটে,

বিজলী চমকি চলি যায় ;

লতা-পাতা শূন্য জুড়ে, বৃষ্টির কণিকা উড়ে,

তুষার-বরণ ধূম তায়।

শ্রান্ত ক্লান্ত ম্লান দীন, রমণী আশ্রয়হীন,

দাঁড়াইয়া ভিজিছে কাননে ;

জানালার পথ দিয়া, আলো উঠে ঝলসিয়া,

এক দিঠে নেহারে নয়নে।

কে তুমি দুঃখিনী মেয়ে, অশ্রুধারা পড়ে বেয়ে,

এ বুঝি তোমারি ছিল ঘর ?

অভিমান ব্যথাভরে, গিয়াছিলে ছলিবারে,

আসিয়া দেখিছ সব পর !

আর কি চাহিয়া দেখ, সাড়া আর দিও নাক,

আমোদে রয়েছে ওরা থাক !

এখানে নাহিক স্থান, ফির' নিয়ে অভিমান,

পরাণ নিভিয়া যাবে যাক !

রমণী আশ্রয় চায়, কেহ না শুনিতে পায়,
ঝুণু ঝুণু নূপুর উথলে।
সুখের সাহানা তান, উথলে মুষ্টির প্রাণ,
অভাগিনী কেঁদে যায় চ'লে !
নিজের বিষাদ ভুলে, আকুল নিশ্বাস তুলে,
নিশীথিনী গায় শোক-গীত,
গৃহেতে উথলে গান, ঝুণুঝুণু নূপুর তান,
অবিশ্রাম এই রঙ্গরীত !
যবনিকা এ খেলায়, কভু না পড়িতে চায়,
চিরকাল ধ'রে আছে ঠাট,
দর্শকের নাহি শ্রান্তি, লেখকের নাহি শান্তি,
দুয়ে মিলে এই মহা নাট ;
প্রকাণ্ড এ নাটকের, না ফুরায় ক্ষুদ্র ফের,
বাকি তবু কিছুই না রয়,
পালা না হইতে সায়, রব ওঠে সে কোথায় ?
মাঝখানে চকিত বিস্ময়।
চকিতের সে বিস্ময়, চকিতে তখনি লয়,
যেই খেলা সেই খেলাময় ;
যে যায় সেই যায়, অন্যে তার পালা গায়,
কেহ আর সে কথা না কয় !
এই ত জীবন-অভিনয় !
কেহ কাঁদে কেহ হাসে, দাঁড়াইয়া পাশে পাশে,
তবুও কাহারো কেহ নয় ;
এই ত জীবন-অভিনয়।

———

ঝটিকা

মেঘে মেঘে মেঘে ছেয়েছে আকাশ,
দেখা নাহি যায় চাঁদিমা আর,
নদীর উরসে ঢেউ সাথে ঢলি
খেলে না জ্যোছনা রজতধার !

মৃদুল পবন বহে নাক আর,
গাছের একটি পাতা না নড়ে,
বহে কি না বহে তটিনী কে জানে,
ঢেউ ত একটি নাহিক পড়ে।

আঁধার আকাশ স্তম্ভিত ধরণী,
মন্ত্র-স্তব্ধ যেন চারিটি ধার ;
কি বিপ্লব-কথা নীরবে কহিছে,
থাকে না বুঝিবা জগৎ আর !

তটিনীর কূলে কুঁড়ে ঘরখানি.
দ্বারের বাহিরে জেলেনী জেলে
ভয়াকুল প্রাণে আছে দাঁড়াইয়ে,
কুটীরের স্নিগ্ধ আলোক ফেলে।

সহসা অশনি কড় মড় কড়
ঘোষিল ভেদিয়া আঁধার নিশি,
নিবিড় জলদ ভীম গরজনে
সঘনে কাঁপায়ে তুলিল দিশি !

বীর পরাক্রমে এদিকে ওদিকে
মাতিয়ে বহিল পবনরাশি,
ধাঁধিয়ে দিগন্ত বেড়াইছে ছুটে
সুবিকট ঐ দামিনী হাসি।

নাহি সে তটিনী প্রশান্ত মূরতি,
ভীষণ সংহার-মূরতি তার ;
সফেন তুফানে আক্রমিছে বেলা,
দুর্দ্দাড় ভাঙ্গিয়ে ফেলিছে পাড় !

সহসা উঠিল করুণ ক্রন্দন,
তরী একখানি এন রে ডোবে ;
কাঁপিয়া উঠিল ধীবর-দম্পতি
হৃদয় দহিল দারুণ ক্ষোভে।

বলিল জেলেনী, "ঐ শুন আহা,
কোন্ অভাগার জীবন যায়" ;
ততক্ষণ ছুটি খুলি দিয়া খুঁটি
করুণ ধীবর উঠিল নায় ।

এ কাল-নিশায় নাহি ভুরু ক্ষেপি
বায়ুবেগে ঐ চলিল তরী,
আকুল পরাণে তীরে দাঁড়াইয়ে
করযোড়ে সতী স্মরিল হরি ।

কত রজনীতে কত ঝটিকায়
সাহসী দয়ার্দ্র সোয়ামী তার,
কত মরণেরে করেছে বারণ,
কতই বিপদ করিয়ে সার ।

সমুখে জাগিল সেই সব ছবি,
পরাণ ভরিয়া গাহিল জয়,
পরাণ ভরিয়ে ডাকিল হরিরে,
'তার এ বিপদে করুণাময় !'

চলিল তরণী তুফানে তুফানে,
কভু প'ড়ে পুনঃ উঠিছে কভু ;
অটল-হৃদয় সাহসী ধীবর,
কোন ভয়-ডর নাহিক তবু ।

মনে তার শুধু জাগে সে রোদন,
ঝটিকা তুফানে চেয়ে না চায়,
কেবলি ডাকিছে 'কোথায় রে তোরা ?
ভয় নেই আর, নে যাব আয় !'

তবুও উত্তর নাহি দিল কেহ,
রোদনও আর ত শোনা না যায় ;
অধীর হৃদয়ে বাহি চলে জেলে,
ঝটিকায় তরী রাখাও দায় ।

তুফানের পর উঠিছে তুফান,
গেল গেল তরী নাহিক আশ ;
নাহি ভ্রুক্ষেপ সেদিকে তাহার,
জলে চেয়ে দেখে চুলের রাশ ।

ঝাঁপাইয়া পড়ি চোখের নিমেষে,
পিঠের উপর দেহটি তুলে,
তরঙ্গের সাথে যুঝিয়া যুঝিয়া
প্রাণপণে জেলে উঠিল কূলে ।

জেলেনী দাঁড়ায়ে স্তম্ভিত-মূরতি,
নামাইল দেহ তাহার কাছে ;
অবসন্ন প্রাণ রুদ্ধশ্বাস দেহ,
আপনি লুটিয়ে পড়িল পাছে ।

বর্ষায়

সুনিবিড় ঘন গরজে সঘন,
ঝর ঝর বারি ঝরণা ;
সচকিত-দিশি, চমকিত নিশি,
ঘোর তামসী বরণা ;

স্বন স্বন স্বন দুরন্ত পবন,
চমকিছে মুহু দামিনী !
সে গো একাকী আপনে রয়েছে কেমনে ?
বুঝি জাগরণে কাটে যামিনী !
যত গরজন গুরু হিয়া দুরু, দুরু,
শূন্যপানে আঁখি লগনা ;
বুঝি আমারি স্মরণে, আমারি স্বপনে,
আমারি বিরহে মগনা ।
ওগো একাকী ফেলিয়া এসেছি চলিয়া,
কেমনে সে হিয়া বাঁধিছে ?

সেই মলিন বয়ান, ছল ছলনয়ান,
আঁখি পরে শুধু জাগিছে।
সে যে কত কেঁদে কেঁদে বাহু দিয়ে বেঁধে
বলেছিল, "ওগো যেয়ো না
যদি নিতান্তই যাবে কি বলিব তবে,
বেশী দিন যেন রয়ো না!"
এই কঠোর হৃদয় বজ্রশিলাময়,
তাই ফেলে আছি তাহারে!
সে যে একা শূন্য ঘরে, নিশি দিন ধ'রে
কেবলি ভাবিছে আমারে!

শারদ-জ্যোৎস্নায়

শরতের হিম জ্যোছনায়
নিশীথিনী আকুল নয়নে চায়,
বহুদিন পরে যেন পেয়েছি প্রণয়ী জনে
অশ্রুর লহরী মাখা সুখের আলোক ভায়!
বসন্তের প্রথম বাতাস—
সুখের মাঝারে যথা জাগায় হুতাশ,—
প্রাণ কেঁদে উঠে হেরি নিশার ও ম্লান হাসি,
হারান স্মৃতির ছায়া বেড়ায় সমুখে ভাসি।
ও ছায়া কাহার ছায়া? ও মূরতি কার মায়া?
চিনিতে পারিনে যেন চিনি চিনি যত করি!
আকুল ব্যাকুল প্রাণ ধরিবারে আগুয়ান,
যতই ধরিতে যাই ধীরে ধীরে যায় সরি!
বড় যেন আপনার ছিল যে রে সে এ জনার!
আজ কি ভাবিছে হেথা পাবে না আশ্রয়?
কাছে এসে তাই কি রে, পর ভেবে যায় ফিরে?
ফুটন্ত জ্যোছনা হাসি করি অশ্রুময়।
তাই প্রাণ কেঁদে ওঠে বুঝি এ সময়।

বসন্ত-জ্যোৎস্নায়

জ্যোছনা হসিত নিশা, বসন্ত পূরিত দিশা,
প্রকৃতি নয়নে ঘুমঘোর ;
কুসুম সুবাস হিয়া, উঠিতেছে উছলিয়া,
চাঁদ পানে চেয়ে ভাবভোর !
উদাস মলয় বায়, আনমনে বহে যায়,
প্রাণে মেশে প্রাণের পিয়াস ;
সে মধু পরশ, লাগে, তটিনী চমকি জাগে,
ধীরে বহে সুখের নিশ্বাস।
উপকূলে তরুগণ, নেহারিয়ে কি স্বপন,
কে জানে কি হরষে মাতোয়ারা ;
সুনীল অম্বর পাশে, তারাটি মুচকি হাসে,
কোথা থেকে বহে গীতধারা !
মধুর স্বপন বেশ, মধুর স্বপন দেশ,
সঙ্গীতের মধুর উচ্ছ্বাস ;
বিহ্বল চাঁদিনী নিশি, বিহ্বল বাসন্তী দিশি,
প্রাণে জাগে আকুল পিয়াস !

———

জ্যোৎস্নায়-নদীকূলে

আমি এ জ্যোছনা রাতে মধুর বসন্ত বাতে,
কবে কার কথা পড়ে মনে !
শাদা মেঘ ভেসে যায়, চাঁদখানি হেসে চায়,
ঢল ঢল মধুর স্বপনে !
সমুখে তটিনী বয়, উপকূল বালুময়,
চারিদি:ে রজত-তুফান ;
শুভ্রতার নাহি তুল, জলে স্থলে সব ভুল,
ম্লান কেন দু-একটি প্রাণ।

ওপারে দিগন্ত বাঁকা, নিবিড় গহনে আঁকা,
শুভ্রতা হোথায় কাল-কায়া ;
ও যেন গো জ্যোছনার, আঁধার হৃদয়ভার,
হায় ! এ কি জগতের মায়া !
আঁধারেতে টিপ টিপ, করে দু-একটি দীপ,
আকাশে অগণ্য তারা ভায় ;
বিমানের শুভ্র কায়া, তরুর জলদচ্ছায়া,
তটিনীর হৃদয় দোলায়।
প্রবাহিত হৃদিমাঝে বিশ্বের মহিমা রাজে,
গরবিণী উথলিত কায় !
আনন্দে আপনা ভুলে, সহস্র তরঙ্গ তুলে,
নিরুদ্দেশ হয়ে চ'লে যায়।
একাকিনী কূলে কূলে, মেয়ে দুটি এলোচুলে,
আনমনে কোন্ গান গায় !
দাঁড় বহা রেখে ফেলে, চমকি যুবক জলে,
মুগ্ধ-আঁখি একদিকে চায় !
বনান্তে বিরহী পাখী, কুহু কুহু উঠে ডাকি,
স্তব্ধ নিশা সঙ্গীত আকুল ;
কাঁটার বেদনা ভুলে, সুখের নিঃশ্বাস তুলে,
অভাগিনী বাবলার ফুল।
সুবাস মাখান গান, পরশি পরশি প্রাণ,
কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় ;
কোন্ অনন্তের তীরে, হারাধন খুঁজি ফিরে,
কে জানে কেন রে নাহি পায় !
কেমনে পাবে রে ফের, এ পার যে অনন্তের,
অন্য পারে সে রতন ভায় !
আলোটুকু দূরে দূরে, নয়নের পথে ঘুরে,
ধরিতে স্বপন ভেঙ্গে যায়।
এমনি সে মধু যামি, ছিনু দোঁহে. একা আমি ;
একা তুমি দশদিশি গায় ;
তাই এ জ্যোছনা রাতে, মধুর বসন্ত বাতে,
নয়ন আপনি ভেসে যায়।

অধরে অধরে

এমনি চাঁদিনী নিশি,
পুলক-কম্পিত দিশি,
এমনি বিজন উপবনে ;
মুখেতে চাঁদের আলো,
দীপ্ত আঁখি-তারা কালো,
চেয়েছিল নয়নে নয়নে।
কুঞ্চিত অলক-চুল,
ঈষৎ দোদুল দুল,
অঞ্চলে বকুল ফুলরাশ,
আধো গাঁথা মালাখানি,
হাতের বাধা না মানি
লুটাইছে চরণের পাশ।
তুলিয়া কুসুম-হার
সঁপিলাম করে তার,
অনন্ত খুলিল আঁখি পরে ;
মুহূর্ত্তে বন্ধন চূর্ণ,
অপূর্ণ হইল পূর্ণ,
স্পর্শ হোল অধরে অধরে।

———

সুখের অবসাদ

রূপের মদিরা পিয়ে নিশীথ বিহ্বল কায়,
কত সাধ ওঠে মনে কত স্বপ্ন উথলায়।
নদী গাহে কূলে কূলে, নিভৃতে কুহরে পিক,
কুঞ্জে কুঞ্জে ফোটা কলি, সৌরভে আকুল দিক্‌।
পূরবে উঠেছে চাঁদ, মধুর জ্যোছনা ফোটে,
ওপারে দিগন্ত মেঘে বিজলি চমকি ছোটে।

থেকে থেকে দু এক-খানি জলদ ঈষৎ কালো,
ঢেকে ঢেকে মেখে যায় চাঁদের হাসির আলো।
কোথা কোন্ দূর হ'তে আর্দ্র বায়ু গায়ে লাগে,
বসন্তের মাঝখানে সহসা বরষা-জাগে।
প্রেমের স্বপন সাধে যেন জাগে অভিমান,
মধুর মিলন মাঝে এ যেন বিরহ গান।
অকূল আকুল সুখে কি যেন কি অবসাদ,
চাঁদের এ হাসি মাঝে ডুবিয়া মরিতে সাধ।

লজ্জাবতী

নিশীথ ঘুমায় যবে
স্তব্ধতার সুখ-কোলে,
কামিনী কানন-বালা
মুখখানি ধীরে খোলে ;
লজ্জাবতী চুপে চুপে
ভালবেসে হেসে চায়,
কে জানে বোঝে কি চাঁদ ?
নীলাকাশে ভেসে যায় !
তটিনী ঘুমের ঘোরে
গায় তারে উপহাসি,
কোথা কোন্ দূর হ'তে
বেজে কার ওঠে বাঁশী !
শিয়রে তারকা দুটি
হেসে ঢ'লে প'ড়ে যায়,
মরমে মরম ঢাকি
সরমে সে ঝ'রে যায় !

অবিশ্বাস যায় টুটে

নীরব নিশীথ স্থির,
বিজন তটিনী তীর,
চঞ্চল অধীর নীর,
কল্লোলি তুলিছে তান,
যেন সেই বিদায়ের,
অশ্রুরুদ্ধ বিষাদের,
সকরুণ নয়নের,
অস্ফুট অব্যক্ত গান।
চাঁদের মলিন আলো,
নীরদের ছায়া কালো,
চমকি তরঙ্গ-জাল
মিলিছে পুলকভারে।
সজল নয়ন আগে
কার মুখখানি জাগে ?
ব্যথাভরা অনুরাগে
পরাণ যাচিছে কারে ?
অদৃশ্য ফুলের বাস
ছুঁয়ে যায় চারিপাশ,
মূর্ত্তিমান্ স্পর্শ-হাস
শিহরে অবশ-কায়া !
কেঁদে চাই নভ পানে,
তারা দুটি মনে আনে,
নয়নের তারা কার,
অনন্ত সৌন্দর্য্যচ্ছায়া ?
বিশ্বের প্রাণের প্রীতি,
স্বর্গের আনন্দ-গীতি,
অমর আত্মার আলো,
অমনি আত্মাতে [illegible];
মুছে যায় অশ্রুজল,
সসীমে অসীম [illegible],
নিরাশার অমঙ্গল,
অবিশ্বাস যায় টুটে।

———

কি যেন নেই

তেমনি রয়েছে সব তবুও কি যেন নেই !
সেই স্নেহ, সেই প্রীতি,
সেই মধুমাখা স্মৃতি,
তেমনি ফুটিয়া ফুল প্রাণভরা হাসিতেই ;
সকলি রয়েছে যেন কি জানি তবু কি নেই।
বাঁশী সেই ওঠে তান,
তেমনি উথলে প্রাণ,
সমুখে মু'খানি সেই বাসন্তী জ্যোস্নারাতে,
অধরে মোহন হাসি,
পরানে স্বপন-রাশি,
চোখে চোখে চাওয়া-চাওয়ি, বাঁধাবাঁধি হাতে হাতে।
তেমনি রয়েছে তবু কি যেন নাহিক তাতে !
তেমনি সকলি আছে,
শুধু সে দিনটি গেছে,
নবীন মুহূর্ত্ত শুধু পিছাইয়া পড়িয়াছে।
সেই মুখ সেই হাসি,
সেই ভালবাসাবাসি,
কথায় কথায় শুধু অশ্রুধারা থামিয়াছে।
কিছুই নাহিক তাই যদিও সে সবি আছে !

থামাও বাঁশরী-তান

বেদনা-আকুল প্রাণ, অন্ধ আঁখি আঁখি-নীরে,
কার পথ নিরখিয়ে দাঁড়াইয়ে আছি তীরে ?
তীরে চলে শত শত, আসে যায় লোক কত,
কোথায় সে, কোথায় সে আঁখি শুধু খুঁজে ফিরে।
আসিবে কি ? আসিবে না—পাষাণ নিষ্ঠুর ধরা,
কে কার আপন হেথা ? কে কাহারে দেয় ধরা ?
শূন্য হেথা ব্যবধান, দেয় না কেহ ত দেখা,
সব দূর, সব পর, সব হেথা একা একা !

* * *

গেল যুগান্তর বেলা, স্তব্ধ ঘোর সন্ধ্যা-কায়া,
কাঁপিছে নদীর বুকে নিরাশ মৃত্যুর ছায়া।
সুদূরেতে সঙ্গীত এ কি বাঁশরীতে কার ভাষ?
মরণের কালে সাড়া কি দারুণ উপহাস!
এলে যদি এস কাছে কেন দাঁড়াইয়া দূরে?
দেখাও অমৃত নদী অনন্ত পিপাসাতুরে।
বলহীন জীর্ণদেহ দীর্ঘ জাগরণ নিয়ে—
জীবন্ত সমাধি শুধু রহিয়াছে দাঁড়াইয়ে।
নিকটে যাইব আমি—ক্ষমতা কি আছে হা রে।
এলে যদি এস কাছে. কেন দাঁড়াইয়া পারে?
আসিবে না? বেশ তবে থামাও বাঁশরী তান;
কঠোর বজ্রের চাহি করুণার অবসান!

———

উপহার

তেমনি রয়েছে সাধ, সখি রে. সে সব কোথা!
চাঁদিনী যমুনা-তীরে,
কই সেই হাসিটি রে?
তটিনীর কলতানে সেই চুপি চুপি কথা?
উল্লাসের মাঝখানে,
কোথা সে প্রেমের গানে,
আঁখি দুটি ছল ছল মিছে অভিমান ছুতা?
হেসে এসে কেঁদে যাওয়া,
যেতে যেতে ফিরে চাওয়া,
থমকি দাঁড়ান সেই, অনিমেষ আঁখি-পাতা?
নেই ত সে দেখা-শোনা,
নেই সে মুহূর্ত্ত গোণা,
সে সব কিছুই নেই, প্রাণে শুধু আছে ব্যথা;
মনে শুধু আছে স্মৃতি,
হৃদে শুধু জাগে প্রীতি,
ফুল ফোটা গেছে ঘুচে বেঁচে তবু আছে লতা।

থাক, সখি, তাই থাক,
ধর, তবে তাই রাখ,
সেই স্মৃতি প্রীতি দিয়ে, সখি, এ মালিকা গাঁথা !

———

ভাই-বোন

পরিপূর্ণ জ্যোছনায় মগ্ন দশদিশি !
সুখেতে মরম-হারা অতি স্তব্ধ নিশি।
রজনীর কানে কানে কি কথা কহে কে জানে,
বারে বারে ধীরে আসি মলয়-বাতাস ;
নিশার আলোক কায়, ফেলিয়া মলিন ছায়,
কাঁপি কাঁপি ছাড়ে তরু আকুল নিঃশ্বাস
তটিনী-কোমল বুকে সে দুঃখে জাগায় ব্যথা,
মৃদু মৃদু কল্লোলি সে কহে সান্ত্বনার কথা।
তরীখানি এ সময়ে ধীরে ধীরে যায় বয়ে,
কে মরি, সোনার ছেলে তোরা ভাই-বোনে ?
জ্যোছনার হাসিরাশি, মুখেতে পড়েছে আসি,
কচি মুখে চুমি খায় প্রাণের যতনে।
অধরে জ্যোছনা ভাসে, বোন দুটি চায় হেসে,
চুলগুলি আশে পাশে করে দুল দুল—
কচি মুখে হাসে আধো, গান গায় বাধো বাধো,
আর কিছু নয় তারা বসন্তের ফুল !
এক হাতে বায় তরী আর হাতে গলা ধরি,
চুমি দেয় ধীরে ধীরে ভাইটি চপল ;
কেন রে এমন প্রাণ ! ও গানে মিলাতে তান,
বেসুরো নীরস কণ্ঠে চাহে অবিরল !
শুষ্ক এ তরুর শাখে, একটি না পাখী ডাকে,
একটি নবীন পাতা নাহি এর পরে ;
শৈশবের খেলাধূলা, যৌবনের হাসি আশা,
একটি নাহিক হেথা পড়িয়াছে ঝ'রে !

এবে বসন্তের বায়, কেন রে এ শুষ্ক কায়,
সহসা শিহরি উঠে অঙ্কুরিতে চায় ?
একটি নবীন পাতা হয়ত বা অঙ্কুরিবে
আবার শুকাবে, সব ফুরাইবে হায় !
সত্যকার ছবি এ কি, আজিকে সম্মুখে দেখি ?
কিংবা নিশীথিনী দেখে সুখের স্বপন ?
সত্য বলে পরকাশে, এখনি মিলাবে হেসে,
যখনি প্রভাত রাণী মেলিবে নয়ন ।
কত স্বপ্ন দেখিয়াছি, আবার গিয়াছে ভাঙ্গি,
এক ফোঁটা অশ্রু শুধু একটি নিঃশ্বাস—
সেই স্বপনের শেষে দেখেছি রয়েছে প'ড়ে,
স্বপ্নের অস্তিত্বে বুঝি জাগাতে বিশ্বাস ।
ছিল যারা নাই আর, কোথায় কে জানে ?
আকুল পরাণে চাহি অন্তরের পানে ;
অশ্রুতে পরাণ ভাসে, ধীরে আঁখি মুদে আসে,
জগৎ মিলায় ধীরে আঁধার নয়ানে ।
এও যদি স্বপ্ন হয় আবার ভাঙ্গিবে নয় !
কে তোরা সোনার ছেলে, দেখি দেখি আয়—
একবার কোলে করি, কূলে নিয়ে আয় তরী,
সুধামুখে চুমি খাব আয় আয় আয় ।
নিয়ে যাবি সাথে ক'রে ? হেরি দিনরাত ধ'রে
সরল হরিণ-কান্তি জ্যোছনার হাসি,
তোমরা করিবে খেলা, খেলেনা হইব আমি,
তুলিয়া আনিয়া দিব ফুল রাশি রাশি ।
শ্রান্ত হয়ে ঘুম এলে, বিছানা পাতিব কোলে,
ভাই-বোনে ঘুমাইবি কোলেতে আমার ।
ঘুমন্ত সুখের হাসি, অধরে বেড়াবে ভাসি,
পুলকে দেখিব বসি অবিশ্রান্ত অনিবার ।
অস্তে যাবে চন্দ্র তারা উদিবেক রবি পুন,
আবার পশিবে দিন রজনীর প্রাণে ;

কালেরে ডুবায়ে দিব কালের মহান্ কোলে,
অনন্ত চাহিয়া রবে অবাক নয়নে।
কে তোরা সোনার ছেলে দেখি দেখি আয়,
একবার কোলে করি, কূলে নিয়ে আয় তরী,
কচিমুখে চুমি খাব আয় আয় আয়।

আশা

অস্তমিত চন্দ্র-তনু কম্পিত তমস-তনু,
স্তব্ধ ঘোরা দ্বিপ্রহরা নিশি;
নির্ম্মল অম্বরতলে, সহস্র তারকা জ্বলে,
নিদ্রায় আকুলা দশদিশি।
বায়ু বহে ধীরে ধীরে, আঁধার সরসী তীরে,
গাছ-পালা কাঁপে মুহুর্মুহু;
চক্রবাক চক্রবাকী, সাড়া দেয় থাকি থাকি,
ঘুমঘোরে ডাকে পিক কুহু।
খদ্যোতিকা দলে দলে, এই নিভে এই জ্বলে,
স্বপনেতে যেন কাঁদে হাসে;
কুটীরে মাটীর দীপ, করিতেছে টিপ টিপ,
শিশু শুয়ে জননীর পাশে।
পুটপুটে দাঁত দুটি, হাসিতে রয়েছে ফুটি,
কচি অধরের মাঝখানে;
ভাঙ্গা জানালাটি দিয়ে, বৃহস্পতি আছে চেয়ে,
বিমল সে মধুর মুখ পানে।
থাক, শিশু, ঘুমাইয়া, এই পুণ্য প্রাণ নিয়া,
যৌবনে উঠিও জাগি তুমি;
আশীর্ব্বাদ পূর্ণ হবে, সবে ধন্য ধন্য কবে,
পবিত্র হইবে মাতৃভূমি!

কেন এ সংশয় ?

সারাদিন কেন এ সংশয় ?
সত্য যাহা রবে তাই
মিথ্যার নাহি ত ঠাঁই,
মঙ্গল রহিবে শুধু, অমঙ্গল নয় ।
তবে কেন সদা মোর,
প্রাণে এ ভয়ের ঘোর ?
এই বুঝি মু'খানির নিভে যায় হাসি !
উজল নয়নে বুঝি বহে অশ্রুরাশি ?
বৃথা বৃথা সারাদিন বৃথা আকুলতা !
অনৃতের শূন্য মূলে জড়িত এ ব্যথা !
দুঃখ বিষ কেবা কহে ? সে সুধা গরল নহে,
অনল সে দহে সোনা আনে পবিত্রতা ;
আঁধার লইয়া আসে প্রভাত-বারতা ।
আসে যদি দুঃখ-শোক, আসুক তাহাই হোক,
না হয় ও হাসি-মুখ হবে অশ্রুময় ;
চপল হাসির পাকে, যা কিছু পঙ্কিল থাকে,
বিমল অশ্রুতে ধুয়ে হয়ে যাবে ক্ষয় ।
সুন্দর যা রবে তাই, মন্দের নাহি ত ঠাঁই,
মঙ্গল রহে গো শুধু, অমঙ্গল নয় ।
বৃথা তবে সারাদিন বৃথা এ সংশয় ।

অশ্রু-জল

কেন, অশ্রু-জল,
স্বরগ-সৌন্দর্য্য তোর মুখে
হৃদয়েতে দারুণ গরল ?
পাছে মৃদু নিশ্বাসের বায়ে,
পাছে কোন উপহাস ঘায়ে,
অশ্রু তোর বহে, অশ্রুজল,

ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে,
হৃদে রাখি লুকায়ে যতনে,
তারি কি রে দিস্ প্রতিফল ?
কেন, অশ্রু-জল,
ফুল হ'তে হয়ে সুকোমল,
ধরিস্ বজ্রের হিয়া বল ?
কত যে রে ভালবেসে তোরে,
কত যে প্রাণের মত ক'রে,
হৃদয়ের রক্ত পিয়াইয়া,
সোহাগে রাখিতে চাহি সদা,
হৃদিমাঝে ঘুম পাড়াইয়া।
কেবলি শোণিত পান ক'রে
সাধ কেন মেটে না তোর,
দেখিবারে হৃদয়-শোণিত
কেন এত আমোদেতে ভোর ?
হৃদি-রক্তে সবল হইয়া,
মনসাধে হৃদি দংশিয়া,
রক্ত-নদী বহাইয়া বুকে,
দেখিস্ বড়ই মনসুখে !
কুটিল অমন কেন সে রে,
মুখ যার এমন বিমল ?
জুড়াইতে হৃদয়-বেদনা,
জুড়াইতে হৃদয়-যাতনা,
হৃদয়ের সখা মনে করি,
হৃদে তোরে যত চেপে ধরি,
ততই যে ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া
ফেলিস্ রে মরমের তল !
কেন, অশ্রু-জল,
সুকোমল দেহখানি ল'য়ে
দারুণ নিঠুর হেন বল্ ?

নহে তিরস্কার

১

এ অশ্রু তোমার প্রতি নহে তিরস্কার,
ভুল ভাল বেসেছিলে, কি দোষ তোমার ?
এখন ভেঙ্গেছে মোহ, ফুরায়ে গেয়েছে স্নেহ,
তোমার কি হাত তাহে, কপাল আমার !
কে কার কাঁদাতে পারে এ নিখিল ভবে ?
আপনার কর্ম্মফলে কেঁদে মরি সবে !
নিজ দোষে কাঁদি আমি, তুমি কি করিবে স্বামি !
ভয় নাই, এ অশ্রু না চিরদিন রবে !

২

আমি কাঁদি রাগ ক'রে আপনার প্রতি,
ভুলিতে পারিনে ব'লে পুরাতন স্মৃতি।
মঙ্গল-আগার ধরা, নবীন সৌন্দর্য্যভরা,
তার মাঝে কেন জাগে শবের মূরতি ?
আমি কাঁদি দু-জনের কেন হোল দেখা,
তাই ত এ ভুল তুমি করিয়াছ, সখা !
বিশ্বাস কর হে, নাথ, তাই ত এই অশ্রুপাত,
ভুলিয়াছ ব'লে নহে তিরস্কার বাঁকা !

বল বারবার

যা বলিছ আজ, সখা, নূতন ত নহে,
সর্ব্বকালে সর্ব্বজনে ঐ কথা কহে ;
আমিও ত চিরদিন জানিতাম মনে,
সৃজনের বিড়ম্বনা নারী এ ভুবনে।
দুঃখ জ্বালা কাঁটা মোরা অশুভ অহিত ;
তুমি শুধু বলিতে গো তার বিপরীত,
এমনি নূতন কথা, এত অপরূপ,
বিস্ময়ে উল্লাসে আমি রহিতাম চুপ।

আজন্ম বিশ্বাস তাহে টলিত তখন,
ভ্রান্ত কি হইতে পারে তোমার বচন।
বুঝিতে নারিনু তাহা মমতার ভুল,
বিধাতার মায়া যথা জগতের মূল।
প্রণয় ভেঙ্গেছে এবে ভাঙ্গিয়াছে মোহ,
পেয়েছে যা দিব্য সত্য, ভাল ক'রে কহ।
প্রাণের সংশয় ধাঁধা মিটুক আমার;
হউক সত্যের জয়—বল বারবার!

*　　*　　*
*　　*　　*
*　　*　　*

সখি গো—
জানি আমি নারী হীন অভাজন অতি,
কোন গুণ নাই শুধু জগতের ক্ষতি;
অন্য কোন প্রমাণের নাহি প্রয়োজন,
তোমার বিস্মৃতি আর তোমার বচন।
সযতনে হৃদিমাঝে ধরিয়া আগ্রহে—
বুঝিলে যা চাহ তুমি তাহা ত এ নহে।
সহসা প্রণয় তব হইল মলিন,
উচ্চ নীচে, সুখে দুখে, নাহি হয় লীন।
দোষ কিন্তু সদা চাহে গুণের আশ্রয়,
আর যাহা মিথ্যা হোক ইহা মিথ্যা নয়।
আর সব সত্য, মিথ্যা ঐটুকু শুধু;
রমণীর প্রেম নহে প্রতারণা মধু।
খাটি সত্য ঐখানে, নহে ফাঁকি শূন্য,
সহস্র দোষের মাঝে ঐটুকু পুণ্য।
করিয়াছ ভালবেসে ভুল একবার,
শত দোষ গুণ ছিল নয়নে তোমার।
পাইয়াছ সত্য, খুলে গেছে আঁখি-অন্ধ,
এখন ওটুকু পুন অপ্রেমের ধন্ধ।

যখন সহে না প্রাণে যাতনা বিষম,
মনে হয় একবার ভাঙুক ও ভ্রম !
কাজ নাই কাজ নাই ! কেমনে সহিবে ?
যে দিন বুঝিবে সত্য নয়ন খুলিবে—
বড় তীব্র বাজিবে সে অনুতাপ-ব্যথা,
বুঝে কাজ নাই তবে যাহা সত্য কথা।
মধুর মিথ্যার মাঝে থাক চিরদিন,
হউক কঠোর সত্য আমাতে বিলীন।
মিথ্যা নহে সব সত্য, বল বার বার ;
প্রাণের সংশয় ধাঁধা ঘুচুক আমার !

———

ভুলে যেতে গিয়াছি ভুলিয়া

মনে যেন পড়িছে এখন,
এক দিন ছিল সে আপন ;
উঃ ! সে কি যুগ-যুগান্তর—
জ্যোৎস্নায় মগন চরাচর,
মরমর তরুর পাতায়,
বিহগের মধুর গাথায়,
উথলিত সন্ধ্যা উপবন,
উলসিত হৃদি প্রাণ মন,
বাহুপাশে বাঁধা দুই জনে,
চুপে কথা চুম্বনে চুম্বনে !
না জানি সে কত কাল গত !
স্মৃতি তার স্বপনের মত,
প্রাণপণে করিয়া যতন
জাগে যদি বিদ্যুৎ মতন,
তখনি মিলায় ধীরে ধীরে ;
যে আঁধার সে আঁধারে ঘিরে।

সমুখে সেই সে অমানিশি,
স্তম্ভিত নীরব দশদিশি,
দু'জনে বসিয়া কাছাকাছি ;
তবু দূরে—অতি দূরে আছি !
নক্ষত্রের ক্ষীণালোক ফুটি,
দেখাইছে বিরাগ ভ্রূকুটি ;
অশ্রুজলে উথলিত প্রাণ,
অভিমানে বিশুষ্ক নয়ান ;
সহসা চাহিয়া নভপ্রতি
কি দেখি এ ভীম দৃশ্য অতি !
অনলের বর্ষি শতধারা
চারিদিকে খসিতেছে তারা ;
ক্রোধে বিশ্ব উঠেছে রাঙ্গিয়া,
সৃষ্টি বুঝি পড়ে বা ভাঙ্গিয়া !
শিহরি চকিতে মুদি আঁখি,
সকাতরে 'নাথ' বলি ডাকি—
আলিঙ্গিতে বাহু প্রসারিয়া
ভূমিতলে পড়িনু লুটিয়া।
পুনঃ যবে দেখিলাম চাহি,
চারিদিকে কোথা কেহ নাহি ;
আঁধারে স্তম্ভিত চরাচর,
আমি শুধু পড়ে ভূমিপর ;
কোথায় সে গিয়াছে চলিয়া,
নিতান্তই একেলা ফেলিয়া !
এই মোর প্রণয়ের স্মৃতি,
এই মোর জীবনের মায়া,
এই মোর হৃদয়ের গান,
ভুলে যেতে গিয়াছি ভুলিয়া !

———

একা আমি যাত্রী

এ কি দেখি দুঃস্বপন ঘোর !
অন্তহীন মহা ভীম রাত্রি,
জীবনের সুদুস্তর পথে
চলিয়াছি একা আমি যাত্রী ;
সাথী নাই সঙ্গী নাই কেহ ;
স্তব্ধ শূন্য কোথা নাহি কেহ ;
দুর্ব্বল মুমূর্ষু প্রাণ নিয়ে
চলেছে একটি ক্ষীণ দেহ !
সত্য ইহা—নহে স্বপ্ন-ভ্রম !
পারি না ত পারি না ত আর !
কোথায় আশ্রয় কোথা পাব ?
অন্ধকার মহা অন্ধকার !
ঐ উঠে প্রতিধ্বনি শুন,
'দীনের আশ্রয় হেথা নাই,
যে চাহে বাঁচিতে এই পথে
বল চাই, বল তার চাই !
সঙ্গী মিলিবে না হেথা,
যাবে যদি একা যাও চ'লে ;
না পার পড়িয়া থাক ভূমে,
কঠিন যাউক পদে দ'লে ;
এই তব জীবনের সুখ !
ফেলো না নিশ্বাস অশ্রুজল,
দুর্ব্বলের বল বিন্দু দানে
সবলের পূর্ণ কর বল !'

উচ্চৈঃশ্রবা ল'য়ে যথা ঘটিল বিবাদ ;
দ্বৈতাদ্বৈতবাদী যথা আরোপি ঈশ্বরে
সগুণ নির্গুণ দ্বন্দ্ব করি সদা মরে !'

হা ধিক্ মানব !

হা ধিক্ মানব, তুই কি করিলি, হীন ।
অনন্ত শকতি তোর অক্ষয় ভাণ্ডার,
অনন্ত প্রেমের স্ফূর্তি ইচ্ছার অধীন ;
জানিয়াও জানিলিনে ব্যবহার তার !
চৌদিকে ছড়ান এই ব্রহ্মাণ্ড অপার
ছাপিয়া উঠেছে তোর জীবন্ত মহিমা ;
অনন্ত জীবনের নিত্য পারাবার
অনন্ত জ্ঞানের জ্যোতি, নাহি তার সীমা ।
ক্ষুদ্র জড় শক্তি পৃথ্বী, অতি ক্ষুদ্র ওরে
অপ্রেম অন্যায় মিথ্যা প্রবৃত্তির কণা ।
বুঝিতে পারিনে কোন্ বিস্মৃতির ভরে
তারি মাঝে হারাইলি মহান্ আপনা ?
অনন্ত আনন্দ-জ্যোতি দিলি বিনিময়,
লভি শুধু এক বিন্দু আঁধার সংশয় !

সমাপ্ত

স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী

[কালানুক্রমিক তালিকা।]

১। দীপনির্বাণ (উপন্যাস) ॥ ১৮৭৬
২। বসন্ত-উৎসব (গীতিনাট্য) ॥ ১৮৭৯
৩। ছিন্নমুকুল (উপন্যাস) ॥ ১৮৭৯
৪। মালতী (উপন্যাস) ॥ ১৮৮০
৫। গাথা (কবিতা) ॥ ১৮৮০
৬। পৃথিবী (বৈজ্ঞানিক পুস্তক) ॥ ১৮৮২
৭। সখী-সমিতি ॥ ১৮৮৬
৮। মিবাররাজ (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ॥ ১৮৮৭
৯। হুগলীর ইমামবাড়ী (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ॥ ১৮৮৮
১০। স্নেহলতা বা পালিতা (উপন্যাস) ॥ ১ম খণ্ড-১৮৯০ ॥ ২য় খণ্ড—১৮৯৩
১১। বিদ্রোহ (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ॥ ১৮৯০
১২। বিবাহ উৎসব (নাটক) ॥ ১৮৯২
১৩। নবকাহিনী (ছোট গল্প ?) ॥ ১৮৯২
১৪। ফুলের মালা (উপন্যাস) ॥ ১৮৯৫
১৫। কবিতা ও গান ॥ ১৮৯৫
১৬। কাহাকে (উপন্যাস) ॥ ১৮৯৮
১৭। কৌতুকনাট্য ও বিবিধ কথা ॥ ১৯০১
১৮। দেবকৌতুক (কাব্যনাট্য) ॥ ১৯০৬
১৯। কনে-বদল (প্রহসন) ॥ ১৯০৬
২০। পাকচক্র (প্রহসন) ॥ ১৯১১
২১। রাজকন্যা (নাটক) ॥ ১৯১৩
২২। নিবেদিতা (নাটক) ॥ ১৯১৭
২৩। যুগান্ত (কাব্যনাট্য) ॥ ১৯১৮
২৪। বিচিত্রা (উপন্যাস) ॥ ১৯২০